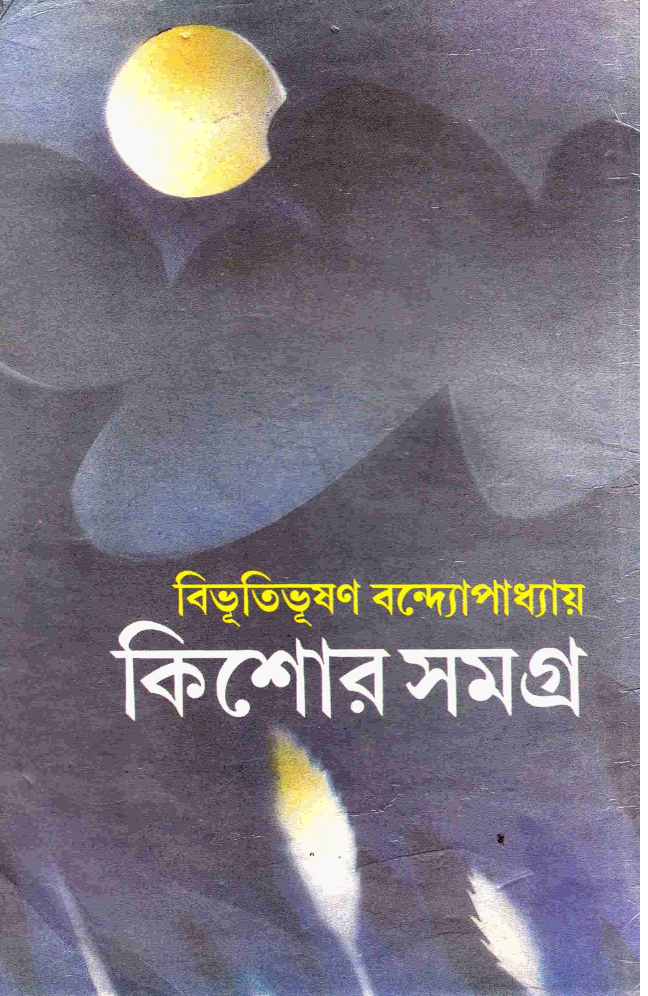

ভূমিকা

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যকে যে কজন লেখক বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। প্রকৃতি এবং মানুষের সম্পর্কের মধ্যকার গভীর অনুভবযোগ্য এক রহস্যময় মাধুর্যের রঙিনাভা ফুটে উঠেছে তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসে। প্রকৃতির প্রাণের স্পর্শকে তিনি নিজের প্রাণে অনুভব করেছেন নিবিড়-গভীরভাবে। সেই নিবিড়-গভীর অনুভবকে আবার মূর্ত করে তুলেছেন অনবদ্য কলমে। জীবন ও প্রকৃতির এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে বলময় করার ক্ষেত্রে উত্তুঙ্গ শৈল্পিক সাফল্য দেখানোর কারণেই সম্ভবত বিভূতিভূষণ বাঙালি পাঠকদের কাছে বারবার স্মরণীয় হয়ে ওঠেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ইংরেজি ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর; তৎকালীন যশোর, বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার বনগ্রাম মহকুমার ব্যারাকপুর গ্রামে। কথকতা ছিল তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেশা। বিভূতিভূষণ বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯১৪ সালে প্রবেশিকা, ১৯১৬ সালে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই এ এবং ১৯১৮ সালে একই কলেজ থেকে ডিস্টিংশন সহ বি এ পাশ করেন। এম এ এবং আইন ক্লাসে ভর্তি হলেও নানা বাস্তব কারণে তাঁর পক্ষে পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয় নি। লেখাপড়া ছেড়ে ১৯১৯ সালে যোগ দেন শিক্ষকতা পেশায়। কিছুকাল হুগলি জেলার জঙ্গিপাড়ার মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এক বছরেরও কিছু বেশি সময় ধরে একই পেশায় ২৪ পরগণার হরিণাভি গ্রামের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে কর্মরত থাকাকালেই সাহিত্যিক জীবনের শুরু। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'উপেক্ষিতা' নামের একটি ছোটগল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। কিছুকাল সেখানে চাকরি করার পর বিভূতিভূষণ ১৯২২ সালে গোরক্ষণী সভার প্রচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। এই উপলক্ষে তিনি বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা এবং আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তারপর ১৯২৩ সাল থেকে জমিদার খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে কিছুদিন সেক্রেটারি এবং গৃহশিক্ষকের কাজ করেন। তারপর খেলাত ঘোষের জমিদারী ভাগলপুর এস্টেট-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালের শেষভাগ পর্যন্ত বিভূতিভূষণ এখানেই অবস্থান করেন। এ উপলক্ষে ভাগলপুরে অবস্থানকালেই রচনা করেন বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। বি এ ক্লাসে অধ্যয়নকালে তিনি গৌরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই গৌরী দেবীর মৃত্যু ঘটলে বিভূতিভূষণের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। কিছুকাল প্রায় সন্ন্যাসী জীবন যাপন করেন। এই ঘটনা ঘটে ১৯১৮ সালে। এর অনেক পরে ১৯৪০ সালের ৩ ডিসেম্বর তিনি রমা দেবীকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয় বিয়ের সাত বছর পর একমাত্র পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ১৯৪২ সাল থেকে বিভূতিভূষণ স্থায়ীভাবে ব্যারাকপুরে বসবাস করতে শুরু করেন। এখানে অবস্থানকালেই তাঁর অধিকাংশ সাহিত্যের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি বিহারের ঘাটশীলাতেও বসবাসের জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করেন। বছরের কয়েকমাস অবসর যাপনের জন্য সস্ত্রীক সেখানে বেড়াতে যেতেন। এই ঘাটশীলাতেই ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর গ্রন্থগুলো হচ্ছে—**উপন্যাস :** পথের পাঁচালী (১৯২৯); অপরাজিত (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৩২); দৃষ্টি-প্রদীপ (১৯৩৫); আরণ্যক (১৯৩৯); আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০); বিপিনের সংসার (১৯৪১); দুই বাড়ি (১৯৪১); অনুবর্তন (১৯৪২); দেবযান (১৯৪৪); কেদার রাজা (১৯৪৫); অথৈ জল (১৯৪৭); ইছামতী (১৯৫০); অশনি সংকেত (অসমাপ্ত, বঙ্গাব্দ (১৩৬৬); দম্পতি (১৯৫২)। **গল্প-সংকলন :** মেঘমল্লার (১৯৩২); মৌরীফুল (১৯৩২); যাত্রাবদল (১৯৩৪) জন্ম

ও মৃত্যু (১৯৩৮); কিন্নরদল (১৯৩৮); বেণীগির ফুলবাড়ি (১৯৪১); নবাগত (১৯৪৪); ক্ষণভঙ্গুর (১৯৪৫); অসাধারণ (১৯৪৬); মুখোশ ও মুখশ্রী (১৯৪৭); আচার্য কৃপালনী কলোনি (বর্তমান নাম 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব') (১৯৪৮); জ্যোতিরিঙ্গন (১৯৪৯); কুশল-পাহাড়ী ১৯৫০); রূপহলুদ (১৯৫৭); অনুসন্ধান (বঙ্গাব্দ ১৩৬৬); ছায়াছবি (বঙ্গাব্দ ১৩৬৬); সুলোচনা (১৯৬৩)। **ভ্রমণ-কাহিনী ও দিনলিপি :** অভিযাত্রিক (১৯৪০); স্মৃতির রেখা (১৯৪১); তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩); উর্মিমুখর (১৯৪৪); বনে পাহাড়ে (১৯৪৫); উৎকর্ণ (১৯৪৬); হে অরণ্য কথা কও (১৯৪৮)। **কিশোর-পাঠ্য :** চাঁদের পাহাড় (১৯৩৮); মরণের ডঙ্কা বাজে (১৯৪০); মিসমিদের কবচ (১৯৪২); তালনবমী (১৯৪৪) আম আঁটির ভেঁপু (১৯৪৫); হীরা মাণিক জ্বলে (১৯৪৬)। **অনুবাদ :** আইভ্যানহো (সংক্ষেপানুবাদ, ১৯৩৮); **বিবিধ :** বিচিত্র জগৎ (১৯৩৭); টমাস বাটার আত্মজীবনী (১৯৪৩); আমার লেখা (বঙ্গাব্দ ১৩৬৮)। সুন্দরবনে সাত বৎসর (ভুবনমোহন রায়ের সহযোগিতায়, ১৯৫২)

বাঙালি মানসের নাড়ির সন্ধান জানা ছিল তাঁর। সে জন্যেই কিশোরদের জন্য লেখা উপন্যাসগুলোতে বাঙালি তারুণ্যের দুঃসাহিকতা, বীরত্ব, সাহস, মনবিকবোধ হয়ে ওঠে তাঁর উপজীব্য বিষয়। ছোটদের জন্য খুব বেশি লেখার সুযোগ তাঁর হয় নি। 'চাঁদের পাহাড়', 'মরণের ডঙ্কা বাজে', 'মিসমিদের কবচ' এবং 'হীরামানিক জ্বলে' এই চারটি মাত্র উপন্যাস লিখেছিলেন ছোটদের জন্য। চারটি উপন্যাসেরই নায়ক বাঙালির ছেলে। এর মধ্যে তিনটি অ্যাডভেঞ্চার আর একটি গোয়েন্দা গল্প।

ছোটদেরকে উদ্দেশ্য করে রচিত বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়'। প্রথমে ধারাবাহিকভাবে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বই আকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭ সালে। ছোটদের উপন্যাস হিসাবে সম্ভবত 'চাঁদের পাহাড়'ই শ্রেষ্ঠতম। 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের ভূমিকায় বিভূতিভূষণ বলেছেন, "চাঁদের পাহাড়' কোনো ইংরেজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি স্যার এইচ. এইচ. জনস্টন, রেসিটা ফরবস প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি। এই গল্পে উল্লিখিত রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা মধ্য-আফ্রিকার অতি প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী এবং ডিঙ্গোনেক 'রোডেসিয়ন মনস্টার' ও বুনিপের প্রবাদ জুলুল্যাণ্ডের বহু আরণ্য অঞ্চলে আজও প্রচলিত।' ...

'চাঁদের পাহাড়'-এ অনুভূত হয় কল্পনা ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়। বাঙালির ছেলে শঙ্করকে লেখক আফ্রিকার জঙ্গলে যে রোমাঞ্চকর অভিযাত্রায় পাঠিয়েছেন তা যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে এই বইয়ে। তাই বলা যায় কল্পনায় তিনি 'কবি' এবং বর্ণনায় 'বাস্তবের চিত্রী'। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে এই ধারার লেখায় আর কেউ এমন সাফল্য লাভ করেন নি। যথার্থ অর্থে অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসও বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে খুব বেশি লেখা হয় নি। সেদিক থেকেও বিভূতিভূষণ অনন্যসাধারণ।

'মরণের ডঙ্কা বাজে' বিভূতিভূষণের ছোটদের জন্য লেখা দ্বিতীয় উপন্যাস। এটিও প্রথমে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৪০ সালে। 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসটিতেও বাস্তব এবং কল্পনার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। বাস্তব ঘটনা এখানে চীন-জাপান যুদ্ধ আর কল্পনা বাঙালি দুই তরুণের সেই যুদ্ধের মধ্যে পড়ে ঘটনা প্রত্যক্ষণ। যুদ্ধের এমন প্রাণস্পর্শী বর্ণনা বাংলা সাহিত্যেই দুর্লভ। এর মধ্যেই আবার লেখক কুটিয়ে তুলেছেন মানুষের মানবিক বোধগুলোকে। প্রতিমুহূর্তের লোমহর্ষক মৃত্যুভীতির অনুভব যেন জীবন্ত হয়ে দেখা দেয় এই বইয়ে।

'মিসমিদের কবচ' বিভূতিভূষণের তৃতীয় কিশোর উপন্যাস এবং একমাত্র গোয়েন্দা রচনা। এটি কোনো পত্রিকায় আগে প্রকাশিত হয় নি। সরাসরি দেবসাহিত্য কুটির থেকে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ'-এর' আওতায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। বাংলা দেশের একটি হত্যাকাণ্ডের কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। গোয়েন্দা কাহিনী হিসেবে গঠনশৈলীর দিক থেকে 'মিসমিদের কবচ' কিছুটা দুর্বল হলেও 'মিসমিদের কবচ'-এর প্রসঙ্গটি বেশ রোমাঞ্চকরভাবে তিনি তুলে ধরেছেন।

'হীরামানিক জ্বলে' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর চতুর্থ উপন্যাস। এটি 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বই আকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬ সালে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাস, আকাশতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূগোল ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে তাঁর যে আগ্রহ ছিল তা এই উপন্যাসের ঘটনা সংস্থাপন এবং বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। বাংলার সুন্দরপুর গ্রামের সুশীল আত্মমর্যাদার অহংকারে দীপ্তিমান এক তরুণ। এককালের অভিজাত ধনী পরিবারের সন্তান বলে দারিদ্র্যপীড়িত হয়েও সে চাকরিতে ইচ্ছুক নয়। হঠাৎ দেখা হওয়া নাবিকের প্ররোচনায় গুপ্তধনের সন্ধানে ভারত মহাসাগরের বুকে ভেসে পড়ে সে। অনেক বাধা-বিপদ-দুর্ভোগ অতিক্রম করে অনেক পরিশ্রমে পাওয়া গুপ্তধন নিয়ে সে দেশে ফেরে। পথে প্রিয়তম ভ্রমণসঙ্গীকে রেখে আসার বেদনাও সঙ্গী হয় আনন্দের উল্টো পিঠে।

'আম আঁটির ভেঁপু' আলাদাভাবে ছোটদের জন্য লেখা উপন্যাস নয়। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একটি অংশের নাম 'আম আঁটির ভেঁপু'। বালক অপু ও তার কিশোরী দিদি দুর্গার দিনগুলি এই অংশের উপজীব্য। কিছুটা সংক্ষেপ করে একটি স্বতন্ত্র কিশোর উপন্যাস হিসাবে 'আম আঁটির ভেঁপু' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ সমৃদ্ধ সিগনেট প্রেস প্রকাশিত এই উপন্যাসটি দীর্ঘকাল ধরে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। সে কারণে 'আম আঁটির ভেঁপু'কে কিশোর সমগ্র'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হল। প্রকাশকাল অনুযায়ী লেখাগুলোকে সাজানো হয়েছে বলে রচনাকালের দিক থেকে অন্য সকল কিশোর উপন্যাসের আগে এবং 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অংশ হিসাবে আগেই গ্রন্থকারে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও 'আম আঁটির ভেঁপু'র ক্ষেত্রে এর বর্তমান রূপের প্রকাশকালকেই যথার্থ বিবেচনা করে অন্যান্য উপন্যাসের পরে এবং 'হীরা মানিক জ্বলে'র আগে স্থান দেয়া হল।

'তালনবমী' বিভূতিভূষণের একমাত্র কিশোর গল্পের সংকলন। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে সবগুলো গল্পই 'মৌচাক' সহ বিভিন্ন পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'তালনবমী'তে মোট ১১টি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তিনটি কিশোরপাঠ্য গল্পও 'কিশোর সমগ্র'তে অন্তর্ভুক্ত হল। এই গল্পগুলোও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পগুলোর মধ্যেও 'বিচিত্র বিষয় ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে বিভূতিভূষণের বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

গত ১২ সেপ্টেম্বর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়ে গেল। এমন এক সময়ে বিভূতিভূষণের কিশোরপাঠ্য রচনাগুলো বাংলাদেশের শিশু-কিশোর পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলা বানানের সমতা বিধানের যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সেই রীতি প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে লেখকের ব্যকরীতি ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হয় নি।

আহমাদ মাযহার
৩৩৫ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ঢাকা ১২০৫

১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৫

চাঁদের পাহাড়

সূচি

চাঁদের পাহাড় / ১
মরণের ডঙ্কা বাজে / ৭১
তালনবমী / ৭৬
আঁম আঁটির ভেঁপু / ৪১
হিরামাণিক জ্বলে / ৯৩
মিসমিদের কবচ /
গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গল্প /

শঙ্কর একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। এইবার সে সবে এফ. এ. [redacted] গ্রামে বসেছে। কাজের মধ্যে সকালে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, দুপুরে আহারান্তে লম্বা ঘুম, বিকেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া।

সারা বৈশাখ এভাবে কাটাবার পরে একদিন তার মা ডেকে বললেন—শোন একটা কথা বলি শঙ্কর। তোর বাবার শরীর ভাল নয়। এ অবস্থায় আর তোর পড়াশুনো হবে কী করে? কে খরচ দেবে? এইবার একটা কিছু কাজের চেষ্টা দ্যাখ।

মায়ের কথাটা শঙ্করকে ভাবিয়ে তুললে। সত্যিই তার বাবার শরীর আজ কমাস থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে। কলকাতার খরচ দেওয়া তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠচে। অথচ করবেই–বা কী শঙ্কর? এখন কি তাকে কেউ চাকরি দেবে? চেনেই–বা সে কাকে?

আমরা যে সময়ের কথা বলচি, ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধতে তখনও পাঁচ বছর দেরি। ১৯০৯ সালের কথা। তখন চাকরির বাজার এতটা খারাপ ছিল না। শঙ্করদের গ্রামের এক ভদ্রলোক শ্যামনগরে না নৈহাটিতে পাটের কলে চাকরি করতেন। শঙ্করের মা তাঁর স্ত্রীকে ছেলের চাকরির কথা বলে এলেন, যাতে তিনি স্বামীকে বলে শঙ্করের জন্যে পাটের কলে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক পরদিন বাড়ি বয়ে বলতে এলেন যে শঙ্করের চাকরির জন্যে তিনি চেষ্টা করবেন।

শঙ্কর সাধারণ ধরনের ছেলে নয়। স্কুলে পড়বার সময় সে বরাবর খেলাধুলোতে প্রথম হয়ে এসেছে। সেবার মহকুমার একজিবিশনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার করে মেডেল পায়। ফুটবলে অমন সেন্টার ফরওয়ার্ড ও–অঞ্চলে তখন কেউ ছিল না। সাঁতার দিতে তার জুড়ি খুঁজে মেলা ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বক্সিং–এ সে অত্যন্ত নিপুণ। কলকাতায় পড়বার সময় ওয়াই. এম. সি. এ.–তে সে রীতিমতো বক্সিং অভ্যাস করেচে। এইসব কারণে পরীক্ষায় সে তত ভাল করতে পারেনি, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু তার একটি বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। তার বার্তিক ছিল যত রাজ্যের ম্যাপ ঘাঁটা ও বড়–বড় ভূগোলের বই পড়া। ভূগোলের অঙ্ক কষতে সে খুব মজবুত। আমাদের দেশের আকাশে যেসব নক্ষত্রমণ্ডল ওঠে, তা সে প্রায় সবই চেনে—ওটা কালপুরুষ, ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া, ওটা বৃশ্চিক। কোন মাসে কোনটা ওঠে, কোন দিকে ওঠে—সব ওর নখদর্পণে। আকাশের দিকে চেয়ে তখনি বলে দেবে। আমাদের দেশের বেশি ছেলে যে এসব জানে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময় সে একরাশ ওইসব বই কিনে এনেছে, নির্জনে বসে প্রায়ই পড়ে আর কী ভাবে ও–ই জানে। তারপর এল তার বাবার অসুখ, সংসারের দারিদ্র্য এবং সঙ্গে–সঙ্গে মায়ের মুখে পাটকলে চাকরি নেওয়ার জন্যে অনুরোধ। কী করবে সে? সে নিতান্ত নিরুপায়। মা–বাপের মলিন মুখ সে দেখতে পারবে না। অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকরি নিতে হবে। কিন্তু জীবনের স্বপ্ন তা হলে ভেঙে যাবে, তাও সে যে না বোঝে এমন নয়। ফুটবলের নামকরা সেন্টার ফরওয়ার্ড, জেলার হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ান, নামজাদা সাঁতারু শঙ্কর হবে কিনা শেষে পাটের কলের বাবু? নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে

সকালের ভোঁ বাজতেই ছুটতে হবে কলে, আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা, ওদিকে সেই ছটার ভোঁ বাজলে ছুটি। তার তরুণ তাজা মন এর কথা ভাবতেই পারে না যে! ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাকড়া গাড়ি টানতে যাবে?

সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই। নদীর ধারে নির্জনে বসে-বসে শঙ্কর এইসব কথাই ভাবছিল। তার মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর, দূর দেশে—শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। লিভিংস্টোন, স্ট্যানলির মতো, হ্যারি জনস্টন, মার্কো পোলো, রবিনসন ক্রুসোর মতো। এর জন্যে ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরি করেছে—যদিও এ-কথা ভেবে দেখেনি অন্য দেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালি ছেলেদের পক্ষে তা ঘটা একরকম অসম্ভব। তারা তৈরি হয়েছে কেরানি, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হবার জন্যে। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাতপথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।

প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েস্টমার্কের বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল। এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে। সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ জার্মান ভূপর্যটক অ্যান্টন হাউপ্টমান লিখিত আফ্রিকার একটা বড় পর্বত—মাউনটেন অফ দি মুন (চাঁদের পাহাড়) আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ। কতবার সে এটা পড়েছে। পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের হাউপ্টমানের মতো সেও একদিন যাবে মাউনটেন অফ দি মুন জয় করতে।

স্বপ্ন! সত্যিকার চাঁদের পাহাড় দূরের জিনিসই চিরকাল। চাঁদের পাহাড় বুঝি পৃথিবীতে নামে?

সে-রাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল সে :

চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনো হাতির দল মড়মড় করে বাঁশ ভাঙচে। সে আর একজন কে তার সঙ্গে, দুজনে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে উঠেচে, চারধারের দৃশ্য ঠিক হাউপ্টমানের লেখা মাউনটেন অফ দি মুনের দৃশ্যের মতো। সেই ঘন বাঁশবন, সেই পরগাছা ঝোলানো বড়-বড় গাছ, নিচে পচাপাতার রাশ, মাঝে-মাঝে পাহাড়ের খালি গা, আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া সাদা ধবধবে চিরতুষারে ঢাকা পর্বত-শিখরটি এক-একবার দেখা যাচ্ছে, এক-একবার বনের আড়ালে চাপা পড়চে। পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে-ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতির গর্জন শুনতে পেলে....সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল, এত বাস্তব বলে মনে হল সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার উপর উঠে বসল, ভোর হয়ে গিয়েচে, জানলার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেচে।

উঃ, কী স্বপ্নটাই দেখেছে সে! ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয় বলে তো অনেকে।

অনেক দিন আগেকার একটা ভাঙা পুরনো মন্দির আছে তাদের গাঁয়ে। বারোভূঁইয়ার এক ভূঁইয়ার জামাই মদন রায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মন্দির তৈরি করেন। এখন মদন রায়ের বংশে কেউ নেই। মন্দির ভেঙেচুরে গিয়েছে, অশত্থগাছ, বটগাছ গজিয়েছে কার্নিসে—কিন্তু যেখানে ঠাকুরের বেদি তার উপরের খিলেনটা এখনও ঠিক আছে। কোনো মূর্তি নেই, তবুও শনি-মঙ্গলবারে পুজো হয়, মেয়েরা বেদিতে সিঁদুর-চন্দন মাখিয়ে রেখে যায়। সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত, যে যা মানত করে তা-ই হয়। শঙ্কর সেদিন স্নান করে উঠে মন্দিরে একটা বটের ঝুরির গায়ে একটা ঢিল ঝুলিয়ে কী প্রার্থনা জানিয়ে এল।

বিকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে দূর্বাঘাসের বনে বসে রইল। জায়গাটা পাড়ার মধ্যে হলেও বনে ঘেরা, কাছেই একটা পোড়ো বাড়ি; এদের বাড়িতে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল শঙ্করের শিশুকালে—সেই থেকে বাড়ির মালিক এ-গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাস করচেন। সবাই বলে জায়গাটায় ভূতের ভয়।....একা বড় কেউ এদিকে আসে না। শঙ্করের কিন্তু এই নির্জন মন্দির-প্রাঙ্গণের নিরালা বনে চুপ করে বসে থাকতে বড় ভাল লাগে।

ওর মনে আজ ভোরের স্বপ্নটা দাগ কেটে বসে গিয়েচে। এই বনের মধ্যে বসে শঙ্করের আবার সেই ছবিটা মনে পড়ল—সেই মড়মড় করে বাঁশঝাড় ভাঙচে বুনোহাতির দল, পাহাড়ের অধিত্যকার নিবিড় বনে পাতালতার ফাঁকে-ফাঁকে অনেক উঁচুতে পর্বতের জ্যোৎস্নাপাণ্ডুর তুষারাবৃত শিখরদেশটা যেন কোন সম্পরাজ্যের সীমা নির্দেশ করচে। কত স্বপ্ন তো সে দেখেচে জীবনে—অত সুস্পষ্ট ছবি স্বপ্নে সে দেখেনি কখনও, এমন গভীর রেখাপাত করেনি কোনো স্বপ্ন তার মনে।

সব মিথ্যে। তাকে যেতে হবে পাটের কলে চাকরি করতে। তা-ই তার ললাটলিপি, নয় কি?

কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা উপন্যাসে ঘটাতে গেলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে। শঙ্করের জীবনেও এমন একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল।

সকালবেলা সে একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে সবে বাড়িতে পা দিয়েচে, এমন সময়ে ওপাড়ার রামেশ্বর মুখুয্যের স্ত্রী একটুকরো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বললেন—বাবা শঙ্কর, আমার জামায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে অনেকদিন পরে। ভদ্রেশ্বরে ওদের বাড়িতে চিঠি দিয়েচে, কাল পিন্টু সেখান থেকে এসেচে, এই তার ঠিকানা তারা লিখে দিয়েচে। পড় তো বাবা।

শঙ্কর বললে—উঃ, প্রায় দুবছরের পর খোঁজ মিলল। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কী ভয়টাই দেখালেন! এর আগেও তো একবার পালিয়ে গেছলেন—না? তারপর সে কাগজটা খুললে। লেখা আছে—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউগান্ডা রেলওয়ে হেড অফিস কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট, মোম্বাসা, পূর্ব-আফ্রিকা।

শঙ্করের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা পড়ে গেল। পূর্ব-আফ্রিকা! পালিয়ে মানুষে এতদূর যায়? তবে সে জানে ননীবালাদিদির এই স্বামী অত্যন্ত একরোখা ডানপিটে ও ভবঘুরে ধরনের। একবার এই গ্রামেই তার সঙ্গে শঙ্করের আলাপও হয়েছিল, শঙ্কর তখন এনট্রান্স ক্লাসে সবে উঠেচে। লোকটা খুব উদার প্রকৃতির, লেখাপড়া ভালই জানে, তবে কোনো একটা চাকরিতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না, উড়ে বেড়ানো স্বভাব। আর একবার পালিয়ে বর্মা না কোচিন কোথায় যেন গিয়েছিল। এবারও বড়দাদার সঙ্গে কী নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার দরুন বাড়ি থেকে পালিয়েছিল এ-খবর শঙ্কর আগেই শুনেছিল। সেই প্রসাদবাবু পালিয়ে গিয়ে ঠেলে উঠেচে একেবারে পূর্ব-আফ্রিকায়!

রামেশ্বর মুখুয্যের স্ত্রী ভাল বুঝতে পারলেন না তাঁর জামাই কত দূরে গিয়েছে। অতটা দূরত্বের তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি চলে গেলে শঙ্কর ঠিকানাটা নিজের নোট বইয়ে লিখে রাখলে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই প্রসাদবাবুকে একখানা চিঠি দিলে। শঙ্করকে তাঁর মনে আছে কি? তাঁর শ্বশুর বাড়ির গাঁয়ের ছেলে সে। এবার এফ. এ. পাস দিয়ে বাড়িতে বসে আছে। তিনি কি একটা চাকরি করে দিতে পারেন তাঁদের

রেলের মধ্যে? যতদূরে হয় সে যাবে।

দেড়মাস পরে, যখন শঙ্কর প্রায় হতাশ হয়ে পড়েচে চিঠির উত্তরপ্রাপ্তি সম্বন্ধে, তখন একখানা খামের চিঠি এল শঙ্করের নামে। তাতে লেখা আছে :

মোম্বাসা
২নং পোর্ট স্ট্রীট

প্রিয় শঙ্কর,

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। কব্জির জোরে তোমার কাছে সেবার হেরে গিয়েছিলুম, সে-কথা ভুলিনি। তুমি আসবে এখানে? চলে এস। তোমার মতো ছেলে যদি বাইরে না বেরুবে তবে কে আর বেরুবে? এখানে নতুন রেল তৈরি হচ্ছে, আরও লোক নেবে। যত তাড়াতাড়ি পার এস। তোমার কাজ জুটিয়ে দেবার ভার আমি নিচ্ছি। তোমাদের—

প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করের বাবা চিঠি দেখে খুব খুশি। যৌবনে তিনিও নিজে ছিলেন ডানপিটে ধরনের লোক। ছেলে পাটের কলে চাকরি করতে যাবে তাঁর এতে মত ছিল না, শুধু সংসারের অভাব অনটনের দরুন শঙ্করের মায়ের মতেই সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর মাসখানেক পরে শঙ্করের নামে এক টেলিগ্রাম এল ভদ্রেশ্বর থেকে। সেই জামাইটি দেশে এসেছেন সম্প্রতি। শঙ্কর যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে টেলিগ্রাম পেয়েই। তিনি আবার মোম্বাসায় ফিরবেন দিন কুড়ির মধ্যে। শঙ্করকে তা হলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন।

দুই

চারমাস পরের ঘটনা। মার্চ মাসের শেষ।

মোম্বাসা থেকে যে-রেলপথ গিয়েছে কিসুমু-ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের ধারে—তারই একটা শাখা-লাইন তখন তৈরি হচ্ছিল। জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়ে-তিনশো মাইল পশ্চিমে। ইউগান্ডা রেলওয়ের নুডসবার্গ স্টেশন থেকে বাহাত্তর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এখানে শঙ্কর কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কেরানি ও সরকারি স্টোরকিপার হয়ে এসেচে। থাকে ছোট একটা তাঁবুতে। তার আশেপাশে অনেক তাঁবু। এখানে এখনও বাড়িঘর তৈরি হয়নি বলে তাঁবুতেই সবাই থাকে। তাঁবুগুলো একটা খোলা জায়গায় চক্রাকারে সাজানো—তাদের চারধার ঘিরে বহু দূরব্যাপী মুক্ত প্রান্তর, লম্বা-লম্বা ঘাসে ভরা, মাঝে-মাঝে গাছ। তাঁবুগুলোর ঠিক গায়েই খোলা জায়গায় শেষ সীমায় একটা বড় বাওবাব গাছ। আফ্রিকার বিখ্যাত গাছ, শঙ্কর কতবার ছবিতে দেখেচে, এবার সত্যিকার বাওবাব দেখে শঙ্করের যেন আশ মেটে না।

নতুন দেশ, শঙ্করের তরুণ তাজা মন, সে ইউগান্ডার এই নির্জন মাঠ ও বনে নিজের স্বপ্নের সার্থকতাকে যেন খুঁজে পেলে। কাজ শেষ হয়ে যেতেই সে তাঁবু থেকে রোজ বেরিয়ে পড়ত, যেদিকে দুচোখ যায় সেদিক বেড়াতে বের হত—পুবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। সব দিকেই লম্বা-লম্বা ঘাস, কোথাও মানুষের মাথা-সমান উঁচু, কোথাও তার চেয়েও উঁচু।

কনস্ট্রাকশন তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিন শঙ্করকে ডেকে

বললেন—শোনো রায়, ওরকম এখানে বেড়িও না। বিনা বন্দুকে এখানে এক পা-ও যেও না। প্রথম, এই ঘাসের জমিতে পথ হারাতে পার। পথ হারিয়ে লোকে এসব জায়গায় মারাও গিয়েছে জলের অভাবে। দ্বিতীয়, ইউগান্ডা সিংহের দেশ। এখানে আমাদের সাড়াশব্দ আর হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজে সিংহ হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েচে—কিন্তু ওদের বিশ্বাস নেই। খুব সাবধান! এসব অঞ্চল মোটেও নিরাপদ নয়।

একদিন দুপুরের পরে কাজকর্ম বেশ পুরোদমে চলচে, হঠাৎ তাঁবু থেকে কিছু দূরে লম্বা ঘাসের জমির মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই সেদিকে ছুটে গেল ব্যাপার কী দেখতে। শঙ্করও ছুটল। ঘাসের জমি পাতিপাতি করে খোঁজা হল—কিছুই নেই সেখানে।

কিসের চিৎকার তবে?

এঞ্জিনিয়ার সাহেব এলেন। কুলিদের নাম-ডাক হল, দেখা গেল একজন কুলি অনুপস্থিত। অনুসন্ধানে জানা গেল সে একটু আগে ঘাসের বনের দিকে কী কাজে গিয়েছিল, তাকে ফিরে আসতে কেউ দেখেনি।

খোঁজাখুঁজি করতে-করতে ঘাসের বনের বাইরে কটা বালির উপরে সিংহের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। সাহেব বন্দুক নিয়ে লোকজন সঙ্গে করে পায়ের দাগ দেখে অনেক দূর গিয়ে এরটা বড় পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলির রক্তাক্ত দেহ বার করলেন। তাকে তাঁবুতে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল। কিন্তু সিংহের কোনো চিহ্ন মিলল না। লোকজনের চিৎকারে সে শিকার ফেলে পালিয়েচে। সন্ধ্যার আগেই কুলিটা মারা গেল।

তাঁবুর চারপাশের লম্বা ঘাস অনেক দূর পর্যন্ত কেটে সাফ করে দেওয়া হল পরদিনই। দিনকতক সিংহের কথা-ছাড়া তাঁবুতে আর কোনো গল্পই নেই। তারপর মাসখানেক পরে ঘটনাটা পুরনো হয়ে গেল, সে-কথা সকলের মনে চাপা পড়ে গেল। কাজকর্ম আবার বেশ চলল।

সেদিন দিনে খুব গরম। সন্ধ্যার একটু পরেই কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ল। কুলিদের তাঁবুর সামনে অনেক কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েচে। সেখানে তাঁবুর সবাই গোল হয়ে বসে গল্পগুজব করচে। শঙ্করও সেখানে আছে, সে ওদের গল্প শুনচে এবং অগ্নিকুণ্ডের আলোতে 'কেনিয়া মর্নিং নিউজ' পড়চে। খবরের কাগজখানা পাঁচদিনের পুরনো। কিন্তু এ জনহীন প্রান্তরে তবু এখানাতে বাইরের দুনিয়ার যা কিছু একটা খবর পাওয়া যায়।

তিরুমল আপ্পা বলে একজন মাদ্রাজী কেরানির সঙ্গে শঙ্করের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল তিরুমল তরুণ যুবক, বেশ ইংরিজি জানে, মনেও খুব উৎসাহ! সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। শঙ্করের পাশে বসে সে আজ সন্ধ্যা থেকে ক্রমাগত দেশের কথা, তার বাপ-মায়ের কথা, তার ছোট বোনের কথা বলছে। ছোট বোনকে সে বড় ভালবাসে। বাড়ি ছেড়ে এসে তার কথাই তিরুমলের বড় মনে হয়! একবার সে দেশের দিকে যাবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। মাস দুই ছুটি মঞ্জুর করবে না সাহেব?

ক্রমে রাত বেশি হল। মাঝে-মাঝে আগুন নিভে যাচ্ছে, আবার কুলিরা তাতে কাঠ-কুটো ফেলে দিচ্ছে। আরও অনেকে উঠে শুতে গেল। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ ধীরে-ধীরে দূর দিগন্তে দেখা দিল—সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলো-আঁধারের লুকোচুরি আর বুনো গাছের দীর্ঘ-দীর্ঘ ছায়া।

শঙ্করের ভারি অদ্ভুত মনে হচ্ছিল বহুদূর বিদেশের এই স্তব্ধ রাত্রির সৌন্দর্য। কুলিদের ঘরের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে একদৃষ্টে সম্মুখের বিশাল জনহীন

তৃণভূমির আলো-আঁধারমাখা রূপের দিকে চেয়ে-চেয়ে কত কী ভাবছিল। ওই বাওবাব গাছটার ওদিকে অজানা দেশের সীমা কেপটাউন পর্যন্ত বিস্তৃত—মধ্যে পড়বে কত পর্বত, অরণ্য, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগর জিম্বাবি—বিশাল ও বিভীষিকাময় কালাহারি মরুভূমি, হীরকের দেশ, সোনার খনির দেশ!

একজন বড় স্বর্ণান্বেষী পর্যটক যেতে-যেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যে-পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেলেন সেটা হাতে তুলে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার সঙ্গে সোনা মেশানো রয়েচে। সে-জায়গায় বড় একটা সোনার খনি বেরিয়ে পড়ল। এ-ধরনের কত গল্প সে পড়েচে দেশে থাকতে।

এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় মহাদেশ, সোনার দেশ, হীরের দেশ—কত অজানা জাতি, অজানা দৃশ্যাবলী, অজানা জীবজন্তু এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কে তার হিসাব রেখেচে?

কত কী ভাবতে-ভাবতে শঙ্কর কখন ঘুমিয়ে পড়েচে। হঠাৎ কিসের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠেচে। ধবধবে সাদা জ্যোৎস্না দিনের মতো পরিষ্কার। অগ্নিকুণ্ডেও আগুন গিয়েচে নিবে। কুলিরা সব কুণ্ডলী পাকিয়ে আগুনের উপরে শুয়ে আছে। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ শঙ্করের দৃষ্টি পড়ল তার পাশে—এখানে তো তিরুমল আপ্পা বসে-বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল! সে কোথায়? তা হলে হয়তো সে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে গিয়ে থাকবে।

শঙ্করও নিজে উঠে শুতে যাবার উদ্যোগ করচে, এমন সময়ে অল্পদূরেই পশ্চিম কোণে মাঠের মধ্যে ভীষণ সিংহগর্জন শুনতে পাওয়া গেল। রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোক যেন কেঁপে উঠল সে-রবে। কুলিরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন। শঙ্কর জীবনে এই প্রথম শুনলে সিংহের গর্জন—সেই দিকদিশাহীন তৃণভূমির মধ্যে শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সে-গর্জন যে কী এক অনির্দেশ্য অনুভূতি তার মনে জাগালে! তা ভয় নয়, সে এক রহস্যময় জটিল মনোভাব। একজন বৃদ্ধ মাসাই কুলি ছিল তাঁবুতে। সে বললে, সিংহ লোক মেরেচে। লোক না মারলে এমন গর্জন করবে না!

তাঁবুর ভিতর থেকে তিরুমলের সঙ্গী এসে হঠাৎ জানালে তিরুমলের বিছানা শূন্য। তাঁবুর মধ্যে কোথাও সে নেই।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। শঙ্করও নিজে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখে এল সত্যিই সেখানে কেউ নেই। তখনি কুলিরা আলো জ্বেলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সব তাঁবুগুলোতে খোঁজ করা হল, নাম ধরে চিৎকার করে ডাকাডাকি করলে সবাই মিলে—তিরুমলের কোনো সাড়া মিলল না।

তিরুমল যেখানটাতে শুয়ে ছিল, সেখানটাতে ভাল করে দেখা গেল তখন। কোনো একটা ভারী জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মাটির উপর সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে কারো দেরি হল না। বাওবাব গাছের কাছে তিরুমলের জামার হাতার খানিকটা টুকরো পাওয়া গেল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে আগে-আগে চললেন, শঙ্কর তাঁর সঙ্গে চলল। কুলিরা তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল। সেই গভীর রাত্রে তাঁবু থেকে দূরে মাঠের চারিদিকে অনেক জায়গা খোঁজা হল, তিরুমলের দেহের কোনো সন্ধান মিলল না। এবার আবার সিংহগর্জন শোনা গেল, কিন্তু দূরে। যেন এই নির্জন প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী কোনো রহস্যময়ী রাক্ষসীর বিকট চিৎকার।

মাসাই কুলিটা বললে—সিংহ দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। আরও অনেকগুলো মানুষ ও ঘায়েল না করে ছাড়বে না। সবাই সাবধান। যে-সিংহ একবার মানুষ খেতে শুরু করে, সে অত্যন্ত ধূর্ত হয়ে ওঠে।

রাত যখন প্রায় তিনটে, তখন সবাই ফিরল তাঁবুতে। বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার এই অংশে পাখি বড় একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু এক ধরনের রাত্রিচর পাখির ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে—সে-সুর অপার্থিব ধরনের মিষ্টি। এইমাত্র সেই পাখি কোনো গাছের মাথায় বহুদূরে ডেকে উঠল। মনটা এক মুহূর্তে উদাস করে দেয়। শঙ্কর ঘুমুতে গেল না। আর সবাই তাঁবুর মধ্যে শুতে গেল, কারণ, পরিশ্রম কারো কম হয়নি। তাঁবুর সামনে কাঠকুটো জ্বালিয়ে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা হল। শঙ্কর সাহস করে বাইরে বসতে অবিশ্যি পারলে না—এরকম দুঃসাহসের কোনো অর্থ হয় না। তবে সে নিজের খড়ের ঘরে শুয়ে জানলা দিয়ে বিস্তৃত জ্যোৎস্নালোকিত অজানা প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল।

মনে কী এক অদ্ভুত ভাব। তিরুমলের অদৃষ্টলিপি এইজন্যেই বোধহয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনেছিল। তাকেই-বা কী জন্যে এখানে এনেচে তার অদৃষ্ট, কে জানে তার খবর?

আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে—কিন্তু আফ্রিকা ভয়ঙ্কর! দেখতে বাবলাবনে ভর্তি বাংলাদেশের মাঠের মতো দেখালে কী হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসঙ্কুল! যেখানে-সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা—পরমুহূর্তে কী ঘটবে, এ-মুহূর্তে তা কেউ বলতে পারে না।

আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেচে—তরুণ হিন্দু যুবক তিরুমলকে। সে বলি চায়।

তিরুমল তো গেল, সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাম্পে পরদিন থেকে এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে আর সেখানে সিংহের উপদ্রবে থাকা যায় না। মানুষখেকো সিংহ অতি ভয়ানক জানোয়ার! যেমন সে ধূর্ত, তেমনি সাহসী। সন্ধ্যা তো দূরের কথা, দিনমানেই একা বেশিদূর যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার আগে তাঁবুর মাঠে নানা জায়গায় বড়-বড় আগুনের কুণ্ড করা হয়, কুলিরা আগুনের কাছে ঘেঁষে বসে গল্প করে, রান্না করে, সেখানে বসেই খাওয়াদাওয়া করে। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুকহাতে রাত্রে তিন-চারবার তাঁবুর চারিদিক ঘুরে পাহারা দেন, ফাঁকা আওয়াজ করেন—এত সতর্কতার মধ্যেও একটা কুলিকে সিংহ নিয়ে পালাল তিরুমলকে মারবার ঠিক দুদিন পরে সন্ধ্যারাত্রে।

তার পরদিন একটা সোমালি কুলি দুপুরে তাঁবু থেকে তিনশো গজের মধ্যে পাথরের ঢিবিতে পাথর ভাঙতে গেল—সন্ধ্যায় সে আর ফিরে এল না।

সেই রাত্রেই, রাত দশটার পরে, শঙ্কর এঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাঁবু থেকে ফিরচে, লোকজন কেউ বড় একটা বাইরে নেই, সকাল-সকাল যে যার ঘরে শুয়ে পড়েচে, কেবল এখানে-ওখানে দু-একটা নির্বাপিত প্রায়অগ্নিকুণ্ড। দূরে শেয়াল ডাকচে—শেয়ালের ডাক শুনলেই শঙ্করের মনে হয় যে, বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে আছে—চোখ বুজে সে নিজের গ্রামটা ভাববার চেষ্টা করে, তাদের ঘরের কোণের সেই বিলিতি আমড়াগাছটা ভাববার চেষ্টা করে—আজও সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুজলে।

কী চমৎকার লাগে! কোথায় সে? সেই তাদের গাঁয়ের বাড়ির জানলার কাছে তক্তপোশে শুয়ে? বিলিতি আমড়াগাছটার ডালপালা চোখ খুলতেই চোখে পড়বে? ঠিক? দেখবে সে চোখ খুলে?

শঙ্কর ধীরে-ধীরে চোখ খুললে।

অন্ধকার প্রান্তর। দূরে সেই বড় বাওবাব গাছটা অস্পষ্ট অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হল সামনের একটা ছাতার মতো গোল খড়ের নিচু চালের উপর কী যেন একটা নড়চে। পরক্ষণেই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা সিংহ খড়ের চাল থাবা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করবার চেষ্টা করচে ও মাঝে-মাঝে নাকটা চালের গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে কিসের যেন ঘ্রাণ নিচ্চে।

তার কাছে থেকে চালাটার দূরত্ব বড়জোর বিশ হাত।

শঙ্কর বুঝলে সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সিংহ চালার খড় খুঁচিয়ে গর্ত করতে ব্যস্ত, সেখান দিয়ে ঢুকে সে মানুষ নেবে—শঙ্করকে সে এখনও দেখতে পায়নি। তাঁবুর বাইরে কোথাও লোক নেই, সিংহের ভয়ে বেশি রাত্রে কেউ বাইরে থাকে না। নিজে সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, একগাছ লাঠি পর্যন্ত নেই হাতে।

শঙ্কর নিঃশব্দে পিছু হঠতে লাগল এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর দিকে, সিংহের দিকে চোখ রেখে। এক মিনিট...দু মিনিট....নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যে তার এত কর্তৃত্ব ছিল, তা এর আগে শঙ্কর জানত না। একটা ভীতিসূচক শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরুল না বা সে হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড় দেবার চেষ্টাও করলে না।

এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে সে ঢুকে দেখলে সাহেব টেবিলে বসে তখনও কাজ করচে। সাহেব ওর রকম-সকম দেখে বিস্মিত হয়ে কিছু জিগগেস করবার আগেই ও বললে—সাহেব, সিংহ!

সাহেব লাফিয়ে উঠল—কৈ? কোথায়?

বন্দুকের র‍্যাকে একটা ·৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফেল ছিল, সাহেব সেটা নামিয়ে নিলে। শঙ্করকে আর একটা রাইফেল দিলে। দুজনে তাঁবুর পর্দা তুলে আস্তে-আস্তে বাইরে এল। একটু দূরেই কুলিলাইনের সেই গোল চালা। কিন্তু চালার উপর কোথায় সিংহ? শঙ্কর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এইমাত্র দেখে গেলাম স্যার। ঐ চালার উপর সিংহ থাবা দিয়ে খোঁচাচ্চে।

সাহেব বললে—পালিয়েচে। জাগাও সবাইকে।

একটু পরে তাঁবুতে মহা সোরগোল পড়ে গেল। লাঠি, সড়কি, গাঁতি, মুগুর নিয়ে কুলির দল হল্লা করে বেরিয়ে পড়ল, খোঁজ-খোঁজ চারদিকে, খড়ের চাল সত্যিই ফুটো দেখা গেল। সিংহের পায়ের দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সিংহ উধাও হয়েচে। আগুনের কুণ্ডে বেশি করে কাঠ ও শুকনো খড় ফেলে আগুন আবার জ্বালানো হল। সেই রাত্রে অনেকেরই ভাল ঘুম হল না, তাঁবুর বাইরেও বড় একটা কেউ রইল না। শেষরাত্রের দিকে শঙ্কর নিজের তাঁবুতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল—একটা মহা সোরগোলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মাসাই কুলিরা সিম্বা-সিম্বা বলে চিৎকার করছে। দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল। শঙ্কর তাঁবুর বাইরে এসে ব্যাপার জিগগেস করে জানলে সিংহ এসে আস্তাবলের একটা ভারবাহী অশ্বতরকে জখম করে গিয়েচে—এইমাত্র! সবাই শেষরাত্রে একটু ঝিমিয়ে পড়েচে আর সেই সময়ে এই কাণ্ড।

পরদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা ছোকরা-কুলিকে তাঁবু থেকে একশো হাতের মধ্যে সিংহ নিয়ে গেল। দিন চারেক পরে আর একটা কুলিকে নিলে বাওবাব গাছটার তলা থেকে।

কুলিরা আর কেউ কাজ করতে চায় না। লম্বা লাইনে গাঁতিওয়ালা কুলিদের অনেক

সময়ে খুব ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করতে হয়—তারা তাঁবু ছেড়ে দিনের বেলাতেও বেশিদূর যেতে চায় না। তাঁবুর মধ্যে থাকাও রাত্রে নিরাপদ নয়। সকলেরই মনে ভয়—প্রত্যেকেই ভাবে এবার তার পালা। কাকে কখন নেবে কিছু স্থিরতা নেই। এই অবস্থায় কাজ হয় না। কেবল মাসাই কুলিরা অবিচলিত রইল—তারা যমকেও ভয় করে না। তাঁবু থেকে দুমাইল দূরে গাঁতির কাজ তারাই করে, সাহেব বন্দুক নিয়ে দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার তাদের দেখাশুনা করে আসে।

কত নতুন ব্যবস্থা করা হল, কিছুতেই সিংহের উপদ্রব কমল না। কত চেষ্টা করেও সিংহ শিকার করা গেল না। অনেকে বললে সিংহ একটা নয়, অনেকগুলো—কটা মেরে ফেলা যাবে? সাহেব বললে—মানুষখেকো সিংহ বেশি থাকে না। এ একটা সিংহেরই কাজ।

একদিন সাহেব শঙ্করকে ডেকে বললে বন্দুকটা নিয়ে গাঁতিদার কুলিদের একবার দেখে আসতে। শঙ্কর বললে—সাহেব, তোমার ম্যানলিকারটা দাও।

সাহেব রাজি হল। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে একটা অশ্বতরে চড়ে রওনা হল—তাঁবু থেকে মাইল খানেক দূরে এক জায়গায় একটা ছোট জলা। শঙ্কর দূর থেকে জলাটা যখন দেখতে পেয়েচে, তখন বেলা প্রায় তিনটে। কেউ কোনো দিকে নেই, রোদের ঝাঁজ মাঠের মধ্যে তাপ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেচে।

হঠাৎ অশ্বতর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর কিছুতেই সেটা এগিয়ে যেতে চায় না। শঙ্করের মনে হল জায়গাটার দিকে যেতে অশ্বতরটা ভয় পাচ্চে। একটু পরে পাশের ঝোপে কী যেন একটা নড়ল। কিন্তু সেদিকে চেয়ে সে কিছু দেখতে পেলে না। সে অশ্বতর থেকে নামল। তবুও অশ্বতর নড়তে চায় না।

হঠাৎ শঙ্করের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝোপের মধ্যে সিংহ তার জন্যে ওত পেতে বসে নেই তো? অনেক সময়ে এরকম হয় সে জানে, সিংহ পথের পাশে ঝোপ-ঝাপের মধ্যে লুকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিঃশব্দে তার শিকারের অনুসরণ করে। নির্জন স্থানে সুবিধে বুঝে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে। যদি তা-ই হয়? শঙ্কর অশ্বতর নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনা করলে না। ভাবলে তাঁবুতে ফিরেই যাই। সবে সে তাঁবুর দিকে অশ্বতরের মুখটা ফিরিয়েছে এমন সময় আবার ঝোপের মধ্যে কী একটা নড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ানক সিংহগর্জন এবং একটা ধূসর বর্ণের বিরাট দেহ সশব্দে অশ্বতরের উপর এসে পড়ল। শঙ্কর তখন হাত চারেক এগিয়ে আছে, সে তখুনি ফিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে উপরি-উপরি দুবার গুলি করলে। গুলি লেগেচে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু তখন অশ্বতর মাটিতে লুটিয়ে পড়েচে—ধূসর বর্ণের জানোয়ারটা পলাতক। শঙ্কর পরীক্ষা করে দেখলে অশ্বতরের কাঁধের কাছে অনেকটা মাংস ছিন্নভিন্ন, রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সে ছটফট করচে। শঙ্কর এক গুলিতে তার যন্ত্রণার অবসান করলে। তারপর সে তাঁবুতে ফিরে এল।

সাহেব বললে—সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েছে। বন্দুকের গুলি যদি গায়ে লাগে তবে দস্তুরমতো জখম তাকে হতেই হবে। কিন্তু গুলি লেগেছিল তো? শঙ্কর বললে—গুলি লাগালাগির কথা সে বলতে পারে না। বন্দুক ছুঁড়েছিল এইমাত্র কথা। লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে দু-তিনদিনেও কোনো আহত বা মৃত সিংহের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

জুন মাসের প্রথম থেকে বর্ষা নামল। কতকটা সিংহের উপদ্রবের জন্যে, কতকটা-বা

জলাভূমির সান্নিধ্যের জন্যে জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁবু ওখান থেকে উঠে গেল।

শঙ্করের আর কনস্ট্রাকশন তাঁবুতে থাকতে হল না। কিসুমু থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোট স্টেশনে সে স্টেশনমাস্টারের কাজ পেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে সেখানেই চলে গেল।

তিন

নতুন পদ পেয়ে উৎফুল্ল মনে শঙ্কর যখন স্টেশনটাতে এসে নামল, তখন বেলা তিনটে হবে। স্টেশনঘরটা খুব ছোট। মাটির প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্ম আর স্টেশনঘরের আশপাশ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্টেশনঘরের পিছনে তার থাকবার কোয়ার্টার। পায়রার খোপের মতো ছোট। যে-ট্রেনখানা তাকে বহন করে এনেছিল, সেখানা কিসুমুর দিকে চলে গেল। শঙ্কর যেন অকূল সমুদ্রে পড়ল। এত নির্জন স্থান সে জীবনে কখনও কল্পনা করেনি।

এই স্টেশনে সে-ই একমাত্র কর্মচারী। একটা কুলি পর্যন্ত নেই। সে-ই কুলি, সে-ই পয়েন্টসম্যান, সে-ই সব।

এরকম ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে, এসব স্টেশন এখনও মোটেই আয়কর নয়। এর অস্তিত্ব এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ। এদের পিছনে রেল-কোম্পানি বেশি খরচ করতে রাজি নয়। একখানি ট্রেন সকালে, একখানি এই গেল—আর সারা দিন-রাত্রে ট্রেন নেই।

সুতরাং তার হাতে প্রচুর অবসর আছে। চার্জ বুঝে নিতে হবে এই একটু কাজ। আগের স্টেশনমাস্টারটি গুজরাটি, বেশ ইংরিজি জানে। সে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এল। চার্জ বোঝাবার বেশি কিছু নেই। গুজরাটি ভদ্রলোক তাকে পেয়ে খুব খুশি। ভাবে বোধ হল সে কথা বলবার সঙ্গী পায়নি অনেক দিন। দুজনে প্ল্যাটফর্মে এদিক-ওদিক পায়চারি করলে।

শঙ্কর বললে—কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা কেন?

গুজরাটি ভদ্রলোকটি বললে—ও কিছু নয়। নির্জন জায়গা—তাই।

শঙ্করের মনে হল কী একটা কথা লোকটা গোপন করে গেল। শঙ্করও আর পীড়াপীড়ি করলে না। রাত্রে ভদ্রলোক রুটি গড়ে শঙ্করকে খাবার নিমন্ত্রণ করলে। খেতে বসে হঠাৎ লোকটি চেঁচিয়ে উঠল—ঐ যাঃ, ভুলে গিয়েছি!

—কী হল?

—খাবার জল নেই মোটে, ট্রেন থেকে নিতে একদম ভুলে গিয়েছি।

—সে কী! এখানে জল কোথাও পাওয়া যায় না?

—কোথাও না। একটা কুয়ো আছে, তার জল বেজায় তেতো আর কষা। সে-জলে বাসন মাজা ছাড়া আর কোনো কাজ হয় না। খাবার জল ট্রেন থেকে দিয়ে যায়।

বেশ জায়গা বটে! খাবার জল নেই, মানুষজন নেই। এখানে স্টেশন করেছে কেন শঙ্কর বুঝতে পারল না।

পরদিন সকালে ভূতপূর্ব স্টেশনমাস্টার চলে গেল। শঙ্কর পড়ল একা। নিজের কাজ করে, রাঁধে খায়, ট্রেনের সময় প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ায়। দুপুরে বই পড়ে কি বড় টেবিলটাতে শুয়ে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে ছায়া পড়লে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে।

স্টেশনের চারধার ঘিরে ধু-ধু সীমাহীন প্রান্তর, দীর্ঘ ঘাসের বন, মাঝে ইউকা, বাবলা-গাছ—দূরে পাহাড়ের সারি, সারা চক্রবাল জুড়ে। ভারি সুন্দর দৃশ্য!

গুজরাটি লোকটি ওকে বারণ করে গিয়েছিল—একা যেন এইসব মাঠে সে না বেড়াতে বার হয়।

শঙ্কর বলেছিল—কেন?

সে-প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর গুজরাটি ভদ্রলোকটির কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার উত্তর অন্য দিক থেকে সে-রাত্রেই মিলল।

রাত বেশি না হতেই আহারাদি সেরে শঙ্কর স্টেশনঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে ডায়েরি লিখছে—স্টেশনঘরেই সে শোবে। সামনের কাচ-বসানো দরজাটি বন্ধ আছে, কিন্তু আগল দেওয়া নেই, কিসের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে চেয়ে দেখে দরজার ঠিক বাইরে কাচে নাক লাগিয়ে প্রকাণ্ড সিংহ। শঙ্কর কাঠের মতো বসে রইল। দরজা একটু জোর করে ঠেললেই খুলে যাবে। সেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। টেবিলের উপর কেবল কাঠের রুলটা মাত্র আছে।

সিংহটা কিন্তু কৌতুকের সঙ্গে শঙ্কর ও টেবিলের কেরোসিন বাতিটার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খুব বেশিক্ষণ ছিল না, হয়তো মিনিট দুই, কিন্তু শঙ্করের মনে হল সে আর সিংহটা কতকাল ধরে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সিংহ ধীরে-ধীরে অনাসক্তভাবে দরজা থেকে সরে গেল। শঙ্কর হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার আগলটা তুলে দিলে।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে স্টেশনের চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া কেন। কিন্তু শঙ্কর একটু ভুল করেছিল—সে আংশিকভাবে বুঝেছিল মাত্র, বাকি উত্তরটা পেতে দু-একদিন বিলম্ব ছিল।

সেটা এল অন্য দিক থেকে।

পরদিন সকালের ট্রেনের গার্ডকে সে রাত্রের ঘটনা বলল।

গার্ড লোকটি ভাল, সব শুনে বললে—এসব অঞ্চলে সর্বত্রই এমন অবস্থা। এখান থেকে বারো মাইল দূরে তোমার মতো আর একটা ছোট স্টেশন আছে—সেখানেও এই দশা। এখানে তো যে কাণ্ড—

সে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কথা বন্ধ করে ট্রেনে উঠে পড়ল। যাবার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে বলে গেল—বেশ সাবধানে থেকো সর্বদা।

শঙ্কর নিশ্চিত হয়ে পড়ল, এরা কী কথাটা চাপা দিতে চায়? সিংহ ছাড়া আরও কিছু আছে নাকি? যাহোক, সেদিন থেকে শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে স্টেশনঘরের সামনে রোজ আগুন জ্বালিয়ে রাখে। সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে স্টেশনঘরে ঢোকে—অনেক রাত পর্যন্ত বসে পড়াশুনা করে বা ডায়েরি লেখে। রাত্রের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে, প্ল্যাটফর্মের ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্যে দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে-প্রহরে শেয়াল ডাকে, এক-একদিন গভীর রাতে দূরে কোথায় সিংহের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়-অদ্ভুত জীবন!

ঠিক এই জীবনই সে চেয়েছিল। এ তার রক্তে আছে। এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি, অচেনা নক্ষত্রে-ভরা আকাশ, এই বিপদের আশঙ্কা—এই তো জীবন! নিরাপদ শান্ত জীবন নিরীহ কেরানির হতে পারে—তার নয়।

সেদিন বিকেলের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সে নিজের কোয়ার্টারের রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময় খুঁটির গায়ে কী একটা দেখে সে তিন হাত লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল—প্রকাণ্ড একটা হলদে খড়িশ গোখুরা তাকে দেখে ফণা উদ্যত করে খুঁটি থেকে প্রায়

এক হাত বাইরে মুখ বাড়িয়েছে! আর দু সেকেণ্ড পরে যদি শঙ্করের চোখ সেদিকে পড়ত—তা হলে—না, এখন সাপটাকে মারবার কী করা যায়? কিন্তু সাপটা পরমুহূর্তে খুঁটি বেয়ে উপরে খড়ের চালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বেশ কাণ্ড বটে! ঐ ঘরে গিয়ে শঙ্করকে এখন ভাত রাঁধতে বসতে হবে। এ সিংহ নয় যে দরজা বন্ধ করে আগুন জ্বেলে রাখবে। খানিকটা ইতস্তত করে শঙ্কর অগত্যা রান্নাঘরে ঢুকল এবং কোনোরকমে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে সন্ধ্যা হবার আগেই খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ করে সেখান থেকে বেরিয়ে স্টেশনঘরে এল। কিন্তু স্টেশনঘরেই-বা বিশ্বাস কী? সাপ কখন কোন ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকবে, তাকে কি আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

পরদিন সকালের ট্রেনে গার্ডের গাড়ি থেকে একটা নতুন কুলি তার রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল। সপ্তাহে দুদিন মোম্বাসা থেকে চাল আর আলু রেল-কোম্পানি এইসব নির্জন স্টেশনের কর্মচারীদের পাঠিয়ে দেয়—মাসিক বেতন থেকে এর দাম কেটে নেওয়া হয়।

যে কুলিটা রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল সে ভারতীয়, গুজরাট অঞ্চলে বাড়ি। বস্তাটা নামিয়ে সে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চাইল শঙ্করের দিকে, এবং পাছে শঙ্কর তাকে কিছু জিগগেস করে, এই ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ল।

কুলির সে-দৃষ্টি শঙ্করের চোখ এড়ায়নি। কী রহস্য জড়িত আছে যেন এই জায়গাটার সঙ্গে, কেউ তা ওর কাছে প্রকাশ করতে চায় না। প্রকাশ করা যেন বারণ আছে। ব্যাপার কী?

দিন দুই পরে ট্রেন পাস করে সে নিজের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছে—আর একটু হলে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিল আর কি! সেই খড়িশ গোখুরা সাপ। পূর্বদৃষ্ট সাপটাও হতে পারে, নতুন একটা যে নয় তারও কোনো প্রমাণ নেই।

শঙ্কর সেই দিন স্টেশনঘর, নিজের কোয়ার্টার ও চারধারের জমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে। সারা জায়গা মাটিতে বড়-বড় গর্ত, কোয়ার্টারের উঠোনে, রান্নাঘরের দেয়ালে, কাঁচা প্ল্যাটফর্মের মাঝে-মাঝে সর্বত্র গর্ত ও ফাটল আর ইঁদুরের মাটি। তবুও সে কিছু বুঝতে পারলে না।

একদিন সে স্টেশনঘরে ঘুমিয়ে আছে, রাত অনেক। ঘর অন্ধকার, হঠাৎ শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর একটা কোনো ইন্দ্রিয় যেন মুহূর্তের জন্যে জাগরিত হয়ে উঠে তাকে জানিয়ে দিলে যে সে ভয়ানক বিপদে পড়বে। ঘোর অন্ধকার, শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল। টর্চটা হাতড়ে পাওয়া যায় না কেন? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা কিসের অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ টর্চটা তার হাতে ঠেকল, এবং কলের পুতুলের মতো সে সামনের দিকে ঘুরিয়ে টর্চটা জ্বাললে।

সঙ্গে-সঙ্গেই সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে টর্চটা ধরে বিছানার উপরেই বসে রইল।

দেয়াল ও তার বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় মাথা উঁচু করে তুলে ও টর্চে আলো পড়ার দরুন সাময়িকভাবে আলো-আঁধারি লেগে থ-খেয়ে আছে আফ্রিকার ক্রূর ও হিংস্রতম সাপ কালো মাম্বা! ঘরের মেঝে থেকে সাপটা প্রায় আড়াই হাত উঁচু হয়ে উঠেছে—সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয় যখন ব্ল্যাক মাম্বা সাধারণত মানুষকে তাড়া করে তার ঘাড়ে ছোবল মারে। ব্ল্যাক মাম্বার হাত থেকে রেহাই পাওয়া একরকম পুনর্জন্ম তাও শঙ্কর শুনেছে।

শঙ্করের একটা গুণ বাল্যকাল থেকেই আছে, বিপদে তার সহজে বুদ্ধিভ্রংশ হয়

না—আর তার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর সে ঘোর বিপদেও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

শঙ্কর বুঝলে হাত যদি তার একটু কেঁপে যায়—তবে যে-মুহূর্তে সাপটার চোখ থেকে আলো সরে যাবে—সেই মুহূর্তে ওর আলো-আঁধারি কেটে যাবে এবং তখুনি সে করবে আক্রমণ।

সে বুঝলে তার আয়ু নির্ভর করচে এখন দৃঢ় ও অকম্পিত হাতে টর্চটা সাপের চোখের দিকে ধরে থাকার উপর। যতক্ষণ সে এরকম ধরে থাকতে পারবে ততক্ষণ সে নিরাপদ। কিন্তু যদি টর্চটা একটু এদিক-ওদিক সরে যায়?

শঙ্কর টর্চ ধরেই রইল। সাপের চোখ দুটো জ্বলচে যেন দুটো আলোর দানার মতো। কী ভীষণ শক্তি ও রাগ প্রকাশ পাচ্চে চাবুকের মতো খাড়া উদ্যত তার কালো, মিশমিশে, সরু দেহটাতে!

শঙ্কর ভুলে গেল চারপাশের সব আসবাবপত্র, আফ্রিকা দেশটা, তার রেলের চাকরি, মোম্বাসা থেকে কিসুমু লাইনটা, তার দেশ, তার বাবা-মা—সমস্ত জগৎটা শূন্য হয়ে গিয়ে সামনের ওই দুটো জ্বলজ্বলে আলোর দানায় পরিণত হয়েচে, তার বাইরে শূন্য! অন্ধকার! মৃত্যুর মতো শূন্য, প্রলয়ের পরের বিশ্বের মতো অন্ধকার।

সত্য কেবল ওই মহাহিংস্র উদ্যত-ফণা মাম্বা, যেটা প্রত্যেক ছোবলে ১৫০০ মিলিগ্রাম তীব্র বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং দেবার জন্যে ওত পেতে রয়েছে।

শঙ্করের হাত ঝিমঝিম করছে, আঙুল অবশ হয়ে আসচে, কনুই থেকে বগল পর্যন্ত হাতের যেন সাড় নেই। কতক্ষণ সে আর টর্চ ধরে থাকবে? আলোর দানা দুটো হয়তো সাপের চোখ নয়—জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র—কিংবা—

টর্চের ব্যাটারির তেজ কমে আসচে না? সাদা আলো যেন হলদে ও নিস্তেজ হয়ে আসচে না? কিন্তু জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র দুটো তেমনি জ্বলচে। রাত না দিন? ভোর হবে না সন্ধ্যা হবে?

শঙ্কর নিজেকে সামলে নিলে। ওই চোখ দুটোর জ্বালাময়ী দৃষ্টি তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তুলচে। সে সজাগ থাকবে। এ তেপান্তরের মাঠে চেঁচালেও কেউ কোথাও নেই সে জানে, তার নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর দৃঢ়তার উপর নির্ভর করচে তার জীবন। কিন্তু সে পারচে না যে, হাত যেন টনটন করে অবশ হয়ে আসচে, আর কতক্ষণ সে টর্চ ধরে থাকবে? সাপে নাহয় ছোবল দিক, কিন্তু হাতখানা একটু নামিয়ে সে আরাম বোধ করবে এখন।

তরপরেই ঘড়িতে টং-টং করে তিনটে বাজল। ঠিক রাত তিনটে পর্যন্তই বোধহয় শঙ্করের আয়ু ছিল, কারণ তিনটে বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত কেঁপে উঠে নড়ে গেল—সামনের আলোর দানা দুটো গেল নিভে। কিন্তু সাপ কই? তাড়া করে এল না কেন?

পরক্ষণেই শঙ্কর বুঝতে পারলে সাপটাও সাময়িক মোহগ্রস্ত হয়েচে তার মতো। এ-ই অবসর! বিদ্যুতের চেয়েও বেগে সে টেবিল থেকে এক লাফ মেরে অন্ধকারের মধ্যে দরজার আগল খুলে ফেলে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

সকালের ট্রেন এল। শঙ্কর বাকি রাতটা প্ল্যাটফর্মেই কাটিয়েছে। ট্রেনের গার্ডকে বললে সব ব্যাপার। গার্ড বললে, চল দেখি স্টেশনঘরের মধ্যে। ঘরের মধ্যে কোথাও সাপের চিহ্নও পাওয়া গেল না। গার্ড লোকটা ভাল, বললে—বলি তবে শোনো। খুব বেঁচে গিয়েচ কাল রাত্রে। এতদিন কথাটা তোমায় বলিনি, পাছে ভয় পাও। তোমার আগে যিনি

স্টেশনমাস্টার এখানে ছিলেন—তিনিও সাপের উপদ্রবেই এখান থেকে পালান। তাঁর আগে দুজন স্টেশনমাস্টার এই স্টেশনের কোয়ার্টারে সাপের কামড়ে মরেচে। আফ্রিকার ব্ল্যাক মাম্বা যেখানে থাকে, তার ত্রিসীমানায় লোক আসে না। বন্ধুভাবে কথাটা বললাম, উপরওয়ালাদের বোলো না যেন যে আমার কাছ থেকে এ-কথা শুনেছ। ট্রান্সফারের দরখাস্ত কর।

শঙ্কর বললে—দরখাস্তের উত্তর আসতেও তো দেরি হবে, তুমি একটা উপকার কর। আমি এখানে একেবারে নিরস্ত্র, আমাকে একটা বন্দুক কি রিভলবার যাবার পথে দিয়ে যাও। আর কিছু কার্বলিক অ্যাসিড। ফিরবার পথেই কার্বলিক অ্যাসিডটা আমাকে দিয়ে যেও।

ট্রেন থেকে সে একটা কুলিকে নামিয়ে নিলে এবং দুজনে মিলে সারাদিন সর্বত্র গর্ত বুজিয়ে বেড়ালে। পরীক্ষা করে দেখে মনে হল কাল রাত্রে স্টেশনঘরের পশ্চিমের দেওয়ালের কোণে একটা গর্ত থেকে সাপটা বেরিয়েছিল। গর্তগুলো ইঁদুরের, বাইরের সাপ দিনমানে ইঁদুর খাবার লোভে গর্তে ঢুকেছিল হয়তো। গর্তটা বেশ ভাল করে বুজিয়ে দিলে। ডাউন-ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড পাওয়া গেল—ঘরের সর্বত্র ও আশেপাশে সে অ্যাসিড ছড়িয়ে দিলে। কুলিটা তাকে একটা বড় লাঠি দিয়ে গেল। দু-তিনদিনের মধ্যেই রেল-কোম্পানি থেকে ওকে একটা বন্দুক দিলে।

চার

স্টেশনে জলের বড় কষ্ট। ট্রেন থেকে যা জল দেয়, তাতে রান্না-খাওয়া কোনোরকমে চলে, স্নান আর হয় না। এখানকার কুয়োর জলও শুকিয়ে গিয়েছে। একদিন সে শুনল স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জলাশয় আছে, সেখানে ভাল জল পাওয়া যায়, মাছও আছে।

স্নান ও মাছ ধরার আকর্ষণে একদিন সে সকালের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সেখানে মাছ ধরতে চলল—সঙ্গে একজন সোমালি কুলি, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম মোম্বাসা থেকে আনিয়ে নিয়েছিল। জলাশয়টা মাঝারি গোছের ; চারধারে উঁচু ঘাসের বন, ইউকাগাছ, কাছেই একটা অনুচ্চ পাহাড়। জলে সে স্নান সেরে উঠে ঘণ্টা দুই ছিপ ফেলে ট্যাংরাজাতীয় ছোট-ছোট মাছ অনেকগুলি পেলে। মাছ অদৃষ্টে জোটেনি অনেক দিন, কিন্তু আর বেশি দেরি করা চলবে না, কারণ, আবার বিকেল চারটের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছুনো চাই, বিকেলের ট্রেন পাস করাবার জন্যে।

মাঝে-মাঝে প্রায়ই সে মাছ ধরতে যায়। কোনোদিন সঙ্গে লোক থাকে—প্রায়ই একা যায়। স্নানের কষ্টও ঘুচেছে।

গ্রীষ্মকাল ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠল। আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম—বেলা নটার পর থেকে আর রোদে যাওয়া যায় না। এগারোটার পর থেকে শঙ্করের মনে হয় যেন দিগ্বিদিক দাউদাউ করে জ্বলচে। তবুও সে ট্রেনের লোকের মুখে শুনলে মধ্য-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার গরমের কাছে এ নাকি কিছুই নয়।

শীঘ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা থেকে শঙ্করের জীবনের গতি মোড় ঘুরে অন্য পথে চলে গেল। একদিন সকালের দিকে শঙ্কর মাছ ধরতে গিয়েছিল। যখন ফিরচে তখন বেলা তিনটে। স্টেশন যখন আর মাইলটাক আছে, তখন শঙ্করের কানে গেল সেই রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে কে যেন কোথায় অস্ফুট আর্তস্বরে কী বলচে। কোনদিক থেকে

স্বরটা আসচে, লক্ষ্য করে কিছুদূর যেতেই দেখলে একটা ইউকাগাছের নিচে স্বল্পমাত্র ছায়াটুকুতে কে একজন বসে আছে।

শঙ্কর দ্রুতপদে তার কাছে গেল। লোকটা ইউরোপীয়ান, পরনে তালি দেওয়া ছিন্ন ও মলিন কোটপ্যান্ট। একমুখ লাল দাড়ি, বড়-বড় চোখ, মুখের গড়ন বেশ শ্রীযুক্ত, দেহও বেশ বলিষ্ঠ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু সম্ভবত রোগে, কষ্টে ও অনাহারে বর্তমানে শীর্ণ। লোকটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে অবসন্নভাবে পড়ে আছে। তার মাথায় মলিন সোলার টুপিটা একদিকে গড়িয়ে পড়েচে মাথা থেকে—পাশে একটা খাকি কাপড়ের বড় ঝোলা।

শঙ্কর ইংরিজিতে জিগগেস করলে—তুমি কোথা থেকে আসচ?

লোকটা কথার উত্তর না দিয়ে মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে জলপানের ভঙ্গি করে বললে—একটু জল! জল!

শঙ্কর বললে—এখানে তো জল নেই। আমার উপর ভর দিয়ে স্টেশন পর্যন্ত আসতে পারবে?

অতি কষ্টে খানিকটা ভর দিয়ে এবং শেষের দিকে একরকম শঙ্করের কাঁধে চেপে লোকটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল। ওকে আনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল, বিকেলের ট্রেন ওর অনুপস্থিতিতেই চলে গিয়েছে। ও লোকটাকে স্টেশনঘরে বিছানা পেতে শোয়ালে, জল খাইয়ে সুস্থ করলে, কিছু খাদ্যও এনে দিলে। সে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল বটে, কিন্তু শঙ্কর দেখলে লোকটার ভারি জ্বর হয়েচে। অনেক দিনের অনিয়মে, পরিশ্রমে, অনাহারে তার শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েচে—দু-চারদিনে সে সুস্থ হবে না।

লোকটা একটু পরে পরিচয় দিলে। তার নাম ডিয়েগো আলভারেজ—জাতে পর্টুগীজ, তবে আফ্রিকার সূর্য তার বর্ণ তামাটে করে দিয়েচে।

রাত্রে ওকে স্টেশনে রাখলে শঙ্কর। কিন্তু ওর অসুখ দেখে সে পড়ে গেল বিপদে—এখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই—সকালের ট্রেন মোম্বাসার দিকে যায় না, বিকেলের ট্রেনে গার্ড রোগীকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রাত কাটতে এখনও অনেক দেরি। বিকেলের গাড়িখানা স্টেশনে এসে যদি পাওয়া যেত, তবে তো কোনো কথাই ছিল না।

শঙ্কর রোগীর পাশে রাত জেগে বসে রইল। লোকটির শরীরে কিছু নেই। খুব সম্ভবত কষ্ট ও আহার ওর অসুখের কারণ। দূর বিদেশে ওর কেউ নেই—শঙ্কর না দেখলে ওকে দেখবে কে?

বাল্যকাল থেকেই পরের দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে, শঙ্কর যেভাবে সারা রাত তার সেবা করলে, তার কোনো আপনার লোক ও'র চেয়ে বেশি কিছু করতে পারত না।

উত্তর-পূর্ব কোণের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর পিছন থেকে চাঁদ উঠছে যখন সে-রাত্রে, ঝমঝম করচে নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি, তখন হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে ভীষণ সিংহগর্জন শোনা গেল। রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল—সিংহের ডাকে সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। শঙ্কর বললে—ভয় নেই, শুয়ে থাকো। বাইরে সিংহ ডাকচে, দরজা বন্ধ আছে।

তারপর শঙ্কর আস্তে-আস্তে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে চারধারে চেয়ে দেখবামাত্রই যেন সে-রাত্রির অপূর্ব দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে ফেললে। চাঁদ উঠচে দূরের আকাশপ্রান্তে—ইউকাগাছের লম্বা-লম্বা ছায়া পড়েচে পুব থেকে পশ্চিমে, ঘাসের বন যেন রহস্যময়, নিস্পন্দ। সিংহ ডাকচে স্টেশনের কোয়ার্টারের পিছনে প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে। কিন্তু সিংহের ডাক আজকাল শঙ্করের গা-সওয়া হয়ে উঠেছে—ওতে আর

আগের মতো ভয় পায় না। রাত্রির সৌন্দর্য এত আকৃষ্ট করেচে ওকে যে ও সিংহের সান্নিধ্য যেন ভুলে গেল।

ফিরে ও স্টেশনঘরে ঢুকল। টং-টং করে ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। ও ঘরে ঢুকে দেখলে রোগী বিছানায় উঠে বসে আছে। বললে—একটু জল দাও, খাব।

লোকটা বেশ ভাল ইংরিজি বলতে পারে। শঙ্কর টিন থেকে জল নিয়ে ওকে খাওয়ালে।

লোকটার জ্বর তখন যেন কমেচে। সে বললে—তুমি কী বলছিলে? আমার ভয় করচে ভাবছিলে? ডিয়েগো আলভারেজ, ভয় করবে? ইয়াংম্যান, তুমি ডিয়েগো আলভারেজকে জান না। লোকটার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, বিষাদ ও ব্যঙ্গ-মেশানো অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা দিল। সে অবসন্নভাবে বালিশের গায়ে ঢলে পড়ল। ওই হাসিতে শঙ্করের মনে হল এ লোক সাধারণ লোক নয়। তখন ওর হাতের দিকে নজর পড়ল শঙ্করের। বেঁটে-বেঁটে মোটা-মোটা আঙুল—দড়ির মতো শিরাবহুল হাত, তাম্রাভ দাড়ির নিচে চিবুকের ভাব শক্ত মানুষের পরিচয় দিচ্ছে। এতক্ষণ পরে খানিকটা জ্বর কমে যাওয়াতে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসচে যেন ধীরে-ধীরে।

লোকটা বললে—সরে এস কাছে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেচ। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর বেশি করতে পারত না। তবে একটা কথা বলি—আমি বাঁচব না। আমার মন বলচে আমার দিন ফুরিয়ে এসেচে। তোমার উপকার করে যেতে চাই। তুমি ইন্ডিয়ান? এখানে কত মাইনে পাও? এই সামান্য মাইনের জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূর এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর আজ তোমাকে যেসব কথা বলব—আমার মৃত্যুর পূর্বে তুমি কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না?

শঙ্কর সেই আশ্বাসই দিলে। তার পরই সেই অদ্ভুত রাত্রি ক্রমশ কেটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে এমন এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ধরনের আশ্চর্য কাহিনী শুনে গেল—যা সাধারণত উপন্যাসেই পড়া যায়।

ডিয়েগো আলভারেজের কথা

ইয়াংম্যান, তোমার বয়স কত হবে? বাইশ? তুমি, যখন মায়ের কোলে শিশু—আজ বাইশ বছর আগের কথা, ১৮৮৮-৮৯ সালের দিকে আমি কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনির সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন বয়েস ছিল কম, দুনিয়ার কোনো বিপদকেই বিপদ বলে গ্রাহ্য করতাম না।

বুলাওয়ে শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে একাই রওনা হলাম, সঙ্গে কেবল দুটি গাধা, জিনিসপত্র বইবার জন্যে। জাম্বেসি নদী পার হয়ে চলেচি, পথ ও দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, শুধু ছোটখাটো পাহাড়, ঘাস, মাঝে-মাঝে কাফিরদের বস্তি। ক্রমে যেন মানুষের বাস কমে এল, এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছানো গেল, যেখানে এর আগে কখনও কোনো ইউরোপিয়ান আসেনি।

যেখানেই নদী বা খাল দেখি—কিংবা পাহাড় দেখি—সকলের আগে সোনার স্তরের সন্ধান করি। লোকে কত কী পেয়ে বড়মানুষ হয়ে গিয়েচে দক্ষিণ-আফ্রিকায়, এ-সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে কত কাহিনীই শুনে এসেছিলুম—সেইসব গল্পের মোহই আমায় আফ্রিকায় নিয়ে এসে ফেলেছিল। কিন্তু বৃথাই দু-বছর ধরে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালুম।

কত অসহ্য কষ্ট সহ্য করলুম এই দু-বছরে। একবার তো সন্ধান পেয়েও হারালুম।

সেদিন একটা হরিণ শিকার করেছি সকালের দিকে। তাঁবু খাটিয়ে মাংস রান্না করে শুয়ে পড়লুম দুপুরবেলা, কারণ দুপুরের রোদে পথ চলা সেসব জায়গায় একরকম অসম্ভব, ১১৫ ডিগ্রি থেকে ১৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীষ্মকালে। বিশ্রামের পরে বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি বন্দুকের নলের মাছিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েচে। মাছি না থাকলে রাইফেলের তাগ টিক হয় না। এদিক-ওদিক কত খুঁজেও মাছিটা পাওয়া গেল না। কাছেই একটা পাথরের ঢিবি, তার গায়ে সাদা-সাদা কী একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল। ঢিবিটার গায়ে সেই জিনিসটা নানা স্থানে আছে। বেছে-বেছে তারই একই দানা সংগ্রহ করে ঘষে-মেজে নিয়ে আপাতত সেটাকেই মাছি করে রাইফেলের নলের আগায় বসিয়ে নিলাম। তারপর বিকেলে সেখান থেকে আবার উত্তরমুখে রওনা হয়েচি, কোথায় তাঁবু ফেলেছিলাম, সে-কথা ক্রমেই ভুলে গিয়েছি।

দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেও আমার মতো সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে দুজন মাটাবেল কুলি ছিল। পরস্পরকে পেয়ে আমরা খুশি হলাম, তার নাম জিম কার্টার, আমারই মতো ভবঘুরে, তবে তার বয়েস আমার চেয়ে বেশি। জিম আমার বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আমায় বললে—বন্দুকের মাছি তোমার এরকম কেন? তারপর আমার গল্প শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে—তুমি বুঝতে পারনি এ জিনিসটা খাঁটি রুপো, খনিজ রুপো। এ যেখানে পাওয়া যায়, সাধারণত সেখানে রুপোর খনি থাকে। আমার আন্দাজ হচ্ছে এক টন পাথর থেকে সেখানে অন্তত ন-হাজার আউন্স রুপো পাওয়া যাবে। সে-জায়গাতে এক্ষুনি চল আমরা যাই। এবার আমরা লক্ষপতি হয়ে যাব।

সংক্ষেপে বলি। তারপর কার্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে-পথে এসেছিলাম, সেই পথে আবার এলাম। কিন্তু চার মাস ধরে কত চেষ্টা করে, কত অসহ্য কষ্ট পেয়ে, কতবার বিরাট দিকদিশাহীন মরুভূমিবৎ ভেল্ডের মধ্যে পথ হারিয়ে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পৌঁছেও, কিছুতেই আমি সে-স্থান নির্ণয় করতে পারলাম না। যখন সেখানে থেকে সেবার তাঁবু উঠিয়ে দিয়েছিলাম, অত লক্ষ্য করিনি জায়গাটা। আফ্রিকার ভেল্ডে কোনো চিহ্ন বড় একটা থাকে না, যার সাহায্যে পুরনো জায়গা খুঁজে বার করা যায়—সবই যেন একরকম। অনেকবার হয়রান হয়ে শেষে আমরা রুপোর খনির আশা ত্যাগ করে গুয়াই নদীর দিকে চললাম। জিম কার্টার আমাকে আর ছাড়লে না, তার মৃত্যু পর্যন্ত আমার সঙ্গেই ছিল। তার সে শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবলে এখনও আমার কষ্ট হয়।

তৃষ্ণার কষ্টই এই ভ্রমণের সময় সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। তাই এখন থেকে আমরা নদীপথ ধরে চলব, এই স্থির করা গেল। বনের জন্তু শিকার করে খাই আর মাঝে-মাঝে কাফির বস্তি যদি পাই, সেখানে থেকে মিষ্টি আলু, মুরগি প্রভৃতি সংগ্রহ করি।

একবার অরেঞ্জ নদী পার হয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটা কাফির বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছি, সেইদিন দুপরের পরে কাফির বস্তির একটি মোড়লের মেয়ে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমরা দেখতে গেলাম—পাঁচ-ছ-বছরের একটা ছোট্ট উলঙ্গ মেয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে—তার পেটে নাকি ভয়ানক ব্যথা। সবাই কাঁদচে ও দাপাদাপি করচে। মেয়েটার ঘাড়ে নিশ্চয়ই দানো চেপেচে—ওকে মেরে না ফেলে ছাড়বে না। তাকে ও তার বাপ-মাকে জিগগেস করে এইটুকু জানা গেল, সে বনের ধারে

গিয়েছিল—তার পর থেকে তাকে ভূতে পেয়েচে।

আমি ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম কোনো বনের ফল বেশি পরিমাণে খেয়ে ওর পেট কামড়াচ্চে। তাকে জিগগেস করা হল, কোনো বনের ফল সে খেয়েছিল কি না। সে বললে হ্যাঁ, খেয়েছিল। কাঁচা ফল? মেয়েটা বললে—ফল নয়, ফলের বীজ। সে-ফলের বীজই খাদ্য।

এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তার ভূত ছেড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ওষুধের বাক্স ছিল। গ্রামে আমাদের খাতির হয়ে গেল খুব। পনেরো দিন আমরা সে-গ্রামের সর্দারের অতিথি হয়ে রইলাম। ইলান্ড হরিণ শিকার করি আর রাত্রে কাফিরদের মাংস খেতে নিমন্ত্রণ করি। বিদায় নেবার সময় কাফির সর্দার বললে—তোমরা সাদা পাথর খুব ভালবাস, না? বেশ খেলবার জিনিস। নেবে সাদা পাথর? দাঁড়াও দেখাচ্চি। একটু পরে সে একটা ডুমুর ফলের মতো বড় সাদা পাথর আমাদের হাতে এনে দিলে! জিম ও আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলাম—জিনিসটা হীরে! খনি বা খনির উপরকার পাথরে মৃত্তিকাস্তর থেকে পাওয়া পালিশ-না করা হীরের টুকরো!

কাফির সর্দার বললে—এটা তোমরা নিয়ে যাও। ঐ যে দূরের বড় পাহাড় দেখচ, ধোঁয়া-ধোঁয়া—এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌঁচে যাবে। ঐ পাহাড়ের মধ্যে এরকম সাদা পাথর অনেক আছে বলে শুনেচি। আমরা কখনও যাইনি, জায়গা ভাল নয়, ওখানে বুনিপ বলে উপদেবতা থাকে। অনেক চাঁদ আগেকার কথা আমাদের গ্রামের তিনজন সাহসী লোক কারো বারণ না শুনে ঐ পাহাড়ে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। আর একবার একজন তোমাদের মতো সাদা মানুষ এসেছিল, সেও অনেক, অনেক চাঁদ আগে। আমরা দেখিনি, আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদাদের আমলের কথা। সে গিয়েও আর ফেরেনি।

কাফির গ্রাম থেকে বার হয়েই পথে আমরা ম্যাপ মিলিয়ে দেখলাম—দূরের ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট ব্যাপারটা হচ্ছে রিখটারসভেল্ড পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণ-আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা বন্য, অজ্ঞাত, বিশাল ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চল। দু-একজন দুর্ধর্ষ দেশ-আবিষ্কারক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া, কোনো সভ্য মানুষ সে-অঞ্চলে পদার্পণ করেনি। ঐ বিস্তীর্ণ বনপর্বতের অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ নেই, তার কোথায় কী আছে কেউ বলতে পারে না।

জিম কার্টার ও আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, আমরা দুজনেই তখনি স্থির করলাম ওই অরণ্য ও পর্বতমালা আমাদেরই আগমন-প্রতীক্ষায় তার বিপুল রত্নভাণ্ডার লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন করে রেখেচে, ওখানে আমরা যাবই।

কাফির গ্রাম থেকে রওনা হবার প্রায় সতেরো দিন পরে আমরা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে নিবিড় বনে প্রবেশ করলাম।

আগেই বলেচি দক্ষিণ-আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে এই পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। জঙ্গলের কাছাকাছি কোনো কাফির বস্তি পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ল না। জঙ্গল দেখে মনে হল কাঠুরিয়ার কুঠার আজ পর্যন্ত এখানে প্রবেশ করেনি।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছেছিলাম। জিম কার্টারের পরামর্শ- মতো সেইখানেই আমরা রাত্রের বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটালাম। জিম জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে, আমি লাগলাম রান্নার কাজে। সকালের দিকে একজোড়া পাখি মেরেছিলাম, সেই পাখি ছাড়িয়ে তার রোস্ট করব এই ছিল মতলব।

পাখি-ছাড়ানোর কাজে একটু ব্যস্ত আছি, এমন সময় জিম বললে—পাখি রাখো। দু-পেয়ালা কফি কর তো আগে!

আগুন জ্বালাই ছিল। জল গরম করতে দিয়ে আবার পাখি ছাড়াতে বসেছি এমন সময় সিংহের গর্জন একেবারে অতি নিকটে শোনা গেল। জিম বন্দুক নিয়ে বেরুল, আমি বললাম অন্ধকার হয়ে আসচে, বেশি দূর যেও না। তার পরে আমি পাখি ছাড়াচ্ছি, কিছু দূরে জঙ্গলের বাইরেই দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম। একটুখানি থেমে আবার আর একটা আওয়াজ। তার পরেই সব চুপ। মিনিট দশ কেটে গেল, জিম আসে না দেখে আমি নিজের রাইফেলটা নিয়ে যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেদিকে একটু যেতেই দেখি জিম আসচে, পিছনে কি একটা ভারীমতো টেনে আনচে। আমায় দেখে বললে—ভারি চমৎকার ছালখানা। জঙ্গলের ধারে ফেলে রাখলে হায়নাতে সাবাড় করে দেবে। তাঁবুর কাছে টেনে নিয়ে যাই চল! দুজনে টেনে সিংহের প্রকাণ্ড দেহটা তাঁবুর আগুনের কাছে নিয়ে এসে ফেললাম। তারপর ক্রমে রাত হল। খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লুম।

অনেক রাত্রে সিংহের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবু থেকে অল্প দূরেই সিংহ ডাকচে। অন্ধকারে বোঝা গেল না ঠিক কত দূরে। আমি রাইফেল নিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। জিম শুধু একবার বললে—সন্ধ্যাবেলার সেই সিংহটার জুড়ি।

বলেই সে নির্বিকারভাবে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাঁবুর বাইরে এসে দেখি আগুন নিবে গিয়েচে। পাশে কাঠকুঠো ছিল, তাই দিয়ে আবার জোর আগুন জ্বাললাম। তারপর আবার এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কিছু দূরে গিয়ে কয়েকজন কাফিরের সঙ্গে দেখা হল। তারা হরিণ শিকার করতে এসেচে। আমরা তাদের তামাকের লোভ দেখিয়ে কুলি ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিতে চাইলাম।

তারা বললে—তোমরা জান না তাই ও-কথা বলচ। এ-জঙ্গলে মানুষ আসে না। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও। ঐ পাহাড়ের শ্রেণী অপেক্ষাকৃত নিচু, ওটা পার হয়ে মধ্যে খানিকটা সমতল জায়গা আছে, ঘন বনে ঘেরা, তার ওদিকে আবার এর চেয়েও উঁচু পর্বতশ্রেণী। ঐ বনের মধ্যে সমতল জায়গাটা বড় বিপজ্জনক, ওখানে বুনিপ থাকে। বুনিপের হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে হবে না। ওখানে কেউ যায় না। আমরা তামাকের লোভে ওখানে যাব মরতে? ভাল চাও তো তোমরাও যেও না।

আমরা জিগগেস করলাম—বুনিপ কী?

তারা জানে না। তবে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে বুনিপ কী না জানলেও, সে কী অনিষ্ট করতে পারে সেটা তারা খুব ভালরকমই জানে।

ভয় আমাদের ধাতে ছিল না, জিম কার্টারের তো একেবারেই না। সে আরও বিশেষ করে জেদ ধরে বসল। এই বুনিপের রহস্য তাকে ভেদ করতেই হবে—হীরে পাই বা না পাই। মৃত্যু যে তাকে অলক্ষিতে টানচে তখনও যদি বুঝতে পারতাম!

বৃদ্ধ এই পর্যন্ত বলে একটু হাঁপিয়ে পড়ল। শঙ্করের মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে, এ-ধরনের কথা সে কখনও আর শোনেনি। মুমূর্ষু ডিয়েগো আলভারেজের জীর্ণ পরিচ্ছদ ও শিরাবহুল হাতের দিকে চেয়ে, তার পাকা ভুরু জোড়ার নিচেকার ইস্পাতের মতো নীল দীপ্তিশীল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে শঙ্করের মন শ্রদ্ধায় ভালবাসায় ভরে উঠল।

সত্যিকার মানুষ বটে একজন।

আলভারেজ বললে—আর এক গ্লাস জল।

জল পান করে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলে—

হ্যাঁ, তারপরে শোনো। ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। কত বড়-বড় গাছ, বড়-বড় ফার্ন, কত বিচিত্র বর্ণের অর্কিড ও লায়ানা, স্থানে-স্থানে সে বড় নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য, বড়-বড় গাছের নিচেকার জঙ্গল এতই ঘন। বঁড়শির মতো কাঁটাগাছের গায়ে, মাথার উপরকার পাতায়-পাতায় এমন জড়াজড়ি যে সূর্যের আলো কোনো জন্মে সে জঙ্গলে প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। অত্যন্ত বেবুনের উৎপাত জঙ্গলের সর্বত্র, বড় গাছের ডালে দলে-দলে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানা রকমের বেবুন বসে আছে—অনেক সময় দেখলাম মানুষের আগমন তারা গ্রাহ্য করে না। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়—দু-একটা বুড়ো সর্দার-বেবুন সত্যিই হিংস্র প্রকৃতির, হাতে বন্দুক না থাকলে তারা অনায়াসেই আমাদের আক্রমণ করত। জিম কার্টার বললে—অন্তত আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না কখনও এ-জঙ্গলে।

সাত-আটদিন সেই নিবিড় জঙ্গলে কাটল। জিম কার্টার ঠিকই বলেছিল, প্রতিদিন একটা করে বেবুন আমাদের খাদ্য যোগান দিতে দেহপাত করত। উঁচু পাহাড়টা থেকে জঙ্গলের নানাস্থানে ছোট-বড় ঝরনা নেমে এসেচে, সুতরাং জলের অভাবও ঘটল না। একবার কিন্তু এতে বিপদও ঘটেছিল। একটা ঝরনার ধারে দুপুরবেলা এসে আগুন জ্বেলে বেবুনের দাপনা ঝলসাবার ব্যবস্থা করচি, জিম গিয়ে তৃষ্ণার ঝোঁকে ঝরনার জল পান করলে। তার একটু পরেই তার ক্রমাগত বমি হতে শুরু করল। পেটে ভয়ানক ব্যথা। আমি একটা বিজ্ঞান জানতাম, আমার সন্দেহ হওয়াতে ঝরনার জল পরীক্ষা করে দেখি, জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে। উপর পাহাড়ের আর্সেনিকের স্তর ধুয়ে ঝরনা নেমে আসচে নিশ্চয়ই। হোমিওপ্যাথিক বাক্স থেকে প্রতিষেধক ওষুধ দিতে সন্ধ্যার দিকে জিম সুস্থ হয়ে উঠল।

বনের মধ্যে ঢুকে কেবল এক বেবুন ও মাঝে-মাঝে দু-একটা বিষধর সাপ ছাড়া অন্য কোনো বন্যজন্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি। পাখির কথা আর প্রজাপতির কথা অবশ্য বাদ দিলাম। কারণ এইসব ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া এত বিচিত্র বর্ণের ও শ্রেণীর পাখি ও প্রজাপতি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বন্যজন্তু বলতে যা বোঝায়, তারা সে-পর্যায়ে পড়ে না।

প্রথমেই রিখটারসভেল্ট পর্বতশ্রেণীর একটা শাখা-পর্বত আমাদের সামনে পড়ল, সেটা মূল ও প্রধান পর্বতের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিচু। সেটা পার হয়ে আমরা একটা বিস্তীর্ণ বনময় উপত্যকায় নেমে তাঁবু ফেললাম। একটা ক্ষুদ্র নদী উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েচে। নদী দেখে আমার ও জিমের আনন্দ হল, এইসব নদীর তীর থেকেই অনেক সময় খনিজদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

নদীর নানাদিকে আমরা বালি পরীক্ষা করে বেড়াই, কিছুই কোথাও পাওয়া যায় না। সোনার একটা রেণু পর্যন্ত নেই নদীর বালিতে। আমরা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লুম। তখন প্রায় কুড়ি-বাইশদিন কেটে গিয়েচে। সন্ধ্যার সময় কফি খেতে-খেতে জিম বললে—দেখো, আমার মন বলচে এখানে আমরা সোনার সন্ধান পাব। থাকো এখানে আর কিছুদিন। আরও কুড়িদিন কাটল। বেবুনের মাংস অসহ্য ও অত্যন্ত অরুচিকর হয়ে উঠেচে। জিমের মতো লোকও হতাশ হয়ে পড়ল। আমি বললাম—আর কেন জিম, চল ফিরি এবার।

কাফির গ্রামে আমাদের ঠকিয়েচে। এখানে কিছু নেই।

জিম বললে—এই পর্বতশ্রেণীর নানা শাখা আছে, সবগুলো না দেখে যাব না।

একদিন পাহাড়ী নদীটার খাতের ধারে বসে বালি চালতে-চালতে পাথরের নুড়ির রাশির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত একখানা হলদে রঙের ছোট পাথর আমি ও জিম একসঙ্গেই দেখতে পেলাম। দুজনেই তাড়াতাড়ি সেটা খুঁড়ে তুললাম। আমাদের মুখ আনন্দে ও বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জিম বললে—ডিয়েগো, পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হল, চিনেচ তো?

আমিও বুঝেছিলাম। বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু নদীস্রোতে ভেসে আসা জিনিসটা। খনির অস্তিত্ব নেই এখানে।

পাথরখানা দক্ষিণ-আফ্রিকার বিখ্যাত হলদে রঙের হীরের জাত। অবশ্য খুব আনন্দের কোনো কারণ ছিল না, কারণ এতে মাত্র এটাই প্রমাণ হয় যে, এই বিশাল পর্বতশ্রেণীর কোনো অজ্ঞাত, দুর্গম অঞ্চলে হলদে হীরের খনি আছে। নদীস্রোতে ভেসে এসেছে তা থেকে একটা স্তরের একটা টুকরো। সে-মূল খনি খুঁজে বার করা অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য ও সাহসসাপেক্ষ।

সে-পরিশ্রম, সাহস ও ধৈর্যের অভাব আমাদের ঘটত না, কিন্তু যে দৈত্য ঐ রহস্যময় বনপর্বতের অমূল্য হীরকখনির প্রহরী, সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বাধা দিলে।

একদিন আমরা বনের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে, সন্ধ্যার দিকে বিশ্রাম করচি, আমাদের সামনে সেই জায়গাটাতে একটা তালগাছ, তালগাছের তলায় গুঁড়িটা ঘিরে খুব ঘন বন-ঝোপ। হঠাৎ আমরা দেখলাম কিসে যেন অত বড় তালগাছটা এমন নাড়া দিচ্ছে যে, তার উপরকার শুকনো ডালপালাগুলো খড়খড় করে নড়ে উঠছে, যেমন নড়ে ঝড় লাগলে। গাছটাও সেইসঙ্গে নড়চে।

আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাতাস নেই কোনোদিকে, অথচ তালগাছটা নড়চে কেন? আমাদের মনে হল কে যেন তালগাছের গুঁড়িটা ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে। জিম তখনই ব্যাপারটা কী তা দেখতে গুঁড়ির তলায় সেই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকল।

সে ওর মধ্যে ঢুকবার অল্পক্ষণ পরেই আমি একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে রাইফেল নিয়ে ছুটে গেলুম। ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি জিম রক্তাক্ত দেহে বনের মধ্যে পড়ে আছে, কোনো ভীষণ বলবান জন্তুতে তার মুখের সামনে থেকে বুক পর্যন্ত ধারালো নখ দিয়ে চিরে ফেঁড়ে দিয়েচে—যেমন পুরনো বালিশ ফেঁড়ে তুলো বার করে তেমনি।

জিম শুধু বললে—সাক্ষাৎ শয়তান! মূর্তিমান শয়তান—হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললে—পালাও পালাও—

তার পরেই জিম মারা গেল। তালগাছের গায়ে দেখি যেন কিসের মোটা শক্ত চোঁচ লেগে আছে। আমার মনে হল কোনো ভীষণ বলবান জানয়ার তালগাছের গায়ে গা ঘষছিল, গাছটা ওরকম নড়চিল সেইজন্যেই। জন্তুটার কোনো পাত্তা পেলাম না। জিমের দেহ ফাঁকা জায়গায় বার করে আমি রাইফেল হাতে ঝোপের ওপারে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মাটির উপরে কোনো অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন, তার মোটে তিনটে আঙুল পায়ে। কিছুদূর গেলাম পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে, জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে একটা গুহার মুখে পদচিহ্নটা ঢুকে গেল। গুহার প্রবেশপথের কাছে শুকনো বালির উপর ওই অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার বড়-বড় তিন আঙুলে থাবার দাগ রয়েচে।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেচে। সেই জনহীন অরণ্যভূমি ও পর্বতবেষ্টিত অজ্ঞাত উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আমি এক অজ্ঞাততর ভীষণ বলবান জন্তুর অনুসরণ করচি। ডাইনে চেয়ে দেখি প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় সুউচ্চ ব্যাসাল্টের দেওয়াল খাড়া উঠেচে প্রায় চার হাজার ফুট, বনে-বনে নিবিড়, খুব উঁচুতে পর্বতের বাঁশবনের মাথায় সামান্য যেন একটু রাঙা রোদ—কিংবা হয়তো আমার চোখের ভুল, অনন্ত আকাশের আভা পড়ে থাকে।

ভাবলাম, এ-সময় গুহার মধ্যে ঢোকা বা এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেচনার কাজ হবে না। জিমের দেহ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। সারারাত তার মৃতদেহ নিয়ে আগুন জ্বেলে রাইফেল তৈরি রেখে বসে রইলুম।

পরদিন জিমকে সমাধিস্থ করে আবার ওই জানোয়ারটার খোঁজে বার হলাম। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, সে-গুহা অনেক খুঁজেও কিছুতেই বার করতে পারলুম না। ওরকম অনেক গুহা আছে পর্বতের নানা জায়গায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন গুহা দেখেছিলাম কে জানে?

সঙ্গীহীন অবস্থায় সেই মহাদুর্গম রিখটারসভেল্ট পর্বতশ্রেণীর বনের মধ্যে থাকা চলে না। পনেরো দিন হেঁটে সেই কাফির বস্তিতে পৌঁছলাম। তারা চিনতে পারলে, খুব খাতির করলে। তাদের কাছে জিমের মৃত্যুকাহিনী বললাম।

শুনে তাদের মুখ ভয়ে কেমন হয়ে গেল, ছোট-ছোট চোখ ভয়ে বড় হয়ে উঠল। বললে—সর্বনাশ! বুনিপ। ওই ভয়েই ওখানে কেউ যায় না।

কাফির বস্তি থেকে আর পাঁচ দিন হেঁটে অরেঞ্জ নদীর ধারে এসে একখানা ডাচ লঞ্চ পেলাম। তাতে করে এসে সভ্য জগতে পৌঁছলাম।

আমি আর কখনও রিখটারসভেল্ট পর্বতের দিকে যেতে পারিনি। চেষ্টা করেছিলাম অনেক। কিন্তু বুয়র যুদ্ধ এসে পড়ল। যুদ্ধে গেলাম। আহত হয়ে প্রিটোরিয়ার হাসপাতালে অনেক দিন রইলাম। তারপর সেরে উঠে একটা কমলালেবুর বাগানে কাজ পেয়ে সেখানেই এতদিন ছিলাম।

বছর চার-পাঁচ শান্ত জীবনযাপন করবার পরে, ভাল লাগল না, তাই আবার বার হয়েছিলাম। বয়েস হয়ে গিয়েচে অনেক, ইয়াংম্যান, এবার আমার চলা বোধহয় ফুরুবে।

এই ম্যাপখানা তুমি রাখো। এতে রিখটারসভেল্ট পর্বত ও যে-নদীতে আমরা হীরে পেয়েছিলাম, মোটামুটিভাবে আঁকা আছে। সাহস থাকে সেখানে যেও, বড়মানুষ হবে। বুয়র যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু-একটা ছোট-বড় হীরের খনি বেরিয়েছে, কিন্তু আমরা যেখানে হীরে পেয়েছিলুম তার সন্ধান কেউ জানে না। যেও তুমি।

ডিয়েগো আলভারেজ গল্প শেষ করে আবার অবসন্নভাবে বালিশের গায়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার গুণে ডিয়েগো আলভারেজ সে-যাত্রা সেরে উঠল এবং দিন পনেরো শঙ্কর তাকে নিজের কাছেই রাখলে। কিন্তু চিরকাল সে পথে-পথে বেড়িয়ে এসেচে, ঘরে তার মন বসে না। একদিন সে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শঙ্কর নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিল। বললে—চল, তোমার অসুখের সময় যেসব কথা বলেছিলে, মনে আছে? সেই হলদে হীরের খনি?

অসুখের ঝোঁকে আলভারেজ যেসব কথা বলেছিল, এখন সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ আর কোনো কথাটি বলে না। বেশির ভাগ সময় চুপ করে কী যেন ভাবে। শঙ্করের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বললে—আমিও কথাটা যে না ভেবে দেখেচি, তা মনে কোরো না। কিন্তু আলেয়ার পিছনে ছুটবার সাহস আছে তোমার?

শঙ্কর বললে—আছে কি না দেখতে দোষ কী? আজই বল তো মাভো স্টেশনে তার করে আমার বদলে অন্য লোক পাঠাতে বলি।

আলভারেজ কিছুক্ষণ ভেবে বললে—কর তার। কিন্তু আগে বুঝে দেখ। যারা সোনা বা হীরে খুঁজে বেরায় তারা সবসময় তা পায় না। আমি আশি বছরের এক বুড়ো লোককে জানতাম, সে কখনও কিছু পায়নি। তবে প্রতিবারই বলত, এইবার ঠিক সন্ধান পেয়েছি, এইবার পাব! আজীবন অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে আর আফ্রিকার ভেল্ডে প্রসপেকটিং করে বেড়িয়েছে।

আরও দিন দশেক পরে দুজনে কিসুমু গিয়ে ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদে স্টীমার চড়ে দক্ষিণমুখে মোয়ানজার দিকে যাবে ঠিক করলে।

পথে এক জায়গায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাজার-হাজার জেব্রা, জিরাফ, হরিণ চরতে দেখে শঙ্কর তো অবাক। এমন দৃশ্য সে আর কখনও দেখেনি।

জিরাফগুলো মানুষকে আদৌ ভয় করে না, পঞ্চাশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল।

আলভারেজ বললে—আফ্রিকার জিরাফ মারবার জন্যে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে বিশেষ লাইসেন্স নিতে হয়। যে-সে মারতে পারে না। সেইজন্য মানুষকে ওদের তত ভয় নেই।

হরিণের দল কিন্তু বড় ভীরু, এক-এক দলে দু-তিনশো হরিণ চরচে। ওদের দেখে ঘাস খাওয়া ফেলে মুখ তুলে একবার চাইলে, পরক্ষণেই মাঠের দূর প্রান্তের দিকে সবাই চার পা তুলে দৌড়।

কিসুমু থেকে স্টীমার ছাড়ল—এটা ব্রিটিশ স্টীমার, ওদের পয়সা কম বলে ডেকে যাচ্ছে। নিগ্রো মেয়েরা পিঠে ছেলেমেয়ে বেঁধে মুবগি নিয়ে স্টীমারে উঠেছে। মাসাই কুলিরা ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে, সঙ্গে নাইরোবি শহর থেকে কাঁচের পুঁতি, কম দামের খেলো আয়না ছুরি প্রভৃতি নানা জিনিস।

স্টীমার থেকে নেমে আবার ওরা পথ চলে। ভিক্টোরিয়া হ্রদের যে-বন্দরে ওরা নামল, তার নাম মোয়ানজা। এখান থেকে তিনশো মাইল দূরে ট্যাবোরা, সেখানে পৌঁছে কয়েক দিন বিশ্রাম করে ওরা যাবে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের তীরবর্তী উজিজি বন্দরে।

এই পথে যাবার সময় আলভারেজ বললে টাঙ্গানিয়াকার মধ্য দিয়ে যাওয়া বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। এখানে একরকম মাছি আছে তা কামড়ালে স্লীপিং সিকনেস হয়। স্লীপিং সিকনেস-এর মড়কে টাঙ্গানিয়াকা জনশূন্য হয়ে পড়েচে। মোয়ানজা থেকে ট্যাবোরার পথে সিংহের ভয়ও খুব বেশি। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার এই অঞ্চলও সিংহের রাজ্য বলা চলে।

শহর থেকে দশ মাইল দূরে পথের ধারে একটা ছোট খড়ের বাংলো। সেখানে এক ইউরোপীয় শিকারি আশ্রয় নিয়েচে। আলভারেজকে সে খুব খাতির করলে। শঙ্করকে দেখে বললে—একে পেলে কোথায়? এ তো হিন্দু! তোমার কুলি?

আলভারেজ বললে—আমার ছেলে।

সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললে—কী রকম?

আলভারেজ আনুপূর্বিক সব বর্ণনা করলে, তার রোগের কথা, শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার কথা। কেবল বললে না কোথায় যাচ্ছে ও কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

সাহেব হেসে বললে—বেশ ভাল। ওর মুখ দেখে মনে হয় ওর মনে সাহস ও দয়া দুই-ই আছে। ইস্ট ইন্ডিজের হিন্দুরা লোক হিসেবে ভালই বটে। একবার ইউগান্ডাতে একজন শিখ আমার প্রতি এমন সুন্দর আতিথ্য দেখিয়েছিল, তা কখনও ভুলতে পারব না। আজ তোমরা এস, রাত সামনে, আমার এখানেই রাত্রি যাপন কর। এটা গবর্নমেন্টের ডাকবাংলো, আমিও তোমাদের মতো সারাদিন পথ চলে বিকেলের দিকে এসে উঠেচি।

সাহেবের একটা ছোট গ্রামোফোন ছিল, সন্ধ্যার পরে টিনবন্দি বিলিতি টোমাটোর ঝোল ও সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করার পরে সবাই বাংলোর বাইরে ক্যাম্প চেয়ারে শুয়ে রেকর্ডের পর রেকর্ড শুনে যাচ্ছে, এমন সময় অল্প দূরে সিংহের গর্জন শোনা গেল। বোধ হল মাটির কাছে মুখ নামিয়ে সিংহ গর্জন করচে—কারণ মাটি যেন কেঁপে-কেঁপে উঠচে।

সাহেব বললে—টাঙ্গানিয়াকায় বেজায় সিংহের উপদ্রব আর বড় হিংস্র এরা। প্রায় অধিকাংশ সিংহই মানুষখেকো। মানুষের রক্তের আস্বাদ একবার পেয়েচে, এখন মানুষ ছাড়া আর কিছু চায় না।

শঙ্কর ভাবলে, খুব সুসংবাদ বটে। ইউগান্ডা রেলওয়ে তৈরি হবার সময় সে সিংহের উপদ্রব কাকে বলে খুব ভাল করেই দেখেচে।

পরদিন সকালে ওরা আবার রওনা হল। সাহেব বলে দিলে—সূর্য উঠে গেলে খুব সাবধানে থাকবে। স্লীপিং সিকনেস-এর মাছি রোদ উঠলেই জাগে, গায়ে যেন না বসে।

দীর্ঘ-দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ। আলভারেজ বললে—খুব সাবধান, এই সব ঘাসের বনেই সিংহের আড্ডা; বেশি পিছনে থেকো না।

আলভারেজের বন্দুক আছে, এই একটা ভরসা। আর একটা ভরসা এই যে, আলভারেজ, যাকে বলে 'ক্র্যাকশট', তা-ই। অর্থাৎ তার গুলি বড় একটা ফসকায় না। কিন্তু অত বড় অব্যর্থলক্ষ্য শিকারির সঙ্গে থেকেও শঙ্কর বিশেষ ভরসা পেলে না, কারণ ইউগান্ডার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, সিংহ যখন যাকে নেবে, এমন সম্পূর্ণ অতর্কিতেই নেবে যে, পিঠের রাইফেলের চামড়ার স্ট্র্যাপ খুলবার অবকাশ পর্যন্ত দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যা হবার ঘণ্টাখানেক আগে দূরবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে রাত্রের বিশ্রামের জন্যে স্থান নির্বাচন করে নিতে হল। আলভারেজ বললে—সামনে কোনো গ্রাম নেই। অন্ধকারের পর এখানে পথ চলা ঠিক নয়।

একটা সুবৃহৎ বাওবাগাছের তলায় দু-টুকরো কেম্বিস্ ঝুলিয়ে ছোট্ট একটু তাঁবু খাটানো হল। কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রের খাবার তৈরি করতে বসল শঙ্কর। তারপর সমস্তদিন পরিশ্রমের পরে দুজনেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে আলভারেজ ডাকলে—শঙ্কর, ওঠো।

শঙ্কর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

আলভারেজ বললে—কী একটা জানোয়ার তাঁবুর চারপাশে ঘুরচে, বন্দুক বাগিয়ে রাখো।

সত্যিই একটা কোনো অজ্ঞাত বৃহৎ জন্তুর নিশ্বাসের শব্দ তাঁবুর পাতলা কেম্বিসের

পর্দার বাইরে শোনা যাচ্ছে বটে। তাঁবুর সামনে সন্ধ্যায় যে-আগুন করা হয়েছিল, তার স্বল্পাবশিষ্ট আলোকে সুবৃহৎ বাওবাবগাছটা একটা ভীষণদর্শন দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করতে বৃদ্ধ বারণ করলে।

পরক্ষণেই জানোয়ারটা হুড়মুড় করে তাঁবুটা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুর পরদার ভিতর থেকেই আলভারেজ পরপর দুবার রাইফেল ছুঁড়লে। শব্দটা লক্ষ্য করে শঙ্করও সেই মুহূর্তে বন্দুক ওঠালে। কিন্তু শঙ্কর ঘোড়া টিপবার আগে আলভারেজের রাইফেল আর একবার আওয়াজ করে উঠল। তার পরেই সব চুপ।

ওরা টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এসে দেখলে তাঁবুর পুবদিকে বাইরের পরদাটা খানিকটা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ।

সেটা তখনও মরেনি, কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছে। আরও দুবার গুলি খেয়ে সেটা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল।

আলভারেজ আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বললে—রাত এখনও অনেক। ওটা এখানে পড়ে থাক। চল আমরা আমাদের ঘুম শেষ করি।

দুজনেই এসে শুয়ে পড়ল—একটু পড়ে শঙ্কর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আলভারেজের নাসিকাগর্জন শুরু হয়েচে। শঙ্করের চোখে ঘুম এল না।

আধঘণ্টা পরে শঙ্করের মনে হল, আলভারেজের নাসিকাগর্জনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে টাঙ্গানিয়াকা অঞ্চলের সমস্ত সিংহ যেন একযোগে ডেকে উঠল। সে কী ভয়ানক সিংহের ডাক! আগেও শঙ্কর অনেকবার সিংহগর্জন শুনেচে, কিন্তু এ-রাত্রের সে-ভীষণ বিরাট গর্জন তার চিরকাল মনে ছিল। তা ছাড়া ডাক তাঁবু থেকে বিশ হাতের মধ্যে।

আলভারেজ আবার জেগে উঠল। বললে—নাঃ, রাত্রে দেখচি একটু ঘুমুতে দিলে না। আগের সিংহটার জোড়া। সাবধান থাকো। বড় পাজি জানোয়ার।

কী দুর্যোগের রাত্রি! তাঁবুর আগুনও তখন নিবুনিবু। তাই বাইরে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাতলা কেম্বিসের চটের মাত্র ব্যবধান—তার ওদিকে সাথীহারা পশু। বিরাট গর্জন করতে-করতে সেটা একবার তাঁবু থেকে দূরে যায়, আবার কাছে আসে, কখনও তাঁবু প্রদক্ষিণ করে।

ভোর হবার কিছু আগে সিংহটা সরে পড়ল। ওরাও তাঁবু তুলে আবার যাত্রা শুরু করলে।

ছয়

দিন পনেরো পরে শঙ্কর ও আলভারেজ উজিজি বন্দর থেকে স্টীমারে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদে ভাসল। হ্রদ পার হয়ে আলবার্টভিল বলে একটা ছোট শহরে কিছু আবশ্যকীয় জিনিস কিনে নিল। এই শহর থেকে কাবালো পর্যন্ত বেলজিয়ম গবর্নমেন্টের রেলপথ আছে। সেখান থেকে কঙ্গোনদীতে স্টীমার চড়ে তিনদিনের পথ সানকিনি যেতে হবে, সানকিনিতে নেমে কঙ্গোনদীর পথ ছেড়ে, দক্ষিণমুখে অজ্ঞাত বনজঙ্গল ও মরুভূমির দেশে প্রবেশ করতে হবে।

কাবালো অতি অপরিষ্কার স্থান, কতকগুলো বর্ণসঙ্কর পর্টুগিজ ও বেলজিয়ানের আড্ডা।

স্টেশনের বাইরে পা দিয়েচে এমন সময় একজন পর্টুগিজ ওর কাছে এসে বললে—হ্যালো, কোথায় যাবে? দেখচি নতুন লোক, আমায় চেন না নিশ্চয়ই। আমার নাম

আলবুকার্ক।

শঙ্কর চেয়ে দেখলে আলভারেজ তখনও স্টেশনের মধ্যে।

লোকটার চেহারা যেমন কর্কশ, তেমনি কদাকার। কিন্তু সে ভীষণ জোয়ান, প্রায় সাত ফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীরের প্রত্যেকটি মাংসেপেশি গুনে নেওয়া যায়, এমনি সুদৃঢ় ও সুগঠিত।

শঙ্কর বললে—তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।

লোকটা বললে—তুমি দেখছি কালা আদমি, বোধহয় ইস্ট ইন্ডিজের। আমার সঙ্গে পোকার খেলবে চল।

শঙ্কর ওর কথা শুনে চটেছিল, বললে—তোমার সঙ্গে পোকার খেলবার আমার আগ্রহ নেই। সঙ্গে-সঙ্গে সে এটাও বুঝলে, লোকটা পোকার খেলবার ছলে তার সর্বস্ব অপহরণ করতে চায়। পোকার একরকম তাসের জুয়াখেলা, শঙ্কর নাম জানলেও সে-খেলা জীবনে কখনও দেখেওনি, নাইরোবিতে সে জানত বদমাইশ জুয়াড়িরা পোকার খেলার ছল করে নতুন লোকের সর্বনাশ করে। এটা একধরনের ডাকাতি।

শঙ্করের উত্তর শুনে পর্টুগিজ বদমাইশটা রেগে লাল হয়ে উঠল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে চাইল। সে আরও কাছে ঘেঁষে এসে, দাঁতে দাঁত চেপে, অতি বিকৃত সুরে বললে—কী? নিগার, কী বললি? ইস্ট ইন্ডিজের তুলনায় তুই অত্যন্ত ফাজিল দেখছি। তোর ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যে তোকে জানিয়ে দিই যে, তোর মতো কালা আদমিকে আলবুকার্ক এই রিভলবারের গুলিতে কাদাখোঁচা পাখির মতো ডজনে-ডজনে মেরেচে। আমার নিয়ম হচ্ছে, এই শোন—কাবালোতে যারা নতুন লোক নামবে, তারা হয় আমার সঙ্গে পোকার খেলবে, নয়তো আমার সঙ্গে রিভলবারে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে।

শঙ্কর দেখলে এই বদমাইশ লোকটার সঙ্গে রিভলবারের লড়াইয়ে নামলে মৃত্যু অনিবার্য। বদমাইশটা হচ্ছে একজন ক্র্যাকশট গুণ্ডা,আর সে কী? কাল পর্যন্ত রেলের নিরীহ কেরানি ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না করে যদি পোকারই খেলে তবে সর্বস্ব যাবে।

হয়তো আধমিনিট কাল শঙ্করের দেরি হয়েচে উত্তর দিতে, লোকটা কোমরের চামড়ার হোলস্টার থেকে নিমেষের মধ্যে রিভলবার বার করে শঙ্করের পেটের কাছে উঁচিয়ে বললে—যুদ্ধ না পোকার?

শঙ্করের মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভীতুর মতো সে পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নিচু করবে না, হোক মৃত্যু।

সে বলতে যাচ্ছে—যুদ্ধ, এমন সময় পিছন থেকে ভয়ানক বাজখাঁই সুরে কে বললে—এই, সামলাও। গুলিতে মাথার চাঁদি উড়ল!

দুইজনেই চমকে উঠে পিছনে চাইলে। আলভারেজ তার উইনচেস্টার রিপিটারটা বাগিয়ে, উঁচিয়ে, পর্টুগিজ বদমাইশটার মাথা লক্ষ্য করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। শঙ্কর সুযোগ বুঝে চট করে পিস্তলের নলের উল্টোদিকে ঘুরে গেল। আলভারেজ বললে—বালকের সঙ্গে রিভলবার ডুয়েল? ছোঃ, তিন বলতে পিস্তল ফেলে দিবি, এক—দুই—তিন—আলবুকার্কের শিথিল হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল।

আলভারেজ বললে—বালককে একা পেয়ে খুব বীরত্ব জাহির করছিলি, না? শঙ্কর ততক্ষণ পিস্তলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েচে। আলবুকার্ক একটু বিস্মিত হল, অলভারেজ যে শঙ্করের দলের লোক, তা সে ভাবেওনি। সে হেসে বললে—আচ্ছা, মেট,

কিছু মনে কোরো না, আমারই হার। দাও, আমার পিস্তল দাও ছোকরা। কোনো ভয় নেই, দাও। এস, হাতে হাত দাও। তুমিও মেট। আলবুকার্ক রাগ পুষে রাখে না। এস, কাছেই আমার কেবিন, এক-এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে যাও।

আলভারেজ নিজের জাতের লোকের রক্ত চেনে। ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে আলবুকার্কের কেবিনে গেল। শঙ্কর বিয়ার খায় না শুনে তাকে কফি করে দিলে। প্রাণ-খোলা হাসি হেসে কত গল্প করলে, যেন কিছুই হয়নি।

শঙ্কর বাস্তবিকই লোকটার দিকে আকৃষ্ট হল। কিছুক্ষণ আগের অপমান ও শত্রুতা যে এমন বেমালুম ভুলে গিয়ে, যাদের হাতে অপমানিত হয়েচে, তাদেরই সঙ্গে এমনি ধারা দিলখোলা হেসে খোশগল্প করতে পারে, পৃথিবীতে এ-ধরনের লোক বেশি নেই।

পরদিন ওরা কাবালো থেকে স্টীমারে উঠল কঙ্গোনদী বেয়ে দক্ষিণমুখে যাবার জন্যে। নদীর দুই তীরের দৃশ্যে শঙ্করের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এরকম অদ্ভুত বনজঙ্গলের দৃশ্য জীবনে কখনও সে দেখেনি। এতদিন সে যেখানে ছিল, আফ্রিকার সে-অঞ্চলে এমন বন নেই, সে শুধু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রধানত ঘাসের বন, মাঝে-মাঝে বাবলা ও ইউকাগাছ। কিন্তু কঙ্গোনদী বেয়ে স্টীমার যত অগ্রসর হয়, দুধারে নিবিড় বনানী, কত ধরনের মোটা-মোটা লতা, বনের ফুল। বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, আপনার সৌন্দর্য ও নিবিড় প্রাচুর্যে আপনি মুগ্ধ।

শঙ্করের মধ্যে যে সৌন্দর্যপ্রিয় ভাবুক মনটি ছিল (হাজার হোক সে বাঙলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আলভারেজের মতো শুধু কঠিনপ্রাণ স্বর্ণান্বেষী প্রসপেক্টর নয়), এই রূপের মেলায় সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে, রাঙা অপরাহ্ণে ও দুপুর-রোদে আপন মনে কত কী স্বপ্ন জাল রচনা করে।

অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, অচেনা তারাভরা বিদেশের আকাশের তলায় রহস্যময়ী বন্য প্রকৃতি তখন যেন জেগে উঠেচে—জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্যজন্তুর ডাক কানে আসে। শঙ্করের চোখে ঘুম নেই, এই সৌন্দর্যস্বপ্নে বিভোর হয়ে, মধ্য-আফ্রিকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও জেগে বসে থাকে।

ঐ জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডল—আকাশের অনেক দূরে তার ছোট্ট গ্রামের মাথায়ও আজ এমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেচে, ঐরকম একফালি কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রির চাঁদও। সেসব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূরে এসে সে পড়েচে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কী এর পরিণতি কে জানে!

দুদিন পরে বেটি এসে সানকিনি পৌঁছুল। সেখান থেকে ওরা আবার পদব্রজে রওনা হল। জঙ্গল এদিকে বেশি নেই, কিন্তু দিগন্তপ্রসারী জনমানবহীন প্রান্তর ও অসংখ্য ছোট-বড় পাহাড়, অধিকাংশ পাহাড় বৃক্ষ ও বৃক্ষশূন্য, কোনো-কোনো পাহাড়ে ইউফোর্বিয়া জাতীয় গাছের ঝোপ। কিন্তু শঙ্করের মনে হল, আফ্রিকার এই অঞ্চলের দৃশ্য বড় অপরূপ। এতটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে মন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সূর্যাস্তের রঙ, জ্যোৎস্নারাত্রির মায়া, এই দেশকে রাত্রে অপরাহ্ণে রূপকথার পরীরাজ্য করে তোলে।

আলভারেজ বললে—এই ভেল্ড অঞ্চলে সব জায়গা দেখতে একরকম বলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশি।

কথাটা যেদিন বলা হল, সেদিনই এক কাণ্ড ঘটল। জনহীন ভেল্ডে সূর্য অস্ত গেলে একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বালে—শঙ্কর জল খুঁজতে বেরুল। সঙ্গে আলভারেজের বন্দুকটা নিয়ে গেল, কিন্তু মাত্র দুটি টোটা। আধঘণ্টা এদিক-ওদিক

ঘুরে বেলাটুকু গেল, পাতলা অন্ধকারে সমস্ত প্রান্তরকে ধীরে-ধীরে আবৃত করে দিলে। শঙ্কর শপথ করে বলতে পারে, সে আধঘণ্টার বেশি হাঁটেনি। হঠাৎ চারধারে চেয়ে শঙ্করের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল, যেন কী একটা বিপদ আসচে, তাঁবুতে ফেরা ভাল। দূরে-দূরে ছোট-বড় পাহাড়, একইরকম দেখতে সবদিক, কোনো চিহ্ন নেই, সব একাকার।

মিনিট পাঁচ-ছয় হাঁটবার পরই শঙ্করের মনে হল সে পথ হারিয়েচে। তখন আলভারেজের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু তখনও সে অনভিজ্ঞতার দরুন বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পারলে না। হেঁটেই যাচ্ছে—হেঁটেই যাচ্ছে—একবার মনে হয় সামনে, একবার মনে হয় বাঁয়ে, একবার মনে হয় ডাইনে। তাঁবুর আগুনের কুণ্ডটা দেখা যায় না কেন? কোথায় সেই ছোট পাহাড়টা?

দুঘণ্টা হাঁটবার পর শঙ্করের খুব ভয় হল। ততক্ষণে সে বুঝেচে যে, সে সম্পূর্ণরূপে পথ হারিয়েচে এবং ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। একা তাকে রোডেশিয়ার এই জনমানবশূন্য, সিংহসঙ্কুল অজানা প্রান্তরে রাত কাটাতে হবে—অনাহারে এবং এই কনকনে শীতে বিনা কম্বলে ও বিনা আগুনে। সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই দাঁড়াল যে, পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে অর্থাৎ পথ হারানোর চব্বিশ ঘণ্টা পরে, উদভ্রান্ত, তৃষ্ণায় মুমূর্ষু শঙ্করকে, ওদের তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে একটা ইউফোর্বিয়া গাছের তলা থেকে আলভারেজ উদ্ধার করে তাঁবুতে নিয়ে এল।

আলভারেজ বললে—তুমি যে-পথ ধরেছিলে শঙ্কর, তোমাকে আজ খুঁজে বার করতে না পারলে তুমি গভীর থেকে গভীরতর মরুপ্রান্তরের মধ্যে গিয়ে পড়ে, কাল দুপুর নাগাদ তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে। এর আগে তোমার মতো অনেকেই রোডেশিয়ার ভেল্ডে এভাবে মারা গিয়েচে। এসব ভয়ানক জায়গা। তুমি আর কখনও তাঁবু থেকে ওরকম বেরিও না, কারণ তুমি আনাড়ি। মরুভূমিতে ভ্রমণের কৌশল তোমার জানা নেই, ডাহা মারা পড়বে।

শঙ্কর বললে—আলভারেজ, তুমি দুবার আমার প্রাণ রক্ষা করলে, এ আমি ভুলব না।

আলভারেজ বললে—ইয়াংম্যান, ভুলে যাচ্চ যে তার আগে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি না থাকলে ইউগান্ডার তৃণভূমিতে আমার হাড়গুলো সাদা হয়ে আসত এতদিনে।

মাস দুই ধরে রোডেশিয়া ও এঙ্গোলার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভেল্ড অতিক্রম করে অবশেষে দূরে মেঘের মতো পর্বতশ্রেণী দেখা গেল। আলভারেজ ম্যাপ মিলিয়ে বললে—ওই হচ্চে আমাদের গন্তব্যস্থান, রিখটারসভেল্ড পর্বত, এখনও এখান থেকে চল্লিশ মাইল হবে। আফ্রিকার এইসব খোলা জায়গায় অনেক দূর থেকে জিনিস দেখা যায়।

এ-অঞ্চলে অনেক বাওবাবগাছ। শঙ্করের এগাছটা বড় ভাল লাগে—দূর থেকে যেন মনে হয় বট কি অশ্বত্থগাছের মতো, কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায় বাওবাবগাছ, ছায়াবিরল অথচ বিশাল, আঁকাবাঁকা, সারা গায়ে বড়-বড় আঁচিল কি আব বেরিয়েচে, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা বেঁটে, কুদর্শন, কুব্জ দৈত্য। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এখানে-ওখানে প্রায় সর্বত্রই দূরে নিকটে বড়-বড় বাওবাবগাছ দাঁড়িয়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলার দুর্জয় শীতে তাঁবুর সামনে আগুন করে বসে আলভারেজ বললে—এই যে দেখচ রোডেশিয়ার ভেল্ড অঞ্চল, এখানে হীরে ছড়ানো আছে সর্বত্র,

এটা হীরের খনির দেশ। কিম্বার্লি খনির নাম নিশ্চয় শুনেচ। আরও অনেক ছোটখাটো খনি আছে, এখানে-ওখানে ছোট-বড় হীরের টুকরো কত লোক পেয়েচে, এখনও পায়।

কথা শেষ করেই বলে উঠল—ও কারা?

শঙ্কর সামনে বসে ওর কথা শুনছিল। বললে—কোথায় কি?

কিন্তু আলভারেজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার হাতের বন্দুকের গুলির মতোই অব্যর্থ, একটু পরে তাঁবু থেকে দূরে অন্ধকারে কয়েকটি অস্পষ্ট মূর্তি এদিকে এগিয়ে আসচে, শঙ্করের চোখে পড়ল। আলভারেজ বললে—শঙ্কর, বন্দুক নিয়ে এস, চট করে যাও, টোটা ভরে—

বন্দুকহাতে শঙ্কর বাইরে এসে দেখলে, আলভারেজ নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করচে, কিছুদূরে অজানা মূর্তি কয়টি এখনও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আসচে। একটু পরে তারা এসে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের বাইরে দাঁড়াল। শঙ্কর চেয়ে দেখলে আগন্তুক কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়—তাদের হাতে কিছু নেই, পরনে লেংটি, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালক—সুগঠিত চেহারা। তাঁবুর আলোয় মনে হচ্ছিল, যেন কয়েকটি ব্রোঞ্জের মূর্তি।

আলভারেজ জুলু ভাষায় বললে—কী চাও তোমরা?

ওদের মধ্যে কী কথাবার্তা চলল, তার পর **ওরা সব মাটির** উপর বসে পড়ল। আলভারেজ বললে—শঙ্কর, ওদের খেতে দাও।

তারপর অনুচ্চস্বরে বললে—বড় বিপদ! খুব হুঁশিয়ার, শঙ্কর।

টিনের খাবার খোলা হল। সকলের সামনেই খাবার রাখলে শঙ্কর। আলভারেজও ওই-সঙ্গে আবার খেতে বসল, যদিও সে ও শঙ্কর সন্ধ্যার সময়েই তাদের নৈশ-আহার শেষ করেচে। শঙ্কর বুঝলে আলভারেজের কোনো মতলব আছে, কিংবা এদেশের রীতি অতিথির সাথে খেতে হয়।

আলভারেজ খেতে-খেতে জুলু ভাষায় আগন্তুকদের সঙ্গে গল্প করচে, অনেকক্ষণ পরে খাওয়াশেষে ওরা চলে গেল। যাবার আগে সবাইকে একটা করে সিগারেট দেওয়া হল।

ওরা চলে গেলে আলভারেজ বললে—ওরা মাটাবেল জাতির লোক। ভয়ানক দুর্দান্ত, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে অনেকবার লড়েছে। শয়তানকেও ভয় করে না। ওরা সন্দেহ করেচে আমরা ওদের দেশে এসেচি হীরের খনির সন্ধানে। আমরা যে-জায়গাটায় আছি, এটা ওদের একজন সর্দারের রাজ্য। কোনো সভ্য গবর্নমেন্টের আইন এখানে খাটবে না। ধরবে আর নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারবে। চল আমরা তাঁবু তুলে রওনা হই।

শঙ্কর বললে—তবে তুমি বন্দুক আনতে বললে কেন?

আলভারেজ হেসে বললে—দেখ, ভেবেছিলাম যদি ওরা খেয়েও না ভোলে, কিংবা কথাবার্তায় বুঝতে পারি যে, ওদের মতলব খারাপ, ভোজনরত অবস্থাতেই ওদের গুলি করব। এই দেখ রিভলবার পিছনে রেখে তবে খেতে বসেছিলাম, এ-কটাকে সাবাড় করে দিতাম। আমার নাম আলভারেজ, আমিও এককালে শয়তানকে ভয় করতুম না, এখনও করিনে। ওদের হাতের মাছ মুখে পৌঁছবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।

আরও পাঁচ-ছদিন পথ চলবার পরে একটা খুব বড় পর্বতের পাদমূলে নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানীর মধ্যে ওরা প্রবেশ করলে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি বিশাল। সে-বন দেখে শঙ্করের মনে হল, একবার যদি সে এর মধ্যে পথ হারায়, সারাজীবন ঘুরলেও বার হয়ে আসবার সাধ্য তার হবে না। আলভারেজও তাকে সাবধান করে দিয়ে

বললে—খুব হুঁশিয়ার শঙ্কর, বনে চলাফেরা যার অভ্যাস নেই, সে পদে-পদে এইসব বনে পথ হারাবে। অনেক লোক বেঘোরে পড়ে বনের মধ্যে মারা পড়ে। মরুভূমির মধ্যে যেমন পথ হারিয়ে ঘুরেছিলে, এর মধ্যেও ঠিক তেমনই পথ হারাতে পার। কারণ, এখানে সবই একরকম, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাকে পৃথক করে চিনে নেবার কোনো চিহ্ন নেই। ভাল বুশম্যান না হলে পদে-পদে বিপদে পড়তে হবে। বন্দুক না নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না, এটিও যেন মনে থাকে। মধ্য-আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পার্ক নয়।

শঙ্করকে তা না বললেও চলত, কারণ এসব অঞ্চল যে শৌখিন পার্ক নয়, তা এর চেহারা দেখেই সে বুঝতে পেরেচে। সে জিগগেস করলে—তোমার সেই হলদে হীরের খনি কতদূরে। এই তো রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা, ম্যাপে যতদূর বোঝা যাচ্ছে।

আলভারেজ হেসে বললে—তোমার ধারণা নেই বললাম যে! আসল রিখটারসভেল্ডের এটা বাইরের থাক্। এরকম আরও অনেক থাক্ আছে। সমস্ত অঞ্চলটা এত বিশাল যে পুবে সত্তর মাইল ও পশ্চিমদিকে একশো থেকে দেড়শো মাইল পর্যন্ত গেলেও এ-বন-পাহাড় শেষ হবে না। সর্বনিম্ন প্রস্থ চল্লিশ মাইল। সমস্ত জড়িয়ে আট-ন-হাজার বর্গমাইল সমস্ত রিখটারসভেল্ড পার্বত্য অঞ্চল ও অরণ্য। এই বিশাল অজানা অঞ্চলের কোনখানটাতে এসেছিলুম আজ সাত-আট বছর আগে, ঠিক সে জায়গাটা খুঁজে বার করা কি ছেলেখেলা ইয়াংম্যান?

শঙ্কর বললে—এদিকে খাবার ফুরিয়েচে, শিকারের ব্যবস্থা দেখতে হয়, নইলে কাল থেকে বায়ুভক্ষণ করা ছাড়া উপায় নেই।

আলভারেজ বললে—কিছু ভেবো না। দেখচ না গাছে-গাছে বেবুনের মেলা? কিছু না মেলে, বেবুনের দাপনা ভাজা আর কফি দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট খাব আজ থেকে। আজ আর নয়, তাঁবু ফেলো, বিশ্রাম করা যাক।

একটা বড় গাছের নিচে তাঁবু খাটিয়ে ওরা আগুন জ্বালালে। শঙ্কর রান্না করলে, আহারাদি শেষ করে যখন দুজনে আগুনের সামনে বসেচে, তখনও বেলা আছে।

আলভারেজ কড়া তামাকের পাইপ টানতে-টানতে বললে—জান শঙ্কর, আফ্রিকার এইসব অজানা অরণ্যে এখনও কত জানোয়ার আচে, যার খবর বিজ্ঞানশাস্ত্র রাখে না? খুব কম সভ্য মানুষ এখানে এসেচে। ওকাপি বলে যে-জানোয়ার, সে তো প্রথম দেখা গেল ১৯০০ সালে। একধরনের বুনো শুওর আছে, যা সাধারণ বুনো শুওরের প্রায় তিনগুণ বড় আকারে। ১৮৮৮ সালে মোজেস কাউলে, পৃথিবী পর্যটক ও বড় শিকারি, সর্বপ্রথম ওই বুনো শুওরের সন্ধান পান বেলজিয়াম কঙ্গোর লুয়ালাবু অরণ্যের মধ্যে। তিনি বহু কষ্টে একটা শিকারও করেন এবং নিউইয়র্ক প্রাণিবিদ্যা সংক্রান্ত মিউজিয়ামে উপহার দেন। বিখ্যাত রোডেশিয়ান মনস্টারের নাম শুনেচ?

শঙ্কর বললে—না, কী সেটা?

—শোনো তবে। রোডিশিয়ার উত্তর সীমায় প্রকাণ্ড জলাভূমি আছে। ওদেশের অসভ্য জুলুদের মধ্যে অনেকেই এক অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারকে এই জলাভূমিতে মাঝে-মাঝে দেখেচে। ওরা বলে তার মাথা কুমিরের মতো, গণ্ডারের মতো তার শিং আছে, গলাটা অজগর সাপের মতো লম্বা ও আঁশওয়ালা দেহটা জলহস্তীর মতো, লেজটা কুমিরের মতো। বিরাটদেহ এই জানোয়ারের প্রকৃতিও খুব হিংস্র। জল ছাড়া কখনো ডাঙায় এ জানোয়ারকে দেখা যায়নি। তবে এইসব অসভ্য দেশি লোকের অতিরঞ্জিত বিবরণ

বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু ১৮৮০ সালে জেমস মার্টিন বলে একজন প্রসপেক্টর রোডেশিয়ার এই অঞ্চলে বহুদিন ঘুরেছিল সোনার সন্ধানে। মিস্টার মার্টিন আগে জেনারেল ম্যাথিউসের এডিকং ছিলেন, নিজে একজন ভাল ভূতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ববিদও ছিলেন। ইনি তাঁর ডায়েরির মধ্যে রোডেশিয়ার এই অজ্ঞাত জানোয়ার দূর থেকে দেখেচেন বলে উল্লেখ করে গিয়েচেন। তিনিও বলেন, জানোয়ারটা আকৃতিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসরজাতীয় সরীসৃপের মতো ও বেজায় বড়। কিন্তু তিনি জোর করে কিছু বলতে পারেননি, কারণ খুব ভোরের কুয়াশার মধ্যে কোভিরান্ডো হ্রদের সীমানায়, জলাভূমিতে আবছায়াভাবে তিনি জানোয়ারটাকে দেখেছিলেন। জানোয়ারটার ঘোড়ার চিহিঁ ডাকের মতো ডাক শুনেই তাঁর সঙ্গের জুলু চাকরগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে-পালাতে বললে—সাহেব পালাও, পালাও, ডিঙ্গোনেক! ডিঙ্গোনেক! ডিঙ্গোনেক ঐ জানোয়ারটার জুলু-নাম। দু-তিন বছরে এক আধবার দেখা দেয় কি না দেয়, কিন্তু সেটা এতই হিংস্র যে-তার আবির্ভাব সে দেশের লোকের পক্ষে ভীষণ ভয়ের ব্যাপার। মিস্টার মার্টিন বলেন, তিনি তাঁর ৩০৩ টোটা গোটা দুই উপরি-উপরি ছুঁড়েছিলেন জানোয়ারটার দিকে। অত দূর থেকে তাক হল না, রাইফেলের আওয়াজে সেটা সম্ভবত জলে ডুব দিলে।

শঙ্কর বললে—তুমি কী করে জানলে এসব? মার্টিনের ডায়েরি ছাপানো হয়েছিল নাকি?

—না, অনেক দিন আগে বুলাওয়েও ক্রনিকল কাগজে মিস্টার মার্টিনের এই ঘটনাটা বেরিয়েছিল। আমি তখন সবে এদেশে এসেচি। রোডেশিয়া অঞ্চলে আমিও প্রসপেকটিং করে বেড়াতুম বলে জানোয়ারটার বিবরণ আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। কাগজখানা অনেক দিন আমার কাছে রেখেও দিয়েছিলুম। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। ওরাই নাম দিয়েছিল জানোয়ারটার রোডেশিয়ান মনস্টার।

শঙ্কর বললে—তুমি কোনো কিছু অদ্ভুত জানোয়ার দেখনি?

প্রশ্নটার সঙ্গে-সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেচে। সেই আবছায়া আলো-অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করের মনে হল—হয়তো শঙ্করের ভুল হতে পারে—কিন্তু শঙ্করের মনে হল সে দেখল আলভারেজ, দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক আলভারেজ, দুঁদে ও অব্যর্থলক্ষ্য আলভারেজ, ওর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল, এবং—এবং সেটাই সকলের চেয়ে আশ্চর্য—যেন পরক্ষণেই শিউরে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে আলভারেজ যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই চারপাশের জনমানবহীন ঘন জঙ্গল ও রহস্যভরা দুরারোহ পর্বতমালার দিকে একবার চেয়ে দেখলে, কোনো কথা বললে না। যেন এই পর্বত জঙ্গলে বহুকাল পরে এসে অতীতের কোনো বিভীষিকাময় পুরাতন ঘটনা ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠেচে—যে-স্মৃতিটা ওর পক্ষে খুব প্রীতিকর নয়।

আলভারেজ ভয় পেয়েছে!

অবাক। আলভারেজের ভয়! শঙ্কর ভাবতেও পারে না! কিন্তু সেই ভয়টা অলক্ষিতে এসে শঙ্করের মনেও চেপে বসল। এই সম্পূর্ণ অজানা বিচিত্র রহস্যময় বনানী, এই বিরাট পর্বত-প্রাচীর যেন এক গভীর রহস্যকে যুগ-যুগ ধরে গোপন করে আসচে। যে বীর যে নির্ভীক, এগিয়ে এস সে—কিন্তু মৃত্যুপণে ক্রয় করতে হবে সেই গহন রহস্যের সন্ধান।

রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা ভারতের দেবাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় নয়—এদেশের মাসাই, জুলু, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতোই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংসলোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না।

সাত

তার পর দিন দুই কেটে গেল। ওরা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলে। পথ কোথাও সমতল নয়, কেবল চড়াই আর উতরাই, মাঝে-মাঝে কর্কশ ও দীর্ঘ টুসক-ঘাসের বন, জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য, ঝরনা এক-আধটা যদিও-বা দেখা যায়, আলভারেজ তাদের জল ছুঁতেও দেয় না। দিব্যি স্ফটিকের মতো নির্মল জল পড়ছে ঝরনা বেয়ে সুশীতল ও লোভনীয়, তৃষ্ণার্ত লোকের পক্ষে সে-লোভ সম্বরণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু আলভারেজ জলের বদলে ঠাণ্ডা চা খাওয়াবে তবুও জল খেতে দেবে না। জলের তৃষ্ণা ঠাণ্ডা চায়ে দূর হয় না, তৃষ্ণার কষ্টই সবচেয়ে বেশি কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল শঙ্করের। এক জায়গায় টুসক-ঘাসের বন বেজায় ঘন। তার উপরে ওদের চারধার ঘিরে সেদিন কুয়াশাও খুব গভীর। হঠাৎ বেলা উঠলে নিচের কুয়াশা সরে গেল। সামনে চেয়ে শঙ্করের মনে হল, খুব বড় একটা চড়াই তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে, কত উঁচু সেটা তা জানা সম্ভব নয়, কারণ নিবিড় কুয়াশা কিংবা মেঘে তার উপরের দিকটা সম্পূর্ণরূপে আবৃত।

আলভারেজ বললে—রিখটারসভেল্ডের আসল রেঞ্জ।

শঙ্কর বললে—এটা পার হওয়া কী দরকার?

আলভারেজ বললে—এজন্যে দরকার যে সেবার আমি আর জিম দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিলুম এই পর্বতশ্রেণীর পাদমূলে, কিন্তু আসল রেঞ্জ পার হইনি। যে-নদীর ধারে হলদে হীরে পাওয়া গিয়েছিল, তার গতি পুব থেকে পশ্চিমে। এবার আমরা যাচ্ছি উত্তর থেকে দক্ষিণে, সুতরাং পর্বত পার হয়ে ওপারে না গেলে কী করে সেই নদীটার ঠিকানা করতে পারি?

শঙ্কর বললে—আজ যেরকম কুয়াশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে একটু অপেক্ষা করা যাক-না কেন। আর একটু বেলা বাড়ুক।

তাঁবু ফেলে আহারাদি সম্পন্ন করা হল। বেলা বাড়লেও কুয়াশা তেমন কাটল না। শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন নেই। চোখ মুছতে-মুছতে তাঁবুর বাইরে এসে সে দেখলে আলভারেজ চিন্তিতমুখে ম্যাপ খুলে বসে আছে। শঙ্করকে দেখে বললে—শঙ্কর, আমাদের এখনও অনেক ভুগতে হবে। সামনে চেয়ে দেখ।

আলভারেজের কথার সঙ্গে-সঙ্গে সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শঙ্করের চোখে পড়ল। কুয়াশা কখন কেটে গেছে, তার সামনে বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বতের প্রধান থাক্ ধাপে-ধাপে উঠে মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেচে। পাহাড়ের কটিদেশ নিবিড় বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জে আবৃত, কিন্তু উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সূর্যের রঙিন আলোয় দেবলোকের কনক-দেউলের মতো বহুদূর নীল শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সামনের পর্বতাংশ সম্পূর্ণ দুরারোহ, শুধুই খাড়া-খাড়া উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ—কোথাও একটু ঢালু নেই। আলভারেজ বললে—এখান থেকে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়, শঙ্কর। দেখেই বুঝেচ নিশ্চয়। পাহাড়ের কোলে-কোলে পশ্চিম দিকে চল। যেখানে ঢালু এবং নিচু পাব, সেখান দিয়েই পাহাড় পার হতে হবে। কিন্তু এই দেড়শো মাইল লম্বা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে

কোথায় সেরকম জায়গা আছে, এ খুঁজতেই তো এক মাসের উপর যাবে দেখচি!

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পশ্চিম দিকে যাওয়ার পর এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল যেখানে পর্বতের গা বেশ ঢালু, সেখান দিয়ে পর্বতে ওঠা চলতে পারে।

পরদিন খুব সকাল থেকে পর্বতারোহণ শুরু হল। শঙ্করের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে-ছটা। সাড়ে-আটটা বাজতে-না-বাজতে শঙ্কর আর চলতে পারে না। যে-জায়গাটা দিয়ে তারা উঠচে—সেখানে পর্বতের খাড়াই চার মাইলের মধ্যে উঠেছে ছ-হাজার ফুট, সুতরাং পথটা ঢালু হলেও কী ভীষণ দুরারোহ তা সহজেই বোঝা যাবে। তা ছাড়া যতই উপরে উঠচে, অরণ্য ততই নিবিড়তর, ঘন অন্ধকার চারদিকে। বেলা হয়েচে, রোদ উঠেচে, অথচ সূর্যের আলো ঢোকেনি জঙ্গলের মধ্যে—আকাশই চোখে পড়ে না তায় সূর্যের আলো!

পথ বলে কোনো জিনিস নেই। চোখের সামনে শুধুই গাছের গুঁড়ি যেন ধাপে-ধাপে আকাশের দিকে উঠে চলেচে। কোথা থেকে জল পড়চে কে জানে, পায়র নিচের প্রস্তর আর্দ্র ও পিচ্ছিল, প্রায় সর্বত্রই শেওলা-ধরা। পা পিছলে গেলে গড়িয়ে নিচের দিকে বহুদূর চলে গিয়ে তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডে আহত হতে হবে।

শঙ্কর বা আলভারেজ কারো মুখে কথা নেই। উত্তুঙ্গ পথে উঠবার কষ্টে দুজনেই অবসন্ন, দুজনেরই ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়চে। শঙ্করের কষ্ট আরও বেশি, বাঙলার সমতল-ভূমিতে আজন্ম মানুষ হয়েচে, পাহাড়ে ওঠার অভ্যাস নেই কখনও।

শঙ্কর ভাবচে, আলভারেজ কখন বিশ্রাম করতে বলবে। সে আর উঠতে পারচে না, কিন্তু যদি সে মরেও যায় এ-কথা আলভারেজকে সে কখনওই বলবে না যে, সে আর পারচে না। হয়তো তাতে আলভারেজ ভাববে ইস্ট ইন্ডিজের মানুষগুলো দেখচি নিতান্তই অপদার্থ। এই মহাদুর্গম পর্বত ও অরণ্যে সে ভারতের প্রতিনিধি—এমন কোনো কাজ সে করতে পারে না যাতে তার মাতৃভূমির মুখ ছোট হয়ে যায়।

বড় চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য! মাঝে-মাঝে ছোটখাটো ঝরনা বনের মধ্যে দিয়ে খুব উপর থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে-ডালে নানা রঙের টিয়াপাখি চোখ ঝলসে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্চে। বড়-বড় ঘাসের মাথায় সাদা-সাদা ফুল, অর্কিডের ফুল ঝুলচে গাছের ডালের গায়ে, গুঁড়ির গায়ে।

হঠাৎ শঙ্করের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে-মাঝে লম্বা দাড়িগোঁফওয়ালা বালখিল্য মুনিদের মতো ও কারা বসে রয়েচে! তারা সবাই চুপচাপ বসে, মুনিজনোচিত গাম্ভীর্যে ভরা। ব্যাপার কী?

আলভারেজ বললে—ও কলোবাসজাতীয় মাদী বাঁদর। পুরুষজাতীয় কলোবাস বাঁদরের দাড়িগোঁফ নেই, স্ত্রীজাতীয় কলোবাস বাঁদরের হাতখানেক লম্বা দাড়িগোঁফ গজায় এবং তারা বড় গম্ভীর, দেখেই বুঝতে পাচ্চ।

ওদের কাণ্ড দেখে শঙ্কর হেসেই খুন।

পায়ের তলায় মাটিও নেই, পাথরও নেই—তার বদলে আছে শুধু পচা পাতা ও শুকনো গাছের গুঁড়ির স্তূপ। এইসব বনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাতার রাশি ঝরচে, পচে যাচ্চে, তার উপরে শেওলা পুরু হয়ে উঠচে, ছাতা গজাচ্চে, তার উপরে আবার নতুন-ঝরা পাতার রাশি, আবার পড়চে গাছের ডালপালা, গুঁড়ি। জায়গায়-জায়গায় ষাট-সত্তর ফুট গভীর হয়ে জমে রয়েচে এই পাতার স্তূপ।

আলভারেজ ওকে শিখিয়ে দিলে, এইসব জায়গায় খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে

হবে। এমন জায়গা আছে, যেখানে মানুষ চলতে-চলতে ওই ঝরাপাতার রাশির মধ্যে ভুস করে ঢুকে ডুবে যেতে পারে, যেমন অতর্কিতে পথ চলতে-চলতে পুরনো কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। উদ্ধার করা সম্ভব না হলে সেসব ক্ষেত্রে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু অনিবার্য।

শঙ্কর বললে—পথের গাছপালা না কাটলে আর তো ওঠা যাচ্ছে না, বড় ঘন হয়ে উঠেছে।

ক্ষুরের মতো ধারাল চওড়া এলিফ্যান্ট ঘাসের বন—যেন রোমান যুগের দ্বিধার তলোয়ার। তার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় দুজনের কেউই নিরাপদ বলে ভাবচে না নিজেকে, দুহাত তফাতে কী আছে দেখা যায় না যখন, তখন সবরকম বিপদের সম্ভাবনাই তো রয়েচে। বাঘ, সিংহ বা বিষাক্ত সাপ কোনোটাই থাকা বিচিত্র নয়।

শঙ্কর লক্ষ্য করচে মাঝে-মাঝে ডুগডুগি বা ঢোল বাজনার মতো একটা শব্দ হচ্ছে কোথায় যেন বনের মধ্যে। কোনো অসভ্য জাতির লোক ঢোল বাজাচ্চে নাকি। আলভারেজকে সে জিগগেস করলে।

আলভারেজ বললে—ঢোল নয়, বড় বেবুন কিংবা বনমানুষে বুক চাপড়ে ঐরকম শব্দ করে। মানুষ এখানে কোথা থেকে আসবে?

শঙ্কর বললে—তুমি যে বলেছিলে এ-বনে গরিলা নেই?

—গরিলা সম্ভবত নেই। আফ্রিকার মধ্যে বেলজিয়ান কঙ্গোর কিছু অঞ্চল, রাওয়েনজির আল্পস্ বা ভিরুঙ্গা আগ্নেয় পর্বতের অরণ্য ছাড়া অন্য কোথাও গরিলা আছে বলে তো জানা নেই। গরিলা ছাড়াও অন্য ধরনের বনমানুষ বুক চাপড়ে ওরকম আওয়াজ করতে পারে।

ওরা সাড়ে চার হাজার ফুটের উপরে উঠেচে। সেদিনের মতো সেখানেই রাত্রির বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলা হল। একটা বিশাল সত্যিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের রাত্রিকালীন শব্দ এত বিচিত্র ধরনের ভীতিজনক যে, সারারাত শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারল না। শুধু ভয় নয়, ভয়মিশ্রিত একটা বিস্ময়।

কত রকমের শব্দ—হায়নার হাসি, কলোবাস বানরের কর্কশ চিৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, বাঘের ডাক—প্রাকৃতিক এই বিরাট নিজস্ব পশুশালায় রাত্রে কেউ ঘুমোয় না। সমস্ত অরণ্যটা এই গভীর রাত্রে যেন হঠাৎ খেপে উঠেচে। বছর কয়েক আগে খুব বড় একটা সার্কাস দল এসে ওদের স্কুল-বোর্ডিংয়ের পাশের মাঠে তাঁবু ফেলেছিল, তাদের জানোয়ারদের চিৎকারে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা রাত্রে ঘুমুতে পারত না—শঙ্করের সেই কথা এখন মনে পড়ল। কিন্তু এসবের চেয়েও মধ্যরাত্রে একদল বনহস্তীর বৃংহতি তাঁবুর অত্যন্ত নিকটে শুনে শঙ্কর এমন ভয় পেয়ে গেল যে, আলভারেজকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠালে। আলভারেজ বললে—আগুন জ্বলছে তাঁবুর বাইরে, কোনো ভয় নেই, ওরা ঘেঁষবেনা এদিকে।

সকালে উঠে আবার উপরে ওঠা শুরু। উঠচে উঠচে—মাইলের পর মাইল বুনো বাঁশের জঙ্গল, তার তলায় বুনো আদা। ওদের পথের একশো হাতের মধ্যে বাঁদিকের বাঁশবনের তলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হস্তিযূথ কচি বাঁশের কোঁড় মড়মড় করে ভাঙতে-ভাঙতে চলে গেল।

পাঁচ হাজার ফুট উপরে কত কী বুনো ফুলের মেলা—টকটকে লাল ইরিথিনা প্রকাণ্ড গাছে ফুটেচে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে ঠিক বাংলাদেশের বনকলমি ফুলের

মতো, কিন্তু রঙটা অত গাঢ় বেগুনি নয়। সাদা ভেরোনিকা ঘন সুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেচে। বন্য কফির ফুল, রঙিন বেগোনিয়া। মেঘের রাজ্যে ফুলের বন, মাঝে-মাঝে সাদা বেলুনের মতো মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগডালে এসে আটকাচ্চে—কখনওবা আরও নেমে এসে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্চে।

সাড়ে-সাত হাজার ফুটের উপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। এই পর্যন্ত উঠতে ওদের আরও দুদিন লেগেচে। আর অসহ্য কষ্ট, কোমর-পিঠ ভেঙে পড়চে। এখানে বনানীর মূর্তি বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখা-প্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা ঝুলচে—সে-শেওলা কোথাও-কোথাও এত লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মতো হয়েচে—বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্চে, তার উপর কোথাও সূর্যের আলো নেই, সব সময়েই যেন গোধূলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করচে এক অপার্থিব ধরনের নিস্তব্ধতা—বাতাস বইচে তারও শব্দ নেই, পাখির কূজন নেই সে-বনে—মানুষের গলার সুর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোনো অন্ধকার নরকে দীর্ঘশ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েচে ওরা!

সেদিন অপরাহ্ণে যখন আলভারেজ তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করবার হুকুম দিলে—তখন তাঁবুর বাইরে বসে একপাত্র কফি খেতে-খেতে শঙ্করের মনে হল, এ যেন সৃষ্টির আদিম যুগের অরণ্যানী, পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ যখন কোনো একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করেনি, যে-যুগে পৃথিবীর বুকে বিরাটকায় সরীসৃপের দল জগৎজোড়া বনজঙ্গলের নিবিড় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত—সৃষ্টির সেই অতীত প্রভাতে সে যেন কোন যাদুমন্ত্রের বলে ফিরে গিয়েচে।

সন্ধ্যার পরেই সমগ্র বনানী নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হল। তাঁবুর বাইরে ওরা আগুন করেচে—সেই আলোর মণ্ডলীর বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। এ-বনের আশ্চর্য নিস্তব্ধতা শঙ্করকে বিস্মিত করেছে। বনানীর সেই বিচিত্র নৈশ শব্দ এখানে স্তব্ধ কেন? আলভারেজ চিন্তিত মুখে ম্যাপ দেখছিল। বললে—শোনো শঙ্কর, একটা কথা ভাবছি। আট হাজার ফুট উঠলাম, কিন্তু এখনও পর্বতের সেই খাঁজটা পেলাম না যেটা দিয়ে আমরা রেঞ্জ পার হয়ে ওপারে যাব। আর কত উপরে উঠব? যদি ধর এই অংশে স্যাডলটা না-ই থাকে?

শঙ্করের মনেও খটকা যে না জেগেছে তা নয়। সে আজই ওঠবার সময় মাঝে-মাঝে ফিল্ড গ্লাস দিয়ে উপরের দিকে দেখবার চেষ্টা করেচে, কিন্তু ঘন মেঘে বা কুয়াশায় উপরের দিকটা সর্বদাই আবৃত থাকায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েচে। সত্যিই তো তারা কত উঠবে আর, সমতল খাঁজ যদি না পাওয়া যায়? আবার নিচে নামতে হবে, আবার অন্য জায়গায় বেয়ে উঠতে হবে। দফা সারা!

সে বললে—ম্যাপে কী বলে?

আলভারেজের মুখ দেখে মনে হল ম্যাপের উপর সে আস্থা হারিয়েছে। বললে—এ ম্যাপ অত খুঁটিনাটিভাবে তৈরি নয়। এ পর্বতে উঠেচে কে যে ম্যাপ তৈরি হবে? এই যে দেখচ—এখানা সার ফিলপোর ডো ফিলিপির তৈরি ম্যাপ, যিনি পর্টুগিজ পশ্চিম-আফ্রিকার ফার্ডিনান্ডো পো শৃঙ্গ আরোহণ করে খুব নাম করেন, এবং বছর কয়েক আগে বিখ্যাত পর্বত আরোহণকারী পর্যটক ডিউক অব আব্রুৎসির অভিযানেও যিনি ছিলেন। কিন্তু রিখটারসভেল্ড তিনি ওঠেননি, এ-ম্যাপে পাহাড়ের যে-কনটুর ছবি আঁকা আছে, তা খুব নিখুঁত বলে মনে তো হয় না। ঠিক বুঝছিনে।

হঠাৎ শঙ্কর বলে উঠল—ও কী!

তাঁবুর বাইরে প্রথমে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ, এবং পরক্ষণেই একটা কষ্টকর কাশির শব্দ পাওয়া গেল—যেন থাইসিসের রোগী খুব কষ্টে কাতরভাবে কাশচে একবার...দুবার... তার পরই শব্দটা থেমে গেল! কিন্তু সেটা মানুষের গলার শব্দ নয়, শুনবামাত্রই শঙ্করের সে কথা মনে হল।

রাইফেল নিয়ে সে ব্যস্তভাবে তাঁবুর বার হতে যাচ্ছে, আলভারেজ তাড়াতাড়ি উঠে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলে। শঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বললে—কেন, কিসের শব্দ ওটা? বলে আলভারেজের দিকে চাইতেই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েচে। শব্দটা শুনেই কি?

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের মণ্ডলীর বাইরে, নিবিড় অন্ধকারে, একটা ভারী অথচ লঘুপদী জীব যেন বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে—বেশ মনে হল।

দুজনেই খানিকটা চুপচাপ, তারপরে আলভারেজ বললে—আগুনে কাঠ ফেলে দাও! বন্দুক দুটো ভরা আছে কি না দেখো। এর মুখের ভাব দেখে শঙ্কর ওকে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করলে না।

রাত্রি কেটে গেল।

পরদিন সকালে শঙ্করেরই ঘুম ভাঙল আগে। তাঁবুর বাইরে এসে কফি করবার আগুন জ্বালতে সে তাঁবু থেকে কিছুদূরে কাঠ ভাঙতে গেল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ভিজে মাটির উপর একটা পায়ের দাগ, লম্বায় দাগটা এগারো ইঞ্চির কম নয়, কিন্তু পায়ে তিনটে মাত্র আঙুল। তিন আঙুলেরই দাগ বেশ স্পষ্ট। পায়ের দাগ ধরে সে এগিয়ে গেল—আরও অনেকগুলো সেই পায়ের দাগ আছে, সবগুলোতেই সেই তিন আঙুল।

শঙ্করের মনে পড়ল ইউগান্ডার স্টেশনঘরে আলভারেজের মুখে শোনা জিম কার্টারের মৃত্যুকাহিনী। গুহার মুখে বালির উপর সেই অজ্ঞাত হিংস্র জানোয়ারের তিন আঙুলওয়ালা পায়ের দাগ। কাফির গ্রামের সেই সর্দারের মুখে শোনা গল্প।

কাল রাত্রে আলভারেজের বিবর্ণ মুখও সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল। আর একদিনও আলভারেজ ঠিক এইরকমই ভয় পেয়েছিল, যেদিন পর্বতের পাদমূলে ওরা প্রথম এসে তাঁবু পাতে।

বুনিপ! কাফির সর্দারের গল্পের সেই বুনিপ! রিখটারসভেল্ড পর্বত ও অরণ্যের বিভীষিকা, যার ভয়ে শুধু অসভ্য মানুষ কেন, অন্য কোনো বন্য জন্তু পর্যন্ত এই আট হাজার ফুটের উপরকার বনে আসে না। কাল রাত্রে কোনো জানোয়ারের শব্দ পাওয়া যায়নি কেন, এখন তা শঙ্করের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আলভারেজ পর্যন্ত ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল ওর গলার শব্দ শুনে। বোধহয় ও-শব্দের সঙ্গে আলভারেজের পূর্বে পরিচয় ঘটেছে।

আলভারেজের ঘুম ভাঙতে সেদিন একটু দেরি হল। গরম কফি এবং কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করবার সঙ্গে-সঙ্গে সে আবার সেই নির্ভীক ও দুর্ধর্ষ আলভারেজ, যে মানুষকেও ভয় করে না, শয়তানকেও না। শঙ্কর ইচ্ছে করেই আলভারেজকে ঐ অজ্ঞাত জানোয়ারের পায়ের দাগটা দেখালে না, কী জানি যদি আলভারেজ বলে বসে—এখনও পাহাড়ের স্যাডল পাওয়া গেল না, তবে নেমে যাওয়া যাক।

সকালে সেদিন খুব মেঘ করে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। পর্বতের ঢাল বেয়ে যেন হাজার ঝরনার ধারায় বৃষ্টির জল গড়িয়ে নিচে নামচে। এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। এতটা উঠেচে ওরা, কিন্তু প্রতি হাজার ফুট উপর থেকে নিচের অরণ্যের গাছপালার মাথা দেখে সেগুলিকে সমতলভূমির অরণ্য বলে ভ্রম হচ্ছে—কাজেই প্রথমটা মনে হয় যেন কতটুকুই-বা উঠেচি, এটুকু তো!

বৃষ্টি সেদিন থামল না। বেলা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আলভারেজ উঠবার হুকুম দিলে। শঙ্কর এটা আশা করেনি। এখানে শঙ্কর কর্মী শ্বেতাঙ্গ-চরিত্রের একটা দিক লক্ষ্য করলে। তার মনে হচ্ছিল, কেন এই বৃষ্টিতে মিছিমিছি বার হওয়া? একটা দিনে কী এমন হবে? বৃষ্টি-মাথায় পথ চলে লাভ?

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে ঘন অরণ্যানী ভেদ করে সেদিন ওরা সারাদিন উঠল। উঠচে, উঠচে, উঠচেই—শঙ্কর আর পারে না। কাপড় চোপড়, জিনিসপত্র, তাঁবু, সব ভিজে একাকার, একখানা রুমাল পর্যন্ত শুকনো নেই কোথাও। শঙ্করের কেমন একটা অবসাদ এসেছে দেহে ও মনে—সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকার হয়ে ভীমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল, তখন ওর মনে হল—এই অজানা দেশে অজানা পর্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে, বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায়, কোন অনির্দেশ্য হীরকখনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে চলেছে সে কোথায়? আলভারেজ কে তার? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল? হীরের খনিতে তার দরকার নেই। বাংলাদেশের খড়ে-ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখিদের কাকলি—সেসব যেন কতদূরের কোন অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি সেসবের চেয়ে মূল্যবান নয়।

কিন্তু তার এ-ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময় রাত্রের বর্ণনা নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে নেই, বাংলা বলে কোনো দেশ নেই, সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে। সে আর কোথাও ফিরতে চায় না, হীরে চায় না, অর্থ চায় না—পৃথিবী থেকে বহু ঊর্ধ্বের এক কৌমুদীশুভ্র দেবলোকের এখন সে অধিবাসী। তার চারধারে প্রকৃতির যে-সৌন্দর্য, কোনো মানুষের চোখ এর আগে তা দেখেনি। সে-গহন নিস্তব্ধতা এর আগে কোনো মানুষ অনুভব করেনি। জনমানবহীন বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বত ও অরণ্য, এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যানস্তিমিত—পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশলাভের সৌভাগ্য কৃচিৎ ঘটে।

সেই রাত্রে ঘুম থেকে ও ধড়মড়িয়ে উঠল আলভারেজের ডাকে! আলভারেজ ডাকচে—শঙ্কর, শঙ্কর, ওঠো বন্দুক বাগাও—

—কী, কী?

তারপর ও কান পেতে শুনলে—তাঁবুর চারপাশে কে যেন ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোরে নিশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে তাঁবুর মধ্যে থেকে। চাঁদ ঢলে পড়েচে, তাঁবুর বাইরে অন্ধকারই বেশি, জ্যোৎস্নাটুকু গাছের মগডালে উঠে গিয়েচে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর দরজার মুখে আগুন তখনও একটু-একটু জ্বলচে—কিন্তু তার আলোর বৃত্ত যেমন ছোট, আলোর জ্যোতিও ততোধিক ক্ষীণ, তাতে দেখবার সাহায্য কিছুই হয় না।

হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল—গাছপালা ভেঙে একটা ভারী জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালাল যেন। তাঁবুর সকলে সজাগ হয়ে উঠেচে, এখন আর অতর্কিতে শিকারের সুবিধে হবে না—বাইরের জানোয়ারটা তা বুঝতে পেরেচে।

জানোয়ারটা যা-ই হোক না কেন, তার যেন বুদ্ধি আছে, বিচারের ক্ষমতা আছে,

মস্তিষ্ক আছে।

আলভারেজ রাইফেলহাতে টর্চ জ্বেলে বাইরে গেল। শঙ্করও গেল ওর পিছনে-পিছনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল, তাঁবুর উত্তর-পূর্বকোণের জঙ্গলের চারা গাছপালার উপর দিয়ে যেন একটা ভারী স্টীম-রোলার চলে গিয়েচে। আলভারেজ সেইদিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে বার দুই আওয়াজ করল।

কোনো দিকে কোনো শব্দ পাওয়া গেল না।

ফিরবার সময় তাঁবুর ঠিক দরজার মুখে আগুনের কুণ্ডের অতি নিকটেই একটা পায়ের দাগ দুজনেরই চোখে পড়ল। মাত্র তিনটে আঙুলের দাগ ভিজে মাটির উপর সুস্পষ্ট।

এতে প্রমাণ হয়, জানোয়ারটা আগুনকে ডরায় না। শঙ্করের মনে হল, যদি ওদের ঘুম না ভাঙত, তবে সেই অজ্ঞাত বিভীষিকাটি তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে একটুও দ্বিধা করত না, এবং তার পরে কী ঘটত তা কল্পনা করে কোনো লাভ নেই।

আলভারেজ বললে—শঙ্কর, তুমি তোমার ঘুম শেষ কর, আমি জেগে আছি।

শঙ্কর বললে—না, তুমি ঘুমোও আলভারেজ।

আলভারেজ ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—পাগল, তুমি জেগে কিছু করতে পারবে না, শঙ্কর। ঘুমিয়ে পড়ো, ঐ দেখ দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আবার ঝড়বৃষ্টি আসবে, রাত শেষ হয়ে আসচে, ঘুমোও। আমি বরং একটু কফি খাই।

রাত ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গে এল মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে-সঙ্গে যেমনি বিদ্যুৎ, তেমনি মেঘগর্জন। সে-বৃষ্টি চলল সমানে সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শঙ্করের মনে হল, পৃথিবীতে আজ প্রলয়ের বর্ষণ শুরু হয়েছে, প্রলয়ের দেবতা সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবার সূচনা করেচেন বুঝি! বৃষ্টির বহর দেখে আলভারেজ পর্যন্ত দমে গিয়ে তাঁবু ওঠাবার নাম মুখে আনতে ভুলে গেল।

বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকেল পাঁচটা। বোধহয় বৃষ্টি না থামলেই ভাল ছিল, কারণ অমনি আলভারেজ চলা শুরু করবার হুকুম দিলে। বাঙালি ছেলের স্বভাবতই মনে হয়—এখন আবেলায় যাওয়া কেন? এত কি সময় বয়ে যাচ্ছে? কিন্তু আলভারেজের কাছে দিন, রাত, বর্ষা, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, সব সমান। সে-রাত্রে বর্ষাস্নাত বনভূমির মধ্য দিয়ে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে উঠচে, উঠচে—এমন সময় আলভারেজ পেছন থেকে বলে উঠল—শঙ্কর দাঁড়াও, ঐ দেখ—

আলভারেজ ফিল্ড গ্লাস দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে বাঁ পাশের পর্বত-শিখরের দিকে চেয়ে দেকচে। শঙ্কর ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। হ্যাঁ, সমতল খাঁজটা পাওয়া গিয়েচে। বেশি দূরেও নয়, মাইল দুইয়ের মধ্যে, বাঁদিক ঘেঁষে।

আলভারেজ হাসিমুখে বললে—দেখচ স্যাডলটা? থামবার দরকার নেই, চল আজ রাত্রেই স্যাডলের উপর পৌঁছে তাঁবু ফেলব। শঙ্কর আর সত্যিই পারচে না। এই দুর্ধর্ষ পর্টুগিজটার সঙ্গে হীরের সন্ধানে এসে সে কি ঝকমারি না করেচে! শঙ্কর জানে অভিযানের নিয়মানুযায়ী দলপতির হুকুমের উপর কোনো কথা বলতে নেই। এখানে আলভারেজই দলপতি, তার আদেশ অমান্য করা চলবে না। কোথাও আইনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও, পৃথিবীর ইতিহাসের বড়-বড় অভিযানে সবাই এই নিয়ম মেনে চলে। সেও মানবে।

অবিশ্রান্ত হাঁটবার পরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ওরা এসে স্যাডলে যখন

উঠল—শঙ্করের তখন আর এক পাও চলবার শক্তি নেই।

স্যাডলটার বিস্তৃতি তিন মাইলের কম নয়, কখনও বা দুশো ফুট খাড়া উঠেচে, কখনও বা চার-পাঁচশো ফুট নেমে গিয়েচে এক মাইলের মধ্যে, সুতরাং বেশ দুরারোহ—যতটুকু সমতল, ততটুকু শুধুই বড়-বড় বনস্পতির জঙ্গল, ইরিথ্রিনা, পেনসিয়ানা, রিঠাগাছ, বাঁশ বা বন্য আদা। বিচিত্র বর্ণের আর্কিডের ফুল ডালে-ডালে। বেবুন ও কলোবাস বাঁদর সর্বত্র।

আরও দুদিন ধরে ক্রমাগত নামতে-নামতে রিখটারসভেল্ড পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে ওরা পদার্পণ করলে। শঙ্করের মনে হল, এদিকে জঙ্গল যেন আরও বেশি দুর্ভেদ্য ও বিচিত্র। আটলান্টিক মহাসাগরের দিক থেকে সমুদ্রবাষ্প উঠে কতক ধাক্কা খায় পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন পর্বতে, বাকিটা আটকায় বিশাল রিখটারসভেল্ডের দক্ষিণ সানুতে—সুতরাং বৃষ্টি এখানে হয় অজস্র, গাছপালার তেজও তেমনি।

দিন পনেরো ধরে সেই বিরাট অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকার সর্বত্র দুজনে মিলে খুঁজেও আলভারেজ-বর্ণিত পাহাড়ী নদীর কোনো ঠিকানা বার করতে পারলে না। ছোটখাটো ঝরনা দু-একটা উপত্যকার উপর দিয়ে বইচে বটে, কিন্তু আলভারেজ কেবলই ঘাড় নাড়ে আর বলে—এসব নয়!

শঙ্কর বলে—তোমার ম্যাপ দেখ না ভাল করে!

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, আলভারেজের ম্যাপের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আলভারেজ বলে—ম্যাপ কী হবে? আমার মনেই গভীরভাবে আঁকা আছে সে-নদী ও সে-উপত্যকার ছবি—সে একবার দেখতে পেলেই তখুনি চিনে নেব। এ সে-জায়গাই নয়, এ উপত্যকা সে উপত্যকাই নয়!

নিরুপায়! খোঁজো তবে।

একমাস কেটে গেল। পশ্চিম আফ্রিকায় বর্ষা নামল মার্চ মাসের প্রথমে। সে কী ভয়ানক বর্ষা! শঙ্কর তার কিছু নমুনা পেয়ে এসেছে রিখটারসভেল্ড পার হবার সময়ে। উপত্যকা ভেসে গেল পাহাড় থেকে নামা বড়-বড় পার্বত্য ঝরনার জলধারায়। তাঁবু ফেলবার স্থান নেই। একরাত্রে হঠাৎ অতিবর্ষণের ফলে ওদের তাঁবুর সামনে একটা নিরীহ ক্ষীণকায় ঝরনাধারা ভীমমূর্তি ধারণ করে তাঁবুসুদ্ধ ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবার যোগাড় করেছিল— আলভারেজের সজাগ ঘুমের জন্যে যে-যাত্রা বিপদ কেটে গেল।

কিন্তু দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। শঙ্কর একদিন ঘোর বিপদে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। সে-বিপদটাও বড় অদ্ভুত ধরনের।

সেদিন আলভারেজ তাঁবুতে তার নিজের রাইফেল পরিষ্কার করছিল, সেটা শেষ করে রান্না করবে কথা ছিল। শঙ্কর রাইফেলহাতে বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে বার হয়েছে।

আলভারেজ বলে দিয়েছে তাকে এ-বনে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে, আর বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্ট্রিজ ভরা থাকে। আর একটা খুব মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে, সেটা এই—বনের মধ্যে বেড়াবার সময় হাতের কব্জিতে কম্পাস সর্বদা বেঁধে নিয়ে বেড়াবে এবং যে-পথ দিয়ে যাবে, পথের ধারে গাছপালায় কোনো চিহ্ন রেখে যাবে, যাতে ফিরবার সময় সেইসব চিহ্ন ধরে আবার ঠিক ফিরতে পারে। নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

সেদিন শঙ্কর শ্রিংবক হরিণের সন্ধানে গভীর বনে চলে গিয়েচে। সকালে বেরিয়েছিল, ঘুরে-ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এক জায়গায় একটা বড় গাছের তলায় সে একটু বিশ্রামের জন্যে বসল।

সেখনটাতে চারধারেই বৃহৎ-বৃহৎ বনস্পতির মেলা, আর সব গাছেই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে একপ্রকারের বড়-বড় লতা উঠে তাদের ছোট-ছোট পাতা দিয়ে এমন নিবিড়ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে গাছগুলো জড়িয়েছে যে গুঁড়ির আসল রঙ দেখা যাচ্চে না। কাছেই একটা ছোট জলার ধারে ঝাড়ে-ঝাড়ে মারিপোসা লিলি ফুটে রয়েচে।

খানিকটা সেখানে বসবার পরে শঙ্করের মনে হল তার কী একটা অস্বস্তি হচ্চে। কী ধরনের অস্বস্তি তা সে কিছু বুঝতে পারলে না—অথচ জায়গাটা ছেড়ে উঠে যাবারও ইচ্ছে তার হল না—সে ক্লান্তও বটে, আর জায়গাটা বেশ আরামেরও বটে।

কিন্তু এ তার কী হল? তার সমস্ত শরীরে এত অবসাদ এল কোথা থেকে? ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরল নাকি?

অবসাদটা কাটাবার জন্যে সে পকেট হাতড়ে একটা চুরুট বার করে ধরালে। কিসের একটা মিষ্টি-মিষ্টি সুগন্ধ বাতাসে, শঙ্করের বেশ লাগচে গন্ধটা। একটু পরে দেশলাইটা মাটি থেকে কুড়িয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে মনে হল, হাতটা যেন তার নিজের নয়—যেন অন্য কারো হাত, তার মনের ইচ্ছেয় সে-হাত নড়ে না।

ক্রমেই তার সর্বশরীর যেন বেশ একটা আরামদায়ক অবসাদে অবশ হয়ে পড়তে চাইল। কী হবে আর বৃথা ভ্রমণে, আলেয়ার পিছু-পিছু বৃথা ছুটে! এইরকম বনের ঘন ছায়ায় নিভৃত লতাবিতানে, অলস স্বপ্নে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে সুখ আর কী আছে?

একবার তার মনে হল, এই বেলা উঠে তাঁবুতে যাওয়া যাক, নতুবা তার কোনো একটা বিপদ ঘটবে যেন। একবার সে উঠবার চেষ্টাও করতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তার দেহমনব্যাপী অবসাদের জয় হল। অবসাদ নয়, যেন একটা মৃদুমধুর নেশার আনন্দ। সমস্ত জগৎ তার কাছে তুচ্ছ। সে-নেশাটাই তার সারাদেহ অবশ করে আনচে ক্রমশ।

শঙ্কর গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে ভাল করেই শুয়ে পড়ল। বড়-বড় কটনউড গাছের শাখায় আলোছায়ার রেখা বড় অস্পষ্ট, কাছেই কোথাও বুনো পেঁচার ডাক অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল, ক্রমে যেন তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসচে। তারপরে কী হল শঙ্কর কিছু জানে না।

আলভারেজ যখন বহু অনুসন্ধানের পর ওর অচৈনত্য দেহটা কটনউড জঙ্গলের ছায়ায় আবিষ্কার করলে, তখন বেলা বেশি নেই। প্রথমটা আলভারেজ ভাবলে, এ নিশ্চয় সর্পাঘাত, কিন্তু দেহটা পরীক্ষা করে সর্পাঘাতের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। হঠাৎ মাথার উপরকার ডালপালা ও চারধারে গাছপালার দিকে নজর পড়তেই অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী আলভারেজ ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলে। সেখানটাতে সর্বত্র অতি মারাত্মক বিষলতার বন, যার রসে আফ্রিকার অসভ্য মানুষেরা তীরের ফলা ডুবিয়ে নেয়। যার বাতাস এমনি বেশ সুগন্ধ বহন করে, কিন্তু নিশ্বাসের সঙ্গে বেশিমাত্রায় গ্রহণ করলে, অনেক সময় পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে, মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য নয়।

তাঁবুতে এসে শঙ্কর দু-তিনদিন শয্যাগত হয়ে রইল। সর্বশরীর ফুলে ঢোল। মাথা যেন ফেটে যাচ্চে আর সর্বদাই তৃষ্ণায় গলা কাঠ। আলভারেজ বললে—যদি তোমাকে সারা রাত ওখানে থাকতে হত, তা হলে সকালবেলা তোমাকে বাঁচানো কঠিন হত।

একদিন একটা ঝরনার জলধারার বালুময় তীরে শঙ্কর হলদে রঙের কী দেখতে পেলে। আলভারেজ পাকা প্রসপেক্টর, সে এসে বালি ধুয়ে সোনার রেণু বার করলে—কিন্তু তাতে সে বিশেষ উৎসাহিত হল না। সোনার পরিমাণ এত কম যে মজুরি পোষাবে না—এক টন বালি ধুয়ে আউন্স তিনেক সোনা হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

শঙ্কর বললে—বসে থেকে লাভ কী, তবু যা সোনা পাওয়া যায়, তিন আউন্স সোনার দামও তো কম নয়।

সে যেটাকে অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিস বলে মনে করেচে, অভিজ্ঞ প্রসপেক্টর আলভারেজের কাছে সেটা কিছুই নয়। তা ছাড়া শঙ্করের মজুরির ধারণার সঙ্গে আলভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না। শেষ পর্যন্ত ও-কাজ শঙ্করকে ছেড়ে দিতে হল।

ইতিমধ্যে ওরা মাসখানেক ধরে জঙ্গলের নানা অঞ্চলে বেড়ালে। আজ এখানে দুদিন তাঁবু পাতে সেখান থেকে আর এক জায়গায় উঠে যায়, সেখানে কিছুদিন তন্নতন্ন করে চারধার দেখবার পরে আর এক জায়গায় উঠে যায়। সেদিন অরণ্যের একটা নতুন স্থানে পৌঁছে ওরা তাঁবু পেতেছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে দু-একটা পাখি শিকার করে সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে এসে দেখলে আলভারেজ বসে চুরুট টানচে, তার মুখ দেখে মনে হল সে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।

শঙ্কর বললে—আমি বলি আলভারেজ, তুমিই যখন বার করতে পারলে না, তখন চল ফিরি।

আলভারেজ বললে—নদীটা তো উড়ে যায়নি, এই বন পর্বতের কোনো-না-কোনো অঞ্চলে সেটা নিশ্চয়ই আছে।

—তবে আমরা বার করতে পারচিনে কেন?

—আমাদের খোঁজ ঠিকমতো হচ্চে না।

—বল কী আলভারেজ, ছমাস ধরে জঙ্গল চষে বেড়াচ্চি, আবার কাকে খোঁজা বলে?

আলভারেজ গম্ভীর মুখে বললে—কিন্তু মুশকিল হয়েছে কোথায় জান, শঙ্কর? তোমাকে এখনও কথাটা বলিনি, শুনলে হয়তো খুব দমে যাবে বা ভয় পাবে। আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, এস আমার সঙ্গে।

শঙ্কর অধীর আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর পিছনে-পিছনে চলল। ব্যাপারটা কী?

আলভারেজ একটু দূরে গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বললে—শঙ্কর, আমরা আজই এখানে এসে তাঁবু পেতেছি, ঠিক তো?

শঙ্কর অবাক হয়ে বলল—এ কথার মানে কী? আজই তো এখানে এসেচি, না আবার কবে এসেচি?

—আচ্ছা, এই গাছের গুঁড়ির কাছে সরে এসে দেখ তো!

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, গুঁড়ির নরম ছাল ছুরি দিয়ে খুদে কে D. A. লিখে রেখেচে—কিন্তু লেখাটা টাটকা নয়, অন্তত মাসখানেকের পুরনো।

শঙ্কর ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে না। আলভারেজের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আলভারেজ বললে—বুঝতে পারলে না? এই গাছে আমিই মাসখানেক আগে আমার নামের অক্ষর দুটি খুদে রাখি। আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। তুমি তো বুঝতে পার না। তোমার কাছে সব বনই সমান। এর মানে এখন বুঝেচ? আমরা চক্রাকারে বনের মধ্যে ঘুরচি। এসব জায়গায় যখন এরকম হয়, তখন তা থেকে উদ্ধার পাওয়া বেজায় শক্ত।

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝলে ব্যাপারটা। বললে—তুমি বলতে চাও মাসখানেক আগে আমরা এখানে এসেছিলাম?

—ঠিক তা-ই। বড় অরণ্যে বা মরুভূমিতে এই বিপদ ঘটে। একে বলে ডেথ সার্কল, আমার মনে মাসখানেক আগে প্রথম সন্দেহ হয় যে, হয়তো আমরা ডেথ সার্কল-এ পড়েচি। সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই গাছের ছালে ঐ অক্ষর দুটি খুদে রাখি। আজ বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল।

শঙ্কর বললে—আমাদের কম্পাসের কী হল? কম্পাস থাকতে দিক ভুল হচ্ছে কীভাবে রোজ-রোজ?

আলভারেজ বললে—আমার মনে হয় কম্পাস খারাপ হয়ে গিয়েচে। রিখটারসভেল্ড পার হবার সময় সেই যে ভয়ানক ঝড় ও বিদ্যুৎ হয়, তাতেই কী ভাবে ওর চৌম্বকশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েচে।

—তা হলে আমাদের কম্পাস এখন অকেজো?

—আমার তা-ই ধারণা।

শঙ্কর দেখলে অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। ম্যাপ ভুল, কম্পাস অকেজো,তার উপর ওরা পড়েছে এক ভীষণ দুর্গম গহনারণ্যের মাঝে বিষম মরণঘূর্ণিতে। জনমানুষ নেই, খাবার নেই, জলও নেই বললেই হয়, কারণ যেখানকার সেখানকার জল যখন পানের উপযুক্ত নয়। থাকার মধ্যে আছে এক ভীষণ, অজ্ঞাত মৃত্যুর ভয়। জিম কার্টার এই অভিশপ্ত অরণ্যানীর মধ্যে রত্নের লোভে এসে প্রাণ দিয়েছিল, এখানে কারো মঙ্গল হবে বলে মনে হয় না।

আলভারেজ কিন্তু দমে যাবার পাত্রই নয়। সে দিনের পর দিন চলল বনের মধ্যে দিয়ে। বনের কোনো কূলকিনারা পায় না শঙ্কর, আগে যাও-বা ছিল, ঘূর্ণিপাকে তারা ঘুরচে শোনা অবধি, শঙ্করের দিক সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েচে।

দিন তিনেক পরে ওরা একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হল, সেখানে রিখটারসভেল্ডের একটি শাখা আসল পর্বতমালার সঙ্গে সমকোণ করে উত্তর দিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে। খুব কম হলেও সেটা চার হাজার ফুট উঁচু। আরও পশ্চিম দিকে একটা খুব উঁচু পর্বতচূড়া ঘন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলচে। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার উপত্যকা তিন মাইল বিস্তীর্ণ হবে এবং উপত্যকা খুব ঘন জঙ্গলে ভরা।

বনে গাছপালার যেন তিনটে-চারটে থাক। সকলের উপরের থাকে শুধুই পরগাছা আর শেওলা, মাঝের থাকে ছোট-বড় বনস্পতির ভিড়, নিচের থাকে ঝোপঝাপ, ছোট-ছোট গাছ। সূর্যের আলোর বালাই নেই বনের মধ্যে।

আলভারেজ বনের মধ্যে না ঢুকে বনের ধারেই তাঁবু ফেলতে বললে। সন্ধ্যার সময় ওরা কফি খেতে-খেতে পরামর্শ করতে বসল যে, এখন কী করা যাবে। খাবার একদম ফুরিয়েচে, চিনি অনেক দিন থেকেই নেই, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আর দু-এক দিন পরে কফিও শেষ হবে। সামান্য কিছু ময়দা এখনও আছে—কিন্তু আর কিছু নেই। ময়দা এই-জন্যে আছে যে, ওরা ও-জিনিসটা কালেভদ্রে ব্যবহার করে। ওদের প্রধান ভরসা বন্য জন্তুর মাংস, কিন্তু সঙ্গে যখন ওদের গুলি-বারুদের কারখানা নেই, তখন শিকারের ভরসাই বা চিরকাল করা যায় কী করে?

কথা বলতে-বলতে শঙ্কর দূরের যে-পাহাড়ের চূড়াটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলচে, সেদিকে মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখছিল। এই সময়ে অল্পক্ষণের জন্যে মেঘ সম্পূর্ণ

সরে গেল। চূড়াটার অদ্ভুত চেহারা, যেন কুলপি বরফের আগার দিকটা কে এক কামড়ে খেয়ে ফেলেচে।

আলভারেজ বললে—এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বুলাওয়েও কি সলস্‌বেরি চারশো থেকে পাঁচশো মাইলের মধ্যে। মধ্যে শ-দুই মাইল মরুভূমি। পশ্চিম দিকে উপকূল তিনশো মাইলের মধ্যে বটে, কিন্তু পর্টুগিজ পশ্চিম-আফ্রিকা অতি ভীষণ দুর্গম জঙ্গলে ভরা, সুতরাং সেদিকের কথা বাদ দাও। এখন আমাদের উপায় হচ্চে, হয় তুমি নয় আমি সলস্‌বেরি কি বুলাওয়েও চলে গিয়ে টোটা ও খাবার কিনে আনি। কম্পাসও চাই।

আলভারেজের মুখে এই কথাটা বড় শুভক্ষণে শঙ্কর শুনেছিল। দৈব মানুষের জীবনে যে কত কাজ করে, তা মানুষে কি সব সময় বোঝে? দৈবক্রমে 'বুলাওয়েও' ও 'সলস্‌বেরি' দুটো শহরের নাম, তাদের অবস্থানের দিক ও এই জায়গাটা থেকে তাদের আনুমানিক দূরত্ব শঙ্করের কানে গেল। এর পরে সে কতবার মনে-মনে আলভারেজকে ধন্যবাদ দিয়েছিল এই নাম দুটো বলবার জন্যে!

কথাবার্তা সেদিন বেশি অগ্রসর হল না। দুজনেই পরিশ্রান্ত ছিল, সকাল-সকাল শয্যা আশ্রয় করলে।

আট

মাঝরাতে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। কী একটা শব্দ হচ্ছে ঘন বনের মধ্যে, কী একটা কাণ্ড কোথায় ঘটচে বনে। আলভারেজও বিছানায় উঠে বসেচে। দুজনেই কান-খাড়া করে শুনলে—বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কী হচ্চে বাইরে?

শঙ্কর তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে বাইরে আসছিল, আলভারেজ বারণ করলে। বললে—এসব অজানা জঙ্গলে রাত্রিবেলা ওরকম তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে যেও না। তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েচি। বিনা বন্দুকেই-বা যাচ্ছ কোথায়?

তাঁবুর বাইরে রাত্রি ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুজনেই টর্চ ফেলে দেখলে—বন্য জন্তুর দল গাছপালা ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্মত্তের মতো দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পশ্চিমের সেই ভীষণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, পুবদিকের পাহাড়টার দিকে চলেচে! হায়েনা, বেবুন, বুনো মহিষ। দুটো চিতাবাঘ তো ওদের গা ঘেঁষে ছুটে পালাল। আরও আসচে, দলে-দলে আসচে। ধাড়ি ও মাদি কলোবাস বাঁদর দলে-দলে ছানাপোনা নিয়ে ছুটেচে, সবাই যেন কোনো আকস্মিক বিপদের মুখ থেকে প্রাণের ভয়ে ছুটেচে! আর সঙ্গে-সঙ্গে দূরে কোথায় একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্চে—চাপা গম্ভীর মেঘগর্জনের মতো শব্দটা, কিংবা দূরে কোথাও যেন হাজার জয়ঢাক একসঙ্গে বাজচে।

ব্যাপার কী! দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলে। দুজনেই অবাক। আলভারেজ বললে—শঙ্কর, আগুনটা ভাল করে জ্বালো, নয়তো বন্য জন্তুদের দল আমাদের তাঁবুসুদ্ধ ভেঙে মাড়িয়ে চলে যাবে।

জন্তুদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল যে! মাথার উপরেও পাখির দল বাসা ছেড়ে পালাচ্চে। প্রকাণ্ড একটা শ্রিংবক হরিণের দল ওদের দশ গজের মধ্যে এসে পড়ল।

কিন্তু ওরা দুজনে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েচে ব্যাপার দেখে যে, এত কাছে পেয়েও গুলি করতে ভুলে গেল। এমন ধরনের দৃশ্য ওরা জীবনে কখনও দেখেনি!

শঙ্কর আলভারেজকে কী একটা জিগগেস করতে যাবে, তার পরেই—প্রলয় ঘটল।

অন্তত শঙ্করের তো তা-ই বলেই মনে হল। সমস্ত পৃথিবীটা দুলে এমন কেঁপে উঠল যে, ওরা দুজনেই টলে পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে-সঙ্গে হাজারটা বাজ যেন কাছেই কোথায় পড়ল। মাটি যেন চিরে ফেঁড়ে গেল—আকাশটাও যেন সেইসঙ্গে ফাটল।

আলভারেজ মাটি থেকে উঠবার চেষ্টা করতে-করতে বললে, ভূমিকম্প!

কিন্তু পরক্ষণেই তারা দেখে বিস্মিত হল, রাত্রির অমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হঠাৎ দূর হয়ে পঞ্চাশ হাজার বাতির এমন বিজলি আলো জ্বলে উঠল কোথা থেকে?

তারপর তাদের নজরে পড়ল দূরের সেই পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। সেখানে যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিলীলা শুরু হয়েচে। রাঙা হয়ে উঠেচে সমস্ত দিগন্ত সেই প্রলয়ের আলোয়, আগুনরাঙা মেঘ ফুঁসিয়ে উঠেচে পাহাড়ের চুড়ো থেকে দু-হাজার আড়াই হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতে—সঙ্গে-সঙ্গে কী বিশ্রী নিশ্বাসরোধকারী গন্ধকের উৎকট গন্ধ বাতাসে!

আলভারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল—আগ্নেয়গিরি! সাণ্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা!

কী অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য! ওরা কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না খানিকক্ষণ। লক্ষটা তুবড়ি একসঙ্গে জ্বলছে, লক্ষটা রঙমশালে একসঙ্গে আগুন দিয়েচে শঙ্করের মনে হল। রাঙা আগুনের মেঘ মাঝে-মাঝে নিচু হয়ে যায়, হঠাৎ যেমন আগুনে ধুনো পড়লে দপ করে জ্বলে ওঠে, অমনি দপ করে হাজার ফুট ঠেলে ওঠে। আর সেই-সঙ্গে হাজরটা বোমা ফাটার আওয়াজ।

এদিকে পৃথিবী এমন কাঁপচে যে, দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—কেবল টলে-টলে পড়তে হয়। শঙ্কর তো টলতে-টলতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। ঢুকে দেখে একটা ছোট কুকুরছানার মতো জীব তার বিছানায় গুটিসুটি হয়ে ভয়ে কাঁপছে। শঙ্করের টর্চের আলোয় সেটা থমমত খেয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল, আর তার চোখ দুটো মণির মতো জ্বলতে লাগল।

আলভারেজ তাঁবুতে ঢুকে দেখে বললে—নেকড়ে বাঘের ছানা। রেখে দাও, আমাদের আশ্রয় নিয়েচে যখন প্রাণের ভয়ে!

ওরা কেউ এর আগে প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখেনি, এ থেকে যে বিপদ আসতে পারে তা ওদের জানা নেই—কিন্তু আলভারেজের কথা ভাল করে শেষ হতে-না-হতে, হঠাৎ কী প্রচণ্ড ভারী জিনিসের পতনের শব্দে ওরা আবার তাঁবুর বাইরে গিয়ে যখন দেখলে যে, একখানা পনেরো সের ওজনের জ্বলন্ত কয়লার মতো রাঙা পাথর অদূরে একটা ঝোপের উপর এসে পড়েছে, সঙ্গে-সঙ্গ ঝোপটাও জ্বলে উঠেচে, তখন আলভারেজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে—পালাও, পালাও, শঙ্কর, তাঁবু ওঠাও— শিগগির—

ওরা তাঁবু ওঠাতে-ওঠাতে আর দু-পাঁচখানা আগুনরাঙা জ্বলন্ত ভারী পাথর এদিক-ওদিক সশব্দে পড়ল। নিশ্বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে, এমনি ঘন গন্ধকের ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়েচে।

দৌড়...দৌড়...দৌড়.. দু-ঘণ্টা ধরে ওরা জিনিসপত্র কতক টেনে-হিঁচড়ে, কতক বয়ে নিয়ে, পুবদিকের সেই পাহাড়ের নিচে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে পর্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বাতাসে। আধঘণ্টা পরে সেখানেও পাথর পড়তে শুরু করলে। ওরা পাহাড়ের উপর উঠল, সেই ভীষণ জঙ্গল আর রাত্রির অন্ধকার ঠেলে। ভোর যখন হল, তখন আড়াই হাজার ফুট উঠে পাহাড়ের ঢালুতে বড় একটা গাছের তলায়, দুজনেই হাঁপাতে-হাঁপাতে বসে পড়ল।

সূর্য ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের সে-ভীষণ সৌন্দর্য অনেকখানি কমে গেল, কিন্তু শব্দ ও পাথর পড়া যেন বাড়ল। এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব মিহি ধূসরবর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়চে, গাছপালা লতাপাতার উপর দেখতে-দেখতে পাতলা একপুরু ছাই জমে গেল।

সারাদিন সমানভাবে অগ্নিলীলা চলল—আবার রাত্রি এল। নিচের উপত্যকাভূমির অত বড় হেমলক গাছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তরবর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রিতে আবার সেই ভীষণ সৌন্দর্য, কতদূর পর্যন্ত বন ও আকাশ, কতদূরের দিগন্ত লাল হয়ে উঠেচে পর্বতের অগ্নিকটাহের আগুনে—তখন পাথর পড়াটা একটু কেবল কমেচে। কিন্তু সেই রাঙা আগুনভরা বাষ্পের মেঘ তখনও সেইরকমই দীপ্ত হয়ে রয়েচে।

রাত-দুপুরের পরে একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে ওদের তন্দ্রা ছুটে গেল—ওরা সভয়ে চেয়ে দেখলে জ্বলন্ত পাহাড়ের চূড়ার মুন্ডুটা উড়ে গিয়েচে। নিচের উপত্যকাতে ছাই, আগুন ও জ্বলন্ত পাথর ছড়িয়ে পড়ে অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা দিলে। আলভারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হল। ওদের তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেল। পিছনের একটা উঁচু গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে।

শঙ্কর ভাবছিল—এই জনহীন অরণ্য অঞ্চলে এত বড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে ঘটে গেল, তা কেউ দেখতেও পেত না, যদি তারা না থাকত। সভ্য জগৎ জানেও না, আফ্রিকার গহন অরণ্যের এ-আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব। কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।

সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, মোমবাতি হাওয়ার মুখে জ্বলে গিয়ে যেমন মাথার দিকে অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে, পাহাড়ের চূড়াটার তেমনি চেহারা হয়েচে। কুলপি-বরফটাতে ঠিক যেন কে আর একটা কামড় বসিয়েচে।

আলভারেজ ম্যাপ দেখে বললে—এটা আগ্নেয়গিরি বলে ম্যাপে দেওয়া নেই। সম্ভবত বহু বছর পরে এই এর প্রথম অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে, তা খুব অর্থপূর্ণ।

শঙ্কর বললে—কী নাম?

আলভারেজ বললে—এর নাম লেখা আছে 'ওলডোনিও লেঙ্গাই'—প্রাচীন জুলু ভাষায় এর মানে 'অগ্নিদেবের শয্যা'। নামটা দেখে মনে হয়, এ-অঞ্চলের প্রাচীন লোকেদের কাছে এ-পাহাড়ের আগ্নেয় প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল না। বোধহয় তার পর দু-একশো বছর কিংবা তার বেশিকাল এটা চুপচাপ ছিল।

ভারতবর্ষের ছেলে শঙ্করের দুই হাত আপনাআপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করলে। প্রণাম, হে রুদ্রদেব প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখার সুযোগ দিয়েচেন, এজন্য প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা, আপনার এ-রূপের কাছে শত হীরকখনি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।

নয়

আগ্নেয় পর্বতের অত কাছে বাস করা আলভারেজ উচিত বিবেচনা করলে না। ওলডোনিও লেঙ্গাই পাহাড়ের ধূমায়িত শিখরদেশের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে, তারা আরও পশ্চিমে ঘেঁষে চলতে থাকল। সেদিকের গহন অরণ্যে আগুনের আঁচটিও লাগেনি, বর্ষার জলে সে-অরণ্য আরও নিবিড় হয়ে উঠেচে, ছোট-ছোট গাছপালার ও লতাঝোপের

সমাবেশ। ছোট-বড় কত ঝরনাধারা ও পার্বত্য নদী বয়ে চলেচে—তাদের মধ্যে একটাও আলভারেজের পূর্বপরিচিত নয়।

বাইরের এক জায়গায় ওরা এসে উপস্থিত হল, যেখানে চারিদিকেই চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট-বড় পাহাড় ও প্রত্যেক পাহাড়ের গায়েই নানা আকারের গুহা। স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্য রিখটারসভেল্ডের সাধারণ দৃশ্য থেকে একটু অন্যরকম। এখানে বন তত ঘন নয়, কিন্তু খুব বড়-বড় গাছ চারিদিকে, আর যেখানে-সেখানে পাহাড় ও গুহা।

একটা উঁচু ঢিপির মতো গ্রানাইটের পাহাড়ের উপর ওরা তাঁবু ফেলে রইল। এখানে এসে পর্যন্ত শঙ্করের মনে হয়েচে জায়গাটা ভাল নয়। কী একটা অস্বস্তি, মনের মধ্যে কী একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, তা সে না পারে ভাল করে নিজে বুঝতে, না পারে আলভারেজকে বোঝাতে।

একদিন আলভারেজ বললে—সব মিথ্যে শঙ্কর, আমরা এখনও বনের মধ্যে ঘুরচি। আজ সেই গাছটা আবার দেখেচি, সেই D.A. লেখা। অথচ তোমার মনে আছে, আমরা যতদূর সম্ভব পশ্চিম দিক ঘেঁষেই চলেচি আজ পনেরো দিন। কী করে আমরা আবার সেই গাছের কাছে আসতে পারি?

শঙ্কর বললে—তবে এখন কী উপায়?

—উপায় আছে। আজ রাত্রে একটা বড় গাছের মাথায় উঠে নক্ষত্র দেখে দিকনির্ণয় করতে হবে। তুমি তাঁবুতে থেকো।

শঙ্কর একটা কথা বুঝতে পারছিল না। তারা যদি চক্রাকারে ঘুরচে, তবে এই অনুচ্চ শৈলমালা ও গুহার দেশে কী করে এল? এ-অঞ্চলে তো কখনও আসেনি বলেই মনে হয়। আলভারেজ এর উত্তরে বললে, গাছটাতে নাম খোদাই দেখে সে আর কখনও তার পূর্বদিকে আসবার চেষ্টা করেনি। পূর্বদিকে মাইল দুই এলেই এই স্থানটাতেই ওরা পৌঁছত।

সে-রাত্রে শঙ্কর একা তাঁবুতে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ছিল। এই একখানাই বাংলা বই সে দেশ থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে আনে, এবং বহুবার পড়লেও সময় পেলেই আবার পড়ে।

কতদূরে ভারতবর্ষ, তার মধ্যে চিতোর, মেওয়ার, মোঘল-রাজপুতের বিবাদ! এই অজানা মহাদেশের অজানা মহা অরণ্যানীর মধ্যে বসে সেসব যেন অবাস্তব বলে মনে হয়।

তাঁবুর বাইরে হঠাৎ যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শঙ্কর প্রথমটা ভাবলে, আলভারেজ গাছ থেকে নেমে ফিরে আসচে বোধহয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এ মানুষের স্বাভাবিক পায়ের শব্দ নয়, কেউ দু-পায়ে থলে জড়িয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘষে-ঘষে টেনে-টেনে চললে যেন এমন ধরনের শব্দ হওয়া সম্ভব। আলভারেজের উইনচেস্টার রিপিটারটা হাতের কাছেই ছিল, ও সেটা তাঁবুর দরজার দিকে বাগিয়ে বসল। বাইরে পদশব্দটা একবার থেমে গেল— পরেই আবার তাঁবুর দক্ষিণ পাশ থেকে বাঁদিকে এল। একটা কোনো বড় প্রাণীর ঘন-ঘন নিশ্বাসের শব্দ যেন পাওয়া গেল—ঠিক যেমন পাহাড় পার হবার সময় এক রাত্রে ঘটেছিল, ঠিক সেইরকমই।

শঙ্কর একটু ভয় খেয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে রাইফেল ছুঁড়ে বসল। একবার ..দুবার।

সঙ্গে-সঙ্গে মিনিট দুই পরে দূরের গাছের মাথা থেকে প্রত্যুত্তরে দুবার রিভলবারের আওয়াজ পাওয়া গেল। আলভারেজ মনে ভেবেচে, শঙ্করের কোনো বিপদ উপস্থিত,

নতুবা রাত্রে খামোকা রিভলবার ছুঁড়বে কেন? বোধ হয় সে তাড়াতাড়ি নেমেই আসচে।

এদিকে চারদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজে জানোয়ারটা বোধহয় পালিয়েচে, আর তার সাড়াশব্দ নেই। শঙ্কর টর্চ জ্বেলে তাঁবুর বাইরে এসে ভাবল, আলভারেজকে সংকেতে গাছ থেকে নামতে বারণ করবে., এমন সময় কিছুদূরে বনের মধ্যে হঠাৎ আবার দুবার পিস্তলের আওয়াজ এবং সেইসঙ্গে একটা অস্পষ্ট চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

শঙ্কর পিস্তলের আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। কিছু দূরে গিয়েই দেখলে বনের মধ্যে একটা বড় গাছের তলায় আলবারেজ শুয়ে। টর্চের আলোয় তাকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে শঙ্কর শিউরে উঠল—তার সর্বশরীর রক্তমাখা, মাথাটা বাকি শরীরের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে, গায়ের কোটটা ছিন্নভিন্ন।

শঙ্কর তারাতাড়ি ওর পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে। ডাকলে—আলভারেজ! আলভারেজ!

আলভারেজের সাড়া নেই। তার ঠোঁট দুটো একবার যেন নড়ে উঠল, কী যেন বলতে গেল। সে শঙ্করের দিকে চেয়েই আছে, অথচ সে-চোখে যেন দৃষ্টি নেই, অথবা কেমন যেন নিস্পৃহ উদাস দৃষ্টি।

শঙ্কর ওকে বহন করে তাঁবুতে নিয়ে এল। মুখে জল দিল, তারপর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে দেখে গলার নিচে কাঁধের দিকের খানিকটা জায়গায় মাংস কে যেন ছিঁড়ে নিয়েচে। সারা পিঠটারও সেই অবস্থা। কোনো এক অসাধারণ বলশালী জন্তু, তীক্ষ্ণধার নখে বা দাঁতে, পিঠখানা চিরে ফালা-ফালা করেচে।

পাশে নরম মাটিতে কোনো এক জন্তুর পায়ের দাগ—তিনটে মাত্র আঙুল সে পায়ে।

সারারাত্রি সেইভাবেই কাটল, আলভারেজের সাড়া নেই, সংজ্ঞা নেই। সকাল হবার সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চেতনা ফিরে এল। শঙ্করের দিকে বিস্ময়ের ও অচেনার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, যেন এর আগে সে কখনও শঙ্করকে দেখেনি। তারপর আবার চোখ বুজল। দুপুরের পর খুব সম্ভবত নিজের মাতৃভাষায় কী সব বকতে শুরু করল, শঙ্কর এক বর্ণও বুঝতে পারলে না। বিকেলের দিকে সে হঠাৎ শঙ্করের দিকে চাইলে। চাইবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের মনে হল, সে ওকে চিনতে পেরেচে। এইবার ইংরিজিতে বললে—শঙ্কর! এখনও বসে আছ? তাঁবু ওঠাও, চল যাই—তারপর অপ্রকৃতিস্থের মতো নির্দেশহীন ভঙ্গিতে হাত তুলে বললে—রাজার ঐশ্বর্য লুকোনো রয়েছে ঐ পাহাড়ের গুহার মধ্যে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্চি। চল আমরা যাই তাঁবু ওঠাও, দেরি কোরো না।

এ-ই আলবারেজের শেষ কথা।

তারপর কতক্ষণ শঙ্কর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সন্ধ্যা হল, একটু-একটু করে সমগ্র বনানী ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল।

শঙ্করের তখন চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আগে আগুন জ্বাললে, তারপর দুটো রাইফেলে টোটা ভরে, তাঁবুর দোরের দিকে বন্দুকের নল বাগিয়ে, আলভারেজের মৃতদেহের পাশে একখানা শতরঞ্চির উপর বসে রইল।

তারপর সে-রাত্রে আবার নামল তেমনি ভীষণ বর্ষা। তাঁবুর কাপড় ফুঁড়ে জল পড়ে জিনিসপত্র ভিজে গেল। শঙ্কর তখন কিন্তু এমন হয়ে গিয়েচে যে, তার কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। এই ক মাসে সে আলভারেজকে সত্যিই ভালবেসেছিল, তার নির্ভীকতা, তার

সঙ্কল্পে অটলতা, তার পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তি, তার বীরত্ব—শঙ্করকে মুগ্ধ করেছিল। সে আলভারেজকে নিজের পিতার মতো ভালোবাসত। আলভারেজ তাকে তেমনি স্নেহের চোখে দেখত।

কিন্তু এসবের চেয়েও শঙ্করের বেশি মনে হচ্ছে যে, আলভারেজ শেষকালে মারা গেল সেই অজ্ঞাত জানায়ারটারই হাতে। ঠিক জিম কার্টারের মতোই।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে–সঙ্গে ক্রমে তার মন ভয়ে আকুল হয়ে উঠল। সম্মুখে ভীষণ অজানা মৃত্যুদূত—ঘোর রহস্যময় তার অস্তিত্ব। কখন সে আসবে, কখন–বা যাবে, কেউ তার সন্ধান দিতে পারবে না। ঘুমে ঢুলে না পড়ে শঙ্কর মনের বলে জেগে বসে রইল সারা রাত।

ওঃ, সে কী ভীষণ রাত্রি! যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এ–রাত্রির কথা সে ভুলবে না। গাছে–গাছে, ডালে–ডালে, হাজার ধারায় বৃষ্টির পতনের শব্দ ও একটানা ঝড়ের শব্দ, অরণ্যানীর অন্য সকল নৈশ শব্দকে আজ ডুবিয়ে দিয়েচে, পাহাড়ের উপর বড় গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়চে। এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে সে একা এই ভীষণ অরন্যানীর মধ্যে! কালো গাছের গুঁড়িগুলো যেন প্রেতের মতো দেখাচ্চে, অত বড় ঝড়বৃষ্টিতেও জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে। সম্মুখে বন্ধুর মৃতদেহ। ভয় পেলে চলবে না। সাহস আনতেই হবে, নতুবা ভয়েই সে মরে যাবে। সাহস আনবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে রাইফেল দুটির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে। একটা উইনচেস্টার, অপরটি ম্যানলিকার—দুটোরই ম্যাগাজিনে টোটা ভর্তি। এমন কোনো শরীরধারী জীব নেই, যে এই দুই শক্তিশালী অতি ভয়ানক মারণাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, আজ রাত্রে অক্ষত দেহে তাঁবুতে ঢুকতে পারে।

ভয় ও বিপদ মানুষকে সাহসী করে। শঙ্কর সারা রাত সজাগ পাহারা দিল। পরদিন সকালে আলভারেজের মৃতদেহ সে একটা বড় গাছের তলায় সমাধিস্থ করলে এবং দুখানা গাছের ডাল ক্রুশের আকারে শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে সমাধির উপর পুঁতে দিলে।

আলভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে ওপর্টো খনি বিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা ছিল ওর নামে। তাদের শেষ পরীক্ষায় আলভারেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েচে। ওর কথাবার্তায় অনেক সময়েই শঙ্করের সন্দেহ হত যে, সে নিতান্ত মূর্খ, ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে নয়।

লোকালয় থেকে বহুদূরে এই জনহীন গহন অরণ্যে, ক্লান্ত আলভারেজের রত্নানুসন্ধান শেষ হল। তার মতো মানুষ রত্নের কাঙাল নয়, বিপদের নেশায় পথে–পথে ঘুরে বেড়ানোই তাদের জীবনের পরম আনন্দ, কুবেরের ভাণ্ডারও তাকে এক জায়গায় চিরকাল আটকে রাখতে পারত না।

দু:সাহসিক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের বনস্পতিদল ছায়া দেবে সমাধির উপর। সিংহ, গরিলা, হায়েনা সজাগ রাত্রি যাপন করবে, আর সবার উপরে, সবাইকে ছাপিয়ে বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযুগ।

দশ

সেদিন সে রাত্রিও কেটে গেল। শঙ্কর এখন দুঃসাহসে মরিয়া হয়ে উঠেচে। যদি তাকে প্রাণ নিয়ে এ ভীষণ অরণ্য থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে তাকে ভয় পেলে চলবে না। দুদিন সে কোথাও না গিয়ে, তাঁবুতে বসে মন স্থির করে ভাববার চেষ্টা করলে, সে এখন কী করবে। হঠাৎ তার মনে হল আলভারেজের সেই কথাটা—সল্‌ভেরি.. এখান থেকে

পূর্ব–দক্ষিণ কোণে আন্দাজ ছশো মাইল...

সল্‌ভেরি! দক্ষিণ রোডেশিয়ার রাজধানী সল্‌ভেরি। যে–করে হোক, পৌঁছুতেই হবে তাকে সল্‌ভেরিতে। সে এখনও অনেক দিন বাঁচবে, তার জন্মকোষ্ঠিতে লেখা আছে। এ জায়গায় বেঘোরে সে মরবে না।

শঙ্কর ম্যাপগুলো খুব ভাল করে দেখলে। পর্টুগিজ গবর্নমেন্টের ফরেস্ট সার্ভের ম্যাপ, ১৮৭৩ সালের রয়েল মেরিন সার্ভের তৈরি উপকূলের ম্যাপ, ভ্রমণকারী স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ, এ বাদে আলভারেজের হাতে আঁকা ও জিম কার্টারের সইযুক্ত একখানা জীর্ণ, বিবর্ণ খসড়া নকশা। আলভারেজ বেঁচে থাকতে সে এইসব ম্যাপ ভাল করে বুঝতে একবারও চেষ্টা করেনি, এখন এই ম্যাপ বোঝার উপর তার জীবন–মরণ নির্ভর করছে। সল্‌ভেরির সোজা রাস্তা বার করতে হবে। এ–স্থান থেকে তার অবস্থিতিবিন্দুর দিক্‌নির্ণয় করতে হবে, রিখটারসভেল্ড অরণ্যের এ–গোলকধাঁধা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে—সবই এই ম্যাপগুলির সাহায্যে।

অনেক দেখবার পর শঙ্কর বুঝতে পারলে এই অরণ্য ও পর্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছুই দেওয়া নেই— এক আলভারেজের ও জিম কার্টারের খসড়া ম্যাপখানা ছাড়া। তাও সেগুলি এত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে এত সাঙ্কেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েচে যে, শঙ্করের পক্ষে তা প্রায় দুর্বোধ্য। কারণ এদের সব সময়েই ভয় ছিল যে, ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে, পাছে আর কেউ এসে ওদের ধনে ভাগ বসায়।

চতুর্থ দিন শঙ্কর সে–স্থান ত্যাগ করে আন্দাজমতো পুব দিকে রওনা হল। যাবার আগে কিছু বনফুলের মালা গেঁথে আলভারেজের সমাধির উপর অর্পণ করলে।

বুশ ক্রাফট্‌ বলে একটা জিনিস আছে। সববিস্তীর্ণ, বিজন, গহন অরণ্যানীর মধ্যে ভ্রমণ করবার সময়ে এ–বিদ্যা জানা না থাকলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আলভারেজের সঙ্গে এতদিন ঘোরাঘুরি করার ফলে, শঙ্কর কিছু–কিছু বুশ ক্রাফট্‌ শিখে নিয়েছিল, তবুও তার মনে সন্দেহ হল যে, এই বন একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা সে কি অর্জন করেচে? শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করে তাকে চলতে হবে, ভাগ্য ভাল থাকলে বন পার হতে পারবে, ভাগ্য প্রসন্ন না হয়—মৃত্যু।

দুটো–তিনটে ছোট পাহাড় সে পার হয়ে চলল। বন কখনও গভীর, কখনও পাতলা। কিন্তু প্রকাণ্ড–প্রকাণ্ড বনস্পতির আর শেষ নেই। শঙ্করের জানা ছিল না যে, দীর্ঘ এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবে যে, বনের প্রান্তসীমায় পৌঁছনো গিয়েচে। কারণ, গভীর জঙ্গলে কখনও এলিফ্যান্ট বা টুসক ঘাস জন্মায় না। কিন্তু এলিফ্যান্ট ঘাসের চিহ্ন নেই কোনোদিকে—শুধু বনস্পতি আর নিচু বনঝোপ।

প্রথম দিন শেষ হল এক নিবিড়তর অরণ্যের মধ্যে। শঙ্কর জিনিসপত্র প্রায় সবই ফেলে দিয়ে এসেছিল, কেবল আলভারেজের ম্যানলিকার রাইফেলটা, অনেকগুলো টোটা, জলের বোতল, টর্চ, ম্যাপগুলো, কম্পাস, ঘড়ি, একখানা কম্বল ও সামান্য কিছু ওষুধ সঙ্গে নিয়েছিল—আর নিয়েছিল একটা দড়ির দোলনা। তাঁবুটা যদিও খুব হালকা ছিল, বয়ে আনা অসম্ভব বিবেচনায় ফেলেই এসেছে।

দুটো গাছের ডালে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে সে দড়ির দোলনা টাঙালে এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে গাছতলায় আগুন জ্বালালে। দোলনায় শুয়ে বন্দুকহাতে জেগে রইল, কারণ, ঘুম অসম্ভব। একে ভয়ানক মশা, তার উপর সন্ধ্যার পর থেকে গাছতলার

কিছুদূর দিয়ে একটা চিতাবাঘ যাতায়াত শুরু করলে। গভীর অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে যেন দুটো আগুনের ভাঁটা, শঙ্কর টর্চের আলো ফেললে পালিয়ে যায়, আবার আধঘণ্টা পরে ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। শঙ্করের ভয় হল, ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো—বা লাফ দিয়ে দোলনায় উঠে আক্রমণ করবে। চিতাবাঘ অতি ধূর্ত জানোয়ার। কাজেই সারারাত্রি শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। তার উপর চারধারে নানা বন্য-জন্তুর রব। একবার একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কাছেই কোথাও একদল বালক-বালিকার খিলখিল হাসির শব্দে তন্দ্রা ছুটে গিয়ে ও চমকে জেগে উঠল। ছেলেমেয়েরা হাসে কোথায়? এই জনমানবহীন অরণ্যে বালক-বালিকাদের যাতায়াত করা বা এ রাত্রে হাসা তো উচিত নয়! পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, একজাতীয় বেবুনের ডাক ঠিক ছেলেপুলের হাসির মতো শোনায়, আলভারেজ একবার গল্প করেছিল। ভোরবেলা সে গাছ থেকে নেমে রওনা হল। বৈমানিকরা যাকে বলেন 'ফ্লাইং ব্লাইন্ড'—সে সেইভাবে বনের মধ্যে দিয়ে চলেচে, সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, দু-চোখ বুজে। এই দুদিন চলেই সে সম্পূর্ণভাবে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েচে— আর তার উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম জ্ঞান নেই। সে বুঝলে কোনো মহারণ্যে দিক ঠিক রেখে চলা কী ভীষণ কঠিন ব্যাপার। তোমার চারপাশে সব সময়েই গাছের গুঁড়ি, অগণিত, অজস্র, তার মাপজোখ নেই। তোমার মাথার উপর সব সময় ডালপালা লতাপাতার চন্দ্রাতপ। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্যের আলোও কম, সব সময়েই যেন গোধূলি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, ঐ একই ব্যাপার। কম্পাস এদিকে অকেজো, কী করেই—বা দিক ঠিক রাখা যায়!

পঞ্চম দিনে একটা পাহাড়ের তলায় এসে সে বিশ্রামের জন্যে থামল। কাছেই একটা প্রকাণ্ড গুহার মুখ, একটা ক্ষীণ জলস্রোত গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েচে।

অত বড় গুহা আগে কখনও না দেখার দরুন কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সে জিনিসপত্র বাইরে রেখে গুহার মধ্যে ঢুকল। গুহার মুখে খানিকটা আলো—ভিতর বড় অন্ধকার, টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে, সে ক্রমশ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছুল, যেখানে ডাইনে বাঁয়ে আরও দুটো মুখ। উপরের দিকে টর্চ উঠিয়ে দেখলে, ছাদটা অনেকটা উঁচু। সাদা শক্ত নুনের মতো ক্যালশিয়াম কার্বনেটের সরু মোটা ঝুরি ছাদ থেকে ঝাড় লণ্ঠনের মতো ঝুলচে।

গুহার দেয়ালগুলো ভিজে, গা বেয়ে অনেক জায়গায় জল খুব ক্ষীণধারায় ঝরে পড়চে। শঙ্কর ডাইনের গুহায় ঢুকল, সেটা ঢুকবার সময় সরু, কিন্তু ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে। পায়ে পাথর নয়, ভিজে মাটি। টর্চের আলোয় ওর মনে হল, গুহাটা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের ভূমির এক কোণে আর একটা গুহামুখ। সেটা দিয়ে ঢুকে শঙ্কর দেখলে সে যেন দুধারে পাথরের উঁচু দেওয়ালওলা একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে এসেচে। গলিটা আঁকাবাঁকা, একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলেচে, শঙ্কর অনেক দূর চলে গেল গলিটা ধরে।

ঘণ্টা দুই এতে কাটল। তারপর সে ভাবলে, এবার ফেরা যাক। কিন্তু ফিরতে গিয়ে সে আর কিছুতেই সে ত্রিভুজ গুহাটা খুঁজে পেল না। কেন, এই তো সেই গুহা থেকেই এই সরু গুহাটা বেরিয়েচে, সরু গুহা তো শেষ হয়েই গেল— তবে সেই ত্রিভুজ গুহাটা কই?

অনেকক্ষণ খোঁজাখুজির পরে শঙ্করের হঠাৎ কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হল। সে গুহার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেনি তো? সর্বনাশ!

সে বসে আতঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করলে, ভাবলে—না, ভয় পেলে তার চলবে না। স্থির বুদ্ধি ভিন্ন এ-বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। মনে পড়ল, আলভারেজ তাকে বলে দিয়েছিল, অপরিচিত স্থানে বেশিদূর অগ্রসর হবার সময়ে পথের পাশে যেন কোনো চিহ্ন রেখে যায়, যাতে আবার সেই চিহ্ন ধরে ফিরতে পারে। এ-উপদেশ সে ভুলে গিয়েছিল। এখন উপায়?

টর্চের আলো জ্বালাতে আর তার ভরসা হচ্ছে না। যদি ব্যাটারি ফুরিয়ে যায়, তবে নিরুপায়। গুহার মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য। সেই অন্ধকারে এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পথ খুঁজে বার করা তো দূরের কথা।

সারাদিন কেটে গেল—ঘড়িতে সন্ধে সাতটা। এদিকে টর্চের আলো রাঙা হয়ে আসচে ক্রমশ। ভীষণ গুমোট গরম গুহার মধ্যে, তা ছাড়া পানীয় জল নেই। পাথরের দেয়াল বেয়ে যে-জল চুয়ে পড়চে, তার আস্বাদ কষা, ক্ষার, ঈষৎ লোনা। তার পরিমাণও বেশি নয়। জিভ দিয়ে চেটে খেতে হয় দেওয়ালের গা থেকে।

বাইরে অন্ধকার হয়েচে নিশ্চয়ই, সাড়ে-সাতটা বাজল।

আটটা, নটা, দশটা। তখনও শঙ্কর পথ হাতড়াচ্ছে। টর্চের পুরনো ব্যাটারি জ্বলচে সমানে বেলা তিনটে থেকে, এইবার তা এত ক্ষীণ হয়ে এসেচে যে, শঙ্কর ভয়ে আরও উন্মাদের মতো হয়ে উঠল। এই আলো যতক্ষণ, তার প্রাণের ভরসাও ততক্ষণ। নতুবা এই নরকের মতো মহা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবার কোনো আশা নেই—স্বয়ং আলভারেজও পারত না।

টর্চ নিবিয়ে ও চুপ করে একখানা পাথরের উপর বসে রইল। এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারত যদি আলো থাকত, কিন্তু এই অন্ধকারে সে কী করে এখন? একবার ভাবলে, রাত্রিটা কাটুক—না, দেখা যাবে এখন। পরক্ষণেই মনে হল—তাতে আর এমন কী সুবিধে হবে? এখানে তো দিন রাত্রি সমান।

অন্ধকারেই সে দেয়াল ধরে-ধরে চলতে লাগল। হায়, হায় কেন, গুহায় ঢুকবার সময় দুটো নতুন ব্যাটারি সঙ্গে নেয়নি! অন্তত একটা দেশলাই!

ঘড়ি হিসেবে সকাল হল। গুহার চির-অন্ধকারে কিন্তু আলো জ্বলল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শঙ্করের শরীর অবসন্ন হয়ে আসচে। বোধহয়, গুহার অন্ধকারে এই ওর সমাধি অদৃষ্টে লেখা আছে, দিনের আলো আর তাকে দেখতে হবে না। আলভারেজের বলি গ্রহণ করে আফ্রিকার রক্ততৃষ্ণা মেটেনি, তাকেও চাই।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। শঙ্কর জুতোর সুকতলা চিবিয়ে খেয়েচে, একটা আরশুলা কি ইঁদুর কি কাঁকড়াবিছে গুহার মধ্যে কোনো জীব নেই যে সে ধরে খায়। মাথা ক্রমশ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আসছে, তার জ্ঞান নেই সে কী করচে বা তার কী ঘটবে—কেবল এইটুকু মাত্র জ্ঞান রয়েচে যে তাকে গুহা থেকে যে-করে হোক বেরুতেই হবে, দিনের আলোর মুখ দেখতেই হবে। তাই সে অবসন্ন নির্জীব দেহেও অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়েই বেড়াচ্ছে, হয়তো মরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এইরকম ভাবে হাতড়াবে।

একবার সে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পরে সে জেগে উঠল তা সে জানে না। দিন রাত্রি, ঘণ্টা, ঘড়ি, দণ্ড, পল মুছে গিয়েচে এই ঘোর অন্ধকারে। হয়তো—বা তার চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েচে, কে জানে।

ঘুমোবার পরে সে যেন একটু বল পেল। আবার উঠল, আবার চলল, আলভারেজের শিষ্য সে, নিশ্চেষ্টভাবে হাত-পা কোলে করে বসে কখনওই মরবে না। সে পথ খুঁজবে, খুঁজবে যতক্ষণ বেঁচে আছে।

আশ্চর্য, সে-নদীটাই-বা গেল কোথায়? গুহার মধ্যে গোলকধাঁধায় ঘুরবার সময়ে জলাধারাকে সে কোথায় হারিয়ে ফেলেচে। নদী দেখতে পেলে হয়তো উদ্ধার পাওয়াও যেতে পারে, কারণ তার এক মুখ যেদিকেই থাক, অন্য মুখ আছে গুহার বাইরে। কিন্তু নদী তো দূরের কথা, একটা অতিক্ষীণ জলধারার সঙ্গেও আজ তিন দিন পরিচয় নেই। জল-অভাবে শঙ্কর মরতে বসেচে। কষা, লোনা, বিস্বাদ জল চেটে-চেটে তার জিভ ফুলে উঠেচে, তৃষ্ণা তাতে বেড়েচে ছাড়া কমেনি।

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে শঙ্কর খুঁজতে লাগল, ভিজে দেওয়ালের গায়ে কোথাও শেওলা জন্মেছে কি না—খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। না, তাও নেই! পাথরের দেওয়াল সর্বত্র অনাবৃত, মাঝে-মাঝে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পাতলা সর পড়েচে, একটা ব্যাঙের ছাতা কি শেওলাজাতীয় উদ্ভিদও নেই। সূর্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদ এখানে বাঁচতে পারে না।

আরও এক দিন কেটে রাত এল। এত ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হচ্ছে বলে তো বোধ হয় না! ওর মনে হতাশা ঘনিয়ে এসেচে। সে কি আরও চলবে, কতক্ষণ চলবে? এতে কোনো ফল নেই, এ-চলার শেষ নেই। কোথায় সে চলেচে এই গাঢ় নিকষকালো অন্ধকারে এই ভয়ানক নিস্তব্ধতার মধ্যে! উঃ, কী ভয়ানক অন্ধকার, আর কী ভয়ানক নিস্তব্ধতা! পৃথিবী যেন মরে গিয়েচে, সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য নিভে গিয়েচে, সেই মৃত পৃথিবীর জনহীন, শব্দহীন, সময়হীন শ্মশানে সে-ই একমাত্র প্রাণী বেঁচে আছে।

আর বেশিক্ষণ এরকম থাকলে সে ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

এগারো

শঙ্কর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধহয়, কিংবা হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে থাকবে। মোটের উপর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ঘড়িতে বারোটা—সম্ভবত রাত বারোটাই হবে। ও উঠে আবার চলতে শুরু করলে। এক জায়গায় তার সামনে একটা পাথরের দেয়াল পড়ল—তার রাস্তা যেন আটকে রেখেছে। টর্চের রাঙা আলো একটিবার মাত্র জ্বালিয়ে সে দেখল, যে-দেয়াল ধরে সে এতক্ষণ যাচ্ছিল, তারই সঙ্গে সমকোণ করে এ-দেয়ালটা আড়াআড়িভাবে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সে কান খাড়া করলে, অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন ক্ষীণ জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, ঠিক জলের শব্দই বটে, কুলু-কুলু, কুলু-কুলু, ঝরনাধারার শব্দ—যেন পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে মাঝে-মাঝে বেঁধে জল বইচে কোথাও। ভাল করে শুনে ওর মনে হল, জলের শব্দটা হচ্ছে এই পাথরের দেয়ালের ওপারে দেয়ালে কান পেতে শুনে ওর ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। দেয়াল ফুঁড়ে যাবার উপযুক্ত ফাঁক আছে কি না, টর্চের রাঙা আলোয় অনুসন্ধান করতে-করতে এক জায়গায় খুব নিচু ও সংকীর্ণ প্রাকৃতিক রন্ধ্র দেখতে পেলে। সেখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা গিয়ে হাতে জল ঠেকল। সন্তর্পণে উপরের দিকে হাত দিয়ে বুঝল, সেখানটাতে দাঁড়ানো, যেতে পারে। দাঁড়িয়ে উঠে ঘন অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা যেতেই, স্রোতযুক্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে পায়ের পাতা ডুবে গেল।

ঘন অন্ধকারের মধ্যেই নিচু হয়ে ও প্রাণভরে ঠাণ্ডা জল পান করে নিলে। তারপর টর্চের ক্ষীণ আলোয় জলের স্রোতের গতি লক্ষ্য করলে। এ-ধরনের নির্ঝরের স্রোতের উজানের দিকে গুহার মুখ সাধারণত হয় না। টর্চ নিবিয়ে সেই মহা নিবিড় অন্ধকারে পায়ে-পায়ে জলের ধারা অনুভব করতে-করতে অনেকক্ষণ ধরে চলল। নির্ঝর চলেচে এঁকেবেঁকে, কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। এক জায়গায় সেটা তিন-চারটে ছোট-বড় ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক চলে গিয়েচে, ওর মনে হল।

সেখানে এসে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। টর্চ জ্বেলে দেখলে স্রোত নানামুখী। আলভারেজের কথা মনে পড়ল। পথে চিহ্ন রেখে না গেলে, এখানে এবার গোল পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

নিচু হয়ে চিহ্ন রেখে যাওয়ার উপযোগী কিছু খুঁজতে গিয়ে দেখলে, স্বচ্ছ নির্মল জলধারার এপারে-ওপারে দুপারেই একঘরনের পাথরের নুড়ি বিস্তর পড়ে আছে। সেই ধরনের পাথরের নুড়ির উপর দিয়েও প্রধান জলধারা বয়ে চলেছে।

অনেকগুলো নুড়ি পকেটে নিয়ে, সে প্রত্যেক শাখা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করবে ভেবে, দুটো নুড়ি ধারার পাশে রাখতে-রাখতে গেল। একটা স্রোত থেকে খানিকদূর গিয়ে আবার অনেকগুলো ফেকড়ি বেরিয়েচে। প্রত্যেক সংযোগস্থলে ও নুড়ি সাজিয়ে একটা 'এস' অক্ষর তৈরি করে রাখলে।

অনেকগুলো স্রোতশাখা আবার ঘুরে শঙ্কর যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই যেন ঘুরে গেল। পথে চিহ্ন রেখে গিয়েও শঙ্করের মাথা গোলমাল হয়ে যাবার যোগাড় হল।

একবার শঙ্করের পায়ে খুব ঠাণ্ডা কী ঠেকতেই, আলো জ্বেলে দেখলে, জলের ধারে এক প্রকাণ্ডকায় অজগর পাইথন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পাইথন ওর স্পর্শে আলস্য পরিত্যাগ করে মাথাটা উঠিয়ে কড়ির দানার মতো চোখে চাইতেই টর্চের আলোয় দিশেহারা হয়ে গেল—নতুবা শঙ্করের প্রাণসংশয় হয়ে উঠত। শঙ্কর জানে অজগর সাপ অতি ভয়ানক জন্তু— বাঘ-সিংহের মুখ থেকেও হয়তো পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, অজগর সাপের নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। একটি বার লেজ ছুঁড়ে পা জড়িয়ে ধরলে আর দেখতে হত না।

এবার অন্ধকারে চলতে ওর ভয়ানক ভয় করছিল। কী জানি, কোথায় আবার কোন পাইথন সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে! দুটো-তিনটে স্রোতশাখা পরীক্ষা করে দেখবার পরে ও তার নিজের চিহ্নের সাহায্যে পুনরায় সংযোগস্থলে ফিরে এল। প্রধান সংযোগস্থলে ও নুড়ি দিয়ে একটি ক্রুশচিহ্ন করে রেখে গিয়েছিল। এবার ওরই মধ্যে যেটাকে প্রধান বলে মনে হল, সেটা ধরে চলতে গিয়ে দেখলে, সেও সোজামুখে যায়নি। কিছুদূর গিয়েই তারও নানা ফেকড়ি বেরিয়েচে। এক-এক জায়গায় গুহার ছাদ এত নিচু হয়ে নেমে এসেচে যে, কুঁজো হয়ে, কোথাও-বা মাজা দুমড়ে, অশীতিপর বৃদ্ধের ভঙ্গিতে চলতে হয়।

হঠাৎ এক জায়গায় টর্চ জ্বেলে সেই অতি ক্ষীণ আলোতেও শঙ্কর বুঝতে পারলে, গুহাটা সেখানে ত্রিভুজাকৃতি—সেই ত্রিভুজ-গুহা, যাকে খুঁজে বার না করতে পেরে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। একটু পরেই দেখলে বহুদূরে যেন অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি নক্ষত্র জ্বলছে। গুহার মুখ! এবার আর ভয় নেই। এ-যাত্রার মতো সে বেঁচে গেল।

শঙ্কর যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন রাত তিনটে। সেখানটায় গাছপালা কিছু কম,

মাথার উপর নক্ষত্রভরা আকাশ দেখা যায়। সেই মহা অন্ধকার থেকে বার হয়ে এসে রাত্রির নক্ষত্রালোকিত স্বচ্ছ অন্ধকার তার কাছে দীপালোকবর্চিত নগরপথের মতো মনে হল। প্রাণভরে সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে, এ-অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্যে।

ভোর হল। সূর্যের আলো গাছের ডালে-ডালে ফুটল। শঙ্কর ভাবলে এ-অমঙ্গলজনক স্থানে আর একদণ্ডও সে থাকবে না। পকেটে একখানা পাথরের নুড়ি তখনও ছিল. ফেলে না দিয়ে, গুহার বিপদের স্মারকস্বরূপ সেখানা সে কাছে রেখে দিল।

পরদিন এলিফ্যান্ট ঘাস দেখা গেল বনের মধ্যে, সেদিনই সন্ধ্যার আগে অরণ্য শেষ হয়ে খোলা জায়গা দেখা দিল। রাত্রে শঙ্কর অনেকক্ষণ বসে ম্যাপ দেখলে। সামনে যে-মুক্ত প্রান্তরবৎ দেশ পড়ল, এখান থেকে এটা প্রায় তিনশো মাইল বিস্তৃত, একেবারে জাম্বেসি নদীর তীর পর্যন্ত। এই তিনশো মাইলের খানিকটা পড়েচে, বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে, প্রায় ১৭৫ মাইল, অতি ভীষণ, জনমানবহীন, জলহীন, পথহীন মরুভূমি। আলভারেজ মিলিটারি ম্যাপ থেকে নোট করেচে যে, এই অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব কোণ লক্ষ্য করে একটি বিশেষ পথ ধরে না গেলে মাঝামাঝি পার হতে যাওয়ার মানেই মৃত্যু। ম্যাপে এর নাম দিয়েছে 'তৃষ্ণার দেশ'। রোডেশিয়া পৌঁছুতে পারলে যাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে, কারণ সেসব স্থানে মানুষ আছে।

শঙ্কর এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিলে। পথের এই ভয়ানক অবস্থা জেনে-শুনেও সে দমে গেল না। হাত-পা-হারা হয়ে পড়ল না। এই পথে আলভারেজ একা গিয়ে সল্‌স্‌বেরি থেকে টোটা ও খাবার কিনে আনবে বলেছিল। বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ যা পারবে বলে স্থির করেছিল, সে তা থেকে পিছিয়ে যাবে?

কিন্তু সাহস ও নির্ভীকতা এক জিনিস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ম্যাপ দেখে গন্তব্যস্থানের দিকনির্ণয় করার ক্ষমতা শঙ্করের ছিল না। সে দেখলে ম্যাপের সে কিছুই বোঝে না। মিলিটারি ম্যাপগুলোতে দুটো মরুমধ্যস্থ কূপের জায়গায় ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড দেওয়া আছে, 'ম্যাগনেটিক্ নর্থ' আর 'ট্রু নর্থ'-ঘটিত কী একটা গোলমেলে অঙ্ক কষে বার করত আলভারেজ, শঙ্কর দেখেচে কিন্তু শিখে নেয়নি।

সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় কী? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই শঙ্কর এই দুস্তর মরুভূমিতে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হল। ফলে, দুদিন যেতে-না-যেতেই শঙ্কর সম্পূর্ণ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ম্যাপ দেখে যে-কোনো অভিজ্ঞ লোক যে-জলাশয় চোখ বুজে খুঁজে বার করতে পারত—শঙ্কর তার তিন মাইল উত্তর দিয়ে চলে গেল, অথচ তখন তার জল ফুরিয়ে এসেছে, নতুন পানীয় জল সংগ্রহ করে না নিলে জীবন বিপন্ন হবে।

প্রথমত শুধু প্রান্তর আর পাহাড়, ক্যাকটাস ও ইউফোর্বিয়ার বন, মাঝে-মাঝে গ্রানাইটের স্তূপ। তারপর কী ভীষণ কষ্টের সে পথচলা! খাবার নেই, জল নেই—পথ ঠিক নেই, মানুষের মুখ-দেখা নেই। দিনের পর দিন শুধু সুদূর শূন্য, দিগ্বলয় লক্ষ্য করে সে-হতাশ পথযাত্রা। মাথার উপর আগুনের মতো সূর্য, পায়ের নিচে বালি পাথর যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। সূর্য উঠচে—অস্ত যাচ্ছে, নক্ষত্র উঠচে, চাঁদ উঠচে—আবার অস্ত যাচ্ছে। মরুভূমির গিরগিটি একঘেয়ে সুরে ডাকছে, ঝিঁঝি ডাকচে—সন্ধ্যায়, গভীর রাত্রে।

মাইল-লেখা পাথর নেই, কত মাইল অতিক্রম করা হল তার হিসেব নেই। খাদ্য দুই-একটা পাখি, কখনও বা মরুভূমির বাজার্ড শকুনি, যার মাংশ জঠুর বিস্বাদ। এমনকি একদিন একটা পাহাড়ী বিষাক্ত কাঁকড়াবিছে, যার দংশনে মৃত্যু—তাও যেন পরম সুখাদ্য,

মিললে মহা সৌভাগ্য।

দুদিন ঘোর তৃষ্ণায় কষ্ট পাবার পরে পাহাড়ে ফাটলে একটা জলাশয় পাওয়া গেল। কিন্তু জলের চেহারা লাল, কতগুলো কী পোকা ভাসছে জলে, ডাঙায় কী একটা জন্তু মরে পচে ঢোল হয়ে আছে। সেই জলই আকণ্ঠ পান করে শঙ্কর প্রাণ বাঁচালে।

দিনের পর দিন কাটচে, মাস গেল, কি সপ্তাহ গেল, কি বছর গেল হিসেব নেই। শঙ্কর শুকিয়ে রোগা হয়ে গিয়েচে, কোথায় চলেচে তার কিছুই ঠিক নেই—শুধু সামনের দিকে যেতে হবে এ-ই সে জানে। সামনের দিকেই ভারতবর্ষ—বাংলাদেশ।

তারপর পড়ল আসল মরু কালাহারি মরুভূমির এক অংশ। দূর থেকে তার চেহারা দেখে শঙ্কর ভয়ে শিউরে উঠল। মানুষ কী করে পার হতে পারে এই অগ্নিদগ্ধ প্রান্তর! শুধুই বালির পাহাড়, আর তাম্রাভ কটা বালির সমুদ্র। ধু-ধু করে যেন জ্বলছে দুপুরের রোদে। মরুভূমির কিনারে, প্রথম দিনেই ছায়ায় ১২৭ ডিগ্রির উত্তাপ উঠল থার্মোমিটারে।

ম্যাপে বারবার লিখে দিয়েছে, উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে ছাড়া কেউ এই মরুভূমি মাঝামাঝি পার হতে যাবে না। গেলেই মৃত্যু, কারণ সেখানে জল একদম নেই। জল যে উত্তর-পূর্ব ধারে আছে তাও নয়. তবে ত্রিশ মাইল, সত্তর মাইল ও নব্বুই মাইল ব্যবধানে তিনটি স্বাভাবিক উনুই আছে—যাতে জল পাওয়া যায়। ঐ উনুইগুলি প্রায়ই পাহাড়ের ফাটলে, খুঁজে বার করা বড়ই কঠিন। এই জন্যেই মিলিটারি ম্যাপে ওদের জায়গার অঙ্ক ও দ্রাঘিমা দেওয়া আছে।

শঙ্কর ভাবলে, ওসব বার করতে পারব না। সেক্সটেন্ট আছে, নক্ষত্রের চার্ট আছে, কিন্তু তাদের ব্যবহার সে জানে না। যা হয় হবে, ভগবান ভরসা। তবে যতদূর সম্ভব উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে যাবার চেষ্টা সে করবে।

তৃতীয় দিনে নিতান্ত দৈববলে সে একটা উনুই দেখতে পেল। জল কাদাগোলা আগুনের মতো গরম, কিন্তু তা-ই তখন অমৃতের মতো দুর্লভ। মরুভূমি ক্রমে ঘোরতর হয়ে উঠল। কোনোপ্রকার জীবের বা উদ্ভিদের চিহ্ন ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। আগে রাত্রে আলো জ্বাললে দু-একটা কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে আসত, ক্রমে তাও আর আসে না।

দিনে উত্তাপ যেমন ভীষণ, রাত্রে তেমনি শীত। শেষরাত্রে শীতে হাত-পা জমে যায় এমন অবস্থা, অথচ ক্রমশ আগুন জ্বালবার উপায় গেল, কারণ জ্বালানি-কাঠ আর একেবারেই নেই। কয়েক দিনের মধ্যে সঞ্চিত জলও গেল ফুরিয়ে। সেই সুবিস্তীর্ণ বালুকাসমুদ্রে, একটি পরিচিত বালুকণা খুঁজে বার করা যতদূর সম্ভব, তার চেয়েও অসম্ভব ক্ষুদ্র হাত-দুই পরিধির এক জলের উনুই বার করা।

সেদিন সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণার কষ্টে শঙ্কর উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। এতক্ষণে শঙ্কর বুঝচে যে, এ-ভীষণ মরুভূমি একা পার হওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সামিল। সে এমন জায়গায় এসে পড়েচে, যেখান থেকে ফিরবার উপায়ও নেই।

একটা উঁচু বালিয়াড়ির উপর উঠে সে দেখলে, চারধারে শুধুই কটা বালির পাহাড়, পূর্বদিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে গিয়েচে। পশ্চিমে সূর্য ডুবে গেলেও সারা আকাশ সূর্যাস্তের আভায় লাল। কিছু দূরে একটা ছোট ঢিপির মতো পাহাড় এবং দূর থেকে মনে হল একটা গুহাও আছে। এ-ধরনের গ্রানাইটের ছোট ঢিপি এদেশে সর্বত্র, ট্রান্সভাল ও রোডেশিয়ায় এদের নাম 'কোপয়ে' অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। রাত্রে শীতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে শঙ্কর সেই গুহায় আশ্রয় নিলে।

এইখানে এক ব্যাপার ঘটল।

বারো

গুহার মধ্যে ঢুকে শঙ্কর টর্চ জ্বেলে দেখলে (নতুন ব্যাটারি তার কাছে ডজন দুই ছিল) গুহাটা ছোট, বেশ বড় একটা ছোটখাটো ঘরের মতো, মেঝেটাতে অসংখ্য ছোট-ছোট পাথর ছড়ানো। গুহার এক কোণে চোখ পড়তেই শঙ্কর অবাক হয়ে গেল। একটা ছোট্ট কাঠের পিঁপে। এখানে কী করে এল কাঠের পিঁপে?

দু-পা এগিয়েই সে চমকে উঠল।

গুহার দেয়ালের ধার ঘেঁষে শায়িত অবস্থায় একটা সাদা নরকঙ্কাল, তার মুণ্ডুটা দেয়ালের দিকে ফেরানো। কঙ্কালের আশেপাশে কালো-কালো থলে ছেঁড়ার মতো জিনিস, বোধহয় সেগুলো পশমের কোটের অংশ। দুখানা বুটজুতো কঙ্কালের পায়ে তখনও লাগানো। একপাশে একটা মরচে-পড়া বন্দুক।

পিঁপেটার পাশে একটা ছিপি-আঁটা বোতল। বোতলের মধ্যে একখানা কাগজ, ছিপিটা খুলে কাগজখানা বার করে দেখলে তাতে ইংরিজিতে কী লেখা আছে।

পিঁপেটাতে কী আছে দেখবার জন্যে যেমনি সে সেটা নাড়াতে গিয়েছে, অমনি পিঁপের নিচ থেকে একটা ফোঁস-ফোঁস শব্দ শুনে ওর শরীরের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু হয়ে ঠেলে উঠল। বোধহয়, ছোবল মারবার আগে সাপটা এক সেকেণ্ড দেরি করেছিল। সেই এক সেকেণ্ড দেরি করার জন্যে শঙ্করের প্রাণরক্ষা হল। পরমুহূর্তেই শঙ্করের .৪৫ অটো-ম্যাটিক কোল্ট গর্জন করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে অতবড় ভীষণ বিষধর স্যান্ড ভাইপারের মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে, রক্তমাংস খানিকটা পিঁপের গায়ে, খানিকটা পাথরের দেয়ালে ছিটকে লাগল। আলভারেজ ওকে শিখিয়েছিল, পথে সর্বদা হাতিয়ার তৈরি রাখবে। এ-উপদেশ কতবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে!

অদ্ভুত পরিত্রাণ! সব দিক থেকেই। পিঁপেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, সেটাতে অল্প একটু জল তখনও আছে। খুব কালো শিউগোলার মতো রঙ বটে, তবুও জল। ছোট পিঁপেটা উঁচু করে তুলে পিঁপের ছিপি খুলে ঢকঢক করে শঙ্কর সেই দুর্গন্ধ কালো কালির মতো জল আকণ্ঠ পান করলে। তারপর সে টর্চের আলোতে সাপটা পরীক্ষা করলে। পুরো পাঁচ হাত লম্বা সাপটা মোটাও বেশ। এ-ধরনের সাপ মরুভূমির বালির মধ্যে শরীর লুকিয়ে শুধু মুণ্ডুটা উপরে তুলে থাকে—অতি মারাত্মকরকমের বিষাক্ত সাপ।

এইবার বোতলের মধ্যের কাগজখানা খুলে মন দিয়ে পড়লে। যে-ছোট্ট পেন্সিল দিয়ে এটা লেখা হয়েচে—বোতলের মধ্যে সেটাও পাওয়া গেল। কাগজখানাতে লেখা আছে—

আমার মৃত্যু নিকট। আজই আমার শেষ রাত্রি। যদি আমার মরণের পরে, কেউ এই ভয়ঙ্কর মরুভূমির পথে যেতে-যেতে এই গুহায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন তবে সম্ভবত এই কাগজ তাঁর হাতে পড়বে।

আমার গাধাটা দিন দুই আগে মরুভূমির মধ্যে মারা গিয়েচে। এক পিঁপে জল তার পিঠে ছিল, সেটা আমি এই গুহার মধ্যে নিয়ে এসে রেখে দিয়েচি, যদিও জ্বরে আমার শরীর অবসন্ন। মাথা তুলবার শক্তি নেই। তার উপর অনাহারে শরীর আগে থেকেই দুর্বল।

আমার বয়স ২৬ বছর। আমার নাম আত্তিলিও গাত্তি। ফ্লোরেন্সের গাত্তি বংশে আমার জন্ম। বিখ্যাত নাবিক রিওলিনো কাভালকান্তি গাত্তি—যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে তুর্কিদের সঙ্গে লড়েছিলেন, তিনি আমার একজন পূর্বপুরুষ।

রোম ও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভবঘুরে হয়ে গেলাম সমুদ্রের নেশায়—যা আমাদের বংশগত নেশা। ডাচ-ইন্ডিজ যাবার পথে পশ্চিম-আফ্রিকার উপকূলে জাহাজডুবি হল।

আমরা সাতজন লোক অতি কষ্টে ডাঙা পেলাম। ঘোর জঙ্গলময় অঞ্চল আফ্রিকার এই পশ্চিম উপকূল। জঙ্গলের মধ্যে শেফুজাতির এক গ্রামে আমরা আশ্রয় নিই এবং প্রায় দুমাস সেখানে থাকি। এখানেই দৈবাৎ এক প্রকাণ্ড অদ্ভুত হীরের খনির গল্প শুনলাম। পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পার্বত্য ও ভীষণ আরণ্য অঞ্চলে নাকি এই হীরের খনি অবস্থিত।

আমরা সাতজন ঠিক করলাম এই হীরের খনি যে-করে হোক, বার করতে হবেই। আমাকে ওরা দলের অধিনায়ক করলে। তারপর আমরা দুর্গম জঙ্গল ঠেলে চললাম সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পার্বত্য অঞ্চলে। সে-গ্রামের কোনো লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হল না। তারা বলে, তারা কখনও সে জায়গায় যায়নি, কোথায় তা জানে না, বিশেষত এক উপদেবতা নাকি সে-বনের রক্ষক। সেখান থেকে হীরে নিয়ে কেউ আসতে পারবে না।

আমরা দমবার পাত্র নই! পথে যেতে-যেতে ঘোর কষ্টে বেঘোরে দুজন সঙ্গী মারা গেল। বাকি চারজন আর অগ্রসর হতে চায় না। আমি দলের অধ্যক্ষ, গাত্তি বংশে আমার জন্ম, পিছু হটতে জানি না। যতক্ষণ প্রাণ আছে, এগিয়ে যেতে হবে এই জানি। আমি ফিরতে চাইলাম না।

শরীর ভেঙে পড়তে চাইচে। আজ রাত্রেই আসবে সে-নিরবয়ব মৃত্যুদূত। বড় সুন্দর আমাদের ছোট্ট হ্রদ সেরিনো লাগ্যানো, ওরই তীরে আমার পৈতৃক প্রাসাদ, কাস্টোলি রিওলিনি। এতদূর থেকেও আমি সেরিনো লাগ্যানোর তীরবর্তী কমলালেবুর বাগানের লেবুফুলের সুগন্ধ পাচ্চি। ছোট্ট যে-গির্জাটি পাহাড়ের নিচেই, তার রুপোর ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ পাচ্চি।

না, এসব কী আবোল-তাবোল লিখচি জ্বরের ঘোরে! আসল কথাটা বলি। কতক্ষণই বা আর লিখব?

আমরা সে-পর্বতমালা, সে-মহাদুর্গম অরণ্যে গিয়েছিলাম। সে-খনি বার করেছিলাম। যে-নদীর তীরে হীরে পাওয়া যায়, এক বিশাল ও অতি ভয়ানক গুহার মধ্যে সে-নদীর উৎপত্তিস্থান। আমিই সেই গুহার মধ্যে ঢুকে এবং নদীর জলের তীরে ও জলের মধ্যে পাথরের নুড়ির মতো অজস্র হীরে ছড়ানো দেখতে পাই। প্রত্যেকটি নুড়ি টেট্রাহেড্রন ক্রিস্ট্যাল, স্বচ্ছ ও হরিদ্রাভ। লন্ডন ও আমস্টার্ডামের বাজারে এমন হীরে নেই।

এই অরণ্য ও পর্বতের সে-উপদেবতাকে আমি এই গুহার মধ্যে দেখেচি—ধুনোর কাঠের মশালের আলোয়, দূর থেকে আবছায়াভাবে। সত্যিই ভীষণ তার চেহারা! জ্বলন্ত মশাল হাতে ছিল বলেই সেদিন আমার কাছে সে ঘেঁষেনি। এই গুহাতেই সে সম্ভবত বাস করে। হীরের খনির সে রক্ষক, এই প্রবাদের সৃষ্টি সেইজন্যেই বোধ হয় হয়েচে।

কিন্তু কী কুক্ষণেই হীরের সন্ধান পেয়েছিলাম এবং কী কুক্ষণেই সঙ্গীদের কাছে তা প্রকাশ করেছিলাম! ওদের নিয়ে আবার যখন সে-গুহায় ঢুকি, হীরের খনি খুঁজে পেলাম না! একে ঘোর অন্ধকার, মশালের আলোয় সে অন্ধকার দূর হয় না, তার উপরে বহুমুখী নদী, কোন স্রোতটার ধারা হীরের রাশির উপর দিয়ে বইচে, কিছুতেই আর বার করতে পারলাম না।

আমার সঙ্গীরা বর্বর, জাহাজের খালাসি। ভাবলে, ওদের ফাঁকি দিলাম বুঝি। আমি একা নেব এই বুঝি আমার মতলব! ওরা কী ষড়যন্ত্র আঁটলে জানিনে, পরদিন সন্ধ্যেবেলা চারজন মিলে অতর্কিতে ছুরি খুলে আমায় আক্রমণ করলে। কিন্তু তারা জানত না আমাকে, আন্তিলিও গাত্তিকে। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত বইচে আমার পূর্বপুরুষ রিওলিনি কাভালকান্তি গাত্তির, যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে ওরকম বহু বর্বরকে নরকে পাঠিয়েছিলেন। সান্টা কাটালিনার সামরিক বিদ্যালয়ে যখন আমি ছাত্র, আমাদের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ফেন্সার অ্যান্টোনিও দ্রেফুসকে দোরার ডুয়েলে জখম করি। আমার ছোরার আঘাতে ওরা দুজনে মরে গেল, দুজন সাংঘাতিক ঘায়েল হল, নিজেও আমি চোট পেলাম ওদের হাতে। আহত বদমাইশ দুটোও সেই রাত্রে ভবলীলা শেষ করল। ভেবে দেখলাম এখন এই গুহার গেলাকধাঁধার ভিতর থেকে খনি খুঁজে হয়তো বার করতে পারব না। তা ছাড়া আমি সাংঘাতিক আহত, আমায় সভ্যজগতে পৌঁছুতেই হবে। পূর্বদিকের পথে ডাচ উপনিবেশে পৌঁছুব বলে রওনা হয়েছিলুম, কিন্তু এ-পর্যন্ত এসে আর অগ্রসর হতে পারলুম না। ওরা তলপেটে ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিষিয়ে। সেইসঙ্গে জ্বর। মানুষের কী লোভ তাই ভাবি। কেন ওরা আমাকে মারলে? ওরা আমার সঙ্গী, একবারও তো ওদের ফাঁকি দেওয়ার কথা আমার মনে আসেনি!

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরকখনির মালিক আমি, কারণ, নিজের প্রাণ-বিপন্ন করে তা আমি আবিষ্কার করেচি। যিনি আমার এ-লেখা পড়ে বুঝতে পারবেন, তিনি নিশ্চয়ই সভ্য মানুষ ও খ্রিস্টান। তাঁর প্রতি আমার অনুরোধ, আমাকে তিনি যেন খ্রিস্টানের উপযুক্ত কবর দেন। এই অনুগ্রহের বদলে ঐ খনির স্বত্ব তাঁকে আমি দিলাম। রানী শেবার ধনভাণ্ডারও এ খনির কাছে কিছু নয়!

প্রাণ গেল, যাক, কী করব? কিন্তু কী ভয়ানক মরুভূমি এ! একটা ঝিঁঝি পোকার ডাক পর্যন্ত নেই কোনোদিকে! এমন সব জায়গাও থাকে পৃথিবীতে! আমার আজ কেবলই মনে হচ্ছে, পপলারঘেরা সেরিনো লাগ্যানো হ্রদ আর দেখব না, তার ধারে যে চতুর্দশ শতাব্দীর গির্জাটা, তার সেই বড় রুপোর ঘণ্টার পবিত্র ধ্বনি, পাহাড়ের উপরে আমাদের যে-প্রাচীন প্রাসাদ কাস্টোলি রিওলিনি, মুরদের দুর্গের মতো দেখায়, দূরে আমন্ড্রিয়ার সবুজ মাঠ ও দ্রাক্ষক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট ডোরা নদী বয়ে যাচ্ছে—যাক, আবার কী প্রলাপ বকচি!

গুহার দুয়ারে বসে আকাশের অগনিত তারা প্রাণভরে দেখচি শেষবারে জন্যে। সাধু ফ্রান্সোর সেই সৌর-স্তোত্র মনে পড়েচে—

স্তুত হোন প্রভু মোর, পবন সঞ্চার তরে, স্থির বায়ু তরে,
ভগিনী মেদিনী তরে নীল মেঘ তরে, আকাশের তরে,
তারকাসমূহ তরে, দিন কুদিন তরে, দেহের মরণ তরে।

আরেকটা কথা। আমার দুই পায়ে জুতোর মধ্যে পাঁচখানা বড় হীরে লুকনো আছে। তোমায় তা দিলাম, হে অজানা পথিক-বন্ধু। আমার শেষ অনুরোধটি ভুলো না। জনন মেরি তোমার মঙ্গল করুন।

—কম্যান্ডার আন্তিলিও গাত্তি
১৮৮০ সাল। সম্ভবত মার্চ মাস

হতভাগ্য যুবক!

তার মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ তিরিশ বছর কেটে গিয়েচে, এই তিরিশ বছরের মধ্যে

এ-পথে হয়তো কেউ যায়নি, গেলেও গুহাটার মধ্যে ঢোকেনি। এতকাল পরে তার চিঠিখানা মানুষের হাতে পড়ল।

আশ্চর্য এই যে, কাঠের পিঁপেটাতে তিরিশ বছর পরেও জল ছিল কী করে?

কিন্তু কাগজখানা পড়েই শঙ্করের মনে হল, এই লেখায় বর্ণিত ঐটেই সেই গুহা—সে নিজে যেখানে পথ হারিয়ে মারা যেতে বসেছিল তারপর সে কৌতূহলের সঙ্গে কঙ্কালের পায়ের জুতো টান দিয়ে খসাতেই পাঁচখানা বড়-বড় পাথর বেরিয়ে পড়ল। এ অবিকল সেই পাথরের নুড়ির মতো, যা একপকেট কুড়িয়ে অন্ধকার গুহার মধ্যে সে পথচিহ্ন করেছিল এবং যার একখানা তার কাছে রয়েচে। এ-পাথরের নুড়ি তো সে রাশিরাশি দেখেচে গুহার মধ্যে সেই অন্ধকারময়ী নদীর জলস্রোতের নিচে, তার দুই তীরে! কে জানত যে-হীরের খনি খুঁজতে সে ও আলভারেজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসে ছমাস ধরে রিখটারসভেল্ড পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে হয়রান হয়ে গিয়েচে—এমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে সেখানে গিয়ে পড়বে! হীরে যে এমন রাশিরাশি পড়ে থাকে পাথরের নুড়ির মতো—তা-ই-বা কে ভেবেছিল! আগে এসব জানা থাকলে, পাথরের নুড়ি সে দু-পকেট ভরে কুড়িয়ে নিয়ে আসত।

কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ হয়ে গিয়েচে যে, সে-রত্নখনির গুহা যে কোথায়, কোন দিকে, তার কোনো নকশা করে আনেনি বা সেখানে কোনো চিহ্ন রেখে আসেনি, যাতে আবার সেটা খুঁজে নেয়া যেতে পারে। সেই সুবিস্তীর্ণ পর্বত ও অরণ্য-অঞ্চলের কোন জায়গায় সেই গুহাটা দৈবাৎ সে দেখেছিল, তা কি তার ঠিক আছে, না ভবিষ্যতে সে আবার সে-জায়গা বার করতে পারবে? এ-যুবকও তো কোনো নকশা করেনি, কিন্তু এ সাংঘাতিক আহত হয়েছিল রত্নখনি আবিষ্কার করার পরেই, এর ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। হয়তো এ যা বার করতে পারত নকশা না দেখে—সে তা পারবে না।

হঠাৎ আলভারেজের মৃত্যুর পূর্বের কথা শঙ্করের মনে পড়ল। সে বলেছিল—চল যাই, শঙ্কর, গুহার মধ্যে রাজার ভাণ্ডার লুকানো আছে! তুমি দেখতে পাচ্চ না, আমি দেখতে পাচ্চি।

শঙ্কর গুহার মধ্যেই সেই নরকঙ্কালটা সমাধিস্থ করলে। পিঁপেটা ভেঙে ফেলে তারই দুখানা কাঠে মরচে-পড়া পেরেক ঠুকে ক্রস তৈরি করলে ও সমাধির উপর সেই ক্রশটা পুঁতলে। এ ছাড়া খ্রিস্টধর্মাচারীকে সমাধিস্থ করবার অন্য কোনো রীতি তার জানা নেই। তারপরে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, এই মৃত যুবকের আত্মার শান্তির জন্য।

এসব শেষ করতে সারা দিনটা কেটে গেল। রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন আবার সে রওনা হল। কঙ্কালের চিঠিখানা ও হীরেগুলি যত্ন করে সঙ্গে নিল।

তবে তার মনে হয়, এই অভিশপ্ত হীরের খনির সন্ধানে যে গিয়েচে, সে আর ফেরেনি। আন্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা মরেচে, জিম কার্টার মরেচে, আলভারেজ মরেচে। এর আগেই বা কত লোক মরেচে তার ঠিক কী? এইবার তার পালা। এই মরুভূমিতেই তার শেষ, এই বীর ইটালিয়ান যুবকের মতো।

তেরো

দুপুরের রোদে যখন দিকদিগন্ত আগুন জ্বলে উঠল, একটা ছোট্ট পাথরের ঢিপির আড়ালে শঙ্কর আশ্রয় নিলে। ১৩৫ ডিগ্রি উত্তাপ উঠেচে তাপমান যন্ত্রে, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এ উত্তাপে পথ হাঁটা চলে না। যদি সে কোনোরকমে এই ভয়ানক

মরুভূমির হাত এড়াতে পারত, তবে হয়তো জীবন্ত অবস্থায় মানুষের আবাসেও পৌঁছতে পারত। সে ভয় করে শুধু এই মরুভূমি, সে জানে কালাহারি মরু বড়-বড় সিংহের বিচরণভূমি। তার হাতে রাইফেল আছে—রাতদুপুরে একা যত বড় সিংহই হোক, সম্মুখীন হতে সে ভয় করে না—কিন্তু ভয় হয় তৃষ্ণা রাক্ষসীকে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। দুপুরে সে দুবার মরীচিকা দেখলে। এতদিন মরুপথে আসতেও এ-আশ্চর্য নৈসর্গিক দৃশ্য দেখেনি, বইয়েই পড়েছিল মরীচিকার কথা। একবার উত্তর-পূর্ব কোণে, একবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, দুই মরীচিকাই কিন্তু প্রায় একরকম—অর্থাৎ একটা বড় গম্বুজওয়ালা মসজিদ বা গির্জা, চারপাশে খেজুরকুঞ্জ, সামনে বিস্তৃত জলাশয়। উত্তর-পূর্ব কোণের মরীচিকাটি বেশি স্পষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে দূরদিগন্তে মেঘমালার মতো পর্বতমালা দেখা গেল। শঙ্কর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। পূর্বদিকে একটাই মাত্র বড় পর্বত এখান থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব, দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রান্তবর্তী চিমানিমানি পর্বতমালা। তাহলে কি বুঝতে হবে যে, সে বিশাল কালাহারি পদব্রজে পার হয়ে প্রায় শেষ করতে চলেচে? না এও মরীচিকা?

কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত পথ চলেও জ্যোৎস্নারাত্রে সে দূর পর্বতের সীমারেখা তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেলে। অসংখ্য ধন্যবাদ হে ভগবান, মরীচিকা নয় তবে। জ্যোৎস্নারাত্রে কেউ কখনও মরীচিকা দেখেনি।

তবে কি প্রাণের আশা আছে? আজ পৃথিবীর বৃহত্তম রত্নখনির মালিক সে। নিজের পরিশ্রমে ও দুঃসাহসের বলে সে তার স্বত্ব অর্জন করেচে। দরিদ্র বাংলা মায়ের বুকে সে যদি আজ বেঁচে ফেরে!

দুদিনের দিন বিকেলে সে এসে পর্বতের নিচে পৌঁছল। তখন সে দেখলে, পর্বত পার হওয়া ছাড়া ওপারে যাওয়ার কোনো সহজ উপায় নেই। নইলে ২৫ মাইল মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে আসতে হবে। মরুভূমির মধ্যে সে আর কিছুতেই যেতে রাজি নয়। সে পাহাড় পার হয়েই যাবে।

এইখানে সে প্রকাণ্ড একটা ভুল করলে। সে ভুলে গেল যে সাড়ে-বারো হাজার ফুট একটা পর্বতমালা ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রিখটারসভেল্ড পার হওয়ার মতোই শক্ত। তার চেয়েও শক্ত, কারণ সেখানে আলভারেজ ছিল, এখানে সে একা।

শঙ্কর ব্যাপারের গুরুত্বটা তেমন বুঝতে পারলে না, ফলে চিমানিমানি পর্বত উত্তীর্ণ হতে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসল, ভীষণ প্রজ্জ্বলন্ত কালাহারি পার হতে গিয়েও সে এমন ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়নি।

চিমানিমানি পর্বতে জঙ্গল খুব বেশি ঘন নয়। শঙ্কর প্রথম দিন অনেকটা উঠল—তারপর একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল, সেখানে থেকে কোনোদিকে যাবার উপায় নেই। কোন পথটা দিয়ে উঠেছিল, সেটাও আর খুঁজে পেলে না—তার মনে হল, সে সমতলভূমির যে-জায়গা দিয়ে উঠেছিল, তার ত্রিশ ডিগ্রি দক্ষিণে চলে এসেচে। কেন যে এমন হল, এর কারণ কিছুতেই সে বার করতে পারলে না। কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেল, কখনও উঠচে, কখনও নামচে, সূর্য দেখে দিক ঠিক করে নিচ্চে, কিন্তু সাত-আট মাইল পাহাড় উত্তীর্ণ হতে এতদিন লাগচে কেন?

তৃতীয় দিনে আর একটা নতুন বিপদ ঘটল। তার আগের দিন একখানা আলগা

পাথর গড়িয়ে তার পায়ে চোট লেগেছিল। তখন তত কিছু হয়নি, পরদিন সাকালে আর সে শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাঁটু ফুলেচে, বেদনাও খুব! দুর্গম পথে নামা-ওঠা করা এ-অবস্থায় অসম্ভব। পাহাড়ের একটা ঝরনা থেকে উঠবার সময় জল সংগ্রহ করে এনেছিল, তা-ই একটু-একটু করে খেয়ে চালাচ্চে। পায়ের বেদনা কমে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। বেশিদূর যাওয়া চলবে না। সামান্য একটু-আধটু চলাফেরা করতেই হবে খাদ্য ও জলের চেষ্টায়, ভাগ্যে পাহাড়ের এই স্থানটা যেন খানিকটা সমতলভূমির মতো, তাই রক্ষে।

এইসব অবস্থায়, এই মনুষ্যবাসহীন পাহাড়ে বিপদ তো পদে-পদেই। একা এ-পাহাড় টপকাতে গেলে যে-কোনো ইউরোপীয় পর্যটকদের ঠিক এইরকম বিপদ ঘটতে পারত।

শঙ্কর আর পারে না। ওর হৃৎপিণ্ডে কী একটা রোগ হয়েচে, একটু হাঁটলেই ধড়াস-ধড়াস করে হৃপিণ্ডটা পাঁজরায় ধাক্কা মারে। অমানুষিক পথশ্রমে, দুর্ভাবনায়, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে, কখনও বা অনাহারের কষ্টে, ওর শরীরে কিছু নেই।

চারদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। খাদ্য নেই গতকাল থেকে। রাইফেল সঙ্গে আছে, কিন্তু একটা বন্য জন্তুর দেখা নেই। দুপুরে একটা হরিণকে চরতে দেখে ভরসা হয়েছিল, কিন্তু রাইফেলটা তখন ছিল ৫০ গজ তফাতে একটা গাছে ঠেস দেওয়া, আনতে গিয়ে হরিণটা পালিয়ে গেল। জল খুব সামান্যই আছে চামড়ার বোতলে। এ-অবস্থায় নেমে সে ঝরনা থেকে জল আনবেই-বা কী করে? হাঁটুটা আরও ফুলেচে। বেদনা এত বেশি যে, একটু চলাফেরা করলেই মাথার শির পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়ে যন্ত্রণায়।

পরিষ্কার আকাশের নিচে জলকণাশূন্য বায়ুমণ্ডলের গুণে অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিকচক্রবালে মেঘলা করে ঘিরেচে নীল পর্বতমালা দূরে-দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিমে দিগন্ত বিস্তীর্ণ কালাহারি। দক্ষিণে ওয়াহকুহক পর্বত, তারও অনেক পিছনে মেঘের মতো দেখা যায় পল ক্রুগার পর্বতমালা। সল্‌সবেরির দিকে কিছু দেখা যায় না, চিমানিমানি পর্বতের এক উচ্চতর শৃঙ্গ সেদিকে দৃষ্টি আটকেচে।

আজ দুপুর থেকে ওর মাথার উপর শকুনির দল উড়চে। এতদিন এত বিপদেও শঙ্করের যা হয়নি, আজ শকুনির দল মাথার উপর উড়তে দেখে সত্যিই ওর ভয় হয়েচে। ওরা তাহলে কি বুঝেচে যে শিকার জুটবার বেশি দেরি নেই!

সন্ধ্যার কিছু পরে কী একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখলে, পাশেই এক শিলাখণ্ডের আড়ালে একটা খুসর রঙের নেকড়ে বাঘ—নেকড়ের লম্বা ছুঁচলো কান দুটো খাড়া হয়ে আছে, সাদা-সাদা দাঁতের উপর দিয়ে রাঙা জিভটা অনেকখানি বার হয়ে লকলক করচে। চোখে চোখ পড়তেই সেটা চট করে পাথরের আড়াল থেকে সরে দূরে পালাল।

নেকড়ে বাঘটাও তা হলে কি বুঝেচে! পশুরা নাকি আগে থেকে অনেক কথা জানতে পারে।

হাড়ভাঙা শীত পড়ল রাত্রে। ও কিছু কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে। অগ্নিকুণ্ডের আলো যতটুকু পড়েছে তার বাইরে ঘন অন্ধকার।

কী একটা জন্তু এসে অগ্নিকুণ্ড থেকে কিছু দূরে অন্ধকারে দেহ মিশিয়ে চুপ করে বসল। কোয়োট বন্যকুকুর জাতীয় জন্তু। ক্রমে আর একটা, আর দুটো, আর তিনটে। রাত বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে দশ-পনেরোটা এসে জমা হল। অন্ধকারে তার চারধার ঘিরে নিঃশব্দে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে যেন কিসের প্রতীক্ষা করচে।

কি সব অমঙ্গলজনক দৃশ্য!

ভয়ে ওর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। সত্যিই কি এতদিনে তারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেচে? সে-ও পারলে না রিখটারসভেল্ড থেকে হীরে নিয়ে পালিয়ে যেতে!

উঃ, আজ কত টাকার মালিক সে! হীরের খনি বাদ যাক, তার সঙ্গে যে-ছখানা হীরে রয়েচে, তার দাম অন্তত দু-তিন লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই হবে। তার গরিব গ্রামে, গরিব বাপ-মায়ের বাড়ি যদি সে এই টাকা নিয়ে গিয়ে উঠতে পারত! কত গরিবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারত, গ্রামের কত দরিদ্র কুমারীকে বিবাহের যৌতুক দিয়ে ভাল পাত্রে বিবাহ দিত, কত সহায়হীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শেষ কটা দিন নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারত!

কিন্তু যা হবার নয় কী হবে সেসব ভেবে? তার চেয়ে এই অপূর্ব রাত্রির নক্ষত্রালোকিত আকাশের শোভা, এই বিশাল পর্বত ও মরুভূমির নিস্তব্ধ গম্ভীর রূপ, মৃত্যুর আগে সেও চোখ ভরে দেখতে চায়, সেই ইটালিয়ান যুবক গাস্তির মতো। ওরা যে অদৃষ্টের এক অদৃশ্য তারে গাঁথা সবাই—আন্তিলিও গাস্তি ও তার সঙ্গীরা, জিম কার্টার, আলভারেজ, শঙ্কর।

রাত গভীর হয়েচে। কি ভীষণ শীত! একবার সে চেয়ে দেখলে, কোয়োটগুলো এরই মধ্যে কখন আরও কাছে সরে এসেচে। অন্ধকারের মধ্যে আলো পড়ে তাদের চোখগুলো জ্বলচে। শঙ্কর একখানা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই ওরা সব দূরে সরে গেল, কিন্তু কী নিঃশব্দ ওদের গতিবিধি আর কী অসীম ওদের ধৈর্য! শঙ্করের মনে হল, ওরা জানে শিকার ওদের হাতের মুঠোয়, হাতছাড়া হবার কোনো উপায় নেই।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাবেলার সেই ধূসর নেকড়ে বাঘটাও দু-দুবার এসে অন্ধকারে কোয়োটদের পিছনে বসে দেখে গিয়েচে।

একটুও ঘুমুতে ভরসা হল না ওর। কী জানি, কোয়োট আর নেকড়ের দল হয়তো তা হলে জীবন্তই তাকে ছিঁড়ে খাবে মৃত মনে করে। অবসন্ন, ক্লান্ত দেহে জেগেই বসে থাকতে হবে তাকে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসলেও উপায় নেই। মাঝে-মাঝে কোয়োটগুলো এগিয়ে এসে বসে, ও জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই সরে যায়। দু-একটা হায়েনাও এসে ওদের দলে যোগ দিয়েচে, হায়েনাদের চোখগুলো অন্ধকারে কী ভীষণ জ্বলে!

কী ভয়ানক অবস্থাতে পরেচে! জনবিরল বর্বর দেশের জনশূন্য পর্বতের সাড়ে-তিন হাজার ফুট উপরে সে চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় বসে, গভীর রাত ঘোর অন্ধকার, সামান্য আগুন জ্বলছে। মাথার উপর জলকণাশূন্য স্তব্ধ বায়ুমণ্ডলের গুণে আকাশের অগণ্য তারা জ্বলজ্বল করচে যেন ইলেকট্রিক আলোর মতো, নিচে তার চারধার ঘিরে অন্ধকারে মাংসলোলুপ নীরব নেকড়ে কোয়োট হায়েনার দল।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার এটাও মনে হল, বাংলার পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ায় ধুঁকে সে মরচে না। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু। পদব্রজে কালাহারি মরুভূমি পার হয়েছে সে—একা। মরে গিয়ে চিমানিমানি পর্বতের শিলায় নাম খুদে রেখে যাবে। সে একজন বিশিষ্ট ভ্রমণকারী ও আবিষ্কারক। অত বড় হীরের খনি সে-ই তো খুঁজে বার করেছে! আলভারেজ মারা যাওয়ার পরে সেই বিশাল অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের গোলকধাঁধা থেকে সে তো একাই বার হতে পেরে এত দূর এসেচে! এখন সে নিরুপায়, অসুস্থ, চলচ্ছক্তিরহিত। তবুও সে যুঝচে, ভয় তো পায়নি, সাহস তো হারায়নি। কাপুরুষ, ভীতু নয় সে। জীবন-মৃত্যু তো অদৃষ্টের খেলা। না বাঁচলে তার দোষ কী?

দীর্ঘ রাত্রি কেটে গিয়ে পুবদিক ফরসা হল। সঙ্গে-সঙ্গে বন্য জন্তুর দল কোথায় পালাল। বেলা বাড়চে, আবার নির্মম সূর্য জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে শুরু করচে দিগ্বিদিক। সঙ্গে-সঙ্গে শকুনির দল কোথা থেকে এসে হাজির। কেউ মাথার উপর ঘুরচে, কেউ বা দূরে-দূরে গাছের ডালে কি পাথরের উপরে বসেচে, খুব ধীরভাবে প্রতীক্ষা করচে। ওরা যেন বলচে—কোথায় যাবে বাছাধন? যে-কদিন লাফালাফি করবে, করে নাও। আমরা বসি, এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই আমাদের।

শঙ্করের খিদে নেই। খাবার ইচ্ছেও নেই। তবুও সে গুলি করে একটা শকুনি মারলে। রোদ ভীষণ চড়েচে। আগুন-তাতা পাথরের গায়ে পা রাখা যায় না। এ-পর্বতও মরুভূমির সামিল, খাদ্য এখানে মেলে না, জলও না। সে মরা শকুনিটা নিয়ে এসে আগুন জ্বেলে ঝলসাতে বসল। এর আগে মরুভূমির মধ্যেও সে শকুনির মাংস খেয়েচে। এরাই এখন প্রাণধারণের একমাত্র উপায়, আজ ও খাচ্চে ওদের, কাল ওরা খাবে ওকে। শকুনিগুলো এসে আবার মাথার উপর জুটেচে।

তার নিজের ছায়া পড়েচে পাথরের গায়ে, সে নির্জন স্থানে শঙ্করের উদ্‌ভ্রান্ত মনে ছায়াটা যেন একজন সঙ্গী মনে হল। বোধহয়, ওর মাথা খারাপ হয়ে আসচে। কারণ বেঘোর অবস্থায়, ও কতবার নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগল, কতবার পরক্ষণের সচেতন মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে সামলে নিল।

সে পাগল হয়ে যাচ্চে নাকি? জ্বর হয়নি তো? তার মাথার মধ্যে ক্রমশ গোলমাল হয়ে যাচ্চে সব। আলভারেজ..... হীরের খনি.....পাহাড়, বালির সমুদ্র ..... আন্তিলিও গাস্তি..... কাল রাত্রে ঘুম হয়নি.... আবার রাত আসচে, সে একটু ঘুমিয়ে নেবে।

কিসের শব্দে ওর তন্দ্রা ছুটে গেল। একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ আসচে কোনদিক থেকে? কোনো পরিচিত শব্দের মতো নয়। কিসের শব্দ? কোনদিক থেকে শব্দটা আসচে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু ক্রমশ কাছে আসচে সেটা।

হঠাৎ আকাশের দিকে শঙ্করের চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তার মাথার উপর দিয়ে আকাশের পথে বিকট শব্দ করে কী একটা জিনিস যাচ্চে। ওই কি এরোপ্লেন? সে বইয়ে ছবি দেখেছে বটে।

এরোপ্লেন যখন ঠিক মাথার উপর এল, শঙ্কর চিৎকার করলে, কাপড় ওড়ালে, গাছের ডাল ভেঙে নাড়লে, কিন্তু কিছুতেই পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না। দেখতে-দেখতে এরোপ্লেনখানা সুদূর ভায়োলেট রঙের পলক্রূগার পর্বতমালার মাথার উপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হয়তো আরও এরোপ্লেন যাবে এ-পথ দিয়ে। কী আশ্চর্য দেখতে এই এরোপ্লেন জিনিসটা! ভারতবর্ষে থাকতে সে একখানাও দেখেনি।

শঙ্কর ভাবলে আগুন জ্বালিয়ে কাঁচা ডালপাতা দিয়ে সে যথেষ্ট ধোঁয়া করবে। যদি আবার এ-পথে যায়, পাইলটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে ধোঁয়া দেখে। একটা সুবিধে হয়েচে, এরোপ্লেনের ঐ বিকট আওয়াজে শকুনির দল কোনদিকে ভেগেচে যেন।

সেদিন কাটল। দিন কেটে রাত্রি হবার সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্করের দুর্ভোগ শুরু হল। আবার গতরাত্রির পুনরাবৃত্তি। সেই কোয়োটের দল অবার এল। আগুনের চারধারে তারা আবার তাকে ঘিরে বসল। নেকড়ে বাঘটা সন্ধ্যা না হতেই দূর থেকে একবার দেখে গেল। গভীর রাত্রে আর একবার এল।

কিসে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? আওয়াজ করতে ভরসা হয় না—

টোটা মাত্র দুটি বাকি। টোটা ফুরিয়ে গেলে তাকে অনাহারে মরতে হবে। মরতে তো হবেই, তবে দুদিন আগে আর পরে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

কিন্তু আওয়াজ তাকে করতেই হল। গভীর রাত্রে হায়েনাগুলো এসে কোয়োটদের সাহস বাড়িয়ে দিলে। তারা আরও সরে এগিয়ে এসে তাকে চারধার থেকে ঘিরলে। পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারলে—আর ভয় পায় না।

একবার একটু তন্দ্রামতো এসেছিল—বসে-বসেই ঢুলে পড়েছিল। পরমুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে দেখলে, নেকড়ে বাঘটা অন্ধকার থেকে পা টিপে-টিপে তার অত্যন্ত কাছে এসে পড়েচে। ওর ভয় হল, হয়তো ওটা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভয়ের চোটে একবার গুলি ছুড়লে।

আরেকবার শেষ-রাতের দিকে ঠিক এ-রকমই হল। কোয়োটগুলোর ধৈর্য অসীম, সেগুলো চুপ করে বসে থাকে মাত্র, কিছু বলে না। কিন্তু নেকড়ে বাঘটা ফাঁক খুঁজচে।

রাত ফরসা হবার সঙ্গে-সঙ্গে দুঃস্বপ্নের মতো অন্তর্হিত হয়ে গেল কোয়োট, হায়েনা ও নেকড়ের দল। সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্করও আগুনের ধারে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা কিসের শব্দে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল।

খানিকটা আগে খুব বড় একটা আওয়াজ হয়েছে কোনোকিছুর। শঙ্করের কানে তার রেশ এখনও লেগে আছে।

কেউ কি বন্দুকের আওয়াজ করেচে? কিন্তু তা অসম্ভব, এই দুর্গম পর্বতের পথে কোন মানুষ আসবে?

একটিমাত্র টোটা অবশিষ্ট আছে। শঙ্কর ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, সেটা খরচ করে একটা আওয়াজ করলে। যা থাকে কপালে, মরেচেই তো। উত্তরে দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল।

আনন্দে ও উত্তেজনায় শঙ্কর ভুলে গেল যে তার পা খোঁড়া, ভুলে গেল যে একটানা বেশিদূর সে যেতে পারে না। তার আর টোটা নেই, সে আর বন্দুকের আওয়াজ করতে পারলে না কিন্তু প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল। গাছের ডাল ভেঙে নাড়তে লাগল, আগুন জ্বালাবার কাঠকুটোর সন্ধানে চারদিকে আকুল-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল।

ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক জরিপ করবার দল, কিম্বার্লি থেকে কেপটাউন যাবার পথে চিমানিমানি পর্বতের নিচে কালাহারি মরুভূমির উত্তর-পূর্ব কোণে তাঁবু ফেলেছিল। সঙ্গে সাতখানা ডবল টায়ার ক্যাটারপিলার চাকা বসানো মোটরগাড়ি, এদের দলে নিগ্রো-কুলি ও চাকরবাকর বাদে ন'জন ইউরোপীয়। জন চারেক হরিণ শিকার করতে উঠেছিল চিমানিমানি পর্বতের প্রথম ও নিম্নতর থাকটাতে।

হঠাৎ এ-জনহীন অরণ্যপ্রদেশে সত্য রাইফেলের আওয়াজ শুনে ওরা বিস্মিত হয়ে উঠল। কিন্তু পুনরায় ওদের আওয়াজের প্রত্যুত্তর না পেয়ে ইতস্তত খুঁজতে বেরিয়ে দেখতে পেলে, সামনের একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর চূড়ো থেকে, জীর্ণ ও কঙ্কালসার কোটরগতচক্ষু প্রেতমূর্তি উন্মাদের মতো হাত-পা নেড়ে তাদের কী বোঝাবার চেষ্টা করচে। তার পরনে ছিন্নভিন্ন অতি মলিন ইউরোপীয় পরিচ্ছদ।

ওরা ছুটে গেল। শঙ্কর আবোল-তাবোল কী বলে, ওরা ভাল বুঝতে পারলে না। যত্ন করে ওকে নামিয়ে পাহাড়ের নিচে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ওর জিনিসপত্র নামিয়ে আনা হয়েছিল। ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু এই ধাক্কায় শঙ্করকে বেশ ভুগতে হল। ক্রমাগত অনাহারে, কষ্টে, উদ্বেগে,

অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণের ফলে, তার শরীর খুব জখম হয়েছিল, সেই রাত্রেই তার বেজায় জ্বর এল।

জ্বরে সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ল, কখন যে মোটরগাড়ি ওখান থেকে ছাড়ল, কখন যে তারা সল্‌সবেরিতে পৌঁছল, শঙ্করের কিছুই খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় পনেরো দিন সে সলস্‌বেরির হাসাপাতালে কাটিয়ে দিলে। তারপর ক্রমশ সুস্থ হয়ে, মাসখানেক পরে একদিন সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরের রাজপথে এসে দাঁড়াল।

চোদ্দ

সল্‌সবেরি! কত দিনের স্বপ্ন!

আজ সে সত্যিই বড় একটা ইউরোপীয় ধরনের শহরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বড়-বড় বাড়ি, ব্যাঙ্ক, হোটেল, দোকান, পিচঢালা চওড়া রাস্তা, একপাশ দিয়ে ইলকট্রিক ট্রাম চলচে, জুলু রিকশাওয়ালা রিকশা টানচে, কাগজওয়ালা কাগজ বিক্রি করচে। সবই যেন নতুন, যেন এসব দৃশ্য জীবনে কখনও সে দেখেনি।

লোকালয়ে তো এসেচে, কিন্তু একবারে কপর্দকশূন্য। এক পেয়ালা চা খাবার পয়সাও তার নেই। কাছে একটা ভারতীয় দোকান দেখে তার বড় আনন্দ হল। কতদিন যে দেখেনি স্বদেশবাসীর মুখ! দোকানদার মেমন মুসলমান, সাবান ও গন্ধদ্রব্যের পাইকারি বিক্রেতা। খুব বড় দোকান। শঙ্করকে দেখেই সে বুঝলে এ দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত। নিজে দুটাকা সাহায্য করলে ও একজন বড় ভারতীয় সওদাগরের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলে।

টাকা দুটি পকেটে নিয়ে শঙ্কর আবার পথে এসে দাঁড়াল। আসবার সময় বলে এল—অসীম ধন্যবাদ টাকা দুটির জন্যে, এ আমি আপনার কাছে ধার নিলাম, আমার হাতে পয়সা এলে আপনাকে কিন্তু এ-টাকা নিতে হবে। সামনেই একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁ। সে ভাল কিছু খাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না, কতদিন সভ্যখাদ্য মুখে দেয়নি! সেখানে ঢুকে এক টাকার পুরি, কচুরি, হালুয়া, মাংসের চপ, কেক, পেট ভরে খেলে। সেই সঙ্গে দু-তিন পেয়ালা কফি।

চায়ের টেবিলে একখানা পুরনো খবরের কাগজের দিকে তার নজর পড়ল! তাতে এক জায়গায় হেডলাইনে বড়-বড় অক্ষরে লেখা আছে—

ন্যাশনাল পার্ক জরিপ—দলের বিচিত্র অভিজ্ঞতা

মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় শ্রান্ত এক ভারতীয় আবিষ্কার

তার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনী

শঙ্কর দেখলে, তার একটা ফটোও ছাপা হয়েচে কাগজে। তার মুখে সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা গল্পও দেওয়া হয়েছে। এরকম গল্পও সে কারো কাছে করেনি।

খবরের কাগজখানার নাম সল্‌সবেরি ডেলি ক্রনিকল। সে খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে। তার চারপাশে ভিড় জমে গেল। ওকে খুঁজে বার করবার জন্যে রিপোর্টারের দল অনেক চেষ্টা করেছিল জানা গেল। সেখানে চিমানিমানি পর্বতে

পা-ভেঙে পড়ে থাকার গল্প বলে ও ফটো তুলতে দিয়ে শঙ্কর পঞ্চাশ টাকা পেলে। তা থেকে সে আগে সেই সহৃদয় মুসলমান দোকানদারের টাকা দুটি দিয়ে এল।

আগ্নেয়গিরিটার সম্বন্ধে সে কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখলে। তাতে আগ্নেয়গিরিটার নামকরণ করলে মাউন্ট আলভারেজ। তবে মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যে লুকানো এত বড় একটা আস্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির এই গল্প—কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে না। অবিশ্যি রত্নের গুহার বাষ্পও সে কাউকে জানতে দেয়নি। দিলে দলে-বলে লোক ছুটবে ওর সন্ধানে।

তার পরে একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে একরাশ ইংরেজি বই ও মাসিক পত্রিকা কিনলে। বই পড়েনি কতকাল। সন্ধ্যায় একটা সিনেমায় ছবি দেখলে। কতকাল পরে রাত্রে হোটেলের ভাল বিছানায় ইলেকট্রিক আলোর তলায় শুয়ে বই পড়তে-পড়তে সে মাঝে-মাঝে জানালা দিয়ে নিচের প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর স্ট্রীটের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল। ট্রাম যাচ্চে নিচ দিয়ে, রিকশা যাচ্চে, ভারতীয় কফিখানায় ঠুনঠুন করে ঘণ্টা বাজচে, মাঝে-মাঝে দু-চারখানা মোটরও যাচ্চে। এর সঙ্গে মনে হল আরেকটা ছবি—সামনে আগুনের কুণ্ড, কিছুদূরে বৃত্তাকারে ঘিরে বসে আছে কোয়েট ও হায়েনার দল। ওদের পিছনে নেকড়েটার দুটো গোল-গোল চোখ আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলচে অন্ধকারের মধ্যে।

কোনটা স্বপ্ন? চিমানিমানি পর্বতে যাপিত সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি, না আজকের এই রাত্রি?

ইতিমধ্যে সল্‌সবেরিতে শঙ্কর একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠেচে।

রিপোর্টারের ভিড়ে তার হোটেলের হল সব সময়ে ভর্তি। খবরের কাগজের লোক আসে তার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপবার কন্‌ট্রাক্ট করতে, কেউ আসে ফটো নিতে।

আন্তিলিও গান্তির কথা সে ইটালিয়ান কনসাল জেনারেলকে জানাল। তাঁর অফিসের পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে জানা গেল, আন্তিলিও গান্তি নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইটালিয়ান যুবক ১৮৭৯ সালে আগস্ট মাসে পর্টুগিজ পশ্চিম-আফ্রিকার উপকূলে জাহাজডুবি হবার পর নামে। তারপর যুবকটির আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি। তার আত্মীয়স্বজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক। ১৮৯০-৯৫ সাল পর্যন্ত তারা তাদের নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়ের সন্ধানের জন্যে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকার কনসুলেট অফিসকে জ্বালিয়ে খেয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করাও হয়েছিল তার সন্ধানের জন্য। ১৮৯৫ সাল থেকে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

পূর্বোক্ত মুসলমান দোকানদারটির সাহায্যে সে ব্ল্যাকমুন স্ট্রীটের বড় জহুরি রাইডাল ও মরস্‌বির দোকানে চারখানা পাথর সাড়ে বত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি করলে। বাকি দুখানার দর আরও বেশি উঠেছিল, কিন্তু শঙ্কর সে-দুখানা পাথর তার মাকে দেখাবার জন্যে দেশে নিয়ে যেতে চায়। এখন বিক্রি করবার তার ইচ্ছে নেই।

নীল সমুদ্র।

বম্বেগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পর্টুগিজ পূর্ব-আফ্রিকার বেইরা বন্দরের নারিকেলবনশ্যাম তীরভূমিকে মিলিয়ে যেতে দেখতে-দেখতে শঙ্কর ভাবছিল তার জীবনের এই এ্যাডভেঞ্চারের কথা। এই তো জীবন, এইভাবেই তো জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল সে। মানুষের আয়ু মানুষের জীবনের ভুল মাপকাঠি। দশ বছর জীবন উপভোগ করেচে সে এই দেড় বছরে। আজ সে শুধু একজন ভবঘুরে পথিক নয়, একটা

জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সহ-আবিষ্কারক। মাউন্ট আলভারেজকে সে জগতে প্রসিদ্ধ করবে। দূরে ভারত মহাসমুদ্রের পারে জননী জন্মভূমি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জন্য এখন মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেচে। তার মন উৎসুক হয়ে আছে, কবে দূর থেকে বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চূড়োটা মাতৃভূমির উপকূলের সান্নিধ্য ঘোষণা করবে। তারপর, বাউলকীর্তনগান মুখরিত বাংলাদেশের প্রান্তে তাদের শ্যামল গ্রামটি, সামনে আসচে বসন্তকাল, পল্লিপথে যখন একদিন সজনে ফুলের দল পথ বিছিয়ে পড়ে থাকবে, বৌ-কথা-কও ডাকবে ওদের বড় বকুলগাছটায়, নদীর ঘাটে লাগবে গিয়ে ওর ডিঙি।

বিদায়, আলভারেজ বন্ধু। স্বদেশে ফিরে যাওয়ার এই আনন্দের মুহূর্তে তোমার কথাই মনে হচ্চে আজ। তুমি সেই দলের মানুষ, সারা আকাশ যাদের ঘরের ছাদ, সারা পৃথিবী যাদের পায়ে চলার পথ। আশির্বাদ কোরো তোমার মহারণ্যের নির্জন সমাধি থেকে, যেন তোমার মতো হতে পারি জীবনে, অমনি সুখ-দুঃখে নিস্পৃহ, অমনি নির্ভীক।

বিদায়, বন্ধু আন্তিলিও গান্তি। অনেক জন্মের বন্ধু ছিলেন তুমি।

তোমরা সবাই মিলে শিখিয়েছ চীন দেশের সেই প্রাচীন ছড়াটি কত সত্য—

ছাদের আলসের চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফটিক পাথর হয়ে ভেঙে যাওয়া অনেক ভাল, অনেক ভাল, অনেক ভাল।

আবার তাকে আফ্রিকায় ফিরতে হবে। এখন জন্মভূমির টান বড় টান। এখন জন্মভূমির কোলে সে কিছুদিন কাটাবে। তারপর দেশেই সে কোম্পানি গঠন করবার চেষ্টা করবে—আবার সুদূর রিখটারসভেল্ড পর্বতে ফিরবে রত্নখনির অনুসন্ধানে—সে খুঁজে বার করবেই।

পরিশিষ্ট

সল্‌স্‌বেরি থাকতে শঙ্কর সাউথ রোডেশিয়ান মিউজিয়মের কিউরেটর প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ ডক্টর ফিটজেরাল্ডের সঙ্গে দেখা করেছিল, বিশেষ করে বুনিপের কথাটা তাঁকে বলবার জন্যে। দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পরে ডক্টর ফিটজেরাল্ডের কাছ থেকে নিম্নলিখিত পত্রখানা সে পায় :

THE SOUTH RHODESIAN MUSEUM
SALISBURY, RHODESIA, SOUTH AFRICA
JANUARY 12,1911

Dear Mr. Choudhuri

I am writing this letter to fulfil my promise to you to let you know what I thought about your report of a strange three toed monster in the wilds of the Richtersveldt Mountains. On looking up my files I find other similar accounts by explorers who had been to the region before you, specially by Sir robert Mc Culloch, the famous naturalist, whose report has not yet been published, owing to his sudden and untimely death last year. On thinking the matter over, I am inclined to believe that the monster you saw was nothing more than a species of anthropoid ape, closely related to the gorilla, but mach bigger in size and more savage than the specimens found in the Ruwenzori and Virunga Mountains. This species is becoming rarer and rarer every day, and such numbers as do exist are not easily to be got at on account of their shyness and the habit of hiding themselves in the depths of the high-altitude rain forests of the Richtersveldt. It is only the very fortunate traveller who gets glimpses of them, and I should think that in meeting them he runs risks proportionate to his good luck.

Congratulating you on both your luck and pluck.

I remain, Yours sincerely
(Sd) J. G. FITZGERALD

মরণের ডঙ্কা বাজে

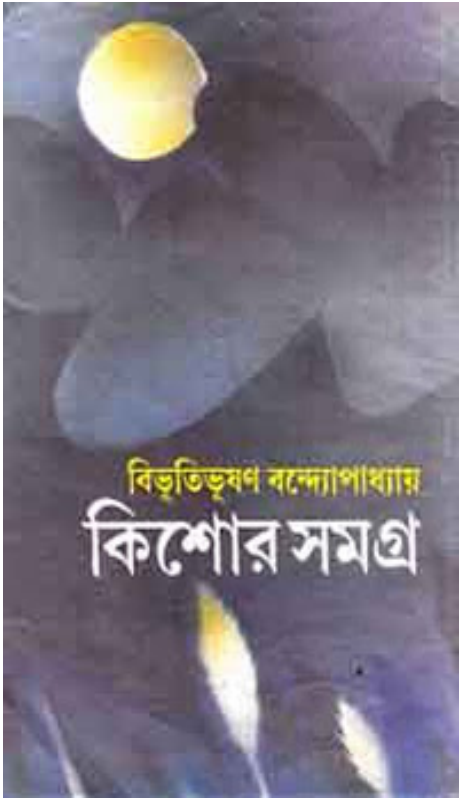

চাঁদপাল ঘাট থেকে রেঙ্গুনগামী মেল-স্টীমার ছাড়চে। বহু লোকজনের ভিড়। পুজোর ছুটির ঠিক পরেই। বর্মাপ্রবাসী দু-চারজন বাঙালি পরিবার রেঙ্গুনে ফিরচে। কুলিরা মালপত্র তুলচে। দড়াদড়ি ছোঁড়াছুঁড়ি, হৈ হৈ। ডেকযাত্রীদের গোলমালের মধ্যে জাহাজ ছেড়ে গেল। যারা আত্মীয়স্বজনকে তুলে দিতে এসেছিল, তারা তীরে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগল।

সুরেশ্বরকে কেউ তুলে দিতে আসেনি। কারণ কলকাতায় তার জানাশোনা বিশেষ কেউ নেই। সবে চাকরিটা পেয়েচে, একটা বড় ঔষধ-ব্যবসায়ী ফার্মের ক্যানভাসার হয়ে সে যাচ্ছে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর।

সুরেশ্বরের বাড়ি হুগলি জেলার একটা গ্রামে। বেজায় ম্যালেরিয়ায় দেশটা উচ্ছন্ন গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত বনজঙ্গল, পোড়োবাড়ির ইঁট স্তূপাকার হয়ে পথে যাতায়াত বন্ধ করেচে, সন্ধ্যার পর সুরেশ্বরদের পাড়ায় আলো জ্বলে না।

ওদের পাড়ার চারিদিকে বনজঙ্গল ও ভাঙা পোড়োবাড়ির মধ্যে একমাত্র অধিবাসী সুরেশ্বররা। কোনো উপায় নেই বলেই এখানে পড়ে থাকা—নইলে কোন কালে উঠে গিয়ে শহর-বাজারের দিকে বাস করত ওরা!

সুরেশ্বর বি. এসসি. পাস করে এতদিন বাড়িতে বসে ছিল। চাকরি মেলা দুর্ঘট আর কে-ই-বা করে দেবে—এইসব জন্যেই সে চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। তার বাবা সম্প্রতি পেনসন নিয়ে বাড়ি এসে বসেছেন, খুব সামান্যই পেনসন—সে-আয়ে সংসার চালানো কায়ক্লেশে হয়; কিন্তু তাও পাড়াগাঁয়ে। শহরে সে-আয়ে চলে না। বছরখানেক বাড়ি বসে থাকবার পরে সুরেশ্বর গ্রামে আর থাকতে পারলে না। গ্রামে নেই লোকজন। তার সমবয়সী এমন কোনো ভদ্রলোকের ছেলে নেই যার সঙ্গে দু'দণ্ড কথাবার্তা বলা যায়। সন্ধ্যা আট্টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়াই গ্রামের নিয়ম। তারপর কোনদিকে সাড়াশব্দ নেই।

ক্রমশ এ-জীবন সুরেশ্বরের অসহ্য হয়ে উঠল। সে ঠিক করলে কলকাতায় এসে টুইশানি করেও যদি চালায়, তবুও তো শহরে সে থাকতে পারবে এখন।

আজ মাস পাঁচ-ছয় আগে সুরেশ্বর কলকাতায় আসে এবং দেশের একজন পরিচিত লোকের মেসে ওঠে। এতদিন এক-আধটা টুইশানি করেই চালাচ্ছিল, সম্প্রতি এই চাকরিটা পেয়েচে, তারই এক ছাত্রের পিতার সাহায্যে ও সুপারিশে। সঙ্গে তিন বাক্স ঔষধপত্রের নমুনা আছে বলে তাদের ফার্মের মোটরগাড়ি ওকে চাঁদপাল ঘাটে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

এই প্রথম চাকরি এবং এই প্রথম দূর বিদেশে যাওয়া—সুরেশ্বরের মনে খানিকটা আনন্দ ও খানিকটা বিষাদমেশানো এক অদ্ভুত ভাব। একদল মানুষ আছে, যারা অজানা দূর বিদেশে নতুন নতুন বিপদের সামনে পড়বার সুযোগ পেলে নেচে ওঠে—সুরেশ্বর ঠিক সে-দলের নয়। সে নিতান্তই ঘরকুনো ও নিরীহ ধরনের মানুষ—তার মতো লোক নিরাপদে চাকরি করে আর দশজন বাঙালি ভদ্রলোকের মতো নির্বিঘ্নে সংসারধর্ম পালন করতে পারলে সুখী হয়।

তাকে যে বিদেশে যেতে হচ্ছে—তাও যে-সে বিদেশ নয়, সমুদ্রপারের দেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে—সে নিতান্তই দায়ে পড়ে। নইলে চাকরি থাকে না! সে চায়নি এবং ভেবেও রেখেছে এইবার নিরাপদে ফিরে আসতে পারলে অন্য চাকরির চেষ্টা করবে।

কিন্তু জাহাজ ছাড়বার পরে সুরেশ্বরের মন্দ লাগছিল না। ধীরে ধীরে বোটানিক্যাল

গার্ডেন, দুইতীরব্যাপী কলকারখানা পেছনে ফেলে রেখে প্রকাণ্ড জাহাজখানা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভোর ছটায় জাহাজ ছেড়েছিল, এখন বেশ রৌদ্র উঠেছে, ডেকের একদিকে অনেকখানি জায়গায় যাত্রীরা ডেক-চেয়ার পেতে গল্পগুজব জুড়ে দিয়েছে, স্টীমারের একজন কর্মচারী সবাইকে বলে গেল পাইলট নেমে যাওয়ার আগে যদি ডাঙায় কোনো চিঠি পাঠানো দরকার হয় তা যেন লিখে রাখা হয়।

বয় এসে বল্লে—আপনাকে চায়ের বদলে আর কিছু দেব?

সুরেশ্বর সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী, সে চা খায় না, এ-খবর আগেই জানিয়েছিল এবং কিছু আগে সকলকে চা দেওয়ার সময়ে চায়ের পেয়ালা সে ফেরত দিয়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—না, কিছু দরকার নেই।

বয় চলে গেল।

এমন সময় কে একজন বেশ মার্জিত ভদ্র সুরে ও পেছনের দিক থেকে জিজ্ঞেস করলে—মাপ করবেন, মশায় কি বাঙালি?

সুরেশ্বর পেছনে ফিরে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে এইমাত্র একজন নব আগন্তুক যাত্রী তার ডেক-চেয়ার পাতবার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছে ও তাকে প্রশ্ন করছে। তার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়, একহারা, দীর্ঘ সুঠাম চেহারা, সুন্দর মুখশ্রী, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল—সবসুদ্ধ মিলিয়ে বেশ সুপুরুষ।

সুরেশ্বর উত্তর দেওয়ার আগেই সে-লোকটি হাসিমুখে বল্লে—কিছু মনে করবেন না, একসঙ্গেই কদিন থাকতে হবে আপনার সঙ্গে, একটু আলাদা করে নিতে চাই। প্রথমটা বুঝতে পারিনি আপনি বাঙালি কি না।

—না, আর যাঁরা যাচ্ছেন—সবাই ডেকে। একজন কেবল ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। আপনি কতদূর যাবেন—রেঙ্গুনে?

—আপাতত তা-ই বটে—সেখান থেকে যাব সিঙ্গাপুর।

—বেশ, বেশ, খুব ভাল হল। আমিও তা-ই। সরে এসে বসুন এদিকে, আপনার সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ জমিয়ে নিই। বাঁচলুম আপনাকে পেয়ে।

সুরেশ্বর শীঘ্রই তার সঙ্গীটির বিষয়ে তার নিজের মুখেই অনেক কথা শুনলে। ওর নাম বিমলচন্দ্র বসু, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে ডাক্তারি করবার চেষ্টায় সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। বিমলের বাড়ি কলকাতায়, ওদের অবস্থা বেশ ভালই। ওদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের বন্ধু সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করেন, তাঁর নামে বিমল চিঠি নিয়ে যাচ্ছে।

কথাবার্তা শুনে সুরেশ্বরের মনে হল বিমল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী। নতুন দেশে নতুন জীবনের মধ্যে যাবার আনন্দেই সে মশগুল। সে বেশ সবল যুবকও বটে। অবশ্যি সুরেশ্বর নিজেও গায়ে ভালই শক্তি ধরে, এক সময়ে রীতিমতো ব্যায়াম ও কুস্তি করত, তারপর গ্রামে অনেক দিন থাকার সময়ে সে মাটি-কোপানো, কাঠ-কাটা প্রভৃতি সংসারের কাজ নিজের হাতে করত বলে হাত পা যথেষ্ট শক্ত ও কর্মক্ষম।

ক্রমে বেলা বেশ পড়ে এল। সুরেশ্বর ও বিমল ডেকে বসে নানারকম গল্প করছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমল বল্লে—আমি একবার কেবিন থেকে আসি, আপনি বসুন। ডায়মন্ডহারবার ছাড়িয়েছে, এখুনি পাইলট নেমে যাবে। আমার চিঠিপত্র দিতে হবে ওর সঙ্গে। আপনি যদি চিঠিপত্র দেন তবে এই বেলা লিখে রাখুন।

সাগর-পয়েন্টের বাতিঘর দূর থেকে দেখা যাওয়ার কিছু আগেই কলকাতা বন্দরের পাইলট জাহাজ থেকে নেমে একখানা স্টীমলঞ্চে কলকাতার দিকে চলে গেল।

সাগর-পয়েন্টে ছাড়িয়ে কিছু পরেই সমুদ্র—কোনো দিকে ডাঙা দেখা যায় না—ঈষৎ ঘোলা ও পাটকিলে রঙের জলরাশি চারিধারে। সন্ধ্যা হয়েছে, সাগর-পয়েন্টের বাতিঘরে আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলছে, কতকগুলো সাদা গাঙচিল জাহাজের বেতারের মাস্তুলের ওপর উড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করছে বলে বিমল কেবিন থেকে ওভারকোটটা আনতে গেল, সুরেশ্বর ডেকে বসে রইল।

জ্যোৎস্না রাত। ডেকের রেলিং-এর ধারে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, সুরেশ্বরের মন এইসন্ধ্যায় খুবই খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ বাড়ির কথা ভেবে, বৃদ্ধ বাপমায়ের কথা ভেবে, আসবার সময়ে বোন প্রভার অশ্রুসজল করুণ মুখখানির কথা ভেবে।

পূর্বেই বলেছি সুরেশ্বর নিরীহ প্রকৃতির ঘরোয়া ধরনের লোক। বিদেশে যাচ্ছে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চাকরির খাতিরে। বিমল যদিও সুরেশ্বরের মতো ঘরকুনো নয়, তবুও তার সিঙ্গাপুরে যাবার মধ্যে কোনো দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল না। সে চিঠি নিয়ে যাচ্ছে পরিচিত বন্ধুর নিকট থেকে সেখানকার লোকের নামে, তারা ওকে সন্ধান বলে দেবে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে; তারপর বিমল সেখানে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে গেটের গায়ে নাম-খোদাই পেতলের পাত বসিয়ে শান্ত ও সুবোধ বালকের মতো ডাক্তারি আরম্ভ করে দেবে—এই ছিল তার মতলব। যেমন পাঁচজনে দেশে বাস করছে, সে নাহয় গিয়ে করবে সিঙ্গাপুরে।

কিন্তু দুজনেই জানত না একটা কথা।

তারা জানত না যে নিরুপদ্রব, শান্তভাবে ডাক্তারি ও ওষুধের ক্যানভাসারি করতে তারা যাচ্ছে না—তাদের অদৃষ্ট তাদের দুজনকে একসঙ্গে গেঁথে নিয়ে চলেছে এক বিপদসঙ্কুল পথযাত্রায় এবং তাদের দুজনের জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার দিকে।

জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে। বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

একদিন দুপুরে বিমল সুরেশ্বরকে উত্তেজিত সুরে ডাক দিয়ে বল্লে—চট করে চলে আসুন, দেখুন, কী একটা জন্তু!

জন্তুটা আর কিছু নয়, উড্ডীয়মান মৎস্য। জাহাজের শব্দে জল থেকে উঠে খানিকটা উড়ে আবার জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম সুরেশ্বর উড্ডীন মৎস্য দেখলে; ছেলেবেলায় চারুপাঠে ছবি দেখেছিল বটে।

মাঝে মাঝে অন্য অন্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রায়ই কলিকাতাগামী জাহাজ।

ওরা জাহাজের নাম পড়ছে—ওরা কেন, সবাই। এ-অকূল জলরাশির দেশে অন্য একখানা জাহাজ ও অন্য লোকজন দেখতে পাওয়া যেন কত অভিনব দৃশ্য! শত শত যাত্রী ঝুঁকে পড়েছে সাগ্রহে রেলিংয়ের ওপর, নাম পড়ছে, কত কী মন্তব্য করছে। ওরাও নাম পড়লে—একখানার নাম ড্যালহাউসি, একখানার নাম ইরাবতী, একখানার নামের কোনো মানে হয় না—কিলাওয়াজা—অন্তত ওরা তো কোনো মানে খুঁজে পেলে না। একখানা জাপানি এন. ওয়াই. কে. লাইনের জাহাজ হিদজুমারু, উদীয়মান সূর্য-আঁকা পতাকা ওড়ানো।

দুদিনের দিন রাত্রে বেসিন লাইট হাউসের আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর সমুদ্র-পীড়ায় কাতর হয়ে পড়েছে, কিন্তু বিমল ঠিক খাড়া আছে, যদিও তার খাওয়ার ইচ্ছা প্রায় লোপ পেয়েছে। সুরেশ্বর তো কিছুই খেতে পারে না, যা খায় পেটে

তলায় না, দিনরাত কেবিনে শুয়ে আছে, মাথা তুলবার ক্ষমতা নেই।

জাহাজের স্টুয়ার্ড এসে দেখে গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

কী বিশ্রী জিনিস এই পরের চাকরি! এত হাঙ্গামা পোয়ানো কি ওর পোষায়? দিব্যি ছিল, বাড়িতে খাচ্ছিল দাচ্ছিল। চাকরির খাতিরে বিদেশে বেরিয়ে কী ঝকমারি দেখ তো!

বিমল আপন মনে ডেকে বসে বই পড়ে, স্ফূর্তিতে শিস দেয়, গান করে। সুরেশ্বরকে ঠাট্টা করে বলে—হোয়াট এ গুড সেলার ইউ আর!

তিন দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত জাহাজে চলবার পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এলিফ্যান্ট পয়েন্টের লাইটহাউস দেখা গেল।

বেলাভূমি যদিও দেখা যায় না, তবুও সমুদ্রের জলের ঘোর নীল রং ক্রমশ সবুজ হয়ে ওঠাতে বোঝা গেল যে ডাঙা বেশি দূরে নেই। ডাঙার গাছপালা মাঝে মাঝে জলে ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার অল্প পরেই জাহাজ ইরাবতীর মোহনায় প্রবেশ করলে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল, রয়েল মেলের নিশান উঠিয়ে দেওয়া হল মাস্তুলে। সন্ধ্যাকাশ তখনও যেন লাল। সন্ধ্যাতারার সঙ্গে চাঁদ উঠেছে পশ্চিমাকাশে—ইরাবতীবক্ষে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

জাহাজ কিছুদূর গিয়ে নোঙর ফেললে। রাত্রে ইরাবতী নদীতে বড় জাহাজ চালানোর নিয়ম নেই। রেঙ্গুনের পাইলট রাত্রে জাহাজে থাকবে, সকালে ইরাবতীবক্ষে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

ভোরবেলায় কেবিন থেকে ঘুমচোখে বেরিয়ে এসে সুরেশ্বর দেখলে জাহাজ চলছে ইরাবতীর দুই তীরের সমতলভূমি ও ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। যতদূর চোখ যায় নিম্ন বঙ্গের মতো শস্যশ্যামলা ঘন সবুজ ভূমি, কাঠের ঘরবাড়ি। তার পরেই রেঙ্গুনে পৌঁছে গেল জাহাজ।

সুরেশ্বর বা বিমল কেউই রেঙ্গুনে নামবে না। সুরেশ্বরের রেঙ্গুনে কাজ আছে বটে, কিন্তু সে ফিরবার মুখে। ওরা দুজনেই এ-জাহাজ থেকে সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে ওদের জিনিসপত্র রেখে শহর বেড়াতে বেরুল।

বেশি কিছু দেখবার সময় নেই। দুপুরের পরেই সিঙ্গাপুরের জাহাজ ছাড়বে, জাহাজের 'পার্সার' বলে দিলে বেলা সাড়ে বারোটার আগেই ফিরে আসতে।

নতুন দেশ, নতুন মানুষের ভিড়। ওরা যা কিছু দেখছে, বেশ লাগছে ওদের চোখে। লেক, পার্ক ও সোয়েডাগোং প্যাগোডা দেখে ওরা জাহাজে ফিরবার কিছু পরেই জাহাজ ছেড়ে দিলে।

আবার অকূল সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি।

একদিন সুরেশ্বর বিমলকে বল্লে—দেখ বিমল, কাল রাত্রে বড় একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি।

এ-কয়েকদিনের মেলামেশায় তাদের পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা 'তুমি'তে পৌঁচেছে।

—কী স্বপ্ন?

—তুমি আর আমি ছোট একটা অদ্ভুত গড়নের বজরা-নৌকা করে সমুদ্রে কোথায় যাচ্ছি। সে-ধরনের বজরা আমি ছবিতে দেখেছি, ঠিক বোঝাতে পারছি নে এখন। তারপর ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, খালি ধোঁয়া—বিশ্রী কালো ধোঁয়া—

—আমরা বাঁচলাম তো! না খসলাম?

কথা শেষ করে বিমল হো হো করে হেসে উঠল। সুরেশ্বর চুপ করে রইল।

বিমল বল্লে—আমি একটা প্রস্তাব করি শোনো। চল দুজনে সিঙ্গাপুর গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ডাক্তারখানা খুলি। তুমি তোমার কোম্পানিকে বলে ওষুধ আনাবে। বেশ ভাল হবে। আমি ডাক্তারি করব।

রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ছেড়ে দুই দিন দুই রাত অনবরত যাওয়ার পরে চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখা গেল। রেঙ্গুনের মত সমতলভূমি নয়, উঁচু-নিচু, যেদিকে চাও সেদিকে পাহাড়। উপকূলের চতুর্দিকেই মাছ ধরবার বিপুল আয়োজন, বড় বড় কালো রঙের খুঁটি দিয়ে ঘেরা, জাল ফেলা। জেলেদের থাকবার টিনের ঘর। পালতোলা জেলে-ডিঙিতে অহরহ তীর আচ্ছন্ন।

পিনাং বন্দরে জাহাজ ঢুকবামাত্রই অসংখ্য সাম্পান এসে জাহাজের চারিধারে ঘিরলে। মাঝিরা সকলেই চীনেম্যান।

ওরা সাম্পানে করে বন্দরে নেমে শহর দেখতে বার হল। ঘণ্টা হিসাবে দুজনে একখানা রিকশা করলে—ঘণ্টাপিছু কুড়ি সেন্ট ভাড়া।

পিনাঙে ঠিক সমুদ্রতীরে একটু সমতলভূমি, চারিদিকেই পাহাড়, অনেকগুলো ছোট নদী এইসব পাহাড় থেকে বার হয়ে শহরের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

ওরা একটা পাহাড়ের ওপর মীনা মঠ দেখতে গেল। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, বাগান, পুরোহিতের ঘর, দেবমন্দির স্তরে স্তরে উঠেছে। বাগানের চারিদিকে নালার ঝরনায় স্রোতে কত পদ্মগাছ! মন্দিরের মধ্যে টেওস্ট ধর্মজ দেবমূর্তি।

এদের মধ্যে একটি মূর্তি দেখে সুরেশ্বর চমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কোনো চীনা দেবতার মূর্তি, ভ্রূকুটি-কুটিল, কঠিন, রুক্ষ মুখ! হাতে অস্ত্র, দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত আক্রোশপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্বংস করতে উদ্যত।

বিমল বল্লে—কী, দাঁড়ালে যে?

—দেখছ মূর্তিটা? মুখচোখের কী ভয়ানক নিষ্ঠুর ভাব দেখেছ?

মন্দিরের পুরোহিতদের জিগ্যেস করে জানা গেল ওটি টেওস্ট রণ-দেবতার মূর্তি।

হঠাৎ সুরেশ্বর বল্লে—চল, এখান থেকে চলে যাই।

বিস্মিত বিমল বল্লে—ওকী! পাহাড়ের উপরে যাবে না?

সুরেশ্বর আর উঠতে অনিচ্ছুক দেখে বিমল ওকে নিয়ে জাহাজে ফিরল।

পথে বল্লে—তোমার কী হল হে সুরেশ্বর? ওরকম মুখ গম্ভীর করে মনমরা হয়ে পড়লে কেন?

সুরেশ্বর বল্লে—কই না! ও কিছু নয়, চল।

জাহাজে ফিরে এসেও কিন্তু সুরেশ্বরের সে-ভাব দূর হল না। ভাল করে কথা কয় না, কী যেন ভাবছে। নৈশভোজের টেবিলে ও ভাল করে খেতেও পারলে না।

রাত ন'টার পরে পিনাং থেকে জাহাজ ছাড়লে সুরেশ্বর যেন কিছু স্বস্তি অনুভব করলে। পিনাং বন্দরের জেটির আলোকমালা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওরা ডেকে এসে বসেছে নৈশভোজের পরে।

হঠাৎ সুরেশ্বর বলে উঠল—উঃ, কী ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম ওই চীনাদেবতার মূর্তিটা দেখে!

বিমল হেসে বল্লে—আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু, সত্যি তুমি এত ভীতু তা তো জানি নে! স্বীকার করি মূর্তিটা অবিশ্যি কমনীয় নয়, তবুও—

সুরেশ্বর গম্ভীর মুখে বল্লে—আমার মনে হচ্ছে কী জান বিমল? আমরা যেন এই

দেবতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছি। সব সময় সব জায়গায় যেতে নেই। আমরা সন্ধ্যাবেলা ঐ চীনে মন্দিরে গিয়ে ভাল কাজ করিনি।

পিনাং থেকে ছাড়বার তিন দিন পরে জাহাজ সিঙ্গাপুর পৌঁছুল।

দূর থেকে সিঙ্গাপুরের দৃশ্য দেখে বিমল ও সুরেশ্বর খুব খুশি হয়ে উঠল। শুধু মালয় উপদ্বীপ কেন, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটি প্রধান বন্দর, বন্দরে ঢুকবার সময়েই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় জলের মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তাদের ওপর সুদৃশ্য ঘরবাড়ি—চারিদিকে পিনাং-এর মতো মাছ ধরবার প্রকাণ্ড আড্ডা। নীল রং-এ চিত্রিত চক্ষু ড্রাগন ঝোলানো পাল-তোলা সেই চীনা জাঙ্ক ও সাম্পানে সমুদ্রবক্ষ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বন্দরে ঢুকবার মুখেই একখানা ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ প্রায় মাঝ-দরিয়ায় নোঙর করে আছে কয়লা নেবার জন্যে। তার প্রকাণ্ড ফোকরওয়ালা দুই কামান ওদের দিকে মুখ হাঁ করে আছে যেন ওদের গিলবার লোভে। আরও নানা ধরনের জাহাজ, স্টীমলঞ্চ, সাম্পান মালয়। নৌকার ভিড়ে বন্দরের জল দেখা যায় না। যেদিকে চোখ পড়ে শুধু নৌকো আর জাহাজ, বিমলের মনে হল কলকাতা এর কাছে কোথায় লাগে? তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বড় বন্দর।

চারিধারেই বারসমুদ্র, বন্দরের মুখে ছোট-বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে দুখানা বড় যুদ্ধ-জাহাজ ওদের চোখে পড়ল। বন্দরের উত্তর-পূর্ব কোণে তিন মাইলের পরে বিখ্যাত নৌবহরের আড্ডা। দূর থেকে দেখা যায়, বড় বড় ইস্পাতের খুঁটি, বেতারের মাস্তুলে সেদিকটা অরণ্যের সৃষ্টি করেছে।

জাহাজের কয়লা নেবার একটা প্রধান আড্ডা সিঙ্গাপুর। পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে পূর্বগামী সবরকম জাহাজকেই এখানে দাঁড়াতে হবে কয়লার জন্যে। এর বিপুল ব্যবস্থা আছে, বহুদূর ধরে পর্বতাকারে কয়লা রক্ষিত হয়েছে, যেন সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দূর পর্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন কয়লার পাহাড়ের সারি চলে গিয়েছে।

বন্দরে জাহাজ এসে থামলে সুরেশ্বর ও বিমল চীনে কুলি দিয়ে মালপত্র এনে দুখানা রিকশা ভাড়া করলে। ওরা দুজনেই একটা ভারতীয় হোটেল দেখে নিয়ে সেখানে উঠল। বিকালের দিকে সুরেশ্বর তার ওষুধের ফার্মের কাজে কয়েক জায়গায় ঘুরে এল, বিমল যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে সুরেশ্বর জিগ্যেস করলে, কী হয়েছে? অমনভাবে বসে কেন?

বিমল বল্লে—ভাই, এতদূরে পয়সা খরচ করে আসাই মিথ্যে হল। আমি যা ভেবে এখানে এলুম তা হবার কোনো আশা নেই। যে-ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিলাম, তাঁর নিজের ভাগনে ডাক্তার হয়ে এসে বসেছে। আমার কোনো আশাই নেই।

সুরেশ্বর বল্লে—তাতে কী হয়েছে? এতবড় সিঙ্গাপুর শহরে দুজন বাঙালি ডাক্তারের স্থান হবে না? খেপেছ তুমি? আমি ওষুধের দোকান খুলছি, তুমি সেখানে ডাক্তার হয়ে বোসো। দেখ কী হয় না হয়।

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে হল তাদের ঘরের বাইরে জানলার কাছে কে যেন একজন ওদের কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

বিমল বল্লে—ও কে?

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তার মনে হল একজন যেন বারান্দার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে ফিরে এসে বল্লে—ও কিছু না, কে একজন গেল।

তারপর ওরা দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একখানা ওষুধের দোকান খুলবার সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করলে। বিমল হাজারখানেক টাকা এখন ঢালতে প্রস্তুত আছে, সুরেশ্বর নিজেদের ফার্মকে বলে ওষুধের যোগাড় করবে।

বড় ডাকঘরের ক্লক টাওয়ারে ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজল। হোটেলের চাকর এসে দুজনের খাবার দিয়ে গেল। শিখের হোটেল, মোটা মোটা সুস্বাদু রুটি ও মাংস, আস্ত মাসকলায়ের ডাল ও আলুর তরকারি—এই আহার্য। সারাদিনের ক্লান্তির পরে তা অমৃতের মতো লাগল ওদের।

আহারাদি সেরে সুরেশ্বর শোবার যোগাড় করতে যাচ্ছে, এমন সময় বিমল হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে।

সুরেশ্বর বল্লে—কী?

বিমল ফিরে এসে বিছানায় বসল। বল্লে—আমার ঠিক মনে হল কে একজন জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কাউকে দেখলুম না কিন্তু—

সুরেশ্বরের কী রকম সন্দেহ হল। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, নানারকম বিপদের আশঙ্কা এখানে পদে পদে। সে বল্লে, সাবধান থাকাই ভাল। দরজা বেশ করে বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়। রাতও হয়েছে অনেক।

সুরেশ্বরের ঘুম ছিল সজাগ। তাই অনেক রাত্রে একটা কিসের শব্দে ও ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসল সন্দিগ্ধ মন নিয়ে।

বিছানার শিয়রের দিকে জানালাটা খোলা ছিল। বিছানা ও জানলার মধ্যে একটা ছোট টেবিলের দিকে নজর পড়াতে সুরেশ্বর দেখলে টেবিলটার ওপর ঢিল জড়ানো এক টুকরো কাগজ। এটাই বোধহয় একটু আগে জানলা দিয়ে এসে পড়েছে, তার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েচে। ঘরে আলো জ্বালাই ছিল। কাগজের টুকরোটা ও পড়লে, তাতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে—

আপনারা ভারতীয়! যতদূর জানতে পেরেছি সিঙ্গাপুরে আপনারা নবাগত ও চিকিৎসাব্যবসায়ী। কাল দুপুরবেলা বোটানিক্যাল গার্ডেনে অর্কিডের ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে বড় ডুরিয়ান ফলের গাছ আছে, তার নিচে অপেক্ষা করবেন দুজনেই। আপনাদের দুজনের পক্ষেই লাভজনক কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। আসতে ইতস্তত করবেন না।

লেখার নিচে নাম-সই নেই।

বিমলও কাগজখানা পড়লে।

ব্যাপার কি? এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

সুরেশ্বরই প্রথমে কথা বল্লে। বল্লে—কেউ তামাশা করেছে বলে মনে হচ্ছে, কী বল? কিন্তু তা-ই-বা করবে কে, আমাদের চেনেই-বা কে?

বিমল চিন্তিত মুখে বল্লে—কিছু বুঝতে পারছি নে। কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না কি?

—কী খারাপ উদ্দেশ্য? আমরা যে খুব বড়লোক নই, তার প্রমাণ ভিক্টোরিয়া হোটেল বা এম্পায়ার হোটেলে না উঠে এখানে উঠেছি। টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়েও যাচ্ছিনে। সুতরাং কী করতে পারে আমাদের?

সে-রাত্রের মতো দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে বিমল বল্লে—চল যাওয়াই যাক। এত ভয় কিসের? বোটানিক্যাল গার্ডেন

তো আর নির্জন মরুভূমি নয়, সেখানে কত লোক বেড়ায় নিশ্চয়ই। দুজনকে খুন করে দিনের আলোয় টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে, এত ভরসা কারু হবে না।

দুপুরের পর হোটেল থেকে বেরিয়ে কুয়ালা জোহোর স্ট্রীটের মোড় থেকে একখানা রিকশা ভাড়া করলে। ম্যাসিডন কোম্পানির সোডাওয়াটারের দোকানের সামনে একজন চীনা ভদ্রলোক ওদের রিকশা থামিয়ে চীনে রিকশাওয়ালাকে কী জিগ্যেস করলে। তারপর উত্তর পেয়ে লোকটি চলে গেল। বিমল রিকশাওয়ালাকে ইংরিজিতে জিগ্যেস করলে—কী বল্লে তোমাকে হে?

রিকশাওয়ালা বল্লে—জিগ্যেস করলে সওদাগরী কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—তুমি কী বল্লে?

—আমি কিছু বলিনি। বলবার নিয়ম নেই আমাদের। সিঙ্গাপুর খারাপ জায়গা, মিস্টার।

বোটানিক্যাল গার্ডেন শহর ছাড়িয়ে প্রায় দুমইল দূরে। শহর ছাড়িয়েই প্রকাণ্ড একটা কিসের কারখানা। তারপর পথের দু'ধারে ধনী মালয়, ইউরোপীয় ও চীনাদের বাগানবাড়ি। এমন ঘন সবুজ গাছপালার সমাবেশ ও শোভা, বিমল ও সুরেশ্বর বাংলাদেশের ছেলে হয়েও দেখেনি—কারণ বিষুবরেখার নিকটবর্তী এইসব স্থানের মতো উদ্ভিদ সংস্থান ও প্রাচুর্য পৃথিবীর অন্য কোথাও হওয়া সম্ভব নয়।

মাঝে মাঝে রবারের বাগান।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌঁছে ওরা রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করলে। প্রকাণ্ড বড় বাগান। কত ধরনের গাছপালা, বেশির ভাগই মালয় উপদ্বীপজাত। বড় বড় রুটিফলের গাছ, ডুরিয়ান, পাকবার সময় বলে ডুরিয়ান ফলের গাছের নিচে দিয়ে যেতে পাকা ডুরিয়ান ফলের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নারিকেলকুঞ্জ একটি অদ্ভুত সৌন্দর্যময় স্থান। এত উঁচু উঁচু নারিকেল গাছের এমন ঘন সন্নিবেশ ওরা কোথাও দেখেনি। নিস্তব্ধ দুপুরে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মাথায় কী পাখি ডাকছে সুস্বরে, আকাশ সুনীল, জায়গাটা বড় ভাল লাগল ওদের। অর্কিড হাউস খুঁজে বার করে তার উত্তর-পূর্ব কোণে সত্যই খুব বড় একটা ডুরিয়ান ফলের গাছ দেখা গেল। সে-গাছেরও ফল পেকে যথারীতি দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

বিমল বললে—একটু সতর্ক থাক! দেখা যাক না কী হয়!

সবুজ টিয়ার ঝাঁক গাছের ডালে ডালে উড়ে বসেছে। একটা অপূর্ব শান্তি চারিদিকে—ওরা দুজনে ডুরিয়ান গাছের ছায়ায় শুকনো তালপাতা পেতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

মিনিট-তিনও হয়নি, এমন সময় কিছুদূরে এক মাদ্রাজি ও একজন চীনা ভদ্রলোককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর ও বিমল দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

ওরা কাছে এসে অভিবাদন করলে। মাদ্রাজি ভদ্রলোকটি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুবেশ, তিনি বেশ পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন—আপনারা ঠিক এসেছেন তা হলে। ইনি মিঃ আ-চিন্ স্থানীয় কনসুলেট অপিসের মিলিটারি অ্যাটাসে। আমার নাম সুব্বা রাও।

পরস্পরের অভিবাদন-বিনিময় শেষ হবার পর চারজনই সেই ডুরিয়ান গাছের তলায় বসল। সমগ্র বোটানিক্যাল গার্ডেনে এর চেয়ে নির্জন স্থান আছে কি না সন্দেহ।

সুব্বা রাও বললেন—প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস করি—আপনারা দুজনেই উপাধিধারী ডাক্তার তো? সুরেশ্বর বললে, সে ডাক্তার নয়, ঔষধ-ব্যবসায়ী। বিমল পাসকরা ডাক্তার।

এ-কথার উত্তরে আ-চিন্ বললে—দুজনকেই আমাদের দরকার। একটা কথা প্রথমেই

বলি, আমাদের দেশ ঘোর বিপন্ন। আমরা ভারতের সাহায্য চাই। জাপান অন্যায়ভাবে আমাদের আক্রমণ করছে, দেশে খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। আমরা গোপনে ডাক্তারি ইউনিট গঠন করে দেশে পাঠাচ্ছি। কারণ আইনত বিদেশ থেকে আমরা তা সংগ্রহ করতে পারি না। আপনারা বুদ্ধের দেশের লোক, আমরা আপনাদের মন্ত্রশিষ্য। আমাদের সাহায্য করুন। এর বদলে আমাদের দরিদ্র দেশ দুশো ডলার মাসিক বেতন ও অন্যান্য খরচ দেবে। এখন আপনারা বিবেচনা করে বলুন আপনাদের কী মতো।

সুরেশ্বর বললে—যদি রাজি হই, কবে যেতে হবে?

—এক সপ্তাহের মধ্যে। লুকিয়ে যেতে হবে, কারণ এখন হংকং যাবার পাসপোর্ট আপনারা পাবেন না। আমার গভর্নমেন্ট সে-ব্যবস্থা করবেন ও আপনাদের এখানে এই এক সপ্তাহ থাকার খরচ বহন করবেন। আপনারা যদি রাজি হন, আমার গভর্নমেন্ট আপনাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সুব্বা রাও বললেন—জবাব এখুনি দিতে হবে না। ভেবে দেখুন আপনারা। আজ সন্ধ্যাবেলা জোহোর স্ট্রীটের বড় ব্যান্ডস্ট্যান্ডের কাছে আমি ও আ-চিন্ থাকব। কিন্তু দয়া করে কাউকে জানাবেন না।

ওরা চলে গেলে বিমল বল্লে—কী বল সুরেশ্বর, শুনলে তো সব ব্যাপার?

সুরেশ্বর বল্লে—চল যাই। এখন আমাদের বয়স কম, দেশবিদেশে যাবার তো এই সময়। একটা বড় যুদ্ধের সময় মেডিকেল ইউনিটে থাকলে ডাক্তার হিসেবে তোমারও অনেক জ্ঞান হবে। চীনদেশটাও দেখা হয়ে যাবে পরের পয়সায়।

বিমল বল্লে—আমার তো খুবই ইচ্ছে, শুধু তুমি কী বল তাই ভাবছিলুম।

সন্ধ্যাবেলায় ওরা এসে জোহোর স্ট্রীটের পার্কের ব্যান্ডস্ট্যান্ডের কোণে আ-চিন্ ও সুব্বা রাওয়ের সাক্ষাৎ পেলে। ওদের সব কথাবার্তা শুনে আ-চিন্ বল্লে—তা হলে আপনাদের রওনা হতে হবে কাল রাত্রে। ক'দিন আপনাদের হোটেলের বিল যা হয়েছে তা কাল বিকেলেই চুকিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা এইখানে অপেক্ষা করবেন। বাকি ব্যবস্থা আমি করব। আর এই নিন—

কথা শেষ করে বিমলের হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে আ-চিন্ ও সুব্বা রাও চলে গেলেন।

বিমল খুলে দেখলে কাগজখানা একশো ডলারের নোট।

পরদিন সকাল থেকে ওরা বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা, কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রইল। বৈকালে নির্দেশমত আবার ব্যান্ডস্ট্যান্ডের কোণে এসে দাঁড়াল।

একটু পরেই আ-চিন্ এলেন। বিমলকে জিগ্যেস কল্লেন—আপনাদের জিনিসপত্র?

—হোটেলে আছে।

হোটেলে রেখে ভাল করেননি। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে গিয়ে জিনিসপত্র তুলে এখানে নিয়ে আসুন। আমি এখানেই থাকি। পার্কের কোণে ছোট রাস্তার ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে হর্ন দিতে বলবেন। আপনাদের আর কিছু লাগবে?

—না, ধন্যবাদ। যা দিয়েছেন, তা-ই যথেষ্ট।

আধঘণ্টার মধ্যেই বিমল ও সুরেশ্বর ট্যাক্সিতে ফিরে পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতে লাগল।

আ-চিন্ এসে ওদের গাড়িতে উঠে মালয় ভাষায় ড্রাইভারকে কী বল্লেন। সে ট্যাক্সি বড় পোস্টঅফিসের সামনে এসে দাঁড় করাল।

বিমল বল্লে—এখানে কী হবে?

বিমলের কথা শেষ হতে-না-হতে ওদের ট্যাক্সির পাশে একখানা নীল রংয়ের হুইপেট গাড়ি এসে দাঁড়াল। স্টিয়ারিং ধরে আছে একজন চীনা ড্রাইভার।

আ-চিন্ বল্লেন—উঠুন পাশের গাড়িতে।

পরে তাঁর ইঙ্গিতমতো দুজন ড্রাইভারে মিলে জিনিসপত্র সব নতুন গাড়িখানায় তুলে দিলে। গাড়ি যখন তীরবেগে সিঙ্গাপুরের অজানা বড় রাস্তা বেয়ে চলেছে, তখন বিমল বল্লে—অত সদরে দাঁড়িয়ে ও-ব্যবস্থা করলেন কেন? কেউ যদি টের পেয়ে থাকে?

আ-চিন্ বল্লেন—কেউ করবে না জানি বলেই ঐ ব্যবস্থা। এ-সময়ে চীনা ডাক নিতে রোজ কনসুলেট অফিসের লোক ওখানে আসবে সকলেই জানে। আমার পরনে কনসুলেট ইউনিফর্ম, আমি লুকিয়ে কোনো কাজ করতে গেলেই লোকে সন্দেহের চোখে দেখবে। সদরে কেউ কিছু হঠাৎ মনে করবে না।

একটু পরেই সমুদ্র চোখে পড়ল—নারিকেলশ্রেণীর আড়ালে। শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে একটা নিভৃত স্থানে এসে গাড়ি একটা বাংলোর কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকল। পাশেই নীল সমুদ্র।

আ-চিন্ বল্লেন—এখানে নামতে হবে।

বাংলোর একটা ঘরে ওদের বসিয়ে আ-চিন্ বল্লেন—আমি যাই। এখানে নিশ্চিন্তমনে থাকুন। কোনো ভয় নেই। যথাসময়ে আপনাদের খাবার দেওয়া হবে। বাকি ব্যবস্থা সব রাত্রে।

তিনি চলে গেলেন। একটু পরে জনৈক চীনা ভৃত্য ছোট ছোট পেয়ালার সবুজ চা ও কুমড়োর বিচির কেক নিয়ে ওদের সামনে রাখলে।

বিমল বল্লে—এ আবার কী চিজ বাবা? ইঁদুর ভাজা-টাজা নয় তো?

সুরেশ্বর বল্লে—ইঁদুর নয়, কুমড়োর বিচি, তা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইঁদুর খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, নইলে হরিমটর খেয়ে থাকতে হবে চীনদেশে।

কিন্তু কেকগুলো ওদের মন্দ লাগল না। চা পানের পরে ওরা বাংলোর চারিধারে একটু ঘুরে বেড়ালে! সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে নির্জন স্থানে সমুদ্রতীরে বাংলোটি অবস্থিত। সুমদ্রের দিকে একসারি ঝাউ অপরাহ্ণের বাতাসে শোঁ শোঁ করছিল। দূরে সমুদ্রবক্ষে অস্তসূর্যের আভা পড়ে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

সুরেশ্বর ভাবছিল হুগলি জেলার তাদের সেই গ্রাম, তাদের পুরনো বাড়ি—বাপ-মায়ের কথা। জীর্ণ, সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটের পৈঠা বেয়ে মা পুকুরে গা ধুতে নামছেন এতক্ষণ।

জীবনে কী সব অদ্ভুত পরিবর্তনও ঘটে! তিন মাস মাত্র আগে সেও এমনি সন্ধ্যায় ঐ গ্রামের খালের ধারটিতে একা পায়চারি করে বেড়াত ও কীভাবে কোথায় গেলে চাকরি পাওয়া যায় সেই ভাবনাতে ব্যস্ত থাকত। আর আজ কোথায় কতদূরে এসে পড়েছে।

বিমল মুগ্ধ হয়েছিল এই সুদূরপ্রসারী শ্যামল সমুদ্রবেলার সান্ধ্যশোভার দৃশ্যে। সে ভাবছিল কবি ও ঔপন্যাসিকদের পক্ষে এমন বাংলো তো স্বর্গ—মাথার ওপরকার নীল আকাশ—এই সবুজ ঝাউয়ের সারি—ঐ সমুদ্রবক্ষের ছোট ছোট পাহাড়—সত্যিই স্বর্গ—

গভীর রাত্রে আ-চিন্ এসে ওদের ওঠালেন। একখানা মোটরে আধ মাইল আন্দাজ গিয়ে সমুদ্রতীরের একটা নির্জন স্থানে ওরা জিনিসপত্রসমেত ছোট একটা জালিবোটে উঠল। দূরে বন্দরের আলোর সারি দেখা যাচ্ছে—অন্ধকার রাত্রি, নির্জন সমুদ্রবক্ষ। কিছুদূরে একটা চীনা জাঙ্ক অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল—জালিবোট গিয়ে জাঙ্কের গায়ে লাগল।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওরা জাঙ্কে উঠল।

পাটাতনের নিচে একটা ছোট কামরা ওদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কামরাতে একটা চীনা মাদুর বিছানো, বেতের বালিশ, চীনা লণ্ঠন, রঙিন গালার পুতুল, কাঁচকড়ার ফুলের টবে নার্সিসাস ফুলগাছ—এমনকি ছোট খাঁচাসমেত একটি ক্যানারি পাখি।

আ-চিন্ বল্লেন—কামরা আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো?

সুরেশ্বর বল্লে—সুন্দর সাজানো কামরা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আ-চিন্ গম্ভীরভাবে বল্লেন—ধন্যবাদ আপনাদের। আমাদের বিপন্ন দেশকে দয়া করে আপনারা সাহায্য করবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে অজানা ভবিষ্যতের দিকে চলেছেন। ভগবান বুদ্ধের দেশের লোক আপনারা—সব সময়েই আপনারা আমাদের নমস্য। ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক।

সুরেশ্বর বল্লে—আপনি তো সঙ্গে যাবেন না—এ-নৌকো ঠিক জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে তো?

—সে বিষয় ভাববেন না। এ চীন গভর্নমেন্টের বেতনভোগী জাঙ্ক। তিন দিন পরে একখানা চীনা জাহাজ আপনাদের তুলে নেবে। কারণ সামনে দুস্তর চীন-সমুদ্র। জাঙ্কে সে-সমুদ্র পার হওয়া তো যাবে না!

আ-চিন্ বিদায় নেবার পরে নৌকা নোঙর ওঠালে। জাঙ্কের সুসজ্জিত কামরায় মোমবাতির আলো জ্বলছে। অনুকূল বায়ুভরে চীন-সমুদ্র বেয়ে নৌকা চলেছে—ঘন অন্ধকার, কেবল আলোকোৎক্ষেপক ঢেউগুলি যেন জোনাকির ঝাঁকের মতো জ্বলছে।

বিমল বল্লে—এখান থেকে হংকং সতেরোশো-আঠারোশো মাইল দূর। একে ভীষণ চীনসমুদ্র—আর এই জাঙ্ক তো এখানে মোচার খোলা! প্রাণ নিয়ে এখন ডাঙায় পা দিতে পারলে হয়!

সুরেশ্বর বল্লে—এসে ভাল করনি, বিমল। ঝোঁকের মাথায় তখন দুজনেই আ-চিনের কথায় ভুলে গেলুম কেমন—দেখলে? এই জাঙ্কে যদি তোমায় আমায় খুন করে এরা জলে ভাসিয়ে দেয়, এদের কে কী করবে? কেউ জানে না আমরা কোথায় আছি। কেউ একটা খোঁজ পর্যন্ত করবে না।

বিমল বল্লে—ওসব কথা ভেবে কেন মন খারাপ কর? বাইরে গিয়ে সমুদ্রের দৃশ্যটা একবার দ্যাখ। ফসফোরেসেন্ট ঢেউগুলো কী চমৎকার দেখাচ্ছে!

মাঝে মাঝে কেমন একপ্রকার শব্দ হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে। ওগুলো কী? ওরা কাউকে কিছু বলতে পারে না, ইংরাজি ভাষা কে জানে নৌকায়, তা ওদের জানা নেই। রাত্রে ওদের ঘুম হল না। ক্রমে পুবদিক ফর্সা হয়ে এল, রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরে সূর্য উঠল।

সকাল থেকে নৌকা ভয়ানক নাচুনি ও দুলুনি শুরু করে দিল। চীনসমুদ্র অত্যন্ত বিপজ্জনক, সর্বদা চঞ্চল, ঝড়-তুফান লেগেই আছে। ওরা সমুদ্রপীড়ায় কাত হয়ে কামরার মধ্যে ঢুকে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আহার-বিহারে রুচি রইল না।

সেদিন বিকেলে এক মস্ত ঢেউয়ের মাথায় একটি কাটল ফিশ এসে পড়ল জাঙ্কের পাটাতনে। সেটি তখনও জ্যান্ত, পালাবার আগেই চীনা মাঝিরা ধরে ফেললে।

জাঙ্কে যা খাবার দেয়, সে ওদের মুখে ভাল লাগে না। ভাত ও শুঁটকি মাছের তরকারি। সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত দুটি বাঙালি যাত্রীর পক্ষে চীনা ভাত-তরকারি খাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সুরেশ্বর বল্লে—ঝকমারি করেছি এসে, ভাই। না খেয়ে তো দেখছি আপাতত মরতে হবে।

তৃতীয় দিন দুপুরে দূরে দিগ্বলয়ে একখানা বড় স্টীমারের ধোঁয়া দেখা গেল। ওরা দেখলে জাঙ্কের সারেং, দূরবীন দিয়ে সেদিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন মুখে কী আদেশ দিলে, মাঝিমাল্লারা পাল নামিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আবার উল্টোদিকে যাবে নাকি? ব্যাপার কী?

সুরেশ্বর সারেংকে জিগ্যেস করলে—নৌকা ঘোরাচ্ছ কেন?

সারেং অস্পষ্ট জাহাজটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বল্লে—ইংলিশ ক্রুজার, মিস্টার, ভেরি বিগ ক্রুজার—বিগ গান—

সুরেশ্বর বল্লে—তাতে তোমার ভয় কী? ওরা তোমাদের কিছু বলতে যাবে কেন?

কিন্তু সুরেশ্বর জানত না সারেং-এর আসল ভয়ের কারণ কোনখানে। চীনা সমুদ্রে চীনা বোম্বেটের উপদ্রব নিবারণের জন্যে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ সর্বপ্রকার চীনা নৌকা, জাহাজ ও জাঙ্কের ওপর—বিশেষ করে বন্দর থেকে দূরে বার-সমুদ্র দিয়ে যে-সব যায়—তাদের ওপর খরদৃষ্টি রাখে। ওদের জাঙ্ককে দেখে সন্দেহ হলেই থামিয়ে খানাতল্লাশ করবে। তা হলে এ জাঙ্কে যে বেআইনি আফিম রয়েছে পাটাতনের নিচে লুকোনো—তা ধরা পড়ে যাবে।

চীনা মাঝিগুলো অতিশয় ধূর্ত। যুদ্ধজাহাজ দূর থেকে যেমনি দেখা, অমনি জাঙ্ক মাঝ-সমুদ্রে ঝুপ করে নোঙর নামিয়ে দিলে ও পাটাতনের নিচে থেকে মাছ ধরার জাল বার করে সমুদ্রে ফেলতে লাগল—দেখতে দেখতে জাঙ্কখানা একখানি চীনা জেলেডিঙিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

বিমল বল্লে—উঃ, কী চালাক দেখেছ!

সুরেশ্বর বল্লে—চালাক তাই রক্ষে—নইলে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এসে যদি আমাদের ধরত—! বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণ করার অপরাধে তোমায়-আমায় জেল খাটতে হবে, সে-হুঁশ আছে?

ধূসরবর্ণের বিরাটকায় ব্রিটিশ ক্রুজারখানা ক্রমেই নিকটে এসে পড়ছে। এখন তার বড় ফোকরওয়ালা কামানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে একটা ধূসরবর্ণের পর্বত যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে।

যদি কোনো সন্দেহ করে একটি বড় কামান তাদের দিকে দাগে—আর ওদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে?

চীনা মাঝিমাল্লাগুলো মহা উৎসাহে ততক্ষণ জাল ফেলে মাছ ধরছে। সুরেশ্বর ও বিমলের বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে উদ্বেগে ও উত্তেজনায়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, যুদ্ধজাহাজখানা ওদের দিকে লক্ষ্যই করলে না। ওদের প্রায় একমাইল দূরে দিয়ে সোজা পূর্ণবেগে সিঙ্গাপুরের দিকে চলে গেল।

জাঙ্কসুদ্ধ লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

দুপুরের পরে দূরে একটি ছোট দ্বীপ দেখা গেল।

জাঙ্ক গিয়ে ক্রমে দ্বীপের পাশে নোঙর করলে। বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে নৌকার জল ফুরিয়ে গেছে—এবং এখানে মিষ্টি জল পাওয়া যায়।

ওরা সেখানে থাকতে থাকতে আর একখানা বড় জাঙ্ক বিপরীত দিক থেকে এসে ওদের কাছেই নোঙর করলে।

বিমলদের জাঙ্কের মাঝিরা বেশ একটু ভীত হয়ে পড়ল নবাগত নৌকোখানা দেখে। সকলেই ঘন ঘন চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে চায়—যদিও ভয়ের কারণ যে কী তা সুরেশ্বর বা বিমল কেউ বুঝতে পারলে না।

কিন্তু একটু পরে সেটা খুব ভাল করেই বোঝা গেল।

ও-নৌকো থেকে দশ-বারোজন গুণ্ডা ও বর্বর আকৃতির চীনেম্যান এসে ওদের জাঙ্ক ঘিরে ফেললে। সকলের হাতেই বন্দুক, কারো হাতে ছোরা।

ওদের জাঙ্কে কেউ কোনোরকম বাধা দিলে না—দেওয়া সম্ভবও ছিল না। দস্যুরা দলে ভারি, তা ছাড়া অত বন্দুক এ-নৌকায় ছিল না। সকলের মুখ বেঁধে ওরা নৌকায় যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিয়ে নিজেদের জাঙ্কে ওঠালে। বিমল ও সুরেশ্বরের কাছে যা ছিল, সব গেল। আ-চিন্ প্রদত্ত একশো ডলারের নোটখানা পর্যন্ত—কারণ সেখানা ভাঙাবার দরকার না হওয়ায় ওদের বাক্সেই ছিল।

চীনসমুদ্রের বোম্বেটের উপদ্রব সম্বন্ধে বিমল ও সুরেশ্বর অনেক কথা শুনেছিল। সিঙ্গাপুরে আরও শুনেছিল যে, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় সমস্ত নৌকো-জাহাজ হংকং-এর নিকটবর্তী সমুদ্রে জড়ো হচ্ছে—এদিকে সুতরাং বোম্বেটেদের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

চীনা ও মালয়-জলদস্যুরা শুধু লুঠপাট করেই ছেড়ে দেয় না—যাত্রীদের প্রাণ নষ্টও করে। কারণ এরা বেঁচে ফিরে গিয়ে অত্যাচারের সংবাদ সিঙ্গাপুর বা হংকং-এ প্রচার করলেই চীন ও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কড়াকড়ি পাহারা বসাবে সমুদ্রে। 'মরা মানুষ কোনো কথা বলে না'—এ-প্রাচীন নীতি অনেক ক্ষেত্রেই বড় কাজ দেয়।

দেখা গেল বর্তমান দস্যুরা এ-নীতি ভালভাবেই জানে। কারণ জিনিসপত্র ওদের জাঙ্কে রেখে এসে ওরা আবার ফিরে এল বিমলদের নৌকায়—যেখানে পাটাতনের ওপর মাঝিমাল্লার দল সারিসারি মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছ।

বিমল ছিল নিজের কামরায়। সুরেশ্বর কোথায় বিমল তা জানে না। একজন বদমাইশকে ছোরাহাতে ওর কামরায় ঢুকতে দেখে বিমল চমকে উঠল।

লোকটা সম্ভবত চীনাম্যান। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, সার্কাসের পালোয়ানের মতো জোয়ান—নীল ইজের আর একটা বুককাটা কোর্তা গায়ে। মুখখানা দেখতে খুব কুশ্রী নয়, কিন্তু কঠিন ও নিষ্ঠুর। ওর হাতে অস্ত্রখানা বিমল লক্ষ্য করে দেখলে ঠিক ছোরা নয়, মালয় উপদ্বীপে যাকে 'ক্রিস' বলে—তা-ই। যেমনি চকচকে তেমনি সে-খানা ক্ষুরধার বলে মনে হল!

সে ক্রিসখানা বিমলের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে দেখিয়ে বল্লে—আমি তোমাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি, কিছু মনে কোরো না!

বিমলের মুখ বাঁধা, সে কী কথা বলবে?

লোকটা পকেট থেকে একটা চামড়ার থলি বার করে সেটার মুখ খুলে বিমলের চোখের সামনে মেলে ধরলে। শুকনো আমচুরের মতো কতকগুলো কী জিনিস তার মধ্যে রয়েছে। বিমল অবাক হয়ে ভাবছে এ-জিনিসগুলো কী, বা তাকে এগুলি দেখানোর সার্থকতাই-বা কী—এমন সময় লোকটা একটা শুকনো আমচুর বার করে ওর নাকের সামনে ধরে বল্লে—চিনতে পারলে না কী জিনিস?

বিমল এতক্ষণে জিনিসটা চিনতে পারলে এবং চিনে ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে উঠল। সেটা একটা কাটা শুকনো কান, মানুষের কান! লোকটা হা-হা করে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্লে—বুঝেছ এবার? হ্যাঁ, ওটা আমার একটা বাতিক—মানুষের কান সংগ্রহ করা। তোমাকেও তোমার কান দুটির জন্যে একটুখানি কষ্ট দেব। আশা করি মনে কিছু করবে না। এস, একটু এগিয়ে এস দেখি।

বিমল নিরুপায়। মুখ দিয়ে একটা কথা বার করবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই তার। এক মুহূর্তে তার মনে হল হয়তো সুরেশ্বরের সমানই অবস্থা ঘটেছে, এতক্ষণে তারও অশেষ দুর্দশা হচ্ছে এই পীতবর্ণ বর্বরদের হাতে।

বুদ্ধদেবের ধর্মকে এরা বেশ আয়ত্ত করেছে বটে!

লোকটা সময়ের মূল্য বোঝে, কারণ কথা শেষ করেই বুদ্ধশিষ্যের এই বিচিত্র নমুনাটি চকচকে ক্রিসখানা হাতে করে এগিয়ে এল—বিমলের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল—মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ বার হতে চেয়েও হল না, সে প্রাণপণে দুই চোখ বুজলে।...

তীক্ষ্ণ ক্রিসের স্পর্শ খুব ঠাণ্ডা—কতটা ঠাণ্ডা, খু-উব ঠাণ্ডা কি? ক্রিসের স্পর্শ এল না, এল তার পরিবর্তে দূর থেকে একটু অস্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ—প্রস্তরময় কূলে সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবল বেগে আছড়ে পড়ার শব্দের মতো গম্ভীর।

কতকগুলো ব্যস্ত মানুষের সম্মিলিত দ্রুত পদশব্দ বিমলের কানে গেল—বিস্মিত বিমল চোখ খুলে চেয়ে দেখলে লোকটা ছুটে কামরার বাইরে চলে গেল—চারিদিকে একটি সাড়া শোরগোল, কাঠের পাটাতনের ওপর অনেকগুলো পলায়নপর মানুষের দ্রুত শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে।

কী ব্যাপার? এ আবার কী নতুন কাণ্ড?

পরক্ষণেই বিমলের মনে হল তাদের জাঙ্কখানা একটা প্রকাণ্ড দুলুনি খেয়ে একেবারে কাত হয়ে পড়বার উপক্রম করেই পরমুহূর্তে ঢেউয়ের তালে যেন আকাশে ঠেলে উঠল—নোঙরের শিকলে কড় কড় শব্দে টান ধরল—মজবুত শেকল না হলে সেই হেঁচকা টানে ছিঁড়ে যেত নিশ্চয়ই। একটু পরে বিমলদের নৌকার একজন জোয়ান মাঝি ওর কামরায় ঢুকে হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিলে।

তখনও পাশে কোথায় খুব হৈচৈ হচ্ছে।

বিমল বল্লে—ব্যাপার কি বল তো? আমার বন্ধুটি কোথায়?

মাঝি বল্লে—সে ভালই আছে।

বলেই সে বাইরে চলে গেল। বেশি কথা বলে না এদেশের লোক।

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে এসে দেখলে সামনে এক অদ্ভুত ব্যাপার! নবাগত বোম্বেটে জাঙ্কখানা কঠিন প্রস্তরময় ডাঙায় ধাক্কা খেয়ে জখম হয়েচে। আর অল্প দূরেই সমুদ্রবক্ষে এমন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে যা জীবনে কখনও দেখেনি।

আকাশ থেকে কালো মোটা থামের মতো একটা জিনিস নেমে সমুদ্রের জলে মিশে গিয়েছে—সে-জিনিসটা আবার চলনশীল—হালকা রবারের বেলুন বা ফানুসের মতো অত বড় কালো মোটা থামটা বায়ুর গতির সঙ্গে ধীরে ধীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে ভেসে চলেছে।

এই সময় সুরেশ্বর ও জাঙ্কের সারেং এসে ওদের পাশে দাঁড়াল।

সারেং বল্লে—উঃ, কত বড় জোড়া জলস্তম্ভ, মিস্টার! চীনসমুদ্রে প্রায়ই জলস্তম্ভ হয় বটে, কিন্তু এমন জোড়া জলস্তম্ভ আমি কখনও দেখিনি! ঐ জলস্তম্ভটা আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে!

ঐ কালো মোটা থামের মতো ব্যাপারটা তা হলে জলস্তম্ভ? ছবিতে দেখেছে বটে। কিন্তু বিমল বা সুরেশ্বর জীবনে এই প্রথম জিনিসটা দেখলে।

কিন্তু ব্যাপারটা ওরা ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। জলস্তম্ভ ওদের জীবন বাঁচাল কী করে?

বেশি দেরি হল না ব্যাপারটা বুঝতে। যখন ওরা দেখলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সুদক্ষ সারেং নোঙর উঠিয়ে জাঙ্কখানা ডাঙা থেকে প্রায় একশো গজ এনে ফেলেছে এবং

প্রতিমুহূর্তেই তীর ও সমুদ্র উভয়ের ব্যবধান বাড়ছে। সারেং ও মাঝিদের মুখে শোনা গেল এই জলস্তম্ভের জোড়াটি দ্বীপের অদূরে ভেঙে গিয়ে বিপুল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে—তাতে বোম্বেটেদের জাঙ্কখানাকে উর্ধ্বে উঠিয়ে সবেগে আছাড় মেরেছে ডাঙার গায়ে। জাঙ্কখানা জখম তো হয়েছেই, এবং বোধ হচ্ছে ওদের কতকগুলি লোককেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মেরেছে।

সারেং বললে—জলস্তম্ভ ভয়ানক জিনিস, মিস্টার। অনেক সময় জাহাজ পর্যন্ত বিপদে পড়ে যায়—বড় বড় জাহাজ দূর থেকে কামান দেগে জলস্তম্ভ ভেঙে দেয়। আর বিশেষ করে এই চীনসমুদ্রে, সপ্তাহে দু-একটা বালাই লেগেই আছে।

দ্বীপ ছেড়ে জাঙ্কটা বহুদূরে চলে এসেছে।

আবার অকূল সমুদ্র।

বোম্বেটে-জাহাজ ও জলস্তম্ভ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গিয়েছে দিগন্তবিস্তৃত নীলিমার মধ্যে। সুরেশ্বর ও বিমল চুপ করে সমুদ্রের অপরূপ রঙের দিক চেয়ে বসে আছে।

সারেং এসে বললে,—মিস্টার, আমরা হংকং থেকে আর বেশি দূরে নেই। কিন্তু হংকং যাব না।

সুরেশ্বর বললে—কোথায় যাব তবে?

—হংকং থেকে পঞ্চাশ মাইল আন্দাজ দূরে ইয়ান-চাউ বলে একটা ছোট দ্বীপ আছে। সেখানে আপনাদের নামিয়ে দেবার আদেশ আছে আমার ওপর। হংকং-এর কাছে গেলে ব্রিটিশ মানোয়ারি জাহাজ আমাদের নৌকো তল্লাশ করবে। তোমরা ধরা পড়ে যাবে মিস্টার।

পরদিন দুপুরের পরে ইয়ান-চাউ পৌঁছে গেল ওদের নৌকো। ক্ষুদ্র দ্বীপ। আগাগোড়া দ্বীপটি যেন একটা ছোট পাহাড়, সমুদ্রের জল থেকে মাথা তুলে জেগে রয়েছে। এখানে চীন গভর্নমেন্টের একটা বেতারের স্টেশন আছে।

সমস্ত দ্বীপে আর কোনো অধিবাসী নেই ঐ বেতারের স্টেশনের জনকয়েক চীনা কর্মচারী ছাড়া।

দুদিন ওরা সেখানে বেতারের আড্ডায় কর্মচারীদের অতিথি রইল। তৃতীয় দিন খুব সকালে ক্ষুদ্র একখানা জাঙ্কে ওদের দশ মাইল দূরবর্তী উপকূলে নিয়ে যাওয়া হল।

বেতারে এইরকম আদেশই নাকি এসেছে।

এ-ই চীনদেশ! যদি ঢেউ-খেলানো ছাদ-আঁটা চীনা বাড়ি না থাকত, তবে চীনদেশের প্রথম দৃশ্যটা বাংলাদেশের সাধারণ দৃশ্য থেকে পৃথক করে নেওয়া হঠাৎ যেত না।

উপকূল থেকে পাঁচ মাইল দূরে রেলওয়ে স্টেশন। অতি প্রচণ্ড কড়া রৌদ্রে পদব্রজেই ওদের স্টেশনে আসতে হল। এদেশে ওদের জামাই-আদরে কেউ রাখবে না, কঠিন সামরিক জীবন যে এখন থেকেই শুরু হল ওদের—এ-কথাটা সুরেশ্বর ও বিমল হাড়ে-হাড়ে বুঝলে সেই ভীষণ রোদে বিশ্রী ধুলোভরা রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

তার ওপর বেতারের কর্মচারীটি ওদের সঙ্গে ছিল, তার মুখেই শোনা গেল এসব অঞ্চল আদৌ নিরাপদ নয়।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে চোর ডাকাত ও গুণ্ডার দল যা খুশি শুরু করেছে। তারা দিনদুপুরও মানে না। স্বদেশি বিদেশিও মানে না। কারো ধন-প্রাণ নিরাপদ নয় আজকাল। দেশ একপ্রকার অরাজক।

শীঘ্রই এর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল পথের মধ্যেই। ওরা একদলে আছে মাত্র চারজন। রৌদ্রে সুরেশ্বরের জলতেষ্টা পেয়েছিল—চীনা কর্মচারীটিকে ও ইংরাজিতে বল্লে—জল

কোথাও পাওয়া যাবে?

রাস্তা থেকে কিছু দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম বা বস্তি। খানকতক খড়ের ঘর এক জায়গায় জড়ো করা মাত্র। সেই চীনা কর্মচারীর পিছু পিছু ওরা বস্তির দিকে গেল। বিমলের মনে হল একবার বৈদ্যবাটীর গঙ্গার চরে সে তরমুজ কিনতে গিয়েছিল—এ ঠি যেন বৈদ্যবাটীর চড়ার চাষী-কৈবর্তদের গাঁখানা। একখানা গরুর গাড়ির সামনেই ছিল—তফাতের মধ্যে চোখে পড়ল সেটার গড়ন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। গরুর গাড়ির অত মোটা চাকা বাংলাদেশে হয় না।

ওদের আসতে দেখেই কিন্তু বস্তির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হল। মেয়ে পুরুষ যে-যার ঘর ছেড়ে ছুটে বেরুল—এদিক-ওদিক দৌড় দিল। চীনা কর্মচারীও তৎপর কম নয়—সেও ছুটে গিয়ে একটি ধাবমানা স্ত্রীলোকের পথ আগলে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটি দুহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে জড়সড় হয়ে আর্তনাদ করে উঠল। ব্যাপারটা কী? সুরেশ্বর ও বিমল অবাক হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীলোকের বিপন্ন কণ্ঠের আর্তনাদ বিমল সহ্য করতে পারলে না। ও চেঁচিয়ে বল্লে—ওকে কিছু বোলো না, মিঃ চংপে—

ততক্ষণ ওদের সঙ্গী চীনা ভাষায় কী একটা বল্লে স্ত্রীলোকটিকে। কথাটা এইরকম শোনাল ওদের অনভ্যস্ত কানে।

—হি চিন-কিচিন—চিন-চিন—

স্ত্রীলোকটি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওর দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে বল্লে—হ্ চিন, কি চিন, সি চিন—

—কি চিন, ফি চিন?

—সি চিন, লি চিন।

সুরেশ্বর ও বিমল ওদের কথা শুনে হেসেই খুন। কথাবার্তাগুলো যেন ঐরকমই শোনাচ্ছিল।

তারপর ওরা স্ত্রীলোকটির কাছে পায়ে পায়ে গেল। আহা, যেন মূর্তিমতী দারিদ্র্যের ছবি। ভারতবর্ষীয় লোকে তবুও স্নান করে, গায়ে-মাথায় তেল দেয়, এরা তাও করে না—গায়ে খড়ি উড়ছে, মাথা রুক্ষ, শরীর অন্নাভাবে শীর্ণ ও জ্যোতিহীন। হতভাগ্য মহাচীন, হতভাগ্য ভারতবর্ষ! দুজনেই দরিদ্র, কেউ খেতে পায় না,—গুরু-শিষ্য দুজনের অবস্থাই সমান।

বিমলের মনে মনে এই দরিদ্রা নারী,—এই দরিদ্র, হতভাগ্য, উৎপীড়িত মহাচীনের এই ভয়ার্ত, অসহায় কুঁড়েঘরবাসী চাষীমজুর—এদের প্রতি একটা গভীর অনুকম্পা ও সহানুভূতি জাগল। মানুষ যখন দুঃখকষ্ট পায়, সব দেশে সর্বকালে তারা এক। চীন, ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন, মেক্সিকো, এদের মধ্যে দেশের সীমা এখানে মুছে গিয়েছে।

এই অভাগিনী ভয়ব্যাকুলা দরিদ্রা নারী সমগ্র চীনদেশের প্রতীক।

বিমল এসেছে এক হতভাগ্য দেশ থেকে—এই হতভাগ্য দেশকে সাহায্য করতে। সে তা যথাসাধ্য করবে। দরকার হলে বুকের রক্ত দিয়েও করবে।

স্ত্রীলোকটি যখন বুঝতে পারলে যে এরা ডাকাত নয় বা বিদ্রোহী রেড আর্মির লোকও নয়, তখন সে উঠে ঘরে গিয়ে জল নিয়ে এসে সবাইকে খাওয়ালে।

ধাতুপাত্র বা চীনামাটির পাত্র নেই বাড়িতে, এত গরিব সাধারণ লোক। লাউয়ের খোলায় জল রেখেছে।

চীনের বিশ্ববিখ্যাত মাটির বাসন, মিং রাজত্বের অপূর্ব প্রাচীন শিল্প, পুতুল, খেলনা, বুদ্ধ, দানব, এসব এই গরিবদের জন্যে নয়।

রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খুব ভিড়। একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন সিনকিউ থেকে সাংহাই যাচ্ছে—প্রত্যেক স্টেশনে আবার নূতন ভর্তি-করা সৈন্যদের ওই ট্রেনেই উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সুরেশ্বর বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ট্রেনের ছাদের দিকে।

সব কামরার ছাদে কাঁচা ডালপালা চাপানো—কোনোটায় শুকনো খড়-বিচালি ছাওয়া।

বিমল বল্লে—এরোপ্লেন পাছে বোমা ফেলে ট্রেনে, তাই ওরকম করেছে বলে মনে হয়!

সাংহাই ৪৫০ মাইল দূরে।

হঠাৎ হঠাৎ করে করে সারদিন ট্রেন কৃষিক্ষেত্র, অনুচ্চ পাহাড়, গ্রাম আর বস্তি পার হয়ে চলেছে, চলেছে। ট্রেনের গতি মন্দ নয়, পুরনো আমলের এঞ্জিন বদলে নতুন এঞ্জিন কেনা হয়েছে, বেশ জোরেই ট্রেন যাচ্ছে।

ওদের কামরাতে সাধারণ সৈন্যদল নেই অবিশ্যি। মাত্র জন আষ্টেক লোক, সবাই অফিসার শ্রেণীর, কিন্তু কেউ ইংরিজি জানে না। মহা অসুবিধেয় পড়ে গেল ওরা—কিছু দরকার হলে চাওয়া যায় না, নতুন কিছু দেখলে জিগ্যেস করা যায় না যে সেটা কী।

দুপুরের দিকে একটা ছোট্ট শহরে গাড়ি দাঁড়াল এবং ওদের কামরাতে একজন সাদা সরু একগুচ্ছ লম্বা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সৌম্যমূর্তি ভদ্রলোক উঠলেন, সঙ্গে তাঁর এগারোটি তরুণ যুবা। এদের সবারই বেশ সুন্দর কমনীয় চেহারা।

বিমল বল্লে—গুড মর্নিং স্যার।

বৃদ্ধের মুখ দেখে মনে হয় জগতে তাঁর আপন-পর কেউ নেই। তিনি সবাইর ওপর সন্তুষ্ট, জীবনে সবাইকে ভালবেসেছেন।

তিনি হাসিমুখে ইংরিজিতে বল্লেন—গুড মর্নিং, আপনারা কোথায় যাবেন?

বিমল বল্লে—সাংহাই। আপনারা কি অনেকদূর যাবেন?

—আমরাও যাচ্ছি সাংহাই। আমি এখানকার কলেজের প্রোফেসর। আমার নাম লি। আমি সেখানে যাচ্ছি যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে। এদেরও নিয়ে যাচ্ছি, এরা সবাই আমার ছাত্র। সদানন্দ বৃদ্ধ কথা শেষ করে গর্বিত দৃষ্টিতে তাঁর এগারোটি তরুণ ছাত্রের দিকে চাইলেন। বিমল ও সুরেশ্বরের বড় অদ্ভুত মনে হল। এই ভয়ানক দিনে ইনি মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে চলেছেন সাংহাইতে, এতগুলি বালকের জীবন বিপন্ন করে।

একটু পরে বৃদ্ধের একটি ছাত্র একটি বেতের বাক্স থেকে কী সব খাবার বার করে সবাইকে খেতে দিলে। বৃদ্ধ সুরেশ্বর ও বিমলকেও তাঁদের সঙ্গে খেতে আহ্বান করলেন।

সুরেশ্বর নিম্নস্বরে বল্লে—খেও না বিমল। ইঁদুর ভাজা কিম্বা আরসুলা-চচ্চড়ি বোধহয়।

কিন্তু সে-সব কিছু নয়। শরবতি লেবুর রস দেওয়া কুমরোর বিচি ভাজা আর শসার আচার।

বিমল বল্লে—'প্রোফেসর লি, আপনি সাংহাইতে কোথায় উঠবেন? আমাদের সঙ্গে থাকুন-না, আমরা যেখানে থাকব! হঠাৎ এরোপ্লেনের আওয়াজ কানে গেল—গাড়িসুদ্ধ সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে জানলার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করলে কোন দিক থেকে আওয়াজটা এসেছে।

ছখানা এরোপ্লেন সারবন্দী হয়ে উড়ে পুব থেকে পশ্চিমের দিকে আসছে। ট্রেনখানার বেগ হঠাৎ বড় বেড়ে গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু

এরোপ্লেনের সারি ট্রেনের ঠিক ওপর দিয়েই উড়ে চলে গেল শান্তভাবেই।

প্রোফেসর লি দিব্যি নির্বিকারভাবেই বসে ছিলেন। তিনি বল্লেন—আমাদের গভর্নমেন্টের এরোপ্লেন।

একটা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে নারীকণ্ঠের কান্না শুনে বিমল ও সুরেশ্বর মুখ বাড়িয়ে দেখলে, কতকগুলি সৈন্য একটি দরিদ্র স্ত্রীলোকের চারিধারে ঘিরে হাসছে—স্ত্রীলোকটির সামনে একটা শূন্য ফলের ঝুড়ি—এদিকে সৈন্যদের প্রত্যেকের হাতে এক-একটা খরমুজ।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি, আমরা তো নতুন এদেশে এসেছি, কিছু বুঝি নে এদেশের ভাষা। বোধহয় খরমুজওয়ালীর সব ফল এরা কেড়ে নিয়ে দাম দিচ্ছে না। আপনি একবার দেখুন-না!

বৃদ্ধ তাঁর এগারোটি ছাত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বাধা দিলেন সৈন্যদের। চীনা ভাষায় তুবড়ি ছুটল উভয় পক্ষেই।

বৃদ্ধের ছাত্রগণও তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দরকার হলে মারামারি করবে। মারামারি একটা ঘটত হয়তো, কিন্তু সেই সময় জনৈক চীনা সামরিক অফিসার গোলমাল দেখে সেখানে উপস্থিত হতেই সৈন্যরা খরমুজ রেখে যে যার কামরায় উঠে বসল। খরমুজওয়ালী গোটাকতক ফল লি ও তাঁর ছাত্রদের খেতে দিলে—বৃদ্ধ তার দাম দিয়ে দিলেন, খরমুজওয়ালীর প্রতিবাদ শুনলেন না।

সন্ধ্যার সময় ট্রেন ফু-চু পৌঁছুল।

ফু-চু থেকে অনেকগুলি সৈন্য উঠল। ট্রেন কিন্তু ছাড়তে চায় না—খবর পাওয়া গেল, সামনের রেলপথে কী একটা গোলমালের দরুন ট্রেন ছাড়বার আদেশ নেই।

এদেশে সময়ের কোনো মূল্য নেই। চার-পাঁচ ঘণ্টা ওদের ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। সৈন্যদল নেমে যে যার খুশিমতো স্টেশনে পায়চারি করছে, তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপাশের বাজারের মধ্যে ঢুকে হল্লা করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে বেড়াচ্ছে।

একটা ছোট ছেলে তারের একরকম যন্ত্র বাজিয়ে গাড়িতে গাড়িতে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। প্রোফেসর লি তাকে ডেকে কী জিগ্যেস করলেন, তাকে কিছু খাবার দিলেন। তাঁরই মুখে বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে ছেলেটি অনাথ, স্থানীয় আমেরিকান মিশনে প্রতিপালিত হয়েছিল—এখন সেখানে আর থাকে না।

সন্ধ্যার আগে ট্রেন ছাড়ল। সারারাতের মধ্যে যে কত স্টেশন পার হল, কত স্টেশনে বিনা কারণে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল—তার লেখাজোখা নেই। এইরকম ধরনের রেলভ্রমণ বিমল ও সুরেশ্বর কখনও করেনি।

ভোরের দিকে ট্রেনখানা এক জায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিমল ঘুমুচ্ছিল—ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রেনখানা দাঁড়াতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমল দেখলে দু'ধারের মাঠে ঘন কুয়াশা হয়েছে, দশহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না—সামনের দিকে লাইনের ওপর আর একখানা ট্রেন যেন দাঁড়িয়ে—কুয়াশায় তার পেছনের গাড়ির লাল আলো ক্ষীণভাবে জ্বলছে।

প্রোফেসর লি-ও ইতিমধ্যে উঠেছেন।

তিনি বল্লেন—ব্যাপারটা কী?

বিমল বল্লে—সামনে দুখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে—এই তো দেখছি। ঘোর কুয়াশা, বিশেষ কিছু দেখা যায় না।

সেখানে আর একখানা ছোট সৈন্যবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে—কিন্তু বর্তমানে সেখানাকে ট্রেন বলে

চিনে নেওয়ার উপায় নেই বল্লেই হয়। ছাদ উড়ে গিয়েছে, মোটা মোটা লোহার দণ্ড বেঁকে দুমড়ে লাইনের পাশের খাদে ছিটকে পড়েছে—জানলা-দরজার চিহ্ন বড় একটা নেই। কেবল ইঞ্জিনের কিছু হয়নি। শোনা গেল ট্রেনখানার ওপর বোমা পড়েছে এই কিছুক্ষণ আগে—কিন্তু সুখের বিষয় গাড়িখানা একদম খালি যাচ্ছিল। এখানা কোনো টাইমটেবলভুক্ত যাত্রী বা সৈন্যবাহী ট্রেন নয়। খালি ট্রেনখানা ফু-চু থেকে সাংহাই যাচ্ছিল, ডাউন লাইনে বড় গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে এর কামরাগুলো এই উদ্দেশ্যে। গার্ড ও ড্রাইভার বেঁচে গিয়েছে। কোনো প্রাণহানি হয়নি।

লাইন পরিষ্কার করতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। মাত্র পনেরো মাইল দূরে সাংহাই, সেখানে পৌঁছুতে বেজে গেল একটা।

সাংহাই নেমে বিমল ও সুরেশ্বর বুঝলে এ অতি বৃহৎ শহর; সাংহাই-এর রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও আধুনিক ধরনে তৈরি, বড় বড় বাড়ি, দোকান, হোটেল, অফিস, স্কুল, কলেজ—চীনা ও ইংরাজি ভাষায় নানা সাইনবোর্ড চারিদিকে, মোটরের ও রিকশাগাড়ির ভিড়, রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য, চায়ের দোকান, চীনা ভাতের দোকানে ছোটবড় ইঁদুর ভাজা ঝোলানো রয়েছে, ফলওয়ালী রাস্তার ধারে বসে ফল বিক্রি করছে—এত বড় শহরের লোকজন ও ব্যবসাবাণিজ্য দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে এই সাংহাই শহরের ওপর বর্তমানে জাপানি সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে আসছে পিকিং থেকে।

কিছু বদললায়নি যেন, মনে হয় প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সহজ ও উদ্বেগশূন্যভাবেই চলেছে।

এখানে প্রোফেসর লি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। খুব বড় ধূসর রংয়ের সামরিক লরিতে চড়ে ওরা একটা বড় লম্বামতো বাড়ির সামনে নীত হল।

বাড়িটা সামরিক বিভাগের একটা বড় দপ্তরখানা, এ ওদের বুঝতে দেরি হল না—ইউনিফর্ম-পরা সৈন্যদল ও অফিসারে ভর্তি। প্রতি কামরায় চীনা ভাষায় সাইনবোর্ড আঁটা। অফিসার দল ঢুকছে বেরুচ্ছে, সকলেই মুখেই ব্যস্ততার ভাব, উদ্বেগের চিহ্ন।

দু-তিন জায়গায় ওদের নাম লেখা হল—ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে যে-চীনা অফিসার, সে প্রত্যেক জায়গায় একটা লম্বা হলদে চীনা ভাষায় লিখিত কাগজ খুলে ধরলে টেবিলের ওপর।

তবুও আইনকানুন শেষ হল না—অবশেষে একটা কামরার সামনে ওদের দাঁড় করালে। কামরার মধ্যে নিশ্চয় কোনো বড় কর্মচারীর আড্ডা, কারণ কামরার সামনে দর্শনপ্রার্থী সামরিক অফিসার ও অন্যান্য লোকের ভিড় লেগেছে।

ভিড় ঠেলে একটু কাছে গিয়ে বিমল পড়লে দরজার গায়ে পিতলের ফলকে ইংরিজিতে লেখা আছে—জেনারেল চু-সিন-টে, অফিসার কমান্ডিং, নাইন্‌টিনথ্ রুট আর্মি। ওদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি—জেনারেল সাহেবের কামরায় শীঘ্রই ডাক পড়ল। বড় টেবিলের ওপাশে এক সুশ্রী, সামরিক ইউনিফর্ম পরিহিত যুবা বসে, ইনিই জেনারেল চু-টে, পূর্বে বিদ্রোহী কমিউনিস্ট সৈন্যদলের নেতা ছিলেন, বর্তমানে জেনারেল চিয়াং-কৈ-শাক-এর বিশিষ্ট সহকর্মী।

হাসিমুখে জেনারেল চু-টে মার্জিত ইংরিজিতে বল্লেন—গুড মর্নিং, আপনাদের কোনো কষ্ট হয়নি পথে?

এরাও হাসিমুখে কিছু সৌজন্যসূচক কথা বল্লে।

জেনারেল চু-টে বল্লেন—আমি ভারতবর্ষের লোকদের বড় ভালবাসি। আপনারা

আমাদের পর নন।

বিমল বল্লে—আমরাও তা-ই ভাবি।

—মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন? ঐ একজন মস্ত লোক আপনাদের দেশের!

জেনারেল চু-টে'র মুখে মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনে বিমল ও সুরেশ্বর দুজনেই আশ্চর্য হয়ে গেল। তবে মহাত্মা গান্ধী তো আর ওদের বাড়ির পাশের প্রতিবেশী ছিলেন না, সুতরাং তাঁর দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওদের কোনো জ্ঞান নেই—তার ওপর ওরা আজ দু'মাস দেশছাড়া।

—ভালই আছেন। ধন্যবাদ।—

—মিঃ জহরলাল নেহেরু ভাল আছেন? আমি তাঁকে শীগগির একটা চিঠি লিখছি আমাদের দেশের জন্য ভারতের সাহায্য, কংগ্রেসের সাহায্য চেয়ে।

বিমল ও সুরেশ্বরের বুক গর্বে ফুলে উঠল। একজন স্বাধীন দেশের বীর সেনানায়কের মুখে তাদের দরিদ্র ভারতের নেতাদের কথা শুনে, চীনদেশ ভারতের কাছে সাহায্যপ্রার্থী এ-কথা শুনে ওরা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে।

জেনারেল চু-টে বল্লেন—আমার একসময় অত্যন্ত ইচ্ছে ছিল ভারতে বেড়াতে যাব। নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। ভারতে ভাল বৈমানিক তৈরি হচ্ছে? এরোপ্লেন চালাবার ভাল স্কুল কোথাও স্থাপিত হয়েছে?

বিমলেরা এ-খবর রাখে না। দমদমায় একটা যেন ঐ ধরনের কিছু আছে—তবে তার বিশেষ কোনো বিবরণ ওরা জানে না।

চু-টে বল্লেন—আপনাদের ধন্যবাদ, এদেশকে আপনারা সাহায্য করতে এসেছেন। আপনাদের ঋণ কখনও চীন শোধ দিতে পারবে না। আপনারা পথ দেখিয়েছেন। আপনাদের প্রদর্শিত পথে দুই দেশের মিলন আরও সহজ হোক এই কামনা করি।

বিমল বল্লে—এখন কি আমাদের সাংহাইতে থাকতে হবে?

—কিছুদিন। বৈদেশিক মেডিকেল ইউনিট আমেরিকান ডাক্তার ব্লুমফিল্ডের অধীনে। এখন আপনাদের থাকতে হবে মার্কিন কনসেশনে—সাধারণ শহরে নয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চীন গবর্নমেণ্ট আপনাদের জীবনের জন্য দায়ী। সাধারণ শহরে বোমা পড়বে, হাতাহাতি যুদ্ধ হবে—এখানে কারো জীবন নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক কনসেশনে আমরা হাসপাতাল খুলেছি। সেখানে আপনারা কাজ করবেন।

—ইওর এক্সেলেন্সি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, যদি বেয়াদবি না হয়!

—বলুন।

—সাংহাই কি জাপনিরা আক্রমণ করবে বলে আপনি ভাবেন?

জেনারেল চু-টে বল্লেন—এ তো আন্দাজের কথা নয়—সাংহাইএর দিকেই তো ওরা পিকিং থেকে আসছে। সেনসি হচ্ছে লুংহাউ রেলের শেষপ্রান্ত। সেখানে আমরা সৈন্য জড়ো করছি ওদের বাধা দিতে যাতে উত্তর-পশ্চিম চীনে আর না এগুতে পারে। তবে সাংহাইতে একটা বড় যুদ্ধ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। মেডিকেল ইউনিটের আরও সেইজন্যে সাংহাইতেই এখন দরকার।

সুরেশ্বর ও বিমল অভিবাদন করে বিদায় নিলে।

সৈন্যবিভাগের দপ্তরখানা থেকে বার হয়ে ওরা মোটরে চড়ে আন্তর্জাতিক কনসেশনে পৌছল। বিমল ও সুরেশ্বর লক্ষ করলে ব্রিটিশ প্রজা হলেও ওদের ব্রিটিশ কনসেশনে না নিয়ে গিয়ে ফরাসি কনসেশনে নিয়ে যাওয়া হল। ওদের সঙ্গে দুজন চীনা সামরিক কর্মচারী

ছিল, আবশ্যকীয় কাগজপত্র তারাই দেখালে বা সই করালে।

প্রকাণ্ড ব্যারাক। কড়া সামরিক আইনকানুন। হুকুম না নিয়ে কনসেশনের সীমার বাইরে যাবার নিয়ম নেই, ঢোকবারও নিয়ম নেই। ফরাসি সান্ত্রী রাইফেল হাতে সর্বদা পাহারা দিচ্ছে। ফরাসি জাতীয় পতাকা উড়ছে ব্যারাকের পতাকা-মন্দিরে। ওদের যাবার দুদিন পরে একদল আমেরিকান যুবক কনসেশনে এসে পৌছুল—এরা বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এসেছে চীন গবর্নমেণ্টকে সাহায্য করতে, নিজেদের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে, প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে। এদের মধ্যে তিনটি তরুণী ছাত্রীও ছিল, এরা এল সেদিন সন্ধ্যাবেলা। এদের কনসেশনে ঢোকানো নিয়ে চীনা গবর্নমেণ্টকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

একটি মেয়ের নাম এ্যালিস ই. হুইটবার্ন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিমলের সঙ্গে সে যেচে আলাপ করলে। যেমনি সুশ্রী তেমনি অদ্ভুত ধরনের প্রাণবন্ত, সজীব মেয়ে। কুড়ি-একুশ বয়েস—চোখেমুখে বুদ্ধির কী দীপ্তি!

বিমল তাকে বল্লে—মিস হুইটবার্ন, তুমি কি ডাক্তারির ছাত্র ছিলে?

মেয়েটি বল্লে—না। আমি নার্স হব আন্তর্জাতিক রেডক্রসে কিংবা চীনা সামরিক বিভাগের হাসপাতালে।

—তোমার বাপ-মা আছেন?

—আছেন। আমার বাবা ঘোড়ার শিক্ষক। খুব নাম-করা লোক আমাদের কাউন্টিতে।

—তাঁরা তোমাকে ছেড়ে দিলেন?

—তাঁদের বুঝিয়ে বল্লাম। জগতের এক হতভাগ্য জাতি যখন এত দুর্দশা ভোগ করছে, তখন পড়াশুনো বা বিলাসিতা কি ভাল লাগে? আমি আমার সেন্ট আর পাউডারের টাকা জমিয়ে, টকির পয়সা জমিয়ে, পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এদের সাহায্যের জন্যে মার্কিন রেডক্রস ফন্ডে। তারপর নিজেই না এসে পারলুম না—তুমিই বল না মিঃ বোস, পারা যায় থাকতে?

বিমল মুগ্ধ হয়ে গেল বিদেশিনী বালিকার হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পেয়ে। স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে! সংস্কারের পুঁটুলি নয়।

মেয়েটা বল্লে—আমাকে এ্যালিস বলে ডেকো। একসঙ্গে কাজ করব, অত আড়ষ্ট ভদ্রতার দরকার নেই। আমার একখানা ফটো দেব তোমায়, চল তুলিয়ে আনি দোকান থেকে।

কনসেশনের মধ্যে প্রায়ই সব আমেরিকান দোকান। মেয়েটি বল্লে—চল সাংহাই শহরের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি—কোনো চীনা দোকানে ফটো তুলব। ওরা দু পয়সা পাবে।

অনুমতি নিয়ে আসতে আধঘন্টা কেটে গেল, তারপর বিমল আর এ্যালিস কনসেশনের বড় ফটক দিয়ে সাংহাইয়ে যাবার রাস্তার ওপর উঠে একখানা রিকশা ভাড়া করলে।

কনসেশনে রাস্তাঘাটের নাম ইংরাজিতে ও ফরাসি ভাষায়। সাংহাই শহরে চীনা ভাষায়। কিছু বোঝা যায় না। চলচলে নীল ইজের ও স্ট্র হ্যাট পরে চীনা রিকশাওয়ালা রিকশা টানছে, কিন্তু এ-অংশেও বহু বিদেশি লোক ও বিদেশি দোকান-পসারের সারি। সাংহাই-এর আসল চীনাপল্লি আলাদা—রাস্তা সেখানে আরও সরু সরু—এ-কথা বিমল ইতিমধ্যে চীনা অফিসারদের মুখে শুনেছিল।

এ্যালিস বল্লে—চল, চীনাপাড়া দেখে আসি, মিঃ বোস।

রিকশাওয়ালাকে চীনাপাড়ার কথা বলতেই সে বারণ করলে। বল্লে—সেখানে কেন যাবে? এ-সময় সে-সব জায়গা ভাল নয়। বিপদে পড়তে পার। তোমাদের সেখানে নিয়ে গেলে আমায় পুলিশে ধরবে।

এ্যালিস ভয় পাবার মেয়েই নয়। বল্লে—চল, মিঃ বোস, আমরা হেঁটেই যাব। ওকে বিপদে ফেলতে চাইনে। ওর ভাড়া মিটিয়ে দিই।

বিমল রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দিলে, এ্যালিসকে দিতে দিলে না। কিন্তু রাস্তা দুজনে কেউই জানে না।

বিমল বল্লে—একখানা ট্যাক্সি নিই, এ্যালিস! সে অনেকদূর, রাস্তা না জানলে ঘুরে হয়রান হব।

হঠাৎ এ্যালিস ওপরের দিকে চেয়ে বল্লে—ও কী ও, মিঃ বোস? এরোপ্লেনের শব্দ শুনছ? অনেকগুলো এরোপ্লেন একসঙ্গে আসছে যেন। কোনদিকে বল তো?

বিমলও শুনলে। বল্লে—গভর্নমেন্টের এরোপ্লেন।

কিন্তু চক্ষের নিমেষে একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হল, যা বিমলের অভিজ্ঞতার বাইরে।

সামনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির ওপর বিকট এক আওয়াজ হল—বাজ পড়ার আওয়াজের মতো—সঙ্গে সঙ্গে এদিকে, ওদিকে, সামনে, পিছনে, পরপর সেইরকম ভীষণ আওয়াজ। ইট, চুন, টালি চারিদিকে ছুটতে লাগল। বিরাট শব্দ করে সামনের সেই বাড়িটার তেতলার ছাদ ধ্বসে পড়ল ফুটপাথের ওপর। বাড়িধ্বসা চুন সুরকির ধুলোয় ও কিসের ঘন শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ায় বিমল ও এ্যালিসকে ঘিরে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠল মানুষের গলার আর্তচিৎকার, গোলমাল, গোঙানি, কাতর কাকুতি, অনুনয়ের শব্দ, দুড়দাড় শব্দে ছুটে চলার পায়ের শব্দ, কান্নার শব্দ, সে এক ভয়ানক কাণ্ড!

বিমল প্রথমটা বুঝতে না পেরে সেই ঘন ধূম আর ধূলির মধ্যে হতভম্বের মতো খানিক দাঁড়িয়ে রইল—ব্যাপার কী? তারপরেই বিদ্যুৎচমকের মতো তার মনে এল এ জাপানি এরোপ্লেনের বোমাবর্ষণ!

এ্যালিস কই? একহাতের দূরের মানুষ চোখে পড়ে না সেই ধোঁয়া ধুলো আর গোলমালের মধ্যে। ওর কানে গেল এ্যালিসের উচ্চ ও সশঙ্ক কণ্ঠস্বর—মিঃ বোস, এস—আমার হাত ধর—বোমা পড়ছে—দৌড় দাও!

অন্ধকারের মধ্যে বিমল এ্যালিসের হাত শক্ত মুঠোয় ধরে বল্লে—কোথাও নোড়ো না এ্যালিস, নড়লেই মারা যাবে। দাঁড়াও এখানে।

কিন্তু তখন আর ছুটবার বা পালাবার পথও নেই। পরবর্তী পাঁচ মিনিট কালের ঠিক হিসেব বিমল দিতে পারব না। সে নিজেও জানে না। বাঁশঝারে আগুন লাগলে যেমন গাঁটওয়ালা বাঁশ ফটফট করে একটার পর একটা ফাটে তেমনি চারিদিকে দুম দাম শুধু বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ।

পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে, টলছে—ভূমিকম্পের মতো—ধোঁয়া, বাড়ি ধ্বসে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, আর্তনাদ—তারপরে সব চুপচাপ, বোমার আওয়াজ থেমে গেল। বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনগুলো মাথার ওপরে চক্রাকারে দুবার ঘুরে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলে গেল—বেশ যেন নিরুপদ্রব, শান্তভাবেই।

ধোঁয়ায় মিনিট দুই-তিন কিছু দেখা গেল না—যদিও গোলমাল, চিৎকার, লোক জড়ো হওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের তীব্র হুইসল্ বেজে উঠল একবার—দুবার, তিনবার।

ক্রমে ধীরে ধীরে ধুলো আর ধোঁয়ার আবরণ কেটে যেতেই এ্যালিস বল্লে—চল এগিয়ে গিয়ে দেখি, মিঃ বোস—

সামনে এক জায়গায় ফুটপাথের ওপর বেজায় লোক জড় হয়েছে। একটা বাড়ি পড়েছে

ভেঙে। অতি বীভৎস দৃশ্য ফুটপাথের ওপর। অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ছিন্ন-ভিন্ন দেহ ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে আছে সেখানটায়। বাড়িটা বোধহয় একটা চীনা স্কুল ছিল—বেলা এগারোটা, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছিল, কতক ছিল স্কুলবাড়ির মধ্যে। বাড়িখানা একেবারে হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফুটপাথ ও রাস্তার খানিক দূর পর্যন্ত।

হর্ন বাজিয়ে দুখানা রেডক্রস অ্যাম্বুলেন্স এল। একটা ছোট ছেলে এখনও নড়ছে—এ্যালিস ছুটে তার পাশে গিয়ে বসল। বিমল এক চমক দেখেই বল্লে—কোনো আশা নেই মিস হুইটবার্ন—ও এখুনি যাবে।

বিমলের গা তখনও কাঁপছে। জীবনে এরকম দৃশ্য কখনও দেখবার কল্পনাও সে করেনি। যুদ্ধ না শিশুপাল বধ!

এ্যালিস বিমলের কাজ অনেক সংক্ষেপ হয়ে গিয়েছিল।

ধ্বংস্তূপের মধ্যে আহত কেউ ছিল না—সবাই মৃত।

সব শেষ হয়ে যাবার পরে বিমল বল্লে—এ্যালিস, এখন কী করবে? আর কি চীনে-পল্লিতে যাবে এখন?

এ্যালিস বল্লে—যেতাম, কিন্তু এই যে বোমা-ফেলা হয়ে গেল, এর শোরগোল অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে তো! কনসেশনের সবাই আমাদের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়বে। সুতরাং চল ফেরা যাক।

কিছুদূরে যেতেই দেখলে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ছুটোছুটি করছে। চীনা গভর্নমেন্টের অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট কামানগুলো চারদিক থেকে ছোঁড়া হতে লাগল—কিন্তু তখন জাপানি বিমান কোথায়? আকাশের কোনো দিকেই তার পাত্তা নাই।

ওরা কনসেশনে ফিরে এল। সুরেশ্বরের কাছে বিমল খুব বকুনি খেল, তাকে ফেলে যাওয়ার জন্যে।

এ্যালিস বল্লে—ওকে বকচ কেন—আমি ভেবেছি আজ বিকেলে আবার চীনাপাড়ায় যাবার চেষ্টা করব। তুমি চল-না, সুরেশ্বর?

এবার ওদের সঙ্গে আর একটি মেয়ে যাবে বল্লে। এ্যালিসের সঙ্গে পড়ত, নাম তার মিনি—মিনি বেরিংটন।

বিকেলে ওরা ট্যাক্সি আনালে। ওদের ট্যাক্সি কনসেশনের গেট পর্যন্ত এসেছে—এমন সময় একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্মচারী ওদের ট্যাক্সিখানা থামালে।

বল্লে—আপনারা কোথায় যাবেন?

বিমল বল্লে—শহর বেড়াতে।

—যাবেন না। আমরা গুপ্ত খবর পেয়েছি, জাপানি যুদ্ধজাহাজ বন্দরের বাইরের সমুদ্র থেকে লম্বা পাল্লার কামানে গোলাবর্ষণ শুরু করবে আজ সন্ধ্যার সময়ে—সেইসঙ্গে জাপানি উড়োজাহাজও যোগ দেবে বোমা ফেলতে।

—ধন্যবাদ। আমরা একটু ঘুরে এখুনি চলে আসব!

এ-কথা বল্লে এ্যালিস—কাজেই বিমল বা সুরেশ্বর কিছু বলতে পারলে না। শহরের মধ্যে এসে দেখলে, পুলিশ সকলের হাতে চীনা ভাষায় মুদ্রিত এক-এক টুকরো কাগজ বিলি করছে। চীনা ছাত্রদের একটা লম্বা দল পতাকা উড়িয়ে মুখে কী বলতে বলতে শোভাযাত্রা করে চলেছে।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড শহর। এত বড় শহর বিমল দেখেনি—সুরেশ্বরও না। কলকাতা এর কাছে লাগেই না।

চীনাপল্লির নাম চা-পেই। সে-জায়গাটায় রাস্তাঘাট কিন্তু অপরিসর নয়—তবে বড় ঘিঞ্জি বসতি। প্রত্যেক মোড়ে খাবারের দোকান, ছোট-বড় ইঁদুর ভাজা ঝুলছে। বাঁকে করে ফিরিওয়ালা ভাত-তরকারি বিক্রি করছে।

বিমলের ভারি ভাল লাগল এই চীনাপাড়ার জীবনস্রোত। এক জায়গায় একটা বুড়ি বসে ভিক্ষে করছে—টাকাপয়সার বদলে সে পেয়েছে ভাত-তরকারি, ওর মুখে এমন একটি উদার ভালবাসার ভাব, চোখে সন্তোষ ও তৃপ্তির দৃষ্টি। বোধহয় আশাতীত ভাত তরকারি পেয়েছে বলে এত খুশি হয়ে উঠেছে মনে মনে। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের দারিদ্র্য ও সহজ সরল সন্তোষের ছবি যেন এই বৃদ্ধা ভিখারিণীর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

হঠাৎ আকাশে কী একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ শুনে ওরা মুখ তুলে চাইলে! একটা চাপা 'শোঁ-ও-ও' শব্দ। মিনি সর্বপ্রথমে বলে উঠল—এ শেলের শব্দ! সর্বনাশ, এ্যালিস, চল আমরা ফিরি—জাপানি যুদ্ধজাহাজের কামান থেকে শেল ছুঁড়ছে!

দুম! দুম!—দূরে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ শোনা গেল।

কাছেই কোথায় একটা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ হল সঙ্গে সঙ্গে। লোকজন চারিধারে ছুটতে লাগল—ওরাও ছুটল তাদের পিছু পিছু। বসতি যেখানে খুব ঘিঞ্জি, সেখানে একটা বাড়িতে গোলা পড়েছে। বাড়িটার সামনের অংশ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—ইঁট, চুন, টালিতে সামনের রাস্তাটা প্রায় বন্ধ—কে মরেছে না-মরেছে বোঝা যাচ্ছে না, সেখানে লোকজনের বেজায় ভিড়।

আবার সেইরকম শোঁ—শোঁ—ও—ও' শব্দ।

কাছেই আর একটা জায়গায় গোলা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে সারবন্দি একদল এরোপ্লেন দেখা গেল। তারা অনেক উঁচু দিয়ে যাচ্ছে, পাছে চীনা বিমানধ্বংসী কামানের গোলা খেতে হয় এই ভয়ে।

এ্যালিস বল্লে—ওরা পাল্লা ঠিক করে দিচ্ছে যুদ্ধজাহাজের গোলন্দাজদের। চল এখানে আর থাকা নয়—এই চীনাপাড়াটা ওদের লক্ষ্য।

কিন্তু ওদের যাওয়া হল না। এ্যালিসের কথা শেষ হতে না-হতেই, যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্পে, পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল এবং একসঙ্গে দু-তিনটি শেলের বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ ও সেইসঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া ও বিশ্রী শ্বাসরোধকারী কর্ডাইট-এর উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল। তুমুল হৈচৈ, আর্তনাদ, কলরব ও পুলিশের হুইসলের মাঝে এ্যালিসের হাত ধরলে বিমল, মিনির হাত ধরলে সুরেশ্বর, কিন্তু পালাবার পথ নেই তখন কোনো দিকেই। ওদের ট্যাক্সিখানা দাঁড়িয়ে আছে বটে, ট্যাক্সিওয়ালার সন্ধান নেই—সে বোধহয় পালিয়েছে।

চা-পেই পল্লির ওপর কেন বিশেষ লক্ষ্য জাপানি তোপের, এ-কথা বোঝা গেল না, কারণ এখানে চীনা গৃহস্থদের বাড়িঘর মাত্র, কোনো সামরিক ঘাঁটি তো নেই এখানে। দেখতে দেখতে বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে পড়ে সামনের-পেছনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন আগে যা কিছু মারা পড়েছিল—এখন সবাই পালিয়েছে, কেবল যারা ভাঙা বাড়ির মধ্যে আটকে পড়েছে তাদেরই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

একটা ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেন ছোট ছেলের কান্নার শব্দ। এ্যালিস বল্লে—দাঁড়াও বিমল—এখানে সবাই দাঁড়াও।

গোলাবর্ষণ তখনও চলছে, কিন্তু চীনাপল্লির অন্য অঞ্চলে। এদিকে এখন শুধু গোঙানি, চিৎকার, হৈচৈ, কলরব ও কাতরোক্তি।

এ্যালিস আগে চড়ল গিয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপরে। পেছনে মিনি ও সুরেশ্বর। বিমল নিচে

দাঁড়িয়ে রইল। একটা কড়িকাঠ সরিয়ে ওরা তিনজনে একটা দরজা পেলে। তারপর একটা ছোট ঘর। এ্যালিস অতি কষ্টে ঘরে ঢুকল—সুরেশ্বর ওকে সাহায্য করলে। একটা ন-দশ মাসের শিশু সেই ঘরের মেঝেতে অক্ষত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

এ্যালিস তাকে সন্তর্পণে মেঝে থেকে তুলে সুরেশ্বরের হাতে দিলে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঘরটার মধ্যে অন্ধকার। তিনজনে ঘরের মধ্যে থেকে ইঁটকাঠের স্তূপটার ওপরে উঠে শুনলে, বিমল উত্তেজিত ভাবে ডাকছে—আঃ, কোথায় গেলে তোমরা? চট করে নেমে এস—বড় বিপদ!

চারিদিকের গোলা ফাটবার আওয়াজ ও ছুটন্ত শেলের চাপা 'শোঁ—ও—ও' রব খুব বেড়েছে। একটা একটা শেল মাঝে মাঝে আকাশেই সশব্দে ফেটে তারাবাজির মতো অনেকখানি আকাশ আলো করে ছড়িয়ে পড়ছে।

এ্যালিস বল্লে—কী হয়েছে?

বিমল বল্লে—জাপানি সৈন্যদল যুদ্ধজাহাজ থেকে নেমেছে শহরে—তারা শহর আক্রমণ করছে শুনছি। এইদিকেই আসছে। তাদের হাতে পড়া আদৌ আনন্দদায়ক ব্যাপার হবে না—তোমার হাতে ও কী?

মিনি বল্লে—একটা ছোট্ট ছেলে। একে কোথায় রাখি বল তো এখন?

সুরেশ্বর একজন ব্যস্ত ও উত্তেজিত পুলিশম্যানকে জিগ্যেস করে জানলে—সমুদ্রের ধারে জাপানি সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। জাপানিরা নগরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে।

এ্যালিস বল্লে—আমরা এখন ছোট ছেলেটিকে কোথায় রাখি বল-না? কনসেশনের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। ওর বাপ-মা এই অঞ্চলের অধিবাসী। ছেলের সন্ধান পাবে না কনসেশনে নিয়ে গেলে।

বিমল বল্লে—পুলিশম্যানদের জিম্মা করে দাও-না।

এ্যালিস ও মিনি তাতে রাজি হল না। এইসব চীনা পুলিশম্যান দায়িত্বজ্ঞানহীন, ওদের হাতে ছোট্ট ছেলেকে ওরা দেবে না।

সমস্ত গলিটা বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে—লোকজন অন্ধকারে তার মধ্যে কী সব খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময় পাশের একটা স্তূপে দু-তিনটি হারিকেন-লণ্ঠন ও টর্চ জ্বালিয়ে একদল ছোকরা একটি মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে বার করছে দেখা গেল।

বিমল উত্তেজিত সুরে বলে উঠল—প্রোফেসর লি! প্রোফেসর লি!

তার পরেই সে ছুটে গেল ছোকরার দলের দিকে। সুরেশ্বর দেখলে ছোকরার দলের নেতা হচ্ছেন দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ—এবং তিনি তাদের পূর্বপরিচিত প্রোফেসর লি।

সেই মুমূর্ষুদের আর্তনাদ ও পথের লোকের চিৎকারের মধ্যে তিনজনের ব্যাকুল প্রশ্ন বিনিময় হল। প্রোফেসর লি তাঁর ছাত্রদল নিয়ে নিকটেই এক সরাইখানায় ছিলেন—হঠাৎ এই বোমাবর্ষণের দুর্যোগ—এখন তিনি সেবাব্রতী, ছাত্রদের নিয়ে হতাহতদের টেনে বার করা ও তাদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

এ্যালিস ও মিনির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেওয়া হল।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি, এই ছোট ছেলেটির কী ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো?

সদানন্দ সৌম্য বৃদ্ধ হাত পেতে বল্লেন—আমায় দাও। তোমরা ওর বাপ-মায়ের সন্ধান করতে পারব না, আমি পারব। আর কী জান, ছেলে অনেকগুলো জমেছে—চ্যাং, এদের নিয়ে চল তো! দেখবে এস তোমরা—

যাবার পথে একটু দূর গিয়েই বিমল বলে উঠল—আঃ, কী ব্যাপার দেখ!

সকলেই দেখলে, সে-দৃশ্য যেমন বীভৎস তেমনি করুণ। সেই বৃদ্ধা ভিখারিণী ঠ্যাং ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে—সেই জায়গাতেই। একখানা হাত প্রায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—পাশেই তার ভিক্ষালব্ধ ভাত-তরকারিগুলো রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে। আশার জিনিসগুলো—মুখেও দিতে পারেনি হয়তো!

এ্যালিসের চোখে জল এল। বিমল ও সুরেশ্বর মাথার টুপি খুলে বসল। মিনি চোখে রুমাল দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালে। কেবল অবিচলিত রইলেন প্রোফেসর লি। তিনি ছাত্রদের বল্লেন, এই মড়াটাকে একটা কিছু ঢাকা দাও তো হে! এ আর কী? আমাদের দেশের এ তো রোজকার ব্যাপার! এতে বিচলিত হলে চলে না মাদাম!

নিকটেই একটা ঘরের মধ্যে প্রেফেসর লি ওদের নিয়ে গেলেন। হারিকেন-লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল সে-ঘরের মেঝেতে পাঁচ-ছয়টি নয়-দশ মাসের কি এক বছরের শিশু অনাবৃত মেঝের ওপর পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে।

এ্যালিস ছুটে গিয়ে তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বল্লে—ও' ইউ পুওর ডিয়ারিজ!

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—সন্ধ্যা থেকে এতগুলো উদ্ধার করেছি স্তূপ থেকে। আপনাদেরটিও দিন। আমার দুটি ছাত্র এখানে পাহারা দিচ্ছে—আমরা খুঁজে এনে এখানে জড়ো করছি—রাখ এখানে।

গোলমাল ও ভিড় এখন একটু কমেছে।

প্রোফেসর লি সকলকে বল্লেন—আসুন, একটু চা খাওয়া যাক—রাত্রে আর ঘুম হবে না আজ, সারারাত এইরকম চলবে দেখছি—

যে-ঘরে শিশুগুলিকে জড়ো করা হয়েছে, তার পাশেই একটা ছোট বাড়িতে লি থাকেন তাঁর ছাত্রবৃন্দ নিয়ে। দুজন ছাত্রকে শিশুদের কাছে রেখে বাকি সকলে ওদের নিয়ে গেল তাদের সেই বাসায়।

ছোট ছোট পেয়ালায় দুধ-চিনিবিহীন সবুজ চা, শসার বিচি ভাজা, শরবতি লেবুর টুকরো এবং বাঙালি মেয়েদের পাঁইজোরের মতো দেখতে, শুয়োরের চর্বিতে ভাজা একপ্রকার কী খাবার।

সুরেশ্বর ও বিমল শেষোক্ত খাবার ঠেলে রেখে দিলে, সে কী একধরনের বিশ্রী গন্ধ খাবারে!

প্রোফেসর লি বল্লেন—আপনারা বিদেশি। আমাদের দেশকে সাহায্য করতে এসেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের এখনও কিছুই দেখেননি, দেখলে আপনাদের দয়া হবে। এত গরিব দেশ আর এমন হতভাগ্য—

মিনি বল্লে—আমাদের সব দেখাবেন দয়া করে প্রোফেসর লি। দেখতেই তো এসেছি—

এ্যালিস বল্লে—আর একটা দেশ আছে প্রোফেসর লি। ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় পড়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে দুঃস্থ ভারতবর্ষের কথা শুনলে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়।

বিমল এ্যালিসের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে চাইলে—বড় ভাল লাগল এই বিদেশিনী বালিকার এই নিষ্কপট নিঃস্বার্থ সহানুভূতি তার দরিদ্র স্বদেশের জন্যে।

এ্যালিস বল্লে—শিশুগুলির কে আছে? পুওর লিট্‌ল্ মাইটস্। আমায় একটা খোকা দেবেন প্রোফেসর লি?

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—কি করবে মিস—

এ্যালিস বল্লে—আমাদের নাম ধরে ডাকবেন প্রোফেসর লি, ওর নাম মিনি, আমার নাম এ্যালিস। আমরা আপনাকে দাদু বলে ডাকব—কেমন?

এই সদানন্দ, উদার, সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধকে এ্যালিসের বড় ভাল লেগে গেল। কিউরিও দোকানে বিক্রি হয় যে-চিনেমাটির হাস্যমুখ বৃদ্ধ—বৃদ্ধের মুখখানা যেন তেমনি পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও প্রেমের ভাব মাখানো।

প্রোফেসর লি'র মুখ উদার হাসিতে ভরে গেল। বল্লেন—বেশ, তা-ই হবে।

একটা বড় রকমের আওয়াজের দিকে এই সময় প্রোফেসর লির জনৈক ছাত্র ওদের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলে।

বিমল বল্লে—বন্দরের দিকে এখনও গোলাবর্ষণ চলছে, হাতাহাতি যুদ্ধও চলছে—

ঠিক এই সময় পুলিশ্যম্যান ঘরের দোরের কাছে এসে চীনা ভাষায় কী জিজ্ঞেস করলে—লোকটা যেন খুব ব্যস্ত ও উত্তেজিত—সে চলে গেলে প্রোফেসর বল্লেন—ও বলে গেল খাওয়াদাওয়া শেষ করে কেউ যেন আজ ঘরের বার না হয়—বিশেষত মেয়েরা। জাপানিরা বেওনেট চার্জ করেছিল—আমাদের সৈন্যরা হটিয়ে দিয়েছে শেনসু প্রাচীরের পূর্ব কোণে। কিন্তু আজ রাত্রে আবার ওরা গোলা মারবে, বোমাও ছুঁড়বে।

চা পান শেষ হল। বিমল বল্লে—প্রেফেসর লি, মেয়েরা রয়েছেন সঙ্গে, আজ যাই। কনসেশনে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

এ্যালিস বল্লে—দাদু, আমার একটা খোকা?

প্রোফেসর লি এ্যালিসের মাথায় হাত দিয়ে খেলার ছলে সস্নেহে বল্লেন—বেওয়ারিশ যদি কোনো খোকা থাকে, পাবে এ্যালিস। কিন্তু কী করবে চীনা ছেলে নিয়ে?

এ্যালিসের এ-হাস্যকর অনুরোধ শুনে মিনি তো হেসেই খুন।

—চল চল এ্যালিস, কনসেশনে একটা জ্যান্ত খোকা নিয়ে তোমায় ঢুকতেই দেবে কি?

ওরা যখন ফিরে আসছে, দূরে মাঝে মাঝে দুমদাম বিস্ফোরণের শব্দ এবং সাহায্যকারী এরোপ্লেনের হাউইয়ের সাদা অগ্নিময় ধূম দেখা যাচ্ছিল। তবে যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

সেই রাত্রে কিসের বিষম আওয়াজে বিমলের ঘুম ভেঙে গেলে—সে ধড়মড় করে উঠে বিছানার ওপর বসল—কর্ডাইটের শ্বাসরোধকারী ধূমে ও বিশ্রী গন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে।

ও ডাকলে—সুরেশ্বর—সুরেশ্বর—ওঠো—কনসেশনে বোমা পড়ছে!

সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট হৈচৈ উঠল চারিদিকে।

বোমা! বোমা!

ওরা জানলা দিয়ে দেখলে, যে-ঘরের মধ্যে ওরা শুয়ে ছিল—তার পুবদিকে আর একটা ঘরের দেওয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই গোলমালের মধ্যে ভিড় ঠেলে এ্যালিস ছুটতে ছুটতে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকলে—বিমল! বিমল!

বিমল বল্লে—এই যে এ্যালিস, তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি? মিনি কোথায়?

বলতে বলতে মিনিও ঘরে ঢুকল। বল্লে—বাইরে এস, দেখ শিগগির—চট করে এস—

ওরা বাইরে গেল। কনসেশনের পুলিশের ডেপুটি মার্শাল এসে পৌঁছেছেন দুর্ঘটনার স্থানে। সবাই আকাশের দিকে চাইলে, দুখানা এরোপ্লেন চলে যাচ্ছে—অলো নিবিয়ে। জনৈক ফরাসি কর্মচারী দেখে বললে—কাওয়াসাকি বম্বার!

বিমল বল্লে—এ্যালিস, কী করে চেনা গেল জিগ্যেস করো-না!

মিনি বল্লে—আমি জানি। নিচের দিকে উইং-এ কালো আঁজিকাটা ছুঁচোমুখ প্লেন—এই

হল জাপানিদের বিখ্যাত বোমা ফেলবার প্লেন কাওয়াসাকি বম্বার। কিন্তু কনশেসনে বোমা! এরকম তো কখনও—

সে-রাত্রে আর কারো ঘুম হল না। বিমল খুব খুশি না হয়ে পরলে না, তার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে এ্যালিসের এত আগ্রহদৃষ্টি দেখে। সেই রাত্রে বোমা পড়েছে শুনে এ্যালিস সকলের আগে এসেছে তাকে দেখতে, সে কেমন আছে!

শেষরাত্রের দিকে সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু শোরগোলে ওদের ঘুম ভেঙে গেল।

ভীষণ গোলাবর্ষণের শব্দ আসছে—সাংহাই শহরে জাপানি যুদ্ধজাহাজ ও এরোপ্লেন থেকে একযোগে গোলা ও বোমাবৃষ্টি হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে সাংহাই শহর থেকে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে পালিয়ে আসছে কনশেসনে—বাক্স-তোরঙ্গ, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে। এদের সবারই মুখে ভীষণ ভয়ের চিহ্ন—এদের চক্ষু উদ্বেগে ও রাত্রিজাগরণে রক্তবর্ণ, চুল রুক্ষ, পাশব বলের কাছে মানুষের কী শোচনীয় পরাজয়!

বেলা দশটার মধ্যে ব্রিটিশ কনশেসনের হাসপাতাল ও মার্কিন রেডক্রসের বড় হাসপাতাল আহতের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কী ভীষণ আওয়াজ ও গোলমাল শেনসু প্রাচীরের দিকে, সমুদ্রের থেকে মাইল দুই দূরে পূর্ব কোণে। সেখানে চীনা টেন্থ-রুট আর্মির সঙ্গে জাপানি নৌ-সৈন্যদের যুদ্ধ চলছে। কনশেসন থেকে যুদ্ধস্থলের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল, বিমল জিজ্ঞেস করে জানলে। এ ছাড়াও গোলাবর্ষণ চলছে শহরের বিভিন্ন স্থানে।

টেলিফোনে অর্ডার এল মেডিকেল ইউনিটের বড় ডাক্তারের কাছে থেকে—বিমল, সুরেশ্বর, এ্যালিস ও মিনিকে চ্যাং-লীন অ্যাভিনিউতে চীনা সামরিক হাসপাতালে যাবার জন্যে।

ওরা আমেরিকান রেডক্রস মোটরে সামরিক হাসপাতালের দিকে ছুটল। ড্রাইভার খুব বড় একটা রেডক্রস পতকা গাড়ির বনেটে উড়িয়ে দিলে—এ ছাড়া গাড়ির ছাদের বাইরের পিঠে সারা ছাদ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড লাল ক্রস আঁকা। এত সাবধানতা সত্ত্বেও ড্রাইভার বল্লে—যদি আপনারা হাসপাতালে পৌঁছতে পারেন, সে খুব জোর বরাত বুঝতে হবে আপনাদের।

সুরেশ্বর ও বিমল একযোগে বল্লে—কেন?

—কনশেসন বা রেডক্রস কিছুই মানছে না। জাপানি বোমারু প্লেন কালও আমাদের রেডক্রস ভ্যানে বোমা ফেলেছে—শোনেননি আপনারা সে-কথা?

সে-কথা না শোনাই ভাল। ওদের মোটর কনশেসন থেকে বার হয়ে খানিকটা ফাঁকা মাঠ দিয়ে তীরবেগে ছুটল। বিমল দেখলে ড্রাইভার মাঝে মাঝে উপরের দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চেয়ে কী দেখছে।

বিমল বল্লে—কী দেখছ?

—বোমারু প্লেন আসছে কি না দেখছি! এখন আপনাদের পৌঁছে দিতে পারব কি না জানি নে—তবে চেষ্টা করব—

বলতে বলতে একখানা এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনা গেল মাথার ওপর। বিমলের মুখ শুকিয়ে গেল—সামনে উদ্যত মৃত্যুকে কে না ভয় করে? সবাই ওরের দিকে চাইলে। ড্রাইভার অ্যাক্সেলারেটর পা দিয়ে চেপে স্পীড তুললে হঠাৎ বেজায়।

বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনখানা যেন আরও নিচে নামল—কিন্তু ভাগ্যের জোরেই হোক বা অন্য কারণেই হোক—শেষ পর্যন্ত সেখানা ওদের ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে চলে

গেল।

ড্রাইভার বল্লে—জাপানি কাওয়াসাকি বম্বার—ভীষণ জিনিস—নিচু হয়ে দেখলে এ-গাড়িতে চীনেম্যান আছে কি না, থাকলে বোমা ফেলত।

সুরেশ্বর বল্লে—উঃ, কানের কাছ দিয়ে তীর গিয়েছে!

এতক্ষণ যেন গাড়ির সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে ছিল, এইবার একযোগে নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

হাসপাতালে পৌঁছে দেখলে সেখানে এত আহত নরনারী এনে ফেলা হয়েছে যে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই। এদের বেশির ভাগ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা। যুদ্ধের সৈন্যও আছে—তবে তাদের সংখ্যা তত বেশি নয়।

একটি দশ-এগারো বছরের ফুটফুটে সুন্দর-মুখ বালকের একখানা পা একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে—আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটি তখনও বেঁচে আছে এবং কিছুক্ষণ আগে অজ্ঞান হয়ে থাকলেও এখন তার জ্ঞান হয়েছে এবং যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করছে। বিমলের ওয়ার্ডেই সে-বালকটি আছে। এ্যালিস সেই ওয়ার্ডেই নার্স।

এ্যালিস পেশাদার নার্স নয়, বয়সেও নিতান্ত তরুণী, চোখের জল রাখতে পারলে না ছেলেটির যন্ত্রণা দেখে। বিমলকে বল্লে—একে মরফিয়া খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখ-না!

বিমল বল্লে—তা উচিত হবে না। ওকে এখুনি ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান করে পা কেটে ফেলতে হবে। অপারেশন-টেবিল একটাও খালি নেই, সব ভর্তি। একটা টেবিল খালি পেলেই ওকে চড়িয়ে দেব।

এ্যালিস বালকটির শিয়রে বসে কতরকমে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে—কিন্তু ওদের সবারই মুশকিল চীনা ভাষা সামান্য এক-আধটু বুঝতে-পারলেও বলতে আদৌ পারে না।

সুরেশ্বর হাসপতালে ঔষধালয়ে সহকারী কম্পাউন্ডার হয়েছে। সে দুখানা চীনা বর্ণপরিচয় কোথা থেকে যোগাড় করে এনে ওদের দিয়েছে। এ্যালিস বল্লে—সুরেশ ঠিক বলছিল সেদিন, এস—তুমি, আমি, মিনি ভাল করে চীনে ভাষা শিখি, নইলে কাজ করতে পারব না—

আর্ত বালকটির শয়নশিয়রে এ্যালিসকে যেন করুণাময়ী দেবীর মতো দেখাচ্ছে, বিমল সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না! এ্যালিসের প্রতি শ্রদ্ধা তার মন ভরে উঠল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় টেবিল খালি হল।

বালকটিকে টেবিলে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েছে, কতকগুলি ডাক্তারি ছাত্র কিছুদূরে একটা গ্যালারিতে বসে আছে, হাসপাতালের সহকারী সার্জন চীনাম্যান, তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে কী বলছেন আর একজন ছাত্র ক্লোরোফর্ম পাম্প করছে। বিমল ও এ্যালিস সার্জনকে সাহায্য করবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। সার্জন হেসে বললেন, সকাল থেকে অপারেশন টেবিলে মরেছে একুশটা, টেবিল থেকে নামাবার তর সয়নি—গরম জলটা সরিয়ে দাও নার্স—

এমন সময়ে মাথার ওপরে কোথায় এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

বাইরে যারা ছিল, তারা দৌড়ে ভেতরে এল, একটা ছুটোছুটি শুরু হল চারিদিকে। কে একজন বল্লে—জাপানি বম্বার।

এ্যালিস বল্লে—রেডক্রসের লাল আলো জ্বলছে বাইরে—হাসপাতাল বলে বুঝতে পারবে—

সার্জন হেসে বল্লে—নার্স, ওরা কি কিছু মানছে?—শক্ত করে ধরে থাকো তুলটা—

বালক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সার্জন ক্ষিপ্র ও কৌশলী হাতে ছুরি চালাচ্ছেন। বিমল নাড়ি ধরে আছে।

বুম-ম-ম-ম!—বিকট বিস্ফোরণের শব্দ কোথাও কাছেই। তুমুল গোলমাল, হৈচৈ, আর্তনাদ, হাসপাতালের বাঁদিকের অংশে বোমা পড়েছে। উগ্র ধোঁয়া ও নাইট্রোগ্লিসিরিনের গন্ধে ঘর ভরে গেল। সার্জন, বিমল বা এ্যালিসের দৃষ্টি কোনদিকে নেই—ওরা একমনে কাজ করছে। সার্জন দৃঢ় অবিকম্পিত হস্তে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন তাঁর অপারেশন-টেবিলের থেকে এক শ্যে গজের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটেনি, যেন তিনি মোটা ফি নিয়ে বড়লোক রোগীর বাড়ি গিয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে ব্যস্ত ; গরম জলের পাত্রে ডোবানো ছুরি, ফরসেপ ছুঁচ ক্ষিপ্রহস্তে একমনে সার্জনকে যুগিয়ে চলছে এ্যালিস, একমনে ব্যান্ডেজের সারি গুছিয়ে রাখছে, পাতলা লিন্ট-কাপড়ে মলম মাখাচ্ছে। বিমল নাড়ি ধরে আছে।

বাইরে বিকট শব্দ—হুড়মুড় করে হাসপাতালের বাঁদিকের উইং-এর ছাদ ভেঙে পড়ল। মহাপ্রলয় চলেছে সেদিকে—

সার্জন বল্লেন—নাড়ির বেগ কত?

বিমল—সত্তর।

কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—স্যার, বাঁদিকের উইং গুঁড়ো হয়ে গোটা সেপটিক-ওয়ার্ডের রোগী চাপা পড়েছে—এদিকেও বোমা পড়তে পারে—তিনখানা বম্বার—

সার্জন বল্লেন—পড়লে উপায় কী? সার্স, বড় ফরসেপটা—

উগ্র ধোঁয়ায় সবারই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! আর একটা শব্দ অন্য কোন দিকে হল—আর একটা বোমা পড়েছে—বেজায় ধোঁয়া আসছে ঘরে।

বিমল বল্লে—স্যার, ধোঁয়ায় রোগী দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে! ক্লোরোফর্মের রোগী, এভাবে কতক্ষণ রাখা যাবে?

সার্জন ছুরি ফেলে বল্লেন—হয়ে গিয়েছে। লিন্ট দাও, নার্স।

বিমল বল্লে—স্যার, রোগীর নাড়ি নেই। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

সার্জন এসে নাড়ি দেখলেন। এ্যালিস নীরবে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নাড়ি থেকে হাত নামিয়ে সার্জন গম্ভীরমুখে বল্লেন—বাইশটা পুরোল।

এ্যালিস নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে বল্লেন—চল নার্স, স্ট্রেচারওয়ালারা এসে লাশ নিয়ে যাবে—এখন সবাই বাইরে চল যাই—

ওপরওয়ালার আদেশ পেয়ে বিমল আগে এ্যালিসের কাছে এল এবং তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে ধূম্রলোক থেকে উদ্ধার করে ডানদিকের বড় দরজা দিয়ে কম্পাউন্ডের খোলা হাওয়ায় নিয়ে এল।

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেই এ্যালিসকে বল্লে—ঐ দেখ এ্যালিস, তিনখানা জাপানি বম্বার!—

এগারো ঘণ্টা সমানে ভিউটিতে থাকবার পরে বিমল, এ্যালিস, সুরেশ্বর ও মিনি বাইরের ফুটপাথে পা দিলে।

চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউ প্রসিদ্ধ দেশনায়ক চ্যাং সো লীনের নামে হয়েছে—রেডশার্টদের প্রভাবে। সাংহাইয়ের মধ্যে এটা একটি প্রসিদ্ধ রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুটপাথে শামিয়ানার নিচে

চা ও শূওরের মাংসের দোকান। লোকজনের বেজায় ভিড়।

এই অ্যাভিনিউয়ের ধারেই গভর্নমেন্ট হাসপাতাল। ওরা যখন ফুটপাথে পা দিলে, তখন হাসপতালের বাঁ অংশে মহা হৈচৈ চলছে। সেপটিক-ওয়ার্ড জাপানি বোমায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—সম্ভবত একটা রোগীও বাঁচেনি সে-ওয়ার্ডে।

মিনি দেখতে যাচ্ছিল—বিমল বারণ করলে।

—ওদিকে গিয়ে দেখে আর কী হবে মিনি? চল আগে কোথাও একটু গরম চা খাওয়া যাক।

বোমা ফেলা ও হত্যা ব্যাপারটা দেখে দেখে কদিনে ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। শুধু ওদের নয়, সাংহাই-এর লোকজন, দোকানি, পথিকদেরও। নতুবা গত আধঘণ্টা ধরে হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণ চলছে, চোখের সামনে এই ভীষণ প্রলয়লীলা ও মাথার ওপরে চক্রাকারে উড়নশীল তিনখানা জাপানি বম্বারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউর চায়ের দোকান, মাংসের দোকান, ভাত-তরকারির দোকান সব খোলা। লোকজনের দিব্যি ভিড়।

রাত পৌনে আটটা।

হঠাৎ এ্যালিস জিগ্যেস করলে—ছেলেটি মারা গেল, তখন ক'টা?

বিমল বল্লে—ঠিক সাড়ে সাতটা। ও-কথা ভেবো না এ্যালিস। চল আর একটু এগিয়ে। এক্ষুনি লাশ নিয়ে যাওয়ার ভ্যান আসবে হাসপাতালে। আমরা একটু তফাতে যাই।

একটা শামিয়ানার নিচে ওরা চা খেতে বসল।

দোকানের মালিক একজন রোগা চেহারার চীনা স্ত্রীলোক। সে এসে পিজিন ইংলিশে বল্লে—কী দেব?

বিমল বল্লে—খাবার কী আছে?

—ভাজা মাছ, রুটি, মাখন আর ব্যাঙের—

—থাক থাক, রুটি মাখন ভাজা মাছ নিয়ে এস—

রুটি-মাখন অন্যত্র চীনা দোকানে পাওয়া যায় না ; তবে চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউর দোকানগুলো কিছু শৌখিন ও বিদেশি-ঘেঁষা। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বিমল একটা আরামের নিশ্বাস ফেললে। সুরেশ্বর তো গোগ্রাসে রুটি ও মাখনের সদ্ব্যবহার করতে লাগল, খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই।

মিনি বল্লে—একটা গল্প বলি শোনো সবাই। আমি তখন স্কুলে পড়ি, মেল্টেনে, কালিফোর্নিয়ায়। আমার বাবা আমায় একটা চিনচিলো কিনে দিয়েছিলেন—

সুরেশ্বর বল্লে—সে কী?

মিনি হেসে বল্লে—জান না? একরকম ছোট কাঠবিড়ালির চেয়ে একটু বড় জানোয়ার, খুব চমৎকার লোম গায়ে—লোমের জন্যে ওদের শিকার করা হয়। তারপর আমার সেই পোষা চিনচিলাটা—

বুম-ম-ম!—বিকট আওয়াজ!

সবাই চমকে উঠল—তিনখানা বাড়ির পরে একটা বাড়ির ওপরে জাপানি বম্বার ঘুরছে দেখা গেল—কিন্তু ধোঁয়া উড়ছে বাড়িটার সামনের রাস্তা থেকে। লোকজন দেখতে দেখতে যে যেখানে পারলে আড়ালে ঢুকে পড়ল! একটু পরে একখানা রিকশা টেনে দুজন লোককে সেদিক থেকে ওদের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেল—রিকশায় আধশোয়া আধবসা অবস্থায় একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। তার মুখটা থেঁতলে রক্ত গড়িয়ে বুকের সামনে জামাটা

রাঙিয়ে দিয়েছে।

শামিয়ানার নিচে আরও তিনটি চীনা খদ্দের বসে চা খাচ্ছিল। তারা উত্তেজিতভাবে চীনা ভাষায় দোকানিকে কী বল্লে। দোকানিও তার কী জবাব দিলে, তরা পরে ওদের মধ্যে একজন একটা সিগারেট ধরালে।

জাপানি রোমারু প্লেন ঘরঘর শব্দ করে যেন ওদের মাথার ওপরে ঘুরছে। বিমল একবার চেয়ে দেখলে। নাঃ, একটু দূরে বাঁদিকে। ঠিক মাথার ওপরে নয়।

মিনি বল্লে—তারপর শোনো, আমার সেই চিনচিলাটা—

এ্যালিস অধীরভাবে বল্লে—আঃ মিনি, থাক চিনচিলার গল্প। খাও এখন ভাল করে। আমার তো বেজায় ঘুম পাচ্ছে! বিমল, দোকানিকে জিগ্যেস করো—না, স্যান্ডউইচ রাখে না?

বিমল বল্লে—ব্যাঙের মাংসের স্যান্ডউইচ বলছে এ্যালিস—দিতে বলব?

সুরেশ্বর ও মিনি একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের খাবার জায়গাটা তীব্র সার্চলাইটের আলোয় আলো হতেই ওরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। ভীষণ ধ্বংসের যন্ত্র সেই চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জাপানি বম্বারখানা থেকে রাস্তার যে-অংশে ওরা বসে চা খাচ্ছে, সেদিকে সার্চলাইট ফেলেছে।

দোকানি চীনা স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে উঠে কী বললে।

সঙ্গে সঙ্গে হুড় হুড় দুড় দুড় শব্দ—তিনজন চীনা খদ্দের ও রাস্তার পথিকদের মধ্যে জনদুই ছুটে এসে বিমলদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে মাথা গুঁজে বসে পড়ল।

মিনি বল্লে—আঃ, এগুলো কী বোকা! টেবিলের তলায় বাঁচবে এরা, আমার পেয়ালাটা উল্টে ফেলে দিলে মাঝ থেকে—

এ্যালিস বল্লে—আমারও। দোকানি, তোমার চায়ের দাম নিয়ে নাও, আমরা অন্য জায়গায় চা খেতে যাই—এ কী রকম উপদ্রব!

বিমল বল্লে—ঠিক তো! মহিলাদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে উৎপাত! বোমা খাবি রাস্তায় দাঁড়িয়ে খা ভদ্রলোকের মতো—

মিনি হঠাৎ আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে বল্লে—ঐ দেখ, দেখ—

তিনখানা চীনা এরোপ্লেন তিনি দিকে জাপানি বম্বারখানাকে তাড়া করছে। একখানা চীনা প্লেন বম্বারখানার খুব কাছে এসে পড়েছে—একটু পরেই সেখানা থেকে মেশিনগানের পট পট আওয়াজ শোনা গেল—পিছনের আর একখানা চীনা সাহায্যকারী প্লেন ওদের ওপরে নীলাভ তীব্র সার্চলাইট ফেলতেই জাপানি বম্বারখনা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

ততক্ষণ সবাই আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে আকাশের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা দেখছে। আরও দুজন চীনা খদ্দের অন্য টেবিলে চা খেতে বসে গেল। দোকানি স্ত্রীলোকটি তাদের খাবার দিলে। মিনি তাদের টেবিলের দিকে চেয়ে বল্লে—ওই ওরা ব্যাঙের স্যান্ডউইচ খাচ্ছে—

মেশিনগানের আওয়াজ তখন বড় বেড়েছে। জাপানি প্লেনখানা পাক দিয়ে ঘুরছে। হঠাৎ পালাবে না।

বিমল বল্লে—না ; একটু নিরিবিলি চা খেতে এলাম আর অমনি মাথার ওপরে চীন-জাপানের যুদ্ধ বেধে গেল—পোড়া বরাত এমনি—

একজন ফিরিওয়ালা এসে শামিয়ানার বাইরে দাঁড়িয়ে বল্লে—মোমের ফুল—খুব চমৎকার মোমের ফুল—গোলাপ, ক্রিসেনথিমাম, গাঁদা—ভারি—সস্তা মোমের ফুল—

এমন সময় একজন খবরের কাগজওয়ালা 'সাংহাই ডেলি নিউজ' বলে হেঁকে যাচ্ছে দেখে বিমল ডেকে একখানা কাগজ কিনলে। এ-কাগজের একদিকে চীনা ভাষায় ও অন্য দিকে ইংরাজি ভাষায় লেখা খবর—চীনাদের পরিচালিত।

রাস্তায় লোক ভিড় করে কাগজ কিনছে, কাগজ এইমাত্র বেরিয়েছে, এ-বেলায় যুদ্ধের খবর নিয়ে—সবাই যুদ্ধের খবর জানতে চায়।

এ্যালিস বল্লে—যুদ্ধের খবর কী?

তারপর সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা পড়ে দেখতে লাগল। শেনসু প্রাচীরের কাছে জাপানি সৈন্য চীনাদের কাছে ধাক্কা খেয়ে হটে গিয়েছে। জাপানিদের বহু সৈন্য মারা পড়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—সর্বৈব মিথ্যা। জাপানিরা জিতছে। ভুল খবর দিচ্ছে আমাদের, পাছে শহরে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দেখছ না বোমা ফেলবার কাণ্ড? চীনারা জিতছে! ফুঃ—

ওদের অত্যন্ত আশ্চর্য মনে হল, মাত্র তিন মাইল দূরে শেনসু প্রাচীরের কাছে যুদ্ধ চলছে, অথচ ওদের খবরের কাগজ পড়ে জানতে হচ্ছে যুদ্ধের ফলাফল, যেমন কলকাতায় বসে বা আমেরিকায় বসে লোকে জেনে থাকে। তিন মাইল দূরে থেকেও বোঝবার কোনো উপায় নেই যুদ্ধের আসল খবরটা কী। চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষ যে-সংবাদ পাঠাচ্ছে সেই সংবাদই ছাপা হচ্ছে। এই রকমই হয় সর্বত্রই, অথচ খবরের কাগজের পাঠকেরা তা জেনেও জানে না। খবরের কাগজে লিখিত সংবাদ বাইবেল বা পুরাণের মতো অভ্রান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেয়, এইটেই আশ্চর্য। এ-সম্বন্ধে ওদের অভিজ্ঞতা আরও পরে যা হয়েছিল তা আরও অদ্ভুত।

কাগজের এক কোণে একটি সংবাদের দিকে মিনি ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে। মার্শাল চিয়াং কৈ শাক চা-পেই পল্লির বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আসবেন রাত ন'টার সময়ে।

মিনি হাতঘড়ি দেখে বল্লে—এখন পৌনে ন'টা।

বিমল বল্লে—তা হলে হাসপাতালেও যাবেন, চল আমরা হাসপাতালে ফিরি। মার্শাল চিয়াংকেও কখনও দেখিনি, দেখা যাবে এখন।

এমন সময়ে ওদের সামনের রাস্তায় একটা হৈচৈ উঠল। রাস্তার দু'ধারে লোকজন সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চীনা পুলিশম্যান রাস্তার মাঝখানের লোক হটিয়ে দিলে। এক মিনিটের মধ্যে পরপর ছ'খানা মোটরকার দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। রাস্তার জনতা চীনা ভাষায় চিৎকার করে বলে উঠল—'মহাচীনের জয়! মার্শাল চিয়াং-এর জয়! টেনথ রুট আর্মির জয়!'

এ্যালিস বল্লে—এই মার্শাল চিয়াং গেলেন।

বিমল বল্লে—তবে আর হাসপতালে এখন ফিরে কী হবে? চল কনশেসনে ফিরি। রাত হয়েছে, এ-অঞ্চল এখন রাত্রে বেড়াবার পক্ষে নিরাপদ নয়। জাপানি বোমা তো আছেই, তা ছাড়া তার চেয়েও খারাপ চীনা দস্যুদের উপদ্রব। সঙ্গে মেয়েরা—

সুরেশ্বর বল্লে—তা ছাড়া ঘুমুতেও তো হবে। কাল সকাল থেকে আবার ডিউটি—

মেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

কনশেসনে ফিরবার পথে ওদের এক বিপদ ঘটল।

কনশেসনে ফিরবার পথে ওরা চ্যাং লো লীন অ্যাভিনিউ দিয়ে খানিকটা এসে পড়ল একটা জনবহুল পাড়াতে। সেখানে দুখানা রিকশা ভাড়া করে ওরা তাদের কনশেসনে যেতে বল্লে। তারপর ওরা গল্প ও গুজবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—যখন ওরা আবার রাস্তার দিকে

নজর করলে তখন দেখলে রিকশা একটা নির্জন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। দু'ধারে দরিদ্র লোকদের কাঁচা মাটির খাপরা-ছাওয়া ঘর। রাস্তা জনশূন্য—দূরে দূরে খোলা মাঠের মধ্যে কী যেন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে।

বিমল বল্লে—এ কোথায় নিয়ে এসে ফেল্লে হে?

সুরেশ্বর পিজিন ইংলিশে একজন রিকশাওয়ালাকে বল্লে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে? এ-পথ তো নয়!

রিকশাওয়ালা কোনো উত্তর না দিয়েই জোরে ছুটতে লাগল।

বিমলের মনে সন্দেহ হল। সে বল্লে—এর মনে কোনো বদমাইশি মতলব আছে মনে হচ্ছে। আমরা তো একেবারে নিরস্ত্র। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে—

মিনি ও এ্যালিস তখন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। ওরাও বল্লে—আর গিয়ে দরকার নেই—চীনা গুণ্ডা এই সময় দেশ ছেয়ে ফেলেছে। নামো এখানে সব।

দুখানা রিকশাই পাশাপাশি যাচ্ছিল। এবার মিনিদের রিকশাখানা এগিয়ে গেল এবং বিমল কিছু বলবার পূর্বেই রিকশাখানা হঠাৎ পথের মোড় ঘুরে পাশের একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বিমলদের রিকশাখানা কিন্তু তখন সোজা রাস্তা বেয়েই দ্রুত চলেছে। বিমলের ও সুরেশ্বরের চিৎকারে সে আদৌ কর্ণপাত করলে না।

বিমল লাফ দিয়ে রিকশাওয়ালার ঘাড়ে পড়ল রিকশা থেকে। রিকশাখানা উল্টে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সুরেশ্বর রিকশার সঙ্গে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল। রিকশাওয়ালাটা সেখানে বসে পড়ল—ওর ওপর বিমল!

রিকশাওয়ালাটা একটু পরেই গা ঝেড়ে উঠে, চীনা ভাষায় কী একটা দুর্বোধ্য কথা বলে উঠে, ওদের দিকে এগিয়ে এল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠল—সুরেশ্বর, সাবধান!

রিকশাওয়ালার হাতে একখানা বড় চকচকে ছোরা দেখা গেল।

সুরেশ্বর পেছন থেকে তাকে জোরে এক ধাক্কা লাগালে। সে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আবার বিমলেরই উপর। বিমলের সঙ্গে তার ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হল। বিমলের রীতিমতো শরীরচর্চা করা ছিল। মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যে রিকশাওয়ালাকে মাটিতে ফেলে, বিমল তার হাত মুচড়ে ছোরাখানা টান দিয়ে ফেলে বল্লে—ওখানা তুলে নাও সুরেশ্বর—তারপর বদমাইশটার গলায় বসিয়ে দাও—

ছোরা হাত থেকে খসে যাওয়াতে বদমাইশটা নিরুৎসাহ ও ভীত হয়ে পড়ল—এইবার ছোরা বসানোর কথা শুনে, সে বিমলের কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলে। সব ব্যাপারটা ঘটে গেল পাঁচ-ছ' মিনিটের মধ্যে।

বিমল ঝেড়ে উঠে একটু দম নিয়ে বল্লে—সুরেশ্বর, মেয়েদের গাড়িখানা!

তারপর ওরা দুজনেই ছুটল সেই গলিটার দিকে—যেটার মধ্যে মিনিদের রিকশাখানা ঢুকেছে। গলিটা নিতান্ত নোংরা, দু'ধারে কাঁচা টালির ছাদওয়ালা নিচু নিচু বাড়ি—কিছু দূরে একটা সাধারণ স্নানাগার—এখানে নীচশ্রেণীর মেয়ে-পুরুষে সাধারণত স্নান করে না—করলেও রাত্রে করে। স্নানাগারের সামনে দুজন চীনেম্যান দাঁড়িয়ে আছে দেখে, বিমল তাদের পিজিন ইংলিশে জিজ্ঞেস করলে—একখানা রিকশা কোন দিকে গেল দেখেছ?

তাদের মধ্যে একজন বল্লে—ওই বাড়িটার সামনে একখানা রিকশা দাঁড়িয়েছিল একটু আগে।

বিমল ও সুরেশ্বর বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বিমল বল্লে—চল বাড়ির মধ্যে ঢুকি—

ঘরটায় ঢুকেই ওদের মনে হল, এটা একটা চণ্ডুর আড্ডা। ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটা চীনাবাঁশের চেয়ার, একদিকে একটি নিচু বাঁশের তক্তপোশ। চণ্ডু খাবার লম্বা নল, ছিটেগুলি গালার বড় পাত্রে, চণ্ডুর আড্ডার সব জিনিসই মজুদ। দেওয়ালে চীনা দেবতার ভীষণ প্রতিকৃতি। ঘরটি লোকশূন্য, নির্জন। এ-ধরনের চণ্ডুর আড্ডা ওরা সিঙ্গাপুরে দেখেছে! কিন্তু বাড়ির লেকেজন কোথায়? বিমল ও সুরেশ্বর বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল।

একটা বড় ঘরের মধ্যে অনেকগুলো লোক বসে মা জং খেলছে। বিমল বুঝতে পারলে, জায়গাটা শুধু চণ্ডু নয়, নীচশ্রেণীর জুয়াড়িদের আড্ডাও বটে। ওদের দেখে দুজন লোক উঠে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একজন কর্কশ কণ্ঠে পিজিন ইংলিশে বল্লে—কী চাই? কে তোমরা? বিমলের মাথায় চট করে এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে কর্তৃত্বের গ্রামভারি চালে বল্লে, আমরা ব্রিটিশ কনশেসনের পুলিশের লোক। আমাদের সঙ্গে দশজন কন্স্টেবল গলির মোড়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ও রিভলবার আছে। দুজন মেমসাহেবকে এই আড্ডায় গুম করা হয়েছে—বার করে দাও, নইলে আমরা জোর করে ভেতরে ঢুকে সন্ধান করব। দরকার হলে গুলি চালাব।

এবার একজন প্রৌঢ় লম্বা ধরনের লোক এক কোণ থেকে বলে উঠল—আমর কনশেসনের পুলিশ মানিনে—সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের সই-করা ওয়ারেন্ট দেখাও—

বিমল বল্লে—তুমি জান এটা যুদ্ধের সময়। আমরা জোর করে ঢুকব এবং দরকায় হোলে এই মা জং-এর জুয়ার আড্ডার প্রত্যেককে গেপ্তার করে সাংহাই পুলিশের হাতে দেব-এর জন্যে যদি কোনো কৈফিয়ত দিতে হয় পুলিশ মার্শালের কাছে আমরা দেব—তুমি মেমসাহেবদের বার করে দেবে কি না বল—

লোকটা বল্লে—কোন মেমসাহেবের কথা বলছ? মেমসাহেবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কী? আমি ভাবছিলাম, তুমি জুয়া আর চণ্ডুর আড্ডা হিসেবে সার্চ করবে বলছ।

বিমল বল্লে—বেশি কথায় সময় নষ্ট করতে চাইনে—তা হলে আমাদের জোর করতে হল—সুরেশ্বর কনস্টেবলদের ডাকো—

হঠাৎ চিৎকার করে সে বলে উঠল—মাথা নিচু করে বসে পড়—বসে পড় সুরেশ।

শাঁ করে একটা শব্দ হল এবং ঝকঝকে কী একটা জিনিস ওদের চোখের সামনে এক ঝলক খেলে গেল—ওরা তখন দুজনেই বসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেছনে দেওয়ালে, একটা ভারি জিনিস ঠক করে লাগবার শব্দ হল।

সুরেশ্বর পিছন ফিরে চকিতে চেয়ে দেখলে—একখানা বাঁকা ধারালো চকচকে চীনেছোরা, ছুঁড়ে-মারা, ছোরা ছুঁড়ে মারবার জন্যেই এগুলি ব্যবহৃত হয়—ছোরাখানা সবেগে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে, আধখানা ফলাসুদ্ধ দেওয়ালের গায়ে গেঁথে গিয়েছে।

সুরেশ্বর শিউরে উঠল—ওরই গলা লক্ষ্য করে ছোরাখানা ছোঁড়া হয়েছিল।

ওদের সঙ্গে সত্যিই হাতাহাতি বাধলে বা সবাই একযোগে আক্রমণ করলে নিরস্ত্র বিমল ও সুরেশের কী দশা হত বলা যায় না, কিন্তু বিমল মাটি থেকে উঠেই দেখলে ঘরের মধ্যে আর একজন লোকও নেই।

পালায়নি—হয়তো-বা ওরা লোক ডাকতে গিয়েছে। সুরেশ্বর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে খানিকটা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। বিমল গিয়ে তার হাত ধরে টেনে তুলে বল্লে—সুরেশ্বর, এই বেলা উঠে বাড়িটা খুঁজি এস—এখুনি সব চলে আসতে পারে।

একটা ঘর বন্ধ ছিল—বাইরে থেকে তালা দেওয়া। আর সব ঘর খোলা—সেগুলি জনশূন্য। সুরেশ্বর ও বিমল দুজনেই একযোগে ঘরের দরজায় লাথি মারতে লাগল।

—মিনি—মিনি—এ্যালিস—এ্যালিস—

ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বিমল বল্লে—কী ব্যাপার। ঘরের মধ্যে কেউ নেই নাকি?

দুজনের সম্মিলিত লাথির ধাক্কাতেও দরজার কিছুই হল না। বেজায় মজবুত সেগুনকাঠের দরজা। হঠাৎ বিমলের চোখ পড়ল ঘরের দেওয়ালের ওপরের দিকে। সেখানে একটা ছোট ঘুলঘুলি রয়েছে। কিন্তু অত উচুতে ওঠা এক মহা সমস্যা। বিমল খুঁজতে খুঁজতে একটা জলের টব আবিষ্কার করলে। সেটা উপুড় করে পেতে, মা জং খেলার ঘর থেকে বাঁশের চেয়ার এনে, তার ওপর চাপিয়ে উঁচু করে, বিমল অতি কষ্টে তার ওপর উঠল। সার্কাসের খেলোয়াড় না হলে ওভাবে ওঠা এবং নিজেকে ঠিকমতো দাঁড় করিয়ে রাখা অতীব কঠিন ব্যাপার।

সুরেশ্বর টবটা ধরে রইল—বিমল সন্তর্পণে উঠে ঘুলঘুলির কাছে মুখ নিয়ে গেল। নিচে থেকে সুরেশ্বর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলে—কী দেখছ? কেউ আছে?

—ঘোর অন্ধকার—কিছু তো চোখে পড়ছে না।

—ওদের পরনে নার্সের সাদা পোশাক আছে, অন্ধকারেও তো খানিকটা ধরা যাবে—ভাল করে দেখ—

বিমল ভাল করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে বলে—উঁহু, কিছুই তো তেমন দেখছিনে—সাদা তো কিছুই নেই—সব কালোয় কালো। আমার মনে হচ্ছে ঘরটায় কিছুই নেই—

—উপায়?

—দাঁড়াও আগে নামি। উপায় ভাবতে হবে, তার আগে দরজা ভেঙে ফেলতে হবে, যে-করেই হোক।

নিচে নেমে বিমল গম্ভীর মুখে বল্লে—সুরেশ্বর, মিনি বা এ্যালিসকে এভাবে হারিয়ে আমরা কনশেসনে ফিরে যেতে পারব না। দরকার হলে এজন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ—খুঁজে তাদের বার করতেই হবে। তবে তারা যে এই বাড়িতেই বা এই ঘরেই আছে তারও তো কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি। তবুও এই ঘরের দরজা ভেঙে, ভেতরটা না দেখে আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় যাব না। তুমি এক কাজ করো। আমি এখানে থাকি—তুমি বাইরে যাও, চীনা পুলিশকে খবর দাও। তাদের বল কনশেসনে টেলিফোন করতে। দরকার হলে কনশেসনের পুলিশ আসুক। আজ রাতের মধ্যেই তাদের খুঁজে বার করতেই হবে—নইলে তাদের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। তুমি দেরি করো না, চট কোরে বাইরে চলে যাও।

সুরেশ্বর বল্লে—তোমাকে একা ফেলে যাব? ওরা যদি দল পাকিয়ে আসে? তুমি নিরস্ত্র।

—সেজন্যে ভেবো না। মিনি ও এ্যালিস তার চেয়েও অসহায়। সকলের আগে ওদের কথা ভাবতে হবে আমাদের।

সুরেশ্বর চলে গেল।

বিমল একা বাড়িটাতে। উত্তেজনার প্রথম মুহূর্ত কেটে গেলে বিমল এইবার ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে। মিনি আর এ্যালিস নেই! গুণ্ডারা তাদের ধরে নিয়ে

গিয়েছে। ওর মনে হল, কনশেসনের ডাক্তার বেডফোর্ড বলেছিলেন—চীনা-সাংহাইতে মধ্য-এশিয়ার বর্বরতার সঙ্গে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা মিলছে। এখানে কনশেসনের বাইরে মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়। বিশেষ করে এই যুদ্ধ দুর্দিনের সময়ে, দেশে আইন নেই, পুলিশ নেই—প্রত্যেক সবল মানুষ নিজেই পুলিশ। সাবধানে চলাফেরা না করলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

কী ভুলই করেছে অত রাত্রে অজানা রাস্তায় অজানা চীনে রিকশাওয়ালার গাড়িতে চড়ে,—সঙ্গে যখন মেয়েরা রয়েছে! তার চেয়েও ভুল, সঙ্গে রিভলবার নিয়ে না বেরুনো!

এখন উপায় কী? যদি ওদের সন্ধান না-ই মেলে! কনশেসনে সে আর সুরেশ্বর মুখ দেখাবে কেমন করে?

স্তব্ধ নির্জন বাড়িটা। সাড়াশব্দ নেই কোনো দিকে। মা জং খেলার ঘরে একটা চীনে-লণ্ঠন ঝুলছে। আধো-আলো অন্ধকারে বিকটমূর্তি চীনা দেবতার ছবিটা যেন এক হিংস্র দৈত্যের প্রতিকৃতির মতো দেখাচ্ছে—সে-ই একমাত্র আলো সারা বাড়িটাতে। বাকিটা অন্ধকার। আশ্চর্য, কোথায় কলকাতার শাঁখারিটোলা লেন, আর কোথায় সাংহাই-এর এক নীচশ্রেণীর জুয়াড়ির আড্ডা। অবস্থার ফেরে কোথা থেকে মানুষকে কোথায় নিয়ে এসে ফেলে!

এ্যালিস চমৎকার মেয়ে, মিনিও চমৎকার মেয়ে; ওদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হলে সে নিজেকে ক্ষমা করবে না। ওদের জন্যে বিমলই দায়ী। হাসপাতাল থেকে বার হয়ে কনশেসনে ফেরা উচিত ছিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট হয়ে গিয়েছে। সুরেশ্বরের দেখা নেই। সে কি কনশেসনে ফিরে গিয়েছে নিজেই খবর দিতে?

বিমল আকাশ-পাতাল ভাবছে, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটল। রাস্তার আলো হঠাৎ যেন নিবে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এ আবার কী কাণ্ড!

মিনিট পাঁচ-ছয় কি দশ পরে বাইরে থেকে কে একজন উত্তেজিত গলায় চীনা ভাষায় কী বললে—কোনো সাড়া না পেয়ে আবার বল্লে। ঠিক যেন কাউকে ডাকছে।

বিমল অবাক হয়ে ভাবছে গুণ্ডারা ফিরে এল না কি!

হঠাৎ দুজন চীনা ইউনিফর্মপরা পুলিশম্যান বাড়ির মধ্যে খানিকটা ঢুকে রাগের ও গালাগালির সুরে চেঁচিয়ে কী কথা বলে উঠল।

বিমল ভাবলে সুরেশ্বরের আনীত পুলিশম্যান বাড়ি খুঁজতে এসেছে। ও এগিয়ে যেতে পুলিশম্যান দুজন একটু আশ্চর্য হল। তারপর পিজিন ইংলিশে উত্তেজিত কণ্ঠে মা জং খেলার ঘরের আলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—আলো এখুনি নিবাও। আমাদের বাঁশি শুনতে পাওনি? আলো জ্বেলে রেখেছ কেন?

বিমল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে বল্লে—আলো, জ্বেলে রেখেছি কেন?

—হ্যাঁ, আলো জ্বালিয়ে রেখেছ কেন? আলো, আলো-লণ্ঠন—যা থেকে আলো বার হয়, অন্ধকার দূর করে সেই আলো—

—আমি তো জ্বেলে রাখিনি। এ আমার বাড়ি নয়।

চীনা পুলিশম্যান দুজন মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলে। এ-বাড়ির যে এ-লোক নয়, তারা সে-কথা আগেই বুঝেছিল।

বিমল এতক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরে পেল। বল্লে—দাঁড়াও, তোমরা যেও না। প্রথমে বল আলো নিবিয়ে দেব কেন?

—মিস্টার, সাংহাই পুলিশ-মার্শালের নোটিস দেখনি? রাত এগারোটার পরে শহরের সব

আলো নিবিয়ে দিতে হবে। ব্ল্যাক-আউট। বোমা ফেলছে জাপানিরা। তোমার কি বাড়ি?

—আমার এ-বাড়ি নয়। সব বলছি, আমি কনশেসনের লোক—যুদ্ধের ডাক্তার, ভারতবর্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। আমরা চারজনে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এই পথে রিকশা করে যাচ্ছিলুম—সঙ্গে ছিলেন দুটি মার্কিন মহিলা। রিকশাওয়ালা তাঁদের নিয়ে কোথায় পালিয়েছে। আমাদের রিকশা অন্যপথে নিয়ে গেলে আমরা এই গলির মধ্যে ঢুকে সন্ধান পাই এই বাড়িটার সামনে রিকশাটা মেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা বাড়িতে ঢুকে দেখি, এটা মা জং জুয়াড়িদের ও চণ্ডুর আড্ডা। ওদের সঙ্গে মারামারি হয়ে যাওয়ার পরে ওরা কোথায় পালিয়েছে। আমার বন্ধু পুলিশ ডাকতে গিয়েছে। তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে, এই তালা-বন্ধ ঘরটা খোলো—আমার বিশ্বাস এরই মধ্যে মহিলা দুটিকে আটকে রেখেছে।

পুলিশম্যান দুজন আবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলে। তারা যে বেজায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, মা জং খেলার ঘরে চীনে-লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয়ও ওদের মুখ দেখে বিমলের সেটা বুঝতে দেরি হল না। যেন ওরা কখনও ওদের ক্ষুদ্র পুলিশজীবনে এমন একটা আজগুবি ব্যাপারের সম্মুখীন হয়নি—ভাবখানা ওইরকম।

একজন পুলিশ—চৌকিদার এগিয়ে বন্ধ ঘরের তালাবন্ধ দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—এই ঘর? কই, কোনো সারাশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো?

—না, সাড়া দেবে কে? ধরো অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছে।

পুলিশম্যান দুটির মধ্যে একজন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের মতো অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না, আমার তা মনে হয় না মিস্টার। তুমি জান না, এইসব জুয়াড়ি ও চণ্ডুর আড্ডাধারী বদমাইশদের। এ-ঘরে ওদের রাখেনি। ওদের গায়ে গহনা ছিল?

—একজনের গলায় একটা ঝুটো মুক্তোর মালা ছিল—দুজনের হাতে দুটো সোনার হাতঘড়ি আর সোনার পাতলা বালা—

এমন সময় বাইরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে বাড়িতে ঢুকল—আগে-আগে সুরেশ্বর, পেছনে একদল চীনা পুলিশ, সঙ্গে একজন কনশেসন পুলিশ।

সুরেশ্বর ঢুকেই বল্লে—টেলিফোন করে দিয়েছি কনশেসনে—পুলিশ-মার্শালকে জানানো হয়েছে। এই একজন কনশেসনের পুলিশম্যানকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে আনলুম। এদিকে মহা মুশকিল, শহরে ব্ল্যাক-আউট, আলো জ্বালাবার জো নেই—সব ঘুটঘুটে অন্ধকার।

—ভাঙো দরজা সবাই মিলে।

সকলের সমবেত চেষ্টায় ও ধাক্কায় হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়ল।

বিমল সকলের আগে ঘরে ঢুকলে। পিছনে ছ'টা পুলিশ টর্চ জ্বেলে ঢুকল। তিনটি বড় বড় জালা ছাড়া ঘরে কিছু নেই। মানুষের চিহ্ন তো নেই-ই।

একজন পুলিশ উঁকি মেরে জালার মধ্যে দেখলে। জালাতে মানুষ তো দূরের কথা, একবিন্দু জল পর্যন্ত নেই। খালি জালা।

মাথার ওপর আকাশে আবার অনেকগুলো এরোপ্লেনের ঘরঘর আওয়াজ শোনা গেল। দুজন পুলিশম্যান উঠোনে গিয়ে হেঁকে বল্লে—আলো নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, জাপানি বম্বার—

সুরেশ্বর বল্লে—আরে, এরা বেশ তো! সারা সন্ধেবেলা জাপানিরা বোমা ফেল্লে, তখন 'ব্ল্যাক-আউট' করলে না—আর এখন এদের হুঁশ হল—

বিমল উপরের দিকে মুখ তুলে বল্লে—হ্যাঁ, জাপানি কাণ্ডয়াসাকি বম্বার। মিনি চিনিয়ে দিয়েছিল কনশেসনে—মনে আছে?

সমস্ত সাংহাই শহর অন্ধকার। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে—কারণ নক্ষত্রের আলো সাংহাইয়ের পুলিশ-মার্শালের আদেশ মানেনি—জাপানি বোমারু প্লেনগুলোর শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, তাও সব সময় নয়। মাঝে মাঝে যেন সেগুলো কোন দিকে চলে যায়, আবার খানিক পরে মাথার ওপরে আসে।

বিমল ভাবছিল, জাপানি বম্বার থেকে আর বোমা ফেলছে না তো!

সুরেশ্বরকে কথাটা বলতে সে বল্লে—ব্ল্যাক-আউটের জন্যে নিশ্চয়। সবাই লুকিয়েছে। রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। কোনো দিকে কোনো শব্দ আছে?

দুজন চীনা পুলিশ বল্লে—তোমরা বোঝনি মিস্টার। ওরা বোমা ফেলবে না, এখন সুবিধে খুঁজছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার। সেই বোমা ফেলে লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পরে, যেমন সব ভয়ে রাস্তাঘাটে বেরুবে কি পালাতে যাবে, অমনি গ্যাসের বোমা ফেলবে। এখন গ্যাসের বোমা ফেল্লে তো মানুষ মরবে না, কারণ সব ঘরের মধ্যে জানালা-দরজার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে ওদের আগে বার করবে রাস্তায়—পরে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের বোমা ছাড়বে, এ-ই করে আসছে দেখছি আজ ক'দিন থেকে—

এইটু পরে কনশেসনের পুলিশ এল, চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল স্বয়ং এলেন বহু লোকজন নিয়ে। ওদের দিয়ে চণ্ডুর ও জুয়ার আড্ডার ছোট্ট উঠানটা ভরে গেল।

ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—শহরে ব্ল্যাক-আউট, ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিধারে—এক্ষুনি জাপানিরা হাই এক্সপ্লোসিভ বম্ব ফেলবে, তারপরে ফসপেন গ্যাসের বোমায় বিষ-ছাড়বে। এ অবস্থায় কী করা যায়? মেয়ে দুটিকে কোথায় আটকে রেখেছে, কী করে খুঁজি?

কনশেসন পুলিশের কর্মচারীরা বল্লে—আপনার এলাকার যত বদমাইশের আড্ডা আছে, সব হানা দিই চলুন।

—কিন্তু তাতে সময় নেবে। এখুনি যে সব ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে ছুটে বেরিয়ে পড়বে! দেখছেন না ওপরকার অবস্থা? ওদের প্ল্যান ঠিক করে নিতে যা দেরি! আচ্ছা, দেখি কতদূর কী হয়। মেয়ে দুটিকে গুণ্ডারা আটকে রেখেছে মুক্তিপণ আদায় করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাদের প্রাণের ভয় বর্তমানে নেই এ-কথা ঠিকই। সাংহাইতে এরকম অনবরত হচ্ছে। এই ভদ্রলোক দুটি এত রাতে মেয়েদের নিয়ে চা-পেই পল্লিতে বেরিয়ে বড় বিবেচনার অভাব দেখিয়েছেন।

পুলিশের লিস্ট দেখে কাছাকাছি দুটি বদমাইশের আড্ডায় হানা দেওয়া হল—কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান মিলল না।

তারপর—রাত তখন দেড়টা—এমন এক ভীষণ ব্যাপারের সূত্রপাত হয়ে গেল যে, এর আগে যে-সব বোমা ফেলার কাণ্ড সুরেশ্বর ও বিমল দেখেছে—এর কাছে সেগুলো সব একেবারে ম্লান হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে মুছে গেল।

বিমল আর সুরেশ্বরের মনে হল, আকাশ থেকে চারিধারে একসঙ্গে যেন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পড়তে শুরু হয়েছে—অসংখ্য। অনেক, অনেক—গুনে শেষ করা যায় না! সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের আওয়াজ, ইঁট টালি ছোটার শব্দ, দেওয়াল পড়ার, ছাদ পড়ার শব্দ—মানুষের কলরব, হৈচৈ, কান্না, পুলিশের হুইসল, মাথার ওপর ঘরঘর শব্দ—সবসুদ্ধ মিলিয়ে একটা সুপ্ত দৈত্যপুরীর দৈত্যরা যেন হঠাৎ জেগে উঠে উন্মাদ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে!

ডেপুটি মার্শাল অর্ডার দিলেন, সব কনস্টেবল একত্র হয়ে গেল। কনশেসন পুলিশের কর্মচারীরা সাহায্য করতে চাইলে, হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সেই অন্ধকারের মধ্যে টর্চ জ্বেলে অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ অনুসন্ধান করে আহত ও চাপা-পড়া মানুষের সন্ধান চলতে লাগল। কাজ এগোয় না। ভাঙা বাড়ির ইটের রাশি পদে পদে ওদের বাধা দিতে লাগল। একটা চীনা মন্দিরের কাছে চারজন লোক মরে পড়ে আছে। দুটি ছোট বাড়ি চুরমার হয়ে সেখানে এমন ভাবে রাস্তা আটকেছে যে, মৃতদেহগুলো টেনে বার করবার উপায়ও রাখেনি। ইটের স্তূপের ওপর উঠে আবার ওদিক দিয়ে নেমে যেতে হল—তবে জায়গাটা পার হওয়া সম্ভব হল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠল—সামনে প্রকাণ্ড বোমার গর্ত, সাবধান!

সবাই চেয়ে দেখলে আন্দাজ ত্রিশ ফুট ব্যাসযুক্ত একটা প্রকাণ্ড গহ্বর থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে—এবং গর্তের ধারে এখনও ছটকানো ধাতুর খোলা-ভাঙা টুকরো পড়ে আছে, বিমল টুকরোটা হাতে তুলে নিয়েই ফেলে দিলে—গরম আগুন!

কর্ডাইটের উগ্র গন্ধ জায়গাটায়। ওরা সবাই অবাক হয়ে সেই ভীষণ গর্তটার দিকে চেয়ে রইল।

এমন সময়ে দেখা গেল, ছ'খানা জাপানি প্লেন সারবন্দি হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে উঠে আসছে—ওদের মাথার উপর। বোধহয় ওদের টর্চে আলো দেখেই আসছে। চীনা-পুলিশের ডেপুটি মার্শাল হেঁকে বল্লেন—সাবধান—! বোমার গর্তে লাফ দাও!

সবাই বুঝলে এ-অবস্থায় ত্রিশ ফুট ব্যাসযুক্ত এবং আন্দাজ প্রায় পনেরো ফুট গভীর বোমার গর্তটাই সবচেয়ে নিরাপদ স্থান, সারা চা-পেই পল্লি অঞ্চলের মধ্যে।

ঝুপঝাপ! দু সেকেণ্ডের মধ্যে ওপরে আর কেউ নেই—সবাই গর্তটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বিমলও ওদের সঙ্গে লাফ দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে ওর হাঁটু পর্যন্ত পাঁকে পুঁতে গেল, গর্তটার মধ্যে কাদা আর জল—কাদার সঙ্গে বোমার ভাঙা টুকরো মেশানো—সবাই কোনোরকমে জলকাদার মধ্যে মাথা গুঁজে রইল ধার ঘেঁষে—কারণ মাঝখানে থাকলে অনেকখানি নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশ দেখা যায়—তখন আর নিজেকে খুব নিরাপদ বলে মনে হয় না।

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকান পুলিশম্যান ওদের বোঝাচ্ছিল যে, এ-অবস্থায় কোন এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেললে ওদের লাগবার কথা নয়—সে নাকি মাঞ্চুকুও রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানে—বোমার গর্তই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

আর একজন বল্লে—কেন, যদি মেশিনগান চালায়?

আগের লোকটা বল্লে—ফুঃ! মেশিনগান! এই অন্ধকারে!

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল সেই ছ'খানা প্লেন ঠিক ওদের গর্তের ওপর এসে চক্রাকারে উড়ছে এবং ক্রমে ক্রমে নিচু হয়ে নামছে যেন।

কে একজন বল্লে—আমাদের টের পেলে নাকি!

মুখের কথা সবারই ওষ্ঠাগ্রে যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে—বুকের রক্ত পর্যন্ত জমাট বেঁধে গেল সকলের। কেবল আগের পুলিশম্যানটি বলতে লাগল—কোনো ভয় নেই—ওরা মেশিনগান ছুঁড়ে কিছু করতে পারবে না—কওয়াসাকি বম্বারের মেশিনগানের তরিবৎ সুবিধের নয়—হত যদি জার্মান হেঙ্কেল ফিফটিওয়ান, কি স্কুল্জ-ব্যাঙ্ক এক'শো এগারো—

সবাই চাপা গলায় বিষম রাগের সঙ্গে একসঙ্গে বলে উঠল—আঃ—চুপ! সঙ্গে সঙ্গে প্লেনগুলো অনেকখানি নেমে এল এবং অকস্মাৎ এক তীব্র সার্চলাইটের আলোয় ওদের বোমার গর্ত এবং চারিপাশের আরও অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল—ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে পট্‌কা বাজির মতো মেশিনগান ছোঁড়ার শব্দে ওদের কানে তালা ধরবার উপক্রম হল।

একজন ফিসফিস করে বল্লে—যদি বাঁচতে চাও তো সবাই মড়ার মতো পড়ে থাক—ভান করো যে সবাই মরে গিয়েছে—

আগেরই সেই মার্কিন পুলিশম্যানটি যুক্তিতর্কে অদম্য। সে বলে উঠল—কিছু হবে না দেখো—হ্যাঁ হত, যদি হেঙ্কেল ফিফটিওয়ান—কিংবা—

—আবার!

সেই কাদাজলের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে উপুড় হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে বিমল অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো কথা ভাবছিল না। তার চিন্তা শুধু বর্তমানকে আশ্রয় করে। সংসার নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ—শুধু সে আছে, আর আছে—এই দুর্দ্ধর্ষ বিভীষণ, নিষ্ঠুর বর্তমান। যে-কোনো মুহূর্তে মেশিনগানের গুলি ওর জীবলীলা, ওর সমস্ত চৈতন্যের অবসান করে দিতে পারে, সারা দুনিয়া ওর কাছ থেকে মুছে যেতে পারে এক মুহূর্তে—যে-কোন মুহূর্তে। কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে, চোখ বুজে ও পড়ে রইল—ওর পাশে সবাই সেইভাবেই আছে—বীরত্ব দেখাবার অবকাশ নেই, বাহুবল বা সাহস দেখাবার অবসর নেই—খোঁয়াড়ের শুয়োরের দলের মতো ভয়ে কাদার মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকা—এর নাম বর্তমান যুগের যুদ্ধ! ওরা আজ দেশপ্রেমিক বীর সৈনিক দল হলেও এর বেশি কিছু করতে পারত না—এই একই উপায় অবলম্বন করতেই হত—অন্য গত্যন্তর ছিল না। অন্য কিছু করা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কানের এত কাছে এরোপ্লেনের শব্দ বিমল কখনও পায়নি, এরোপ্লেনের বিরাট আওয়াজ কানে একেবারে তালা ধরাল যে! ওর ভয়ানক আগ্রহ হচ্ছে একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে চোখ চেয়ে দেখে, এরোপ্লেনগুলো গর্তটার কত ওপরে এসেছে।

আওয়াজ—আওয়াজ—এরোপ্লেনের আওয়াজ, মেশিনগানের আওয়াজ! কিন্তু আওয়াজ যত হল কাজ তত হল না। মেশিনগানের একটা গুলিও বোমার গর্তের মধ্যে পড়ল না। দু-তিনবার প্লেনগুলো গর্তের দিকে নেমে এল পুরোদমে, কিন্তু কিছু করতে পারলে না। আওয়াজ, কেবলই আওয়াজ। ক্রমে প্লেনগুলো সরে গেল গর্তের ওপর থেকে, হয়তো দেখে ভাবলে গর্তের লোকগুলো সব মরে গিয়েছে। মড়ার ওপর মেশিনগানের দামি গুলি চালিয়ে বৃথা অপব্যয় করা কেন?

ওরা সবাই গর্ত থেকে উঠে এল। পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলে, কী অদ্ভুত কাদা-মাখা চেহারা হয়েছে সকলকার! পুলিশের স্মার্ট ইউনিফর্ম একেবারে কাদায় আর ঘোলা জলে নষ্ট হয়ে ভিজে-ন্যাতা হয়ে গিয়েছে। মার্কিন পুলিশম্যানটি গর্ত থেকে ঠেলে উঠেই বল্লে—বলিনি তোমাদের, এরা মেশিনগান ছুঁড়ে সুবিধে করতে পারে না ও এরোপ্লেন থেকে? স্কুল্জ্ ব্যাঙ্কস্ একশো এগারো যদি হত, তবে দেখতে একটা প্রাণীও আজ বাঁচতাম না।

মিনিট পনেরো কেটে গেল। বোমারু প্লেনগুলো আকাশের অন্যদিকে চলে গিয়েছে। কী ভীষণ আওয়াজ! বিমলের মনে পড়ল, এ্যালিস্ তার নরম সাদা হাত দুটি তুলে কান ঢেকে বসত—হোয়াট-অ্যান-অ-ফুল্ রকেট! এ্যালিসের সেই ভঙ্গিটা, তার মুখের কথা মনে পড়তেই বিমলের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

এ্যালিস্—মিনি—বেচারি এ্যালিস্!—কী ভীষণ কালরাত্রি আজ ওদের পক্ষে। সাংহাইয়ের এই দুর্যোগের রাত্রির কথা বিমল কি কখনও ভুলবে জীবনে? কোথায় সে সিঙ্গাপুরে ডাক্তারি করবে বলে বাড়ি থেকে রওনা হল—অদৃষ্ট তাকে কোথায় কী অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেছে!

হঠাৎ পিনাং-এর মন্দিরে সেই নিষ্ঠুর মূর্তি চীনা রণদেবতার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ মনে পড়ল ওর।—রণদেবতা ওদের তাঁর ফাঁদে ফেলেছেন—

একটা প্লেন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা বস্তির ওপরে দুটো বোমা ফেললে—ভীষণ আওয়াজ হল—অন্ধকারের মধ্যে একটা আগুনের শিখার চমক দেখা গেল, কিন্তু লোকজনের চেঁচামেচি শোনা গেল না। মার্কিন পুলিশম্যানটি বল্লে—পঞ্চাশ পাউন্ডের বোমা। দেখেছ কী কান্ডটা করলে বস্তিতে! লোক সব নিশ্চয় পালিয়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—ওই দ্যাখো, আর একদল বম্বার দেখা দিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে—

অন্তত বারোখানা সারবন্দি হয়ে এগিয়ে আসছে। এরা যে এলমেলোভাবে বোমা ফেলছে না, তা বেশ বোঝা গেল—এদের ধ্বংসলীলার মধ্যে প্ল্যান আছে, শৃঙ্খলা আছে, সমস্ত শহরটা এবং তার প্রান্তস্থিত এই দরিদ্র পল্লি চা-পেই ও অন্যান্য ছড়ানো গ্রামগুলোকে ওরা যেন কতকগুলো কাল্পনিক অংশে ভাগ করে নিয়েছে এবং নিয়ম করে প্রত্যেক অংশে বোমা ফেলছে—কোনো অংশ পরিত্রাণ না পায়!

বিমল লক্ষ্য করলে অন্ধকারের মধ্যে বস্তির লোকজনেরা খানা-নালার মধ্যে অনেকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—একটা লোক একটা গাছের গুঁড়িতে প্রাণপণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না—মেয়ে কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না, যেন ভীত, সন্ত্রস্ত প্রেতমূর্তি। সন্ধ্যাবেলার সেই বেপরোয়া ভাব আর নেই।

একমুঠো ছড়ানো নক্ষত্রের মতো কতকগুলো বোমা পড়ল দূরের একটা পাড়ায়—সাংহাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র সে-জায়গাটা—পুলিশম্যানগুলো বলাবলি করছে। ওদিকে সেই প্লেনগুলো আবার আসছে, তবে এবার সার্চলাইট জ্বালায়নি, অন্ধকারেই আসছে। কাছেই একটা পল্লিতে ওরা ছ'টা বোমা ফেল্লে, আন্দাজ এক-একটা পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের। পুলিশের ডেপুটি মার্শালের আদেশে ওরা সবাই সেদিকে ছুটল। সেখানে এক ভীষণ দৃশ্য! রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, ভয়ের চোটে সতর্কতা ভুলে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে ছত্রাকার হয়ে পড়েছে—তারই মধ্যে এক জায়গায় একটা প্রৌঢ়া মহিলার ছিন্নভিন্ন বিকৃত মৃতদেহ। কিছুদূরে একটি সুন্দরী বালিকার দেহ দু' টুকরো হয়ে পড়ে আছে, তলপেটের নাড়িভুঁড়ি খানিকটা বেরিয়ে ধুলোতে লুটিয়ে পড়েছে।

এইসব বীভৎস দৃশ্যের মাঝখানে এক জায়গায় একটা ছোট মেয়ে ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চোখ বুজে ছুটে একটা ছোট মাঠ পার হয়ে পালাচ্ছিল—পুলিশের লোক ওকে ধরে ফেল্লে। মেয়েটির বয়স ন' বছর—সে ভয়ে এমনি দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারলে না।

ওর হাতে একটা পুঁটুলি। পুঁটুলির মধ্যে কিছু শুকনো শুওরের মাংসের টুকরো আর গোটাকতক কিশমিশ। তাকে খানিকক্ষণ ধরে জিগ্যেস করার পরে জানা গেল তাদের বাড়িতে বোমা পড়বার পরে বাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কে কোথায় গিয়েছে তা সে জানে না। সে কিছু খাবার সংগ্রহ করে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে পালাচ্ছে—তার বিশ্বাস, চোখ বুজে ছুটে পালালে বোমা ফেলে যারা, তারা ওকে দেখতে পাবে না। তাকে ডেকে নিয়ে প্রৌঢ়া মহিলার মৃতদেহ দেখানো হল।

খুকি চিৎকার করে কেঁদে উঠল, ওই তার মা। পাশের বালিকাটি তার দিদি। ডেপুটি মার্শাল পাড়ার একজন লোক ডেকে মেয়েটির নাম-ধাম, বাপের নাম-ঠিকানা জেনে নিলেন, কারণ ছেলেমানুষ পুলিশের প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত দিতে পারবে না। মেয়েটি পুলিশের

জিম্মাতেই রইল—কারণ, শোনা গেল ওর বাবা বছর-তিন মারা গিয়েছেন, বিধবা মা আর দিদি ছাড়া সংসারে ওর আর কেউ ছিল না।

একদল লোককে দেখা গেল ভাঙা বাড়িগুলো থেকে জিনিসপত্র, মৃতদেহ টেনে বার করছে। ওরা টর্চ জ্বেলে টর্চের মুখ নিচের দিকে নামিয়ে মৃতদেহ কি জ্যান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাছে ওপর থেকে বোমারু প্লেনগুলো টের পায়।

বিমল তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলে। সাগ্রহে সে ছুটে গেল—প্রোফেসর লি, প্রোফেসর লি—

অন্ধকারের মধ্যে বিমলকে উনি চিনলেন। বল্লেন—আমি আমার ছাত্রের দল নিয়ে বেরিয়েছি, দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার মেয়েরা কোথায়?

এই সৌম্যদর্শন, পরহিতব্রতী বৃদ্ধের স্নেহ-সম্ভাষণে বিমলের মন আর্দ্র হয়ে উঠল। বল্লে—সে অনেক কথা। আমার মনে হয় আপনি এবং আপনার দলই এ-বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে পারবেন।

প্রোফেসর লি হাসিমুখে বল্লেন—যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব আলোচনা করতে এসেছিলুম জানেন তো? এর চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কোথায় পাব সে-আলোচনার?

হঠাৎ একটা প্লেন মাথার ওপর এল। সবাই কথা বন্ধ করে ওপর দিকে চাইলে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি চেঁচিয়ে উঠল—কভার! কভার!

কোথায় আর আশ্রয় নেবে, সেই ভাঙা বাড়ির ইঁটকাঠের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ছাড়া। সবাই সেই দিকে ছুটল। বিমলও চীনা খুকিটার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সেই দিকে।

প্লেন থেকে বোমা পড়ল না। পড়ল কতকগুলো চকচকে রুপোর বাতিদানের মতো লম্বা লম্বা জিনিস। প্লেনটা চলে গেলে ওরা সেগুলো দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখলে। সরু সরু রুপোর নলের মতো জিনিস, হাতখানেক লম্বা। ঝকঝকে সাদা। মার্কিন পুলিশম্যান একটা হাতে তুলে নিয়ে বল্লে—ইনসেনডিয়ারি বম্—আগুন লাগাবার বোমা—অ্যালুমিনিয়ম আর ইলেকট্রনের খোল্ল, ভেতরে অ্যালুমিনিয়ম পাউডার আর আয়রন অক্সাইড ভর্তি। এই দেখ ছ'টা করে ফুটো টিউবের গোড়ার দিকে। এই দিয়ে আগুনের ফুলকি বার হয়ে আসবে। এ-আগুন নিবোনো যায় না।

জাপানিদের মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার পর লোকজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পালাবে, তখন ওরা শহরে ইনসেনডিয়ারি বম্ব ফেলে আগুন লাগিয়ে দেবে, আগুন নিবোতে কে এগোবে তখন!

কী ভীষণ ধ্বংসের আয়োজন! বিমল সেই ঝকঝকে পালিশ-করা সরু টিউবটা হাতে নিয়ে শিউরে উঠল। এই টিউবের মধ্যে সুপ্ত অগ্নিদেব এখুনি জেগে উঠে এই এত বড় সাংহাই শহরটা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে, তারই আয়োজন চলছে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি বল্লে—পঁয়ষট্টি গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম পাউডার আর পঁয়ত্রিশ গ্রাম আয়রন অক্সাইড। আমাদের মার্কিন নৌবহরের উড়োজাহাজে আজকাল এর চেয়েও ভাল বোমা তৈরি হচ্ছে—আয়রন অক্সাইডের বদলে দিচ্ছে—

কাছেই আরও দু-তিনটা রুপোর বাতিদান পড়ল।

দিনের বেলায় ওরা পরস্পরের ধুলোকাদামাখা চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রোফেসর লি তখনও কাজে ব্যস্ত, চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে লোকজন টেনে বার করে বেড়াচ্ছেন, তিনি আর তাঁর ছাত্রেরা। পুলিশও এসেছে, দুটো রেডক্রসের হাসপাতাল-গাড়িও

এসেছে। আকাশে জাপানি বোমারু প্লেনগুলোর চিহ্ন নেই।

রাত্রিটা কেটে গিয়েছে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত। বেলা এখন দশটা—এখনও সে-দুঃস্বপ্নের জের মেটেনি! বিনা কারণে এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার তান্ডব যে চলতে পারে তা এর আগে, ভারতবর্ষে থাকতে বিমল কখনও ভেবেছিল?

কনশেসনে সেই সবজান্তা আমেরিকান পুলিশটা বলছিল—দেখবেন ওরা ইনসেনডিয়ারি বোমা ফেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে। এখানে অনেক বাড়িই কাঠের। তাতে আবার বোমার আগুন জলে নেবে না। বালি ছড়াতে হয় একরকম কল দিয়ে। প্রথম অবস্থায় বোমাটাকে বালি-বোঝাই থলে দিয়ে চেপে ধরলেও আর স্পর্কে ছোটে না—কিন্তু সেসব করে কে?

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমায়। কাল সন্ধ্যা ও রাতে বোমা ফেলার দরুন চা-পেই পাড়া ও সাংহাইয়ের চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউতে সাত-আটশো বাড়ির চিহ্ন নেই—মানুষ মারা পড়েছে তিনশোর ওপর, মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে। জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে প্রায় পাঁচশো। তাদের মধ্যে অর্ধেকের বাঁচবার আশা নেই।

প্রোফেসর লি বল্লেন—আমাদের সবচেয়ে ভীষণ শত্রু যে এই বোমারু প্লেনগুলো, তা ক'দিনের ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারছি। তবুও তো এখন ওরা সমবেতভাবে আক্রমণ করেনি—করলেও একশোখানা প্লেনের প্রত্যেক প্লেনখানা থেকে দু' টন বোমা ফেললে পাঁচ হাজার লোক কালই মেরে ফেলত।

সবজান্তা পুলিশম্যানটি বল্লে—জাপানি বম্বারগুলো এক-একখানা দু' টন বোমা বইতে পারে না মশায়—সে পারে জার্মান ডর্নিয়ের কিংবা ইটালির কাপ্রোণি—কিংবা—

ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—আহা হা, ওসব এখন থাক—ও তর্কে কী লাভ আছে? এখন আমাদের দেখতে হবে যে-দুটি মার্কিন মহিলাকে কাল রাত্রে গুন্ডারা নিয়ে গেয়েছে, তাঁদের উদ্ধারের কী উপায় করা যায়, বোমা এখন এবেলা অন্তত আর পড়বে না—

এমন সময়ে একজন চীনা পুলিশ সার্জেন্ট মোটর সাইকেলে ছুটে এসে সংবাদ দিলে, কনশেসন অঞ্চলে চীনা পলাতক নরনারীদের সঙ্গে কনশেসন-পুলিশের ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। ওরা ইয়াংসিকিয়াং-এর ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছিল, কনশেসন-পুলিশ ব্রিজের ও-মুখে মেশিনগান বসিয়েছে—তারা বলছে এত পলাতক লোক জায়গা দেবার স্থান নেই কনশেসনে। খাবার নেই, জল নেই। গেলে সেখানে দুর্ভিক্ষ হবে।

প্রোফেসর লি বল্লেন—কত লোক পালাচ্ছিল?

—তা বোধহয় দশ হাজারের কম নয়। অর্ধেক সাংহাই ভেঙে মেয়ে-পুরুষ সব পালাচ্ছে কনশেসনের দিকে। আপনারা সব চলুন, একটু বোঝান ওদের। রাত্রির ব্যাপারে সব ভয় খেয়েছে বড্ড।

কনশেসনের পুলিশদলকে চলে যেতে উদ্যত দেখে বিমল বল্লে—আজই মেয়ে দুটির ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে—দেরি হলে ওদের খুঁজে বার করা শক্ত হবে হয়তো।

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—সে-বিষয়ে ওঁরা কিছু সাহায্য করতে পারবেন না। আমাদের বদমাইশদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে। আমি আজ এখুনি এর ব্যবস্থা করছি। ব্যস্ত হবেন না—বিদেশি গভর্নমেন্টের কাছে এজন্যে আমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি।

সেদিন সারাদিন ওরা হাসপাতালে গেল না। ডাক্তার সাহেবকে জানিয়ে দিলে মিনি ও এ্যালিসের বিপদের কথা। কনশেসনে যাবার জন্যে দুবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হল না।

সে-পথ লোকজনের ভিড়ে বন্ধ হয়ে আছে, তা ছাড়া ইয়াংসিকিয়াংয়ের পুলের ওপারের মুখে মেশিনগান বসানো।

সারাদিন ধরে কী করুণ দৃশ্য সাংহাইয়ের বাইরের বড় বড় রাজপথগুলিতে! লোকজন মোট-পুঁটুলি নিয়ে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে—সাংহাই থেকে হোনান যাবার রাজপথ পলাতক নরনারীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভয়ানক গরমে এই ভিড়ে অনেকে সর্দি-গর্মি হয়ে মারাও পড়ছে।

দুখানা হাসপাতালের গাড়ি ওদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু ভিড় ঠেলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে গাড়ি দুখানা শহরের উপকণ্ঠে এক জায়গায় পথের ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। একখানা গাড়ির চার্জ নিয়ে বিমল সেখানে রয়ে গেল। সুরেশ্বর রইল তার সহকর্মী হিসাবে।

শীঘ্রই কিন্তু কী ভয়ানক বিপদে পড়ে গেল দুজনেই। ওরা অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিল এই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে জাপানি প্লেন যদি বোমা ফেলে তবে যে কী কান্ড হবে তা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

বেলা দুটো বেজেছে। একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্মচারী মোটরবাইকে সাংহাইয়ের দিক থেকে এসে ওদের অ্যাম্বুলেন্স-গাড়ির সামনে নামল। বল্লে—আপনারা এখান থেকে সরে যান—

বিমল বল্লে—কেন?

—জাপানি সৈন্য শহরের বড় পাঁচিল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে—এখনও দুটো পাঁচিল বাকি—কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে ওরা সমুদ্রের ধারে সমস্ত দিকটা দখল করবে। আর আমরা খবর পেয়েছি পঞ্চাশখানা বোমারু প্লেন একঘণ্টার মধ্যে শহরের ওপর আবার বোমা ফেলবে।

—এই লোকগুলোর অবস্থা তখন কী হবে?

—চীনের মহা দুর্ভাগ্য, স্যার। আপনারা বিদেশি, আপনাদের প্রাণ আমরা বিপন্ন হতে দেবো না। আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই। আপনারা সরে যান এখান থেকে।

একটি গাছের তলায় একটি বৃদ্ধা বসে। সঙ্গে একটা পুঁটুলি, গোটা-কতক মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি। মুখে অসহায় আতঙ্কের চিহ্ন।

সামরিক কর্মচারীটি কাছে গিয়ে বল্লে—কোথায় যাবে?

বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সৈনিকটির দিকে চাইল, কিন্তু চুপ করে রইল। উত্তর দিলে না। সৈনিকটি আবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবে তুমি? তোমার সঙ্গে কে আছে? এবারও বুড়ি কিছু বল্লে না।

বিমল বল্লে—বোধহয় কানে শুনতে পায় না। দেখছ না ওর বয়েস অনেক হয়েছে! চেঁচিয়ে বলো।

তরুণ সামরিক কর্মচারী বৃদ্ধার নাতির বয়সী। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বল্লে—ও দিদিমা, কোথায় যচ্ছ?

বুড়ি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কোথায় আর যাব? সবাই যেখানে যাচ্ছে।

—এখানে বসে থেকো না। বোমা পড়বে এক্ষুনি। সঙ্গে কেউ নেই?

বোমার কথা শুনেই বুড়ি ভয়ে আড়ষ্ট হল, ওপরের দিকে চাইলে। বল্লে—আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমার আর কেউ নেই, আমাকে তোমরা একখানা গাড়ির ওপর উঠিয়ে

দাও।

বিমল বল্লে—আমি ওকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিচ্ছি। বড্ড বয়েস হয়েছে, এতখানি পথ ছুটোছুটি করে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে।

দুজনে ওকে ধরাধরি করে গাড়িতে এনে ওঠালে।

এক জায়গায় একটি গৃহস্থ পরিবারের ঠিক এই অবস্থা। গৃহিণীর বয়েস প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ, সাত-আটটি ছেলেমেয়ে, সকলের ছোটটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, বাকি সব দুই, চার, পাঁচ, সাত এমনি বয়েসের। সঙ্গে একটিও পুরুষ নেই। ওরাও হাঁটতে না পেরে বসে পড়েছে।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল বাড়ির কর্তা জাহাজে কাজ করেন—জাহাজ আজ কুড়ি দিন হল বন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছে। এদিকে এই বিপদ! কাজেই মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ি থেকে—কোথায় যাবেন ঠিক নেই।

এদের অসহায় অবস্থা দেখে বিমলের খুব কষ্ট হল। কিন্তু তার কিছু করবার নেই। কত লোককে সে হাসপাতাল-গাড়িতে জায়গা দেবে?

সেদিন শহরের এমন ভয়ানক অবস্থা গেল যে কে কার খোঁজ রাখে! মিনি ও এ্যালিসের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই হল না। সারা দিনরাত এমনি করে কাটল।

রাত্রিশেষে জাপানি নৌসেনা সাংহাই শহরের দক্ষিণ অংশ অধিকার করলে। বিমল ও সুরেশ্বর তখন হাসপাতালে। ওরা কিছুই জানত না। তবে ওরা এটুকু বুঝেছিল যে অবস্থা গুরুতর। সারারাত্রি ধরে জাপানি যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করলে। বোমারু প্লেনগুলোর তেমন আর দেখা নেই, কারণ শহর প্রায় জনশূন্য। পথেঘাটে লোকজনের ভিড় নেই বললেই চলে।

রাত তিনটে। এমন সময় ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য ঢুকতে দেখে বিমল প্রথমটা বিস্মিত হল। তারপরই ওর মনে হল এরা চীনা নয়, জাপানি সৈন্য। ক্রমে পিলপিল করে বিশ-ত্রিশজন জাপানি সৈন্য হাসপাতালের বড় হলটার মধ্যে ঢুকল। চারিদিকে শোরগোল শোনা গেল। রোগীর দল অধিকাংশই বোমার আহত নাগরিক, তারা ভয়ে কাঠ হয়ে রইল জাপানি সৈন্য দেখে।

বিমল একা আছে ওয়ার্ডে। হাসপাতালের বড় ডাক্তার খানিকটা আগে চলে গিয়েছেন। ওই এখন কর্তা। দুজন চীনা নার্স ভয়ে অন্য ওয়ার্ড থেকে ছুটে এসে বিমলের পেছনে দাঁড়াল।

হঠাৎ একজন জাপানি সৈন্য বন্দুক তুলে জমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে ধরলে—রাইফেলের আগার ধারালো বেয়নেট ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। চক্ষের নিমেষে সে এমন একটা ভঙ্গি করলে, তাতে মনে হল বিমলদের দেশে সিটকি-জালে মাছ ধরবার সময় জালের গোড়ার দিকের বাঁশটা যেমন কাদাজলের মধ্যে ঠেলে দেয়—তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানুষিক আর্তনাদ শোনা গেল। পাশের বিছানায় একটা চীনা যুবক রোগী শুয়ে ভয়ে ভয়ে ওদের দিকে চেয়ে ছিল—বেয়নেট তার তলপেটটা গেঁথে ফেলেছে। চারিদিকে রোগীরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। রক্তে ভেসে গেল বিছানাটা। সে এক বীভৎস দৃশ্য!

বিমলের মাথা হঠাৎ কেমন বেঠিক হয়ে গেল এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড দেখে। সে এগিয়ে এসে ইংরাজিতে বল্লে—তোমরা কি মানুষ না পশু?

জাপানি সৈন্যেরা ওর কথা বুঝতে পারলে না—কিন্তু ওর দাঁড়াবার ভঙ্গি ও গলার সুর শুনে অনুমান করলে মানে যা-ই হোক, প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা তা নয়।

অমনি সব কজন সৈন্য ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুললে।

বিমল চোখ বুজলে—ও-ও বুঝলে এই শেষ।

সেই দুজন চীনা তরুণী নার্স, যারা ওর পেছনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। হাসপাতালের সবাই বিমলকে ভালবাসত।

এমন সময় বিমলের কানে গেল পেছন থেকে একটা সামরিক আদেশের ক্ষিপ্র, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ সুর। জাপানি ভাষায় হলেও তার অর্থ যেন কোনো অদ্ভুত উপায়ে বুঝে ফেলে চোখ চাইলে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন জাপানি সামরিক কর্মচারী, লেফটেনেন্টের ইউনিফর্ম পরা। সৈন্যরা ততক্ষণ বেয়নেট নামিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছে।

জাপানি অফিসারটি এগিয়ে এসে জাপানি ভাষাতেই কি প্রশ্ন করলে। তিন-চারজন সৈন্য একসঙ্গে ওর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কি বললে।

জাপানি অফিসার বিমলের দিকে চেয়ে ভাঙা ইংরিজিতে বল্লে—তুমি আমার সৈন্যদের গালাগালি দিয়েছ?

বিমল বল্লে—তোমার সৈন্যরা কি করেছে তা আগে দ্যাখো। এটা রেডক্রস হাসপাতাল। এখানে কেউ যোদ্ধা নেই। অকারণে তোমার সৈন্যরা আমার ওই রোগীটিকে খুন করেছে বেয়নেটের ঘায়ে।

জাপানি অফিসার একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রক্তাক্ত বিছানা ও মৃত রোগীর দেহটার দিকে চেয়ে দেখলে এবং তারপর সম্ভবত ভর্ৎসনার সুরে সৈন্যদের কী বললে।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি কোন দেশের লোক?

—ভারতীয়।

—রেডক্রসের ডাক্তার?

—না, আমি চীনা মেডিকেল ইউনিটের ডাক্তার।

—ও, চীনাদের সাহায্য করতে এসেছ ভারতবর্ষ থেকে?

—হ্যাঁ।

—আমার সৈন্যদের অপমান করতে তুমি সাহস কর?

—আমার সামনে আমার রোগী খুন করল ওরা, তার প্রতিবাদ মাত্র করেছি।

হঠাৎ জাপানি অফিসারটি ঠাস করে একটা চড় মারলে বিমলের গালে। পরক্ষণেই সেই ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট সামরিক আদেশের সুর গেল ওর কানে—রাগে অপমানে, চড়ের প্রবল ঘায়ে দিশাহারা ওর কানে। সব কজন সৈন্য মিলে তক্ষুনি ওকে ঘিরে ফেল্লে চক্ষের নিমেষে। দুজন ওকে পিছমোড়া করে বাঁধলে চামড়ার কোমরবন্ধ দিয়ে। তার পরে ওকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে চলল রাইফেলের কুঁদোর ধাক্কা দিতে দিতে। চীনা নার্স দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল।

বিমলকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানটা একটা ছোট মাঠের মতো। একদিকে একটা নিচু বাড়ি।

মাঠের এক পাশে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার পেতে জনৈক জাপানি সামরিক কর্মচারী বসে। তার চারিপাশে সশস্ত্র জাপানি সৈন্যের ভিড়। কিছু দূরে দেওয়াল থেকে পনেরো হাত দূরে একসারি রাইফেলধারী সৈন্য দাঁড়িয়ে। আরও অনেক জাপানি সৈন্য মাঠটার মধ্যে এদিকে-ওদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

এ-জায়গাটাতে কী হচ্ছে বুঝতে পারলে না।

ওকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কিছু দূরে দাঁড় করালে সৈন্যরা, তখন ও চেয়ে দেখলে দুজন চীনাকে জাপানি সৈন্যরা ঘিরে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। চেয়ারে উপবিষ্ট

জাপানি অফিসারটি কী জিজ্ঞেস করছে সৈন্যদের। চীনা দুটি সৈন্য নয়, সাধারণ নাগরিক—বিমল ওদের দেখেই বুঝলে। একটু পরেই জাপানি অফিসারটি কী একটা আদেশ দিয়ে হাত নেড়ে চীনা দুটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বল্লে।

জাপানি সৈন্যরা তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের ওদিকে যে-বাড়িটা, তার দেওয়ালের গায়ে নিয়ে দাঁড় করালে।

চীনা লোক দুটির মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে—তারা কলের পুতুলের মতো জাপানিদের সঙ্গে চলল বটে, কিন্তু তাদের চোখের অবাক ভাব দেখে মনে হয় তারা বুঝতে পারেনি কেন তাদের দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে।

বিমলও প্রথমটা বুঝতে পারেনি, সে বুঝলে—যখন দশজন জাপানি সৈন্যের সারি একযোগে রাইফেল তুল্লে।

একটা তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, সামরিক আদেশ বাতাস চিরে উচ্চারিত হল, সঙ্গে সঙ্গে দশটি রাইফেলের এক যোগে আওয়াজ। বিমল চোখ বুজলে।

যখন সে আবার চোখ চাইলে, তখন প্রথমেই যে কথা তার মনে উঠল, স্থান ও অবস্থা হিসেবে সেটা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার বলতে হবে। তার সর্বপ্রথম মনে হল—জাপানি রাইফেলের ধোঁয়া তো খুব বেশি হয় না! কেন এ-কথা তার মনে হল এই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে—জীবনের এই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্তে, কে তা বলবে?

তার পরই বিমল দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা দুটি উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। দুজন জাপানি সৈন্য তাদের মৃতদেহের পা ধরে হিঁচড়ে টেনে একপাশে রেখে দিলে। তারা পাশাপাশি পড়ে রইল এমনভাবে, দেখে বিমলের মনে হল ওরা কোনো ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে প্রণাম করছে।

মানুষকে মানুষ যে এমনভাবে হত্যা করতে পারে, বিমল তা আজ প্রথম দেখেছে হাসপাতালে, আর দেখলে এখন।

এবার বিমলের পালা, বিমল ভাবলে।

কিন্তু চেয়ে দেখলে আর চারজন চীনাকে আবার কোথা থেকে নিয়ে এসে জাপানি সৈন্যরা টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

এবারও পূর্বের মতো কথা-কাটাকাটি হল জাপানি অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে।

তারপর আবার পূর্বের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি! এই চীনা চারজনও উপুড় হয়ে পড়ল দেয়ালের সামনে আগের দুজনের মত।

চীনা ভাষা যদিও-বা কিছু কিছু শিখেছে বিমল, জাপানি ভাষার তো সে বিন্দুবিসর্গ জানে না। কেন যে এদের গুলি করে মারা হচ্ছে, কী অপরাধে এরা অপরাধী, কিছু বোঝা গেল না। আর এখানে জাপানিরাই কথাবার্তা বলছে, চীনাদের বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

বিমল ভাবছিল—এই দূর বিদেশে এখনি তার প্রাণ বেরুবে। মা-বাবার সঙ্গে আর দেখা হল না, হয়তো তারা জানতেও পারবেন না যে তার কি হয়েছে। শুধু একখানা চিঠি যাবে তাঁদের কাছে, তাতে লেখা থাকবে, ছেলে তাঁদের 'মিসিং'—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!...কিন্তু এ্যালিসের কী হল! এ্যালিসের সঙ্গেও আর দেখা হবে না। এ্যালিসকে বড় ভাল লেগেছিল। কোথায় যে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে! বেচারি এ্যালিস! বেচারি মিনি!

কিন্তু বিমলের পালা আসতে বড় দেরি হতে লাগল।

দলে দলে চীনা নাগরিকদের টেবিলের সামনে দাঁড় করানো চলতে লাগল। তারপর

তাদের হত্যা করাও সমানভাবে চলছে।

মৃতদেহ ক্রমেই স্তূপাকার হয়ে উঠেছে।

এ-রকম নিষ্ঠুর হত্যাদৃশ্য আর দেখা যায় না চোখে।

বিমলকে এইবার দুজন জাপানি সৈন্য নিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। বিমল অনুভব করলে তার ভয় হচ্ছে না মনে—কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে।

জ্বর আসবার আগে যেমন গা বমি-বমি করে, ওর ঠিক তেমনি হচ্ছে শরীরের মধ্যে। মাথাটা যেন হঠাৎ বড় হাল্কা হয়ে গিয়েছে, আর কেমন যেন বমির ভাব হচ্ছে।

জাপানি সামরিক অফিসারটি ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলে—তুমি রাস্তায় কী করছিলে?

বিমল ইংরিজিতে বল্লে—রাস্তায় সে কিছু করেনি। হাসপাতাল থেকে তাকে ধরে এনেছে।

—কোন হাসপতাল?

—চীনা রেডক্রস হাসপাতাল।

—তুমি সেখানে কি করছিলে?

—আমি ডাক্তার। ডিউটিতে ছিলাম, জাপানি সৈন্যরা একজন চীনা রোগীকে অকারণে বেয়নেটের খোঁচায়—

পিছন থেকে দুজন জাপানী সৈন্য ওকে রুক্ষ স্বরে কী বল্লে, বিমলের মনে হল তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।

জাপানি অফিসারটি বল্লে—থামলে কেন? বলে যাও—

বিমল হাসপাতালের হত্যাকান্ডের কথা সংক্ষেপে বলে গেল।

জাপানি অফিসার চারিপাশের জাপানি সৈন্যদের দিকে চেয়ে জাপানি ভাষায় কী প্রশ্ন করলে। বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি সেই সৈন্যকে চিনতে পারবে?

—না। অত ভাল করে দেখিনি তার চেহারা, তখন মাথার ঠিক ছিল না, তা ছাড়া জাপানি সৈন্যরা সবাই আমার চোখে একই রকম দেখায়। দেখতে অভ্যস্ত নই বলে।

—তুমি সিঙ্গাপুরের লোক?

—আমি ভারতবাসী।

—চীনা হাসপাতালে চাকুরি কর?

—হ্যাঁ।

—সরাসরি এসেছ চীনে?

এ-প্রশ্ন করবার কারণ বিমল একটু একটু বুঝতে পারলে। এখানে সে একটা মিথ্যে কথা বল্লে। এই একমাত্র ফাঁক, এই ফাঁক দিয়ে সে এবারের মতো গলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তো করবে! তারপর যা হয় হবে। সে বল্লে—সরাসরি আসিনি। আন্তর্জাতিক কনশেসনে এসেছিলাম; ব্রিটিশ কনসুলেট আপিসে আমার নাম রেজেষ্ট্রি করা আছে।

এই সময় একজন জাপানি সৈন্য কী বল্লে অফিসারটিকে। তার হাতে তিনটে জরির ব্যান্ড, দেখে মনে হয় সে একজন করপোরাল কিম্বা কোম্প্যানি-কম্যান্ডার।

জাপানি অফিসার বিমলের দিকে ভ্রূকুটি করে বল্লে—তুমি একজন গুপ্তচর।

—আমি একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। আমি ডাক্তার। তোমার সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই জানে আমি হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলাম, ওরা ধরে এনেছে।

—আঙুলের টিপসই দাও দুটো এখানে।

বিমল দুখানা কাগজে টিপসই দিলে। তারপর জাপানি অফিসার কী আদেশ করলে জাপানি ভাষায়, ওকে দুজন জাপানি সৈন্য ধরে নিয়ে গিয়ে বাইরে একটা কামানের গাড়ির উপর বসালে। চারিধারে বহু জাপানি সৈন্য গিজগিজ করছে। সকলেই ব্যস্ত, উত্তেজিত। কোথায় যাবার জন্য সকলেই যেন ব্যগ্র উৎসুক।

বিমল দেখলে তাকে এরা ছেড়ে দিলে না। মুক্তি যে দিয়েছে তা নয়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে? জাপানি ভাষার সে বিন্দুবিসর্গ বোঝে না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে না। মিনিট পনেরোর মধ্যে ঘড়-ঘড় করে কামানের গাড়ি টানতে লাগল একখানা মোটর লরি। ওর দুদিকে সাঁজোয়া গাড়ি চলেছে সারি দিয়ে।

সাংহাই অতি প্রকান্ড শহর, এর আর যেন শেষ নেই, ঘণ্টা দুই চলবার পরে শহরের বাড়িঘর ক্রমে কমে আসতে লাগল। ফাঁকা মাঠ আর ধানের ক্ষেত। চীনদেশের এ-অংশের দৃশ্য ঠিক যেন বাংলাদেশ, তবে এখানে কাছাকাছি নিচু পাহাড় শ্রেণী চোখে পড়ে।

কিছুদূরে একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ওপারে ঘন ধোঁয়া। রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ আসছে।

এক জায়গায় মাঠের মধ্যে পাইন বন। সেখানে কামানের গাড়ি দাঁড়াল। বিমল দেখলে একটা উঁচু ঢালুমতো জায়গায় লম্বা সারি দিয়ে জাপানি সৈন্যরা উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেল ধরে ছুঁড়ছে, এক সঙ্গে পঞ্চাশ ষাটটা রাইফেলের আওয়াজ হচ্ছে।

ওপাশ থেকেও তার জবাব আসছে ; এটা যে যুদ্ধক্ষেত্র এতক্ষণ পরে বিমল বুঝতে পারলে! ওদিকে চীনা নাইন্‌থ রুট আর্মি জাপানিদের বাধা দিচ্ছে—চীনা সৈন্যবাহিনী সাংহাই ছেড়ে হটে গিয়েছে বটে, কিন্তু জাপানিদের আর এগোতে দেবে না।

আর একটু পরে বিমল লক্ষ্য করে দেখলে, পাইন বনের একপাশে গাছের তলায় একরাশ মৃতদেহ জাপানি সৈন্যের। স্ট্রেচারে করে বিমলের চোখের সামনে আরও দুজন মরা কি জ্যান্ত সৈন্যকে নিয়ে এল, বিমল বুঝতে পারলে না। একটু পরে আহতদের আর্তনাদ কানে যেতেই চিকিৎসক বিমল চঞ্চল হয়ে উঠল। পাশের একজন জাপানি সৈন্যকে বল্লে পিজিন ইংলিশে—আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমি ডাক্তার, ওদের দেখব।

সব মানুষের দুঃখই সমান। দুঃখপীড়িত মানুষের জাত নেই—তারা চীনা নয়, জাপানিও নয়। একটু পরে জাপানি অফিসারের সম্মতিক্রমে বিমল হতাহত সৈন্যদের কাছে গেল দেখতে, যদি তার দ্বারা কোনো সাহায্য হয়। যদি মড়ার গাদায় জড়ো করা সৈন্যদের মধ্যে দু-একজন সাংঘাতিক আহত লোক বার হয়—কারণ আর্তনাদ সেই গাদার মধ্যে থেকেই আসছিল।

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিমলের কিন্তু মনে হচ্ছিল না যে এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

বইয়ে পড়া বা কল্পনায় দেখা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

একটা শান্ত পাইন বন, গোটা তিনেক কামানের গাড়ি, রাইফেল-হাতে কতকগুলি সৈন্য উপুড় হয়ে আছে—ওপারে পাহাড়ের ওপর কিছু ধোঁয়া।—

কেবল সম্মুখের হতাহত জাপানি সৈন্যগুলি পরিচয় দিচ্ছে যে বিমল কোনো শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই—যেখানে সে রয়েছে সেখানে মানুষের জীবন-মরণের সঙ্গে সম্পর্ক বড় বেশি।

কিন্তু ওষুধপত্র কিছু নেই যা দিয়ে এইসব আহত সৈনিকদের চিকিৎসা চলে। এমনকি খানিকটা আইডিন পর্যন্ত বিমল অনেককে বলেও জোটাতে পারলে না। এদের হাসপাতাল শিবির অনেক দূরে—সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত নেই।

জাপানি সৈন্যরা কিন্তু দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপারে চীনা

সৈন্যদের রাইফেল নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কারণ যে কি, কিছু বুঝলে না।

আবার কামানের গাড়িতে চড়ে সৈন্যবেষ্টিত হয়ে যাত্রা।

এবার জাপানিরা বিমলের সঙ্গে খানিকটা ভাল ব্যবহার করলে, কারণ আহত জাপানি সৈনিকদের ও যথেষ্ট সেবা করেছে। ও যে সাধারণ সৈনিক বা স্পাই নয়, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার—এই বিশ্বাস জন্মেছে সকলেরই।

পাহাড়ের ওপারে অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সৈন্যশিবির। ওর মধ্যে ঢুকেই বিমল বুঝতে পারলে, এটা চীনা আর্মির হাসপাতাল—প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল এখানে—এখন কিছু নেই, চীনা সৈন্য সব সঙ্গে করে নিয়ে পালিয়েছে, কেবল একটা বড় দস্তার টব পড়ে আছে—আর কিছু ব্যান্ডেজের তুলো। হাসপাতাল-শিবির থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এক গাছের তলায় এক চীনা সৈন্যকে পাওয়া গেল—হতভাগ্য গুরুতর আহত। রাইফেলের গুলি বোধহয় জাপানিদের, তার শরীরের দুই জায়গায় বিঁধেছে—রক্তে তার ইউনিফর্ম ভিজে উঠেছে। একে যে ওর বন্ধুরা কেন শত্রুর হাতে ফেলে পালিয়েছে কিছু বোঝা গেল না।

একজন জাপানি সৈন্য ওর পা ধরে খানিকটা হেঁচড়ে নিয়ে চলল। লোকটার বেশ জ্ঞান রয়েছে—সে যন্ত্রণায় অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠতেই পেছন থেকে একজন জাপানি অফিসার এগিয়ে গেল তাকে দেখতে।

ওদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে জাপানি ভাষায় কী বলাবলি হল, বিমল বুঝলে না—হঠাৎ অফিসারটি রিভলভার বার করে আহত সৈনিকের মাথায় প্রায় নল ঠেকিয়ে গুলি করলে।

লোকটা যেন রিভলভার ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়ল। ওর সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

বিমল শিউরে উঠল—চোখের সামনে এরকম নিষ্ঠুর হত্যা দেখতে সে এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। মাইল তিন দূরে একটা চীনা গ্রাম—যুদ্ধক্ষেত্রের বাঁদিক ঘেঁষে। ডানদিকে একটা অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দিকে জাপানি অফিসারটির ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দেখছে সবাই, সেদিকে আঙুল দিয়ে কী দেখাচ্ছে—বিমল বুঝলে ওই পাহাড়টা বর্তমানে চীনা নাইন্‌থ রুট আর্মির দ্বিতীয় ঘাঁটি। প্রথম ঘাঁটি ছিল পূর্বোক্ত পাইন বনের সামনের পাহাড়—তা গিয়েছে।

একস্থানে একদল জাপানি সৈন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের পাশ দিয়ে বিমলদের দল কামানের গাড়ি নিয়ে চলে গেল। ওরা যেন খুব উত্তেজিত হয়ে কী বলাবলি করছে, বিমল বুঝতে পারলে না। একজন পিজিন ইংলিশ জানা জাপানি সৈন্যকে জিজ্ঞেস করলে—ওখানে কী হচ্ছে। সৈন্যটি বল্লে—শোননি তুমি? সাংহাই শহর এখন আমাদের হাতে। আজ সকালে আমাদের হাতে এসেছে।

—এত বড় সাংহাই শহর তোমাদের হাতে সবটা এসেছে?

—সব। ওরা এইমাত্র ফিল্ড টেলিফোনে খবর পেয়েছে।

—যুদ্ধ হল কখন?

—কাল সারারাত প্রায় দুশো বম্বার প্লেন বোমা ফেলেছে—শুনছি বিস্তর লোক মরেছে সাংহাইতে—

—সকলেই সাধারণ নাগরিক বোধহয়?

—বেশির ভাগ! হাজার দুই তো শুধু চা-পেইতেই মরেছে—আর শুনছি কনশেসনে বোমা ফেলে দুশো পলাতক চীনাকে মারা হয়েছে। ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে—হবেই

তো—আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। সাংহাই কী, সারা এশিয়া আমরা দখল করব—তোমাদের ভারতবর্ষ তো বটেই। দেখে নিও তুমি—নাও এগিয়ে চল।

বিমল ভাবছিল, সুরেশ্বর কি বেঁচে আছে? বোধহয় নয়। চা-পেই পল্লির অত্যন্ত কাছে চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউতে চীনা রেডক্রস হাসপাতাল। জাপানি বম্বারগুলোর বিশেষ দৃষ্টি হাসপাতালের ওপর। কাল রাত্রেই সুরেশ্বরের ডিউটি থাকবার কথা। সম্ভবত হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিয়েছে—রোগী, ডাক্তার, নার্সসুদ্ধু। ভাগ্যে এ্যালিস আর মিনি ওখানে ছিল না।

কিন্তু আন্তর্জাতিক কনশেসনে বোমা ফেলে আশ্রয়হীন চীনা নরনারীদের মেরেছে, এ-কথাটা বিমলের ভাল বিশ্বাস হল না। আন্তর্জাতিক কনশেসনে বোমা ফেলতে সাহস করে কখনও? ওটা নিতান্ত বাজে কথা বলছে।

ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক কনশেসনের সম্পর্কে বিমলের এ-অলৌকিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব দূর হয়েছিল—সাংহাই অধিকার করার পূর্বে ও পরে জাপানি বম্বার প্লেনগুলো সে কনশেসনের পবিত্রতা মানেনি—এ-সংবাদ বিমল আরও ভাল জায়গা থেকে এর পরে শুনেছিল।

পথের মধ্যে একটা চীনা গ্রাম। বড় বড় ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে। তখন সন্ধ্যা হবার বেশি দেরি নেই। পূর্বোক্ত পাহাড় ও পাইনবন থেকে অন্তত পাঁচ মাইল তখন আসা হয়েছে। জাপানি সৈন্যের একটা দল গ্রামটা দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠল—এবং সবাই তক্ষুনি হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে প্রায় বুক ঠেকিয়ে, চুপিচুপি অগ্রসর হতে লাগল গ্রামখানার দিকে। বিমল শুধু ভাবছিল, ভগবান করেন—গ্রামটাতে লোক না থাকে—সব যেন পালিয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তা হল না। এ গ্রামের লোক যুদ্ধের বিশেষ কোনো খবর রাখত না—সাংহাই থেকে অন্তত পনেরো-ষোল মাইল দূরে গ্রামখানা। এরা বেশ নিশ্চিন্ত ছিল যে চীনা নাইন্থ-রুট আর্মি তাদের রক্ষা করছে। হঠাৎ যে নাইন্থ-রুট আর্মি ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছে—তা ওরা সম্ভবত জানত না।

জাপানি সৈন্যরা গ্রামখানাকে আগে চুপিচুপি গোল করে ঘিরে ফেল্লে। গ্রামে অনেকগুলো সাদা সাদা খোলার ঘর, খড়ের ঘর। শস্যের গোলা, দোকানপত্রও আছে। বেশ করে ঘেরার পরে জাপানিরা হটাৎ একযোগে ভীষণ পৈশাচিক চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত নরনারী ঘুম ভেঙে বাইরে এসে অনেকে দাঁড়াল—অনেকে ব্যাপারটা কি না বুঝতে পেরে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে জানলা খুলে চেয়ে দেখতে লাগল।

তারপর যে-দৃশ্যের সূচনা হল তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অমানুষিক। বিমলের চোখের সামনে বর্বর জাপানি সৈন্যরা নিরীহ গ্রামবাসীদের টেনে টেনে ঘর থেকে বার করতে লাগল, এবং বিনা দোষে বেয়নেটের কিংবা বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে তার মধ্যে সাত-আটজনকে একদম মেরে ফেললে। ছুতো এই যে, তারা নাকি বাধা দিয়েছিল। বাকিগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে দাঁড় করিয়ে রাখলে—চারিধারে বেয়নেট-চড়ানো রাইফেল-হাতে জাপানি সৈন্যের দল।

দু-তিনখানা খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দুটো ছোট ছোট বাছুরকে ভয় দেখিয়ে মজা করতে লাগল, একটা পিচ গাছের ডালগুলো অকারণে ভেঙে গাছটাকে ন্যাড়া করে দিলে। তবুও বিমল সবটা দেখতে পাচ্ছিল না—একে অন্ধকার, গ্রামটাও লম্বায় বড়, ওদিকে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সে জানে না—তার সামনে যেগুলো ঘটছে সেগুলো সে কেবল জানে। তবে নারী ও শিশুকণ্ঠের চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, ওদিকের জাপানি সৈন্যেরা ঠিক বুদ্ধদেবের বাণী আবৃত্তি করছে না। মিনিট কুড়ি পঁচিশ এমনি চলল—বেশিক্ষণ ধরে নয়।

তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে, কেবল জ্বলন্ত ঘরের চালের আলোয় সামনেটা আলোকিত।

হঠাৎ বিমলের যেন হুঁশ হল—সে তার আশেপাশে চেয়ে দেখলে তার খুব কাছে কোনো জাপানি সৈন্য নেই—লুঠপাটের লোভে সবাই গ্রামের ঘরদোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে জটলা করছে।

বিমল একবার পিছনের দিকে চাইলে—সেদিকে একখানা কামানের গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির কাছে সৈন্য নেই। গাড়িখানা থেকে পঞ্চাশ গজ আন্দাজ দূরে একটা প্রাচীন সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভ। চীনদেশের অনেক পাড়াগাঁয়ে সহমৃতা বিধবার এমন পুরনো আমলের স্মৃতিস্তম্ভ সে আরও দু-একটা দেখেছে। ততদূর পর্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে অগ্নিকান্ডের আলোয়, কিন্তু তার ওপারে অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না।

বিমল আস্তে আস্তে পিছনে হটতে হটতে দশ-বারো পা গিয়ে হঠাৎ পেছনে ফিরে ছুট দিয়ে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার আড়ালে একটা অন্ধকার স্থানে এসে দাঁড়াল।

ওর বুক টিপটিপ করছে। যদি জাপানিরা তাকে এখন ধরে, তবে এখুনি গুলি করে মারবে। কিন্তু ওদের হাতে বন্দি হয়ে এভাবে থাকার চেয়ে মৃত্যুপণ করেও মুক্তির চেষ্টা তাকে করতে হবে।

স্মৃতিস্তম্ভটার গায়ে একটা ডোবা। অন্ধকারের মধ্যেও মনে হল ডোবাটায় বেশ জল আছে। বিমল তাড়াতাড়ি ডোবার জলে নামল—তার মনে হল জলে নেমে সে যদি গলা ডুবিয়ে থাকে, তবেই সবচেয়ে নিরাপদ—ডাঙায় ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে বেশিদূর যেতে-না-যেতেই সে ধরা পড়বে।

এই ডোবায় নামবার জন্যেই যে এ-যাত্রা বেঁচে গেল—সেটা সে খানিকটা পরেই বুঝতে পারলে।

অল্পক্ষণ—বোধহয় দশ-বারো মিনিট পরেই ভীষণ চিৎকার ও বহু রাইফেলের সম্মিলিত আওয়াজ শোনা গেল। খুব একটা হৈচৈ দুপ্ দাপ্ পালানোর শব্দ, আবার চেঁচামেচি—একটা ঘোর বিশৃঙ্খলার ভাব!

বিমল তখন ডোবার জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছে। যদি ডাঙায় থাকত তবে অন্ধকারে ছুটন্ত রাইফেলের গুলিতে হয়তো তার প্রাণ যেত।

ব্যাপারটা কী? বিমল দেখলে সেই জাপানি কামানের গাড়িটা ঘিরে একটা খন্ডযুদ্ধ ও হাতাহাতি আরম্ভ হয়েছে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার ওপারে। হ্যান্ডগ্রনেড ফাটাবার ভীষণ আওয়াজে হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যেন কেঁপে উঠল। একটা—দুটো—তিনটে। জাপানি কামানের গাড়ির কাছ থেকে জাপানি সৈন্যরা হটে যাচ্ছে একটা বাগানের দিকে।

বিমল এবার ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝলে। চীনা সৈন্যের একটা দল জাপানিদের অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। জাপানিরা ফিল্ড গানগুলো একেবারে ছুঁড়তে পারলে না—দুটোর একটাও না। চীনারা বুদ্ধি করে আগেই সে-দুটো কামানই ঘেরাও করে দখল করলে। চীনা সৈন্যের এই দলটা হ্যান্ডগ্রেনেড ছুঁড়ে জাপানিদের দলের জটলা ভেঙে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে রাইফেলের ও হ্যান্ডগ্রনেডের আওয়াজ থেমে গেল। জাপানিরা কামানের গাড়ি ও বন্দিদের ফেলে পালিয়েছে। বিমল বেশ দেখতে পেলে কাছাকাছি কোথাও জাপানি সৈন্য একটাও নেই। কাদমাখা পোশাকে সতর্কতার সঙ্গে সে ধীরে ধীরে ডোবার জল থেকে

উঠল ডাঙায়।

একজন সৈনিকের চড়া আওয়াজ তার কানে গেল—কে ওখানে?

বিমল আশ্চর্য হল, এ পুরুষের গলা নয়—মেয়েমানুষের মতো সরু গলা। বিমল কথার উত্তর দেবার আগে দুজন রাইফেলধারী চীনা সৈনিক ওর দিকে এগিয়ে এল ইলেকট্রিক্ টর্চ হাতে। তারা ওকে দেখে যেমন অবাক হল, বিমলও ওদের দেখে তেমনি অবাক হয়ে গেল।

এরা পুরুষমানুষ নয়, দুজনেই মেয়ে ; বয়েসও বেশি নয়। কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে। বেশ সুশ্রী দুজনেই—সৈন্যবিভাগের আঁটসাঁট খাকি পোশাকে এদের দেহের লাবণ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি।

তারা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল গ্রামের সদর রাস্তার ওপরে।

অবাক কান্ড ! সকলেই মেয়ে-সৈনিক ! এদের মধ্যে পুরুষমানুষ নেই একজন। এই সুশ্রী তরুণীর দল এতক্ষণ হ্যান্ডগ্রেনেড ছুঁড়ছিল এবং এরাই জাপানি ফিল্ড গান দুটো ঘেরাও করে দখল করেছে।

বিমলের মনে পড়ল চীনা নাইন্থ রুট আর্মির সঙ্গে একটি নারীবাহিনী আছে—সে সাংহাই চীনা রেডক্রস হাসপাতালে শুনেছিল বটে।

এরাই সেই চীনা মেয়ে-যোদ্ধার দল।

এদের কম্যান্ডান্ট কিন্তু মেয়ে নয়—পুরুষ। একটা পাইনকাঠের পুরনো ভাঙা টেবিলের সামনে সম্ভবত একটা উপুড়-করা কলসি বা ওইরকম কোনো হাস্যকর জিনিস পেতে খুব লম্বা গোঁপ-ওয়ালা কম্যান্ডান্ট বসে ছিলেন। মেয়েরা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল সেখানে।

বিমলের মনে হল সমগ্র নারীবাহিনীর মধ্যে এই লোকটি ইংরাজি জানে এবং বেশ ভাল আমেরিকান টানের ইংরাজি বলে।

বিমলের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে প্রশ্ন করলে—তুমি জাপানিদের লোক?

—না। আমি চীনা হাসপাতালের ডাক্তার।

—কোথাকার হাসপাতাল?

—সাংহাইয়ের রেডক্রস হাসপাতাল। আমাকে ওরা বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল।

—তুমি কোন দেশের লোক?

—ভারতবর্ষের। চীনা মেডিকেল ইউনিটের আমি সভ্য।

কম্যান্ডান্ট বিস্ময়ের সুরে বল্লে—ও! তা ডোবার জলে কী করছিলে?

বিমল লজ্জিত হল। এতগুলি মেয়ের সামনে।

বল্লে—লুকিয়ে ছিলুম। ওদের অসতর্ক মুহূর্তে ওদের হাত থেকে পালিয়ে ডোবার জলে লুকিয়েছিলুম। তার পর হঠাৎ হ্যান্ড গ্রেনেডের আওয়াজ আর চিৎকার শুনলাম, তখনই ভাবলাম চীনা সৈন্য আক্রমণ করেছে ওদের।

কথাবার্তা চলছে এমন সময়ে গ্রামের পথে কী একটা গোলমাল উঠল। কম্যান্ডান্টকে ঘিরে যারা ছিল, তারা চমকে উঠে সেদিকে ছুটতে লাগল। আবার কি জাপানি সৈন্যের দল আক্রমণ করেছে?

বিমল চেয়ে দেখল জনকয়েক সৈন্য যেন কাউকে ধরে আনছে—তাদের পেছনে পেছনে অনেক সৈন্য মজা দেখতে আসছে।

ব্যাপার কী? হয়তো কোনো জাপানি সৈন্য ওদের হাতে ধরা পড়েছে, তাকে সকলে মিলে ধরে আনছে—নিশ্চয়ই।

কিন্তু দলটি কম্যান্ডান্টের কাছে এসে পৌঁছে যখন ওদের প্রথামতো সামরিক অভিবাদন করে দুজন বন্দিকে এগিয়ে নিয়ে দাঁড় করাল কম্যান্ডান্টের সামনে—বিমল চমকে উঠে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। কারণ কিছুক্ষণ পরে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরুল—এ্যালিস ! মিনি ! সামনের শীর্ণকায়া মূর্তি দুটি এ্যালিস ও মিনি ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু ওদের হাত-পা বাঁধা—মুখে কাপড় দিয়ে বাঁধা। এমন শক্ত করে বাঁধা যে ওদের কথা বলবার উপায় নেই।

ভয়ানক রাগ হল বিমলের এক মুহূর্তে এই চীনা নারী-বাহিনীর ওপর। মেয়ে হয়ে মেয়ের ওপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার ! ওদের এমন করে বেঁধে আনার অর্থ কী? ওরা ছিলই বা কোথায়?

কম্যান্ডান্ট উত্তেজিত সুরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। ইতিমধ্যে এ্যালিস ও মিনির হাত-পা মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। ব্যাপারটা ক্রমশঃ যা জানা গেল তা হল এই—

চীনা নারী-সৈন্যেরা এদের গ্রামের একটা ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণে এই অবস্থাতেই পায়। বাইরে থেকে ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল—কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজে সন্দেহ করে ওরা দরজা ভেঙে দেখতে পায় এদের। ওরা বুঝতে পেরেছে যে এরা ইউরোপীয় বা আমেরিকান মহিলা। কিন্তু চীনের এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে একটা অন্ধকার ঘরের কোণে এদের কে এ অবস্থায় এনে ফেলেছে তা না বুঝতে পেরে সবাই মহা বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

হঠাৎ বিমল বলে উঠল—এ্যালিস ! মিনি !

প্রথমে চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে এ্যালিস। বিমলকে দেখে সে যেন প্রথমটা চিনতে পারলে না—তারপর প্রায় ছুটে ওর কাছে এসে বিস্মিত চকিত আনন্দভরা কণ্ঠে বল্লে—তুমি এখানে !

সঙ্গে সঙ্গে মিনিও ছুটে এল। মিনির চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে নানা কষ্টে, উদ্বেগে, এবং খুব সম্ভবত অনাহারেও বটে। সে বল্লে—তোমার বন্ধু কই?

ঘণ্টা কয়েক পরে।

একটা রিচ গাছের তলায় বসে মিনি, এ্যালিস ও বিমল কথা বলছিল। এখনও রাত আছে, তবে পূর্ব আকাশে শুকতারা উঠেছে—ভোর হওয়ার বেশি দেরি নেই।

মিনি ও এ্যালিস তাদের গল্প বলে যাচ্ছিল। ওদের ভাল করে খেতে দেওয়া হয়েছে, কারণ ওদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পেট ভরে খাওয়া ওদের অদৃষ্টে অনেকদিন ধরে জোটেনি।

বিমল বল্লে—এখানে তোমরা কী করে এলে?

এ্যালিস বল্লে—এখনও ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু বড্ড খুশি হয়েছি তোমায় দেখে, বিমল। আমরা তো আশঙ্কা করছিলাম জাপানিরা আক্রমণ করেছে—এইবার ঘর জ্বালিয়ে আমাদের বন্দি অবস্থায় পুড়িয়ে মারবে—কে আর উদ্ধার করবে আমাদের? আর আমাদের অস্তিত্ব জানেই বা কে?

—কবে তোমরা এ গ্রামে এসেছ?

—আজ তিন দিন হল খুব সম্ভব—কারণ দিনরাত্রির জ্ঞান আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—কে তোমাদের আনে?

—কয়েকজন চীনা দস্যু।

—সাংহাইয়ের চন্দুর আড্ডায় তোমাদের নিয়ে গিয়েছিল ধরে?

এ্যালিস বিস্ময়ের সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি কী করে জানলে?

বিমল হেসে বল্লে—আমি আর সুরেশ্বর সেই চন্দুর আড্ডাতে যাই তোমাদের খুঁজতে। কিন্তু বড় বিভ্রাট বেধে গেল সে রাত্রে। জাপানি বম্বারগুলো সেই রাত্রে ভীষণ বোমা-বর্ষণ শুরু করে। মিনি বল্লে—আমরা খুব জানি। আমরা তখন হাতমুখ বাঁধা অবস্থায় একটা গরুর গাড়ির মধ্যে শুয়ে। একটা বোমা তো আমাদের গাড়ির পাশেই পড়ল।

এ্যালিস বল্লে—তারপর ওরা আমাদের নানা জায়গায় ঘোরালে। দশ হাজার ডলার মুক্তিপণ না দিলে আমাদের ছাড়বে না। দেশে বাপমায়ের কাছে চিঠি লিখবে বলে ঠিকানা চেয়েছিল—আমরা দিইনি। আজ ওরা আমাদের শাসিয়েছিল জাপানি সৈন্যরা গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে—ঠিকানা যদি না দিই তবে ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে পালাবে—আমরা নিঃশব্দে পুড়ে মরব। করেছিলও তা-ই। চীনা মেয়ে-সৈন্যেরা না এলে জাপানিরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। আমরাও পুড়ে মরতাম।

বিমল বল্লে—কী সর্বনাশ!

এ্যালিস বল্লে—আর কী, পুড়ে মরতাম এর আর সর্বনাশ কী? কতই তো মরছে! কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে, বিমল?

—আমাকে হাসপাতাল থেকে জাপানিরা বন্দি করে এনেছিল। আমি নাকি স্পাই। এতদিন গুলি করেই মারত যদি এ-কথা ওদের না বলতুম যে ব্রিটিশ কনসুলেট আপিসে আমার নাম রেজেস্ট্রি করা আছে।

মিনি বল্লে—সুরেশ্বর কোথায় গেল একটা খোঁজ করতে হয়। আর আমেরিকান কনসুলেটে আমাদের বিষয়ে একটা খবর দিতে হয়—চল কমান্ডান্টকে বলি।

জনকয়েক তরুণী চীনা মেয়ে-সৈন্য ওদের হাসিমুখে ঘিরে দাঁড়াল। এদের হাস্যদীপ্ত সুন্দর চেহারা বিমলের বড় ভাল লাগল, এমন একটা জিনিস নতুন দেখছে সে—বহুশতাব্দীর জড়তা দূর করে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী—রণক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা, কঠোরতার মধ্যে। দেশের দুর্দিনে দেশমাতৃকার সেবাযজ্ঞে তারা আজ মস্ত বড় হোতা—মিথ্যে জড়তা, মিথ্যে লজ্জা-সঙ্কোচ দূর করে ফেলেছে টেনে।

একটি মেয়ে ইংরেজিতে বল্লে—তোমরা হ্যাংচাউতে রাজকুমারী তাং -এর দেউল দেখেছ? এ্যালিস বল্লে—না, সে কী?

—পাঁচশো বছর আগে মিং রাজবংশের একজন রাজকুমারী ছিলেন তাং। তাঁর পুণ্যচরিত্র এখনও আমাদের দেশের লোকের মুখে-মুখে আছে। এখান থেকে বেশি দূর নয় দেখে যেও।

বিমল বল্লে—তুমি বেশ ইংরেজি বলতে পার তো!

মেয়েটি এমন হাসল যে তার তেরচা চোখ দুটো বুজে গিয়ে দুটো কালো রেখার মতো দেখাতে লাগল।

—ভাল ইংরেজি বলছি। তবুও এ ইয়াংকি ইংরাজি। মিশনারি স্কুলে পাঁচ বছর পড়েছিলুম একসময়ে। ইংরিজি গান পর্যন্ত গাইতে পারি-শুনবে?

হঠাৎ বিউগল বেজে উঠল। সবাই ব্যস্ত হয়ে কমান্ডান্টের তাঁবুর দিকে চলল। এখনি মার্চ শুরু করতে হবে। খবর পাওয়া গিয়েছে জাপানিদের বড় একটা দল এখানে আসছে।

বিমল বাঁ দিকে চেয়ে দেখলে।

একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মতো লম্বা টিবির আড়াল থেকে মাঝে মাঝে যেন সাদা ধোঁয়া বার হচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে ফটফট শব্দ হচ্ছে। শব্দটা অনেকটা যেন বিমলদের দেশের লিচু বাগানে পাখি তাড়াবার জন্যে চেরা বাঁশের ফটাফট আওয়াজের মতো।

রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ। আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত রাইফেলে শব্দ হয় খুব কম—বিমল জানত।

সবাই বল্লে—মাথা নিচু করো—মাথা নিচু করো—

জাপানি সৈন্যরা আক্রমণ করে ওই টিবিটাতে আড়াল নিয়েছে—কিন্তু হয়তো এখুনি বয়নেট চার্জ করবে কিংবা হ্যান্ডগ্রেনেড নিয়ে ছুটে আসবে।

চক্ষের নিমেষে সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেলের মুখ টিবিটার দিকে ফেরালে। একটি মেয়ে হঠাৎ অস্পষ্ট চিৎকার করে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে গেল—তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে গিয়ে পড়ল আর একটি মেয়ের পিঠের ওপরে—সে কিছু দূরে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল বন্দুক বাগিয়ে। এ্যালিস ছুটে উঠে গিয়ে মেয়েটির মাথা নিজের কোলে তুলে বলে—আশপাশের মেয়েরা বল্লে—মাথা নিচু—মাথা নিচু—শুয়ে পড়।

বিমল শঙ্কিত চোখে অল্পক্ষণের জন্যে এ্যালিসের দিকে চেয়ে দেখলে—তারপরে সেও উঠে গিয়ে এ্যালিসের পাশে বসল। আহত মেয়ে-সৈনিকের হাতের নাড়ি দেখে বল্লে—এ শেষ হয়ে গিয়েছে। এঃ, এই দ্যাখো গলায় লেগেছে গুলি—তোমার কাপড় যে রক্তে ভেসে গেল!

এ্যালিসকে একরকম জোর করে টেনে বিমল তাকে আবার উপুড় করে শোয়ালে। বিমল ভাবছিল, এখুনি যদি দুর্দান্ত জাপানি গ্রেনেডিয়ারেরা হ্যান্ডগ্রেনেড নিয়ে ছুটে আসে টিবিটা ডিঙিয়ে, তবে এই শায়িতা নারী-সৈনিকের দল একটাও টিকবে না। জাপানি হ্যান্ডগ্রেনেডের বিস্ফোরণের ফল অতি সাংঘাতিক, এদের কমান্ডান্ট কী ভরসায় এদের এখনও শুইয়ে রেখেছে? মরবে তো সবগুলোই মরবে। যা করে করুক, ওদের সৈন্য ওরা চালাতে হয় বাঁচাক, নয় তো যা হয় করুক। কিন্তু মিনি ও এ্যালিসের জীবন আবার বিপন্ন হল।

ফটাফট—ফটাফট—

আবার একটা অস্ফুট শব্দ। তারপর বিমল চেয়ে দেখলে চিৎকার না করেও সারির ঝাঝামাঝি দুটি মেয়ে উপুড় অবস্থাতেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। হাতের শিথিল মুঠিতে এখনও রাইফেল ধরাই রয়েছে। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ থেকে রক্ত বার হয়ে সামনের মাটি রাঙা হয়ে গিয়েছে। আর একটি মেয়েও দেখতে দেখতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। উঃ—কী ভীষণ হত্যাকান্ড! পুরুষদের এরকম অবস্থায় দেখলে সহ্য করা হয়তো যায়—কিন্তু এই ধরনের নারীবলির দৃশ্যটা বিমলের কাছে অতি করুণ ও অসহনীয় হয়ে উঠল!

বিমল বল্লে—এ্যালিস! কমান্ডান্টটি কেমন লোক? এদের দাঁড়িয়ে খুন করাচ্ছে কেন? উঠে যাবার অর্ডার না দেওয়ার মানে কী! জাপানিরা বেয়নেট কি হ্যান্ডগ্রেনেড চার্জ করলে একজনও বাঁচবে?

এ্যালিস বিমলের পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে—তার ওদিকে মিনি।

মিনি বল্লে—কমান্ডান্টের এরকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোনো মানে আছে।

মানে কী আছে তা জানবার আগেই আরও দুটি মেয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল—এদের এই নিঃশব্দ মৃত্যু বিমলের কাছে বড় মর্মস্পর্শী বলে মনে হল। হঠাৎ একটা লম্বা কাশীর

পেয়ারা আকারের বস্তু শায়িতা মেয়েদের সারির অদূরে এসে পড়ল—বিমল ও এ্যালিস দুজনেই বলে উঠল—গ্রেনেড।

কিন্তু হ্যান্ডগ্রেনেডটা ফাটল না। বোধহয় এবার জাপানিরা চার্জ করবে। এ্যালিস ও মিনির জন্যে বিমল শঙ্কিত হয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময় কমান্ডান্ট ওদের হঠবার অর্ডার দিলে।

পেছনের সারি শুয়ে-শুয়ে পিছুদিকে হঠতে লাগল। সামনের সারিগুলো ততক্ষণ রাইফেল বাগিয়ে তাদের রক্ষা করছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামনের সারিও হঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে জাপানিরা চার্জ করলে। দলে দলে ওরা ঢিবিটা পেরিয়ে 'বানজাই' বলে ভীষণ বাজখাঁই চিৎকার করতে করতে ছুটে এল—এদিকে নারীবাহিনীর সব বন্দুকগুলো একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। এখানে-ওখানে জাপানি সৈন্য ধুপধাপ করে মুখ থুবড়ে পড়তে লাগল। তবুও ওদের দল এগিয়ে আসছে।

সব পেছনের সারি উঠে দাঁড়িয়ে একযোগে সাত-আটটা হ্যান্ডগ্রেনেড ছুঁড়ল, চার-পাঁচট ফাটল। আরও কতকগুলো জাপানি সৈন্য মাটিতে পড়ে গেল। তিনজন মাত্র জাপানি এদের দলের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে দুজন বেয়নেটের ঘায়ে সাংঘাতিক আহত হল—বাকি একজনের মাথায় গুলি লেগে সাবাড় হল।

ততক্ষণ নারীবাহিনী প্রায় একশো-দেড়শো গজ দূরে চলে গিয়েছে। এতদূর থেকে হ্যান্ডগ্রেনেড কোনো কাজে আসবে না—কেবল কার্য্যকরি হতে পারে মিল্‌স্‌-বম্ব্ জাতীয় বোমা। সে কোনো দলের কাছেই নেই, বেশ বোঝা গেল।

কমান্ডান্ট বিমলকে ডেকে বল্লেন—এরকম কেন করেছি, আপনি বোধহয় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। আর কিছু দূরে মিং-চাউ-এর রেলস্টেশন। দুটো সৈন্যবাহী ট্রেন পরপর চলে যাবার কথা। জাপানিরা রেলস্টেশন আক্রমণ করত। আমি ওদের বাধা দিয়ে এখানে আটকে রাখলাম। টাইম অনুসারে ট্রেন দুটো চলে গিয়েছে। এখন আর আমাদের সৈন্যদের মৃত্যুর সম্মুখীন করা অনাবশ্যক। জাপানিরাও তা বুঝেছে, ওরাও আর আসবে না। ওদের লক্ষ্যস্থল আমরা নই—সেই ট্রেন দুখানা।

—কিন্তু এরোপ্লেন যদি বোমা ফেলে?

—আমার ঘাঁটি পার করে দিলাম নিরাপদে—তারপর অন্য এলাকার লোক গিয়ে বুঝুক সে-কথা।

মিং-চাউয়ের রেলস্টেশনে পৌঁছে সবাই খাওয়াদাওয়া করবার হুকুম পেলে। বিমল ব্যস্ত হয়ে পড়ল মিনি ও এ্যালিসকে কিছু খাওয়াতে। খাবার কিছুই নেই। অন্তত সভ্য খাদ্য কিছু নেই। কমান্ডান্টকে বলে কিছু চাল যোগাড় করে একটা গাছতলায় এ্যালিস একটা পুরানো সসপ্যানে ভাত চাপিয়ে দিলে তিনজনের মতো।

বেলা প্রায় বারোটা। রৌদ্র বেশ প্রখর, কিন্তু গরম নেই, বেশ শীত।

ভাত প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় দলে দলে ছোট্ট শীর্ণকায় ছেলেমেয়ে গাছতলায় নীরবে এসে দাঁড়াল। তারা ক্ষুধার্তের ব্যগ্র দৃষ্টিতে সসপ্যানের দিকে চেয়ে রইল। জনৈক মেয়ে-সৈনিক বল্লে—এরা আশপাশের গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত ছেলেমেয়ে ; আমাদের দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলছে। ওরা খাবার লোভে এসেছে।

এ্যালিস বল্লে—পুওর লিটল্ ডিয়ারস্!....ওদের কী খেতে দিই, বিমল?

বিমল মুশকিলে পড়ে গেল। নিজের খাওয়ার জন্যে নয়—মিনি ও এ্যালিস কত দিন পেট ভরে খায়নি বলেই ও ওদের খাওয়াতে ব্যগ্র ছিল। নিজে নাহয় না খাবে, কিন্তু এ্যালিস

যেমন মেয়ে, নিজের মুখের ভাত সব এক্ষুনি তুলে দেবে এখন এদের।

সুখের বিষয় একটা সমাধান হল। ওরা চীনা ছেলেমেয়ে, চীনা খাবার খেতে আপত্তি নেই। অন্য অন্য মেয়ে-সৈনিকরা ওদের দেশীয় খাদ্য কিছু কিছু দিলে। তারা চলে গেল তা-ই খেয়ে। এ্যালিসের ইচ্ছে ওদের মধ্যে একটা ছোট্ট ছেলে নিয়ে যায়। বল্লে—বিমল, বলো-না ওদের মধ্যে কাউকে আমার সঙ্গে যাবে। আমি খুব যত্ন করব। বিমল হাসলে, তা কি কখনও হয়?

একটু পরে একখানা ট্রেন এল। তাতে সব খোলা ট্রাক, কয়লার গাড়ির মতো। কমান্ডান্টের আদেশে সবাই তাতে উঠে পড়ল। ট্রেনের গার্ডের মুখে শোনা গেল জাপানিরা এখান থেকে বাইশ মাইল ডাউন লাইনে একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন এরোপ্লেন থেকে বোমা মেরে উড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে।

ট্রেন ছাড়ল। গার্ড বল্লে—ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থা। ওরা প্রত্যেক সৈন্যবাহী ট্রেনের ওপর কড়া লক্ষ্য রেখেছে। পৌঁছে দিতে পারব কি না নিরাপদে তার ঠিক নেই।

মাইল ত্রিশেক দুধারে ফাঁকা মাঠ, ধানের ক্ষেত, গমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলল। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে, রোদ নেই। মাঠে ঘন ছায়া পড়ে এসেছে। এমন সময় একটা পরিচিত আওয়াজ শুনে বিমলের বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠল। মুখ উঁচু করে দেখতে গিয়ে দেখলে ট্রেনের সবাই মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে। অনেকগুলি এরোপ্লেনের সম্মিলিত ঘরঘর আওয়াজ। ট্রেন যেন গতি বাড়িয়ে দিয়ে জোরে চলতে লাগল।

মিনি বল্লে—ওই দ্যাখো বিমল, এরোপ্লেনের সারি! বম্বার!—

চক্ষের নিমেষে এরোপ্লেনের সারি নিকটবর্তী হল—কিন্তু ট্রেনখানাকে গ্রাহ্য না করেই যেন এরোপ্লেনগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ একখানা বম্বার দল ছেড়ে বেশ নিচু হয়ে এল। ট্রেনের সকলের মুখ শুকিয়েছিল আগেই—এখন যেন বুকের রক্ত পর্যন্ত জমে গেল। এই ফাঁকা মাঠে বোমা ফেললে ট্রেনের চিহ্ন খুঁজে মিলবে না। তার ওপরে ছাদ-খোলা ট্রাকগাড়ি-বোঝাই সৈন্য, কারও মৃতদেহ এর পর সনাক্ত পর্যন্ত করা যাবে না। এ্যালিস ও মিনিকে বাঁচানো গেল না শেষ পর্যন্ত।

এরোপ্লেনখানা নিচে নেমে ছোঁ-মারা চিলের মতো একটা বোমা ফেলেই তখনি ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ! সমস্ত ট্রেনখানা কেঁপে নড়ে উঠল যেন, কিন্তু ট্রেনের বেগ কমল না। বিমল চেয়ে দেখলে, রেললাইন থেকে দশ গজ দূরে একটা জায়গায় বিশাল গর্তের সৃষ্টি করে মাটি, ধুলো, ঘাস, বালি, অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ হাত উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে কালো ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে বোমাটা সমাধি লাভ করেছে। বোমারু তাগ ঠিক করতে পারেনি।

আর মাইল পাঁচ-ছয় পরে একটা রেলস্টেশন। গাড়িখানা সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পূর্বেই দেখা গেল স্টেশন থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরুচ্ছে—লোকজন ছোটাছুটি করছে—একটা হট্টগোল, কলরব, ব্যস্ততার ভাব। ট্রেনখানা স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াতেই বোঝা গেল জাপানি বিমান থেকে বোমা ফেলে স্টেশনটাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। টিনের ছাদ দুমড়ে বেঁকে ছিটকে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে, একপাশে আগুন লেগে গিয়েছে—গোটা প্ল্যাটফর্মে মানুষের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ, কারো হাত, কারো পা, কারো মুন্ড।

নিকটে একখানা গ্রাম। গ্রামের চিহ্ন রাখেনি বোমারুর দল। ইনসেনডিয়ারি বোমা ফেলে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ট্রেন থেকে সবাই নেমে সাহায্য করতে ছুটল। গ্রামের লোক বেশি মরেনি—তবুও বিমল

দেখলে গ্রামের পথে চার-পাঁচটা বীভৎস মৃতদেহ পড়ে আছে। এরোপ্লেনগুলোর চিহ্ন নেই আকাশে, তাদের কাজ শেষ করে তারা চলে গিয়েছে। গ্রামের নরনারী ভয়ে বিহ্বল হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে পালিয়েছিল, যদিও বিপদের সম্ভাবনা ছিল সেখানেই সর্বাপেক্ষা বেশি, একটি মেয়ে একটা ভাঙা ঘরের সামনে ভাঙাচোরা হাঁড়িকুড়ি, বেতের পেটরা কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে আর কাঁদছে। একজন মেয়ে-সৈন্য তার কাছে গিয়ে চীনা ভাষায় কী জিজ্ঞেস করলে। বিমলের দল গ্রামের অন্য অন্য লোকজনের সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটু পরেই সেখানে ভারি একটা অদ্ভুত দৃশ্য সবারই চোখে পড়ল।

গ্রামের পাশে একটা ছোট্ট মাঠ—তারই এক গাছতলায় জনৈক বৃদ্ধ গ্রামের লোকজনকে চারিপাশে নিয়ে কী বলছেন বক্তৃতার ধরনে। বিমল চিনলে—প্রোফেসর লি!

এ্যালিস সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—ড্যাডি! চিনতে পার?

সৌম্য মূর্তি শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ বক্তৃতা থামিয়ে একগাল হেসে ওর দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন—তোমরা কোথা থেকে?

এ্যালিস হেসে বল্লে—এই ট্রেনে নামলাম। আর একটু হলে আমাদের কাউকে দেখতে পেতে না—আমাদের ট্রেনেও বোমা পড়েছিল।

বিমল বল্লে—গুডমর্নিং, প্রোফেসর লি। আপনার দলবল কোথায়? আপনি কী করছেন এখানে?

বৃদ্ধ বল্লেন—দলবল এখান থেকে তিন মাইল দূরে আর একখানা বোমায় বিধ্বস্ত গ্রামে সাহায্য করছে। আমি এদের উপদেশ দিচ্ছি এরোপ্লেন বোমা ফেলতে এলে কী করে আত্মরক্ষা করতে হয়। এরা কিছুই জানে না—দাঁড়িয়ে মরছে, নইলে দ্যাখো গ্রামের অধিকাংশ লোক ফাঁকা মাঠে ছুটে পালায়?

—আপনাকে তো সর্বত্রই দেখি, প্রোফেসর লি। পরের সাহায্য করতে এমন আর ক'জন লোক চীনদেশে আছেন জানি না। আপনাকে দেখে আপনার দেশের ওপর ভক্তি আমার অনেক বেড়ে গেল।

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—আমার দেশ অতি হতভাগ্য, আমরা অতি প্রাচীন সভ্য জাতি, কিন্তু জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছি। ভগবান নদীর এক কূল ভাঙেন আর এক কূল গড়েন। জাপান আজ উঠছে—আবার আমাদের দিন আসবে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, যে ক'দিন বাঁচি, মূঢ়তা ও বর্বরতার দ্বারা অত্যাচারিত দেশের সেবা করে দিন কাটিয়ে যেতে চাই। কিন্তু আমার দ্বারা আর কতটুকু উপকারই-বা হবে?

বিমল বল্লে—বড় ইচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথা অনুসারে আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আপনি কি অনুমতি করবেন? বৃদ্ধ মহাচীন যেন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন আপনার মূর্তিতে।

বিমলের দেখাদেখি মিনি, এ্যালিস এবং আরও কয়েকটি মেয়ে-সৈনিক বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে হাসিমুখে।

ট্রেন হুইস্‌ল্ দিলে। কমান্ডান্টের হুকুম শোনা গেল—ট্রেনে গিয়ে উঠে পড়।

এ্যালিস বল্লে—ড্যাডি, তোমার সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে? আমরা দুটি মেয়ে এবং এই ভারতবর্ষীয় বন্ধুটি তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে চাই—অনুমতি দেবে ড্যাডি?

বৃদ্ধ বল্লেন—এখন তোমরা যাও খুকিরা-শিগগির আমার সঙ্গে দেখা হবে। এ-কাজ তোমাদের নয়।

ট্রেন আবার চলল।

দুধারে শষ্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ধোঁয়ায় কালো অগ্নিদগ্ধ গ্রাম। জাপানি বোমারু বিমানের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন।

এ্যালিস বল্লে—বিমল, আমার কি মনে হচ্ছে জান? প্রোফেসর লিকে আবার আমাদের মধ্যে পেতে। এত ভাল লেগেছে ওঁকে! আমার নিজের বাবা নেই, ওকে দেখে সেই বাবার কথা মনে আসে।

বিমল দেখলে, এ্যালিসের বড় বড় চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

মিনি বল্লে—আমারও বড় ভক্তি হয় সত্যি! ভারি চমৎকার লোক।

বিমল বল্লে—অথচ কীভাবে ওর সঙ্গে আলাপ তা জান? আমি যখন প্রথম চীনদেশে আসি—আজ প্রায় এক বছর আগের কথা—তখন হ্যাং-চাউ রেলস্টেশনে উনি ওঁর ছাত্রদল নিয়ে উঠলেন—বল্লেন, যুদ্ধের সময় ওখানকার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন। শুনে আমারও হাসি পেয়েছিল।

এ্যালিস বল্লে—তখন কি জানতে উনি একজন মহাপুরুষ লোক! উনি যুদ্ধ-উপদ্রুত অঞ্চলের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন এটা ঠিকই—কিন্তু পরের দুঃখ দেখে সেসব ওঁর ভেসে গেল। People such as these are the salts of the Earth নয় কি?

বিমল মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

একটি নদীর পুল বোমায় ভেঙে দিয়েছে। আর ট্রেন যাবার উপায় নেই। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীরা দিনরাত খাটছে যদি পুলটা কোনোরকমে মেরামত করে কাজ চালানো যায়।

কাছেই একটা তাঁবু। মাঠের মধ্যে কিছুদূরে জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। এটা ফিল্ড হাসপাতাল।

ট্রেন থেকে মেয়ে-সৈন্যদের পথেই নামিয়ে দেওয়া হল। ট্রেনখানা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবে বলে পিছু হটে চলে গেল। কোনো বড় স্টেশনে গিয়ে এঞ্জিনখানা সোজা করে জুড়ে নেবে। সম্পূর্ণ নতুন জায়গা। যেন অনেকটা পূর্ববঙ্গের বড় বড় জলা-অঞ্চলের মতো। ফসলের ক্ষেত নেই—সামনে একটা বিল কিংবা ঐ ধরনের জলাশয়—দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাসের বন জলের ধারে। দূরে দূরে মেঘের মতো নীল পাহাড়। জায়গাটার নাম সিং-চাং। বিমল নেমে চারিদিকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

ট্রেনে করে এতদূরে এসে এখানে আবার যুদ্ধক্ষেত্র কী করে এল!

বিমলের ধারণা ছিল জাপানিদের আসল ঘাঁটি কোনকালে পার হয়ে আসা গিয়েছে।

কিন্তু কমান্ডান্ট তাকে বুঝিয়ে বল্লেন, এখান থেকে আরও প্রায় পঁচিশ মাইল দূর হ্যাং কাউ শহর পর্যন্ত ওদের সৈন্য-রেখা বিস্তৃত। সমুদ্রের উপকূলভাগে অনেক দূর অবধি ওরা নিজেদের লাইন ছড়িয়ে রেখেছে। মাটিতে একটা নকশা এঁকে বুঝিয়েও দিলেন।

বিমল একটা অনুচ্চ টিবির ওপর উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

কিছুদূরে একটা গ্রাম—পাশে কাদের অনেকগুলো ছোটবড় তাঁবু—সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে, বোধহয় রান্নাবান্না চলছে। পশ্চিম দিকে একটা বড় শষ্যক্ষেত্র, তার ধারে লম্বা লম্বা কী গাছের সারি। মোটের ওপর সবটা নিয়ে বেশ শান্তিপূর্ণ পল্লিদৃশ্য।

এ কী ধরনের যুদ্ধক্ষেত্র?

কিন্তু বিমলদের সেখানে উপস্থিত হবার আধ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ-ছ'জন আহত সৈন্যকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতাল-তাঁবুতে আনা হল। সকলেই রাইফেলের গুলিতে আহত।

বিমল জিজ্ঞেস করে জানল যুদ্ধক্ষেত্র যে বেশিদূর তাও নয়—ওই গাছের সারির পাশেই, এখান থেকে আধমাইলের মধ্যে। একটা ক্ষুদ্র গ্রাম জাপানিরা দখল করে সেখানে ঘাঁটি করেছে—চীনা সৈন্য ওদের সেখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে।

কমান্ডান্টের আদেশে মেয়ে-সৈনিকরা রান্নাবান্না করে খাবার আয়োজন করতে লাগল—কারণ অনেকক্ষণ তারা বিশেষ কিছু খায়নি। বিমল বল্লে—খাইয়ে নিয়ে এদের কি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে? কমান্ডান্ট বল্লে—না, এরা পরিশ্রান্ত। ক্লান্ত সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ হয় না—ওদের অন্তত দশ ঘন্টা বিশ্রাম করতে দেব।

—তারপর?

—তারপর যুদ্ধে পাঠাতে পারি-রিজার্ভ রাখতে পারি। এখান থেকে সাত মাইল দূরে হ্যানকাউ-ক্যান্টন রেলের ধারে একটা গ্রামে নাইন্থ-রুট আর্মির এক ঘাঁটি। সেখানে জেনারেল মাও-সি-তুং আছেন—তাঁর হুকুম মতো কাজ হবে।

—হুকুম আসবে কী করে?

—ঘোড়ার পিঠে যায় আসে ডেসপ্যাচ দল। আমাদের ফিল্ড টেলিফোন নেই।

কমান্ডান্টের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে বিমল হাসপাতাল-তাঁবুতে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার কাজে মন দিল। তিনটি হতভাগ্য সৈনিক কোনোপ্রকার সাহায্য পাবার পূর্বেই মারা গেল। বাকি কয়েকজনের করুণ আর্তনাদে হাসপাতাল মুখরিত হয়ে উঠল। কী নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ব্যাপার এই যুদ্ধ! এ-কথা বিমলের মনে না এসে পারল না।

এ্যালিস এসে বল্লে—এদের জন্যে বৃথা চেষ্টা। এদের একজনও বাঁচবে না।

বিমল বল্লে—তা-ই মনে হয়। না আছে ওষুধ, না আছে যন্ত্রপাতি, কী দিয়ে চিকিৎসা করব?

—বিমল, এদের জন্যে আমরিকান রেডক্রসে লিখে কিছু জিনিস আনার চেষ্টা করব?

—লেখো-না! নইলে সত্যি বলছি আমাদের খাটুনি বৃথা হবে।

—ঠিকই তো! এটা কি একটা হাসপাতাল? কী ছাই আছে এখানে?

—মিনি কোথায় গেল?

—সে রাঁধছে। খেতে হবে তো! রাঁধবারও কোনো বন্দোবস্ত নেই। দুটি চাল ছাড়া আর কিছু দেয়নি।

—টিনবন্দি খাবার কিছু সাংহাই থেকে আনিয়ে নিই। ও খেয়ে তোমরা বাঁচবে না।

—একটা কথা শোনো। তুমি একবার সাংহাই যাও—মিনি সুরেশ্বর সম্বন্ধে বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে আমায় বলছিল। ও আমায় কাল থেকে বলচে তোমায় বলতে।

—আমিও যে তা না ভেবেছি এমন নয়। কিন্তু সাংহাই পর্যন্ত কোনো ট্রেন এখান থেকে যাচ্ছে না তো! আচ্ছা, কমান্ডান্টকে বলে দেখি।

আবার চারজন আহত সৈনিককে স্ট্রেচারে করে আনা হল। একজনের মাথার খুলির অর্ধেকটা উড়ে গিয়েছে বল্লেই হয়। বিমল বল্লে—এ তো গেল! একে এখানে কেন এনেছে?

কিন্তু অদ্ভুত জীবনীশক্তি চীনা সৈনিকটির। মাথার ব্যান্ডেজ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দুবার ব্যান্ডেজ বদলাতে হল, তবুও সৈনিকটি মারা গেল না—বিমল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে।

একজন সৈনিক ডেসপ্যাচ রাইডার হাসপাতালে ঢুকে বল্লে—আমাদের তাঁবু ওঠাতে হবে এখান থেকে—শত্রু খুব নিকটে এসে পড়েছে। রেললাইনের ওপর ওদের লক্ষ্য কিনা! রেললাইনটি দখল করবে। আমাদের সৈন্য প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু আজ সারাদিনে

জাপানিরা প্রায় এক মাইল এগিয়েছে। দেখবে এসো।

তার পরে সৈনিকটি একটা ফিল্ডগ্লাস বার করে বিমলের হাতে দিয়ে বল্লে—পূর্বদিকে ওই যে গাঁ-খানা দেখা যাচ্ছে ওদিকে চেয়ে দ্যাখো—বিমল একখানা গ্রাম বেশ স্পষ্ট দেখছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু না। সৈনিকটি বল্লে—ওই গ্রামখানির পেছনেই শত্রুর লাইন। গ্রামখানা দখল করতে ওরা আজ ক'দিন চেষ্টা করছে—ওখানেই আমরা বাধা দিচ্ছিলাম। আজ গ্রামের অর্ধেকটা দখল করেছে। সুতরাং বোধহয় কাল কি পরশু রেলাইনে এসে পৌঁছবে।

—গ্রামে লোকজন আছে?

—পাগল! কবে পালিয়েছে! পশ্চিমদিকে একটা নদী আছে—তার ওপারে পলাতক গৃহহারাদের একটা বস্তি বসে গেছে। আট-দশখানা গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে ওখানে।

—খাবার দিচ্ছে কে?

—কে দেবে? অনাহারে অনেকে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দুর্দশা দেখলে বুঝবে বর্তমান-কালের যুদ্ধ কী নিষ্ঠুর ব্যাপার।

বিমল কথায় কথায় জানতে পারলে, ডেসপ্যাচ-রাইডার সৈনিকটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান—পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—পূর্বে স্কুল-মাস্টারি করত, যুদ্ধ বাধবার পর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে।

বিমল বল্লে—তুমি আমাকে ওই গ্রামে নিয়ে চল-না!

—এমনিই তো যেতে হবে। বোধহয় ওখানেই হাসপাতাল উঠে যাবে—কারণ শত্রুর লাইন থেকে জায়গাটা দূরে।

—এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে বারণ করেছে কে?

—কেউ না। সে তো সর্বত্রই ফেলছে। তবে একটা পাইনবনের তলায় এ বস্তি—জাপানি প্লেন হঠাৎ সন্ধান পাবে না। ভয়ে ওরা রান্না করে না—পাছে ধোঁয়া দেখে বোমারু প্লেন সন্ধান পায়।

সৈনিকটি চলে গেলে বিমল এ্যালিসকে ডেকে কথাটা বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একখানা ট্রেনের শব্দ শোনা গেল দূরে।

এ্যালিস তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে এসে বল্লে—ট্রেন আসছে, না এরোপ্লেন? বিমল বল্লে—ট্রেনই। বোধহয় আরও সৈন্য আসছে। চল দেখি গিয়ে। অনেকে রেললাইনের ধারে জড়ো হল। এখানে স্টেশন নেই। একজন লোক নিশান হাতে অপেক্ষা করছিল—নিশান দেখিয়ে ট্রেন দাঁড় করাবে। ট্রেন এসে পড়ল। সারি সারি খোলা মালগাড়িতে সৈন্য বোঝাই—অন্য সাধারণ যাত্রীও আছে। কতকগুলো ছাদ-আঁটা মালগাড়ি পেছনের দিকে—তাতে সৈন্যদের রসদ বোঝাই।

গাড়ি থেকে দলে দলে সৈন্য নামতে লাগল। জাপানি সৈন্যদের হাত থেকে গ্রাম রক্ষা করবার জন্যে এরা আসছে ক্যান্টন থেকে। রসদ বোঝাই মালগাড়িগুলো থেকে রসদ নামানোর ব্যবস্থা করা হতে লাগল কারণ বেশিক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলে এক্ষুনি কোনোদিক থেকে জাপানি বিমান আকাশপথে দেখা দেবে হয়তো। হঠাৎ এ্যালিস উত্তেজিত সুরে বল্লে—বিমল, বিমল—ও কে? প্রোফেসর লি না?

তার পরেই সে হাসিমুখে সামনের দিকে ভিড়ের মধ্যে ছুটে গেল—ড্যাডি—ড্যাডি—

সত্যিই তো—হাস্যমুখ বৃদ্ধ একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ভিড় ঠেলে বাইরে আসতে চেষ্টা করছেন।

বিমল এগিয়ে গিয়ে বল্লে—নমস্কার প্রোফেসর লি—ব্যাগটা আমার হাতে দিন। আপনি কোথা থেকে?

এ্যালিস ততক্ষণ গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ তার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বিমলের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন—তোমরা এখানে আছ? বেশ বেশ। আমি এসেছি পলাতক গ্রামবাসীদের যে বস্তি আছে নদীর ওপারে—সেখানে কয়েক পিপে আপেল বিলি করতে। আমেরিকান জুনিয়র রেডক্রস দুশো পিপে ভাল কালিফোর্নিয়ার আপেল পাঠিয়েছে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের খাওয়ানোর জন্যে। আমার ঠিকানাতেই পাঠিয়েছিল। আর সব বিলি করে দিয়েছি অন্য অন্য স্থানে—দশ পিপে মজুত আছে এখনও। তা তোমরা আছ ভালই হয়েছে—তোমরা সাহায্য করো এখন।

এ্যালিস তো বেজায় খুশি। বল্লে—ড্যাডি, খুব ভাল কথা। তা বাদে আরও অনেক কাজ হবে যখন তুমি এসে পড়েছ। চল, আপেলের পিপে সব নামিয়ে নিই।

এমন সময় মিনি ভিড়ের মধ্যে কোথা থেকে ছুটে এসে ব্যস্তভাবে বল্লে—শিগগির এসো বিমল, শিগগির এসো এ্যালিস—সুরেশ্বর নামছে ওই দ্যাখো ট্রেন থেকে—

সুরেশ্বর সত্যিই নামছে বটে—তার সঙ্গে দুজন চীনা ডাক্তার, এদেরও বিমল চেনে—সাংহাই চীনা রেডক্রস হাসপাতালে এরা ছিল।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি—একটু আমায় ক্ষমা করুন, পাঁচ মিনিটের জন্যে আসছি।

সুরেশ্বর তো ওদের দেখে অবাক। বল্লে—তোমরা এখানে! মিনি আর এ্যালিসই—বা এখানে কী করে এল! সাংহাইতে বেজায় গুজব এদের চীনা গুন্ডারা গুম করেছে—আর বিমল তুমি জাপানিদের হাতে বন্দি। মিনি কেমন আছে?

বিমল বল্লে—সেসব কথা হবে এখন। চল এখন সবাই মিলে তাঁবুতে গিয়ে বসা যক। অনেক কথা আছে। প্রোফেসর লিকে ডেকে আনি—উনিও আমাদের সঙ্গে আসুন। তোমরা এগিয়ে চল ততক্ষণ। আমি ওঁর আপেলের পিপেগুলো নামাবার কী ব্যবস্থা হল দেখে আসি।

কিছুক্ষণ পরে দুঃস্থ চীনা নরনারীদের তাঁবুতে সুরেশ্বর, বিমল, এ্যালিস ও মিনি আপেল-বিলি কাজে প্রফেসর লিকে সাহায্য করছিল। এ-জায়গা ঠিক তাঁবু নয়, একটা পাইন বন, তার মাঝে মাঝে পুরনো ক্যাম্বিস, চট, মাদুর, ভাঙা টিন প্রভৃতি জোড়াতালি দিয়ে আশ্রয় বানিয়ে তারই মধ্যে হতভাগ্য গৃহহারার দল মাথা গুঁজে আছে। ওদের দুর্দশা দেখে বিমলের কঠিন মনেও দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হল। ছোট ছোট উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত, কাদামাটিমাখা শিশুদের ব্যগ্র প্রসারিত হাতে আপেল বিলি করবার সময় এ্যালিসের চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখলে বিমল। নাঃ—বড় ছেলেমানুষ এই এ্যালিস!....এ্যালিসের প্রতি একটা কেমন অকারণ স্নেহে ও মমতায় বিমলের মন গলে যায়। কী সুন্দর মেয়ে এ্যালিস আর কী ছেলেমানুষ!

হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। আপেল বিলি করতে করতে প্রফেসর লি এক সময় একটা আপেলের পিপের মধ্যে ঘাড় নিচু করে দেখে বল্লেন—চারটে আপেল আর বাকি আছে। আমি কালিফোর্নিয়ার আপেল কখনও খাইনি—একটি আমি খাব।

বলেই সদানন্দ বৃদ্ধ বালকের মতো আনন্দে একটা আপেল তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেন। বিমল অবাক, সে যেন একটা স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলে। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তার মাথা লুটিয়ে পড়তে চাইল বৃদ্ধের পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরণের ভালবাসা এসে তার মনে উপস্থিত হোল, বৃদ্ধের প্রতি। একে ছেড়ে আর সে থাকতে পারবে না—অসম্ভব!

যেমন সে আর এ্যালিসকে ছেড়ে কখনও থাকতে পারবে না। চীনদেশে তার আসা সার্থক মেয়েছে এই দুজনের সাক্ষাৎ পেয়ে। এই যুদ্ধের বর্বরতা, হত্যা, বোমাবর্ষণ, রক্তপাত, অনাহার, দারিদ্র্য, এই চারিদিকের বীভৎস নরবলির হৃদয়হীন অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রোফেসর লি আর এ্যালিস (অবশ্য মিনিও আছে)—এদের আবির্ভাব দেবতার আবির্ভাবের মতোই অপ্রত্যাশিত ও সুন্দর।

এ্যালিস ও মিনি ছুটে গেল ছেলেমানুষের মতো।

—ড্যাডি, ড্যাডি, আমাদের একটা আপেল দেবে না?..

বৃদ্ধ হাসিমুখে বল্লেন—মেয়েদের না দিয়ে কি বুড়ো বাবা খায়? দুটি রেখে দিয়েছি তোমাদের দুজনের জন্যে—আর একটি বাকি আছে, কে নেবে?

বিমল বল্লে—সুরেশ্বর নাও।

সুরেশ্বর বল্লে—বিমল, তুমি নাও, আমি আপেল খাই না।

এ্যালিস বল্লে—খাও, সুরেশ্বর, আমি আমার আধখানা বিমলকে দিচ্ছি।

মিনি বল্লে—তা নয়, বিমল খাও, আমি আধখানা সুরেশ্বরকে দেব।

প্রোফেসর লি মীমাংসা করে দিলেন—একটা আপেল ভাগাভাগি করে খাবে বিমল ও সুরেশ্বর। মেয়েরা আস্ত আপেল খাবে। তাঁর কথার ওপর আর কেউ কথা বলতে সাহস করলে না।

সেই সৈনিক ডেসপ্যাচ-রাইডারটি এসে খবর দিলে, হাসপাতাল-তাঁবু এখানেই উঠে আসছে—পাইন বনের মাঝখানে। সামনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কমান্ডান্ট খবর পাঠিয়েছেন। ডেসপ্যাচ-রাইডার আরও এক করুণ সংবাদ দিলে—আজ সকালে জাপানিদের হ্যান্ডগ্রেনেড চার্জে নারীবাহিনীর সতেরোটি তরুণী একদম মারা পড়েছে। একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দেহ—হাত, পা, মুন্ড, আঙুল—ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে গিয়েছে!

মিনি শিউরে উঠে বল্লে—ও হাউ সিম্পলি ড্রেডফুল!

কেন জানি না এই দুঃসংবাদে বিমলের মন এ্যালিসের প্রতি মমতায় ভরে উঠল। এ্যালিসের মতোই উদার, নিঃস্বার্থ সতেরোটি তরুণী—কত গৃহ অন্ধকার করে, কত বাপমায়ের হৃদয় শূন্য করে চলে গেল!—মানুষ মানুষের ওপর কেন এমন নিষ্ঠুর হয়?

হঠাৎ পালাতকদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত শোরগোল উঠল। সবাই ছুটছে, গাছের তলায় গুঁড়ি মেরে বসছে, ঘাসের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে—একটা হুড়োহুড়ি, এ ওকে ঠেলছে, দু-একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে খোলা মাঠের দিকে ছুটছে।

ডেসপ্যাচ-রাইডার সৈনিক যুবকটি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বল্লে—নিচু হয়ে বসে পড়ুন—সবাই শুয়ে পড়ুন—জাপানি বম্বার!

আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশই স্পষ্ট হয়ে উঠল...বিমল চোখ তুলে দেখলে পাইনবনের মাথার ওপর আকাশে দুখানা কাওয়াসাকি বম্বার...নিজের অজ্ঞাতসারে সে তখনি এ্যালিসের হাত ধরে তাকে একটা গাছের তলায় নিয়ে দাঁড় করালে।

—প্রোফেসর লি—প্রোফেসর লি—এদিকে আসুন—

ভীষণ একটা আওয়াজ....বিদ্যুতের মতো আলোর চমক....ধোঁয়া, মাটি....পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল ভূমিকম্পের মতো....সবারই কানে তালা..চোখ অন্ধকার....জাপানি বম্বার বোমা ফেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আর্তনাদ কান্না...গোঙানি...নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার।

আবার একটা...বমিলের মনে হল পৃথিবীর প্রলয় সমাগত...পৃথিবী দুলছে, আকাশ দুলছে...কেউ বাঁচবে না ; মিনি, এ্যালিস, সে, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি, সবাই এই প্রলয়ের অনলে ধ্বংস হবে।

তার পর ক'টা বোমা পড়ল এরোপ্লেন থেকে—তা আর গুনে নেওয়া সম্ভব হল না বিমলের পক্ষে। বিস্ফোরণের আওয়াজ ও মনুষ্যকণ্ঠের আর্তনাদের একটা একটানা শব্দ প্রবাহ তার মস্তিষ্কের মধ্যে বয়ে চলেছে—একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করে নেওয়া শক্ত।

তারপর হঠাৎ যখন সব থেমে গেল, এরোপ্লেন চলে গিয়েছে—যখন বিমল আবার সহজ বুদ্ধি ফিরে পেল—তখন দেখলে এ্যালিসের একখানা হাত শক্ত করে তার নিজের মুঠোর মধ্যে ধরা।—মিনি, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি সকলে মাটিতে শুয়ে—হয়তো সবাই মারা গিয়েছে—সে-ই একমাত্র রয়েছে বেঁচে।

প্রথমে মাটি থেকে ঝেড়ে উঠল এ্যালিস। তারপর প্রোফেসর লি, তারপর সুরেশ্বর।—মিনি মূর্ছা গিয়েছে—অনেক কষ্টে তার চৈতন্য সম্পাদন করা হল। হঠাৎ এ্যালিস চমকে উঠে আঙুল দিয়ে কী দেখিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

সেই তরুণ ডেসপ্যাচ-রাইডারের দেহ অস্বাভাবিকভাবে শায়িত কিছু দূরে। রক্তে আশপাশের মাটি ভেসে গিয়েছে—একখানা হাত উড়ে গিয়েছে—বীভৎস দৃশ্য। সেদিকে চাওয়া যায় না।

কিন্তু দেখা গেল পলাতক গৃহহীন ব্যক্তিদের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। কয়েকটি ছেলেমেয়ে এবং একটি বৃদ্ধ জখম হয়েছে মাত্র। পাইনবনের পাতার আড়ালে ছিল এরা—ওপর থেকে বোমার লক্ষ্য ঠিকমতো হয়নি।

প্রোফেসর লির সঙ্গে এ্যালিস ও মিনি আহতদের সাহায্যে অগ্রসর হল।

সন্ধ্যার পরে একখানা ট্রেন এসে দাঁড়াল। নাইন্‌থ্‌-রুট আর্মির একটা ব্যাটালিয়ন ট্রেন থেকে নামল—এরা এসেছে রেলপথ রক্ষা করতে এবং দুটো স্যাঁকো পাহারা দিতে।

বিমল সুরেশ্বরকে বল্লে—আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বলতে গেলে একরকম বাস করচি, অথচ লড়াই যে কোনদিকে হচ্ছে—কীভাবে হচ্ছে—তা কিছুই জানিনে, চোখেও দেখতে পাচ্ছিনে।

রাত্রে কমান্ডান্টের সারকুলার বেরুল—রেললাইনের প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে—আজ শেষ রাত্রে জাপানিরা আক্রমণ করবে—সকলে তৈরি থাকো, যারা সৈন্য নয়, যুদ্ধ করছে না—এমন শ্রেণীর লোক দূরে চলে যাও।

রাত প্রায় বারোটা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

সুরেশ্বর বর্ষাতি-কোট গায়ে বাইরে থেকে হাসপাতাল তাঁবুতে ঢুকে বল্লে—আমাদের আয়ু মনে হচ্ছে ফুরিয়ে এসেছে। সারকুলার দেখেছ?

বিমল বল্লে—গতিক সেইরকমই বটে। জাপানিরা হ্যান্ডগ্রেনেড চার্জ করলে কেউ বাঁচবে না।

—আমি ভাবছি মেয়েদের কথা—

—প্রোফেসর লিকে কথাটা বলা ভাল। উনি কি বলেন দেখি।

প্রোফেসর লিকে ডাকতে গিয়ে একটা সুন্দর দৃশ্য বিমলের চোখে পড়ল। হাসপাতাল তাঁবুর পাশে একটা ছোট্ট চটে-ছাওয়া তাঁবুতে এ্যালিস ও মিনি কি রান্না করছে আগুনের ওপর—বৃদ্ধ লি ওদের কাছে উনুন ঘেঁষে বসে বুড়ো ঠাকুরদাদার মতো গল্প করছেন।

এ্যালিস বল্লে—তোমার বন্ধু কোথায় বিমল—খেতে হবে না তোমাদের আজ? ড্যাডি

আমাদের এখানে খাবেন। উঃ—কী সত্যি কথা! গোলমালে তার মনেই নেই যে সন্ধ্যা থেকে কারো পেটে কিছু যায় নি! বিমল সুরেশ্বরকে ডেকে নিয়ে এল। খাবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু ভাত ও শুকনো সিঙ্গাপুরী কাঁচকলা, চর্বিতে ভাজা।

একজন ডেসপ্যাচ-রাইডার ব্যস্তভাবে তাঁবুর বাইরে এসে বিমলকে ডাক দিলে। তার হাতে একখানা ছোট্ট সিল-করা খাম।

—আপনি হাসপাতালের ডাক্তার? আপনার চিঠি। ট্রেন এখুনি একখানা আসছে, টেলিগ্রামে অর্ডার দিয়ে আনানো হচ্ছে। আপনি আপনার নার্স ও রোগী নিয়ে হ্যানকাউতে এই ট্রেনে যাবেন; আপনাকে এ-কথা বলার আদেশ আছে আমার ওপর। গুড নাইট।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। কেন হঠাৎ এ-আদেশ জানেন?

—আমরা এই রেলের জন্যে আর লোকক্ষয় করব না। জেনারেল চু-টে'র আদেশ এসেছে হেড কোয়ার্টার্স থেকে। পরবর্তী যুদ্ধ হবে এর দশ মাইল দূরে। আর এখুনি আপনারা তৈরি হোন। আজ শেষরাত্রে জাপানিরা আড্ডা দখল করবে। তার আগে হয়তো গোলা ছুঁড়তে পারে।

প্রোফেসর লি কাছেই দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলেন। তিনি বল্লেন—আমি এই ট্রেনে গরিব গ্রামবাসীদের উঠিয়ে নিয়ে যাব। নইলে জাপানি বোমা থেকে যাও-বা বেঁচেছে, গোলা আর হ্যান্ডগ্রেনেড খেলে তাও যাবে! আপনি দয়া করে আমার এই অনুরোধ কমান্ডান্টকে জানিয়ে আমায় খবর দিয়ে যাবেন?

ডেসপ্যাচ-রাইডার অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হল।

আরও দেড়ঘণ্টা পরে এল ট্রেন। ট্রেনখানা প্রায় খালি। তবে পেছনের গাড়িগুলো শুটকি মাছ বোঝাই—বিষম দুর্গন্ধ। বিমল হাসপাতালের সব লোকজন নিয়ে ট্রেনে উঠল—মিনি, এ্যালিস, দুটি চীনা নার্স, সাত-আটটি রোগী। প্রোফেসর লি ইতিমধ্যে তাঁর দলবল নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—কিন্তু ট্রেনের সামরিক গার্ড কমান্ডান্টের বিনা আদেশে তাঁর দলবল গাড়িতে ওঠাতে চাইলে না।

এ্যালিস বল্লে—বিমল, ওদের বলো তা হলে আমরাও যাব না। ওঁকে ফেলে আমরা যাব না। ট্রেনের সামরিক গার্ড বল্লে—আমার কোনো হাত নেই। আপনারা না যান, পনেরো মিনিট পরে আমি গাড়ি ছেড়ে দেব।

এ্যালিস ও মিনি নামল। চীনা নার্স দুটিও এদের দেখাদেখি নামল। ট্রেনের গার্ড বল্লে—রোগীরা কাদের চার্জে যাবে? একজন ডাক্তার চাই। আমি রিপোর্ট করলে আপনাদের কোর্ট মার্শাল হবে। আপনারা হাসপাতালের কর্মচারী, সামরিক আদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য।

বিমল বল্লে—সে এঁরা নন—এই মেয়ে দুটি। এঁরা আমেরিকান রেডক্রস সোসাইটির। চীনা পার্লামেন্টের হাত নেই এঁদের ওপর।

এদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময়ে ডেসপ্যাচ-রাইডারটিকে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেখা গেল এবং কিছুক্ষণ পরে প্রোফেসর লি তাঁর দলবল নিয়ে হুড়মুড় করে ট্রেনে উঠে পড়লেন। ট্রেনও ছেড়ে দিল।

দিন পনেরো পরে।

হ্যানকাউ শহরের উপকণ্ঠে পবিত্র ফা-চিন মন্দির। মিং রাজবংশের রাজকুমারী ফা-চিন তাঁর প্রণয়ীর স্মৃতির মান রাখবার জন্যে চিরকুমারী ছিলেন—এবং একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মঠে

দেহত্যাগ করেন একষট্টি বছর বয়সে। তাঁর দেহের পুণ্য ভস্মরাশির ওপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিধারে অতি মনোরম উদ্যান ও ফোয়ারা।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এ্যালিস ও বিমল মার্বেলের চৌবাচ্চায় মন্দিরের অতি বিখ্যাত লালমাছ দেখছিল। অনেক দূর থেকে লোকে এই লালমাছ দেখতে আসে—আর আসে নব-বিবাহিত দম্পতি—তাদের বিবাহিতজীবনের কল্যাণ কামনায়।

একটা গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে এ্যালিস ক্লান্তভাবে বসল।

বিমল বল্লে—মিনিরা কোথায়?

—মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। এখানে বসো। কেমন সুন্দর লালমাছ খেলা করছে দ্যাখো। আমি কি ভাবছি বিমল জান, এমন পবিত্র মন্দির, এমন সুন্দর শান্তি, এই প্রাচীন পাইন-গাছের সারি—সব জাপানি বোমায় একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যুদ্ধের এই পরিণাম, প্রাচীন দিনের শান্তি ও সৌন্দর্যকে চুরমার করে বর্বরতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

—এ্যালিস, আর কতদিন চীনে থাকবে?

–যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়, যতদিন একজন আহত চীনা সৈনিকও হাসপাতালে পড়ে থাকে। যতদিন ড্যাডি লি তাঁর সাহায্যকারিণী মেয়ের দরকার অনুভব করেন।

এ্যালিস বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—কিন্তু বিমল, ততদিন তোমাকেও তো থাকতে হবে—তোমাকে যেতে দেব না।

পাইনগাছের ওদিকে নিকটেই প্রোফেসর লির প্রাণখোলা হাসি ও কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল।

এ্যালিস বল্লে—ওরা এদিকেই আসছে।

এ্যালিসের ভুল হয়েছিল, মিনি আর সুরেশ্বর এল না—এলেন প্রোফেসর লি। এই বয়সেও তাঁর চোখের অমন অদ্ভুত দীপ্তি যদি না থাকত, তবে তাঁকে জনৈক বৃদ্ধ চীনা রিকশাওয়ালা বলে ভুল করা অসম্ভব হয় না—এমনি সাদাসিধে তাঁর পরিচ্ছদ।

প্রোফেসর লি বল্লেন—হ্যানকাউ শহরে এসে আমার গরিব গ্রামবাসীরা আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছে। কিন্তু গভর্নমেন্টের তৈরি মাটির নিচের ঘরে লুকিয়ে থাকলে আমার চলবে না এ্যালিস, আমি কালই এখান থেকে গ্রামে চলে যাব।

এ্যালিস বল্লে, কেন?

—দক্ষিণ চীনে সর্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ। লোক না খেয়ে মরছে, তার সাথে বোমা আছে। মড়ক লেগেছে। আমার এখানে বসে থাকলে চলে? আমি আবেদন পাঠিয়েছি আমেরিকায় মার্কিন রেডক্রস সোসাইটির মধ্যস্থতায়। তারাই আপেল পাঠিয়েছিল এদের খাওয়াতে। যতদূর জানা গিয়েছে, ওরা কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছে। টাকাটা শিগগির আসবে।

এ্যলিস বল্লে—ড্যাডি, আমার একটা প্রস্তাব শুনবেন? আমার মাসিমা নিঃসন্তান, বিধবা, অনেক টাকার মালিক। আমায় তিনি উইল করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন, টাকাটা আমি চাইলেই পাব। সেই টাকা আপনাকে দিচ্ছি—হ্যানকাউ শহরে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের জন্যে একটা 'হোম' খুলুন। আপনি লেখালেখি করলে গভর্নমেন্টও কিছু সাহায্য করবে। আমি আর মিনি ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করব।

প্রোফেসর লি বল্লেন—তোমায় ধন্যবাদ, এ্যালিস। অতি দয়াবতী মেয়ে তুমি, কিন্তু তোমার টাকা নেব না। তা ছাড়া, এমন কোনো বড় আশ্রয়স্থল আমরা গড়তে পারব না, যাতে সকল দুঃস্থ বালক-বালিকাকে আমরা জায়গা দিতে পারি। সারা দক্ষিণ-চীন বিপন্ন, কত ছেলেমেয়েকে আমরা পুষতে পারি? মাঝে পড়ে তোমার টাকাগুলো যাবে।

বিমল একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, এ্যালিসের ওপর প্রোফেসর লির স্নেহ নিজের সন্তানের ওপর পিতার স্নেহের মতোই। উনি চান না এ্যালিসের টাকাগুলো খরচ করিয়ে দিতে। নইলে উনি 'হোম' গঠনের বিরুদ্ধে যে-যুক্তি দেখালেন, সেটা এমন কিছু জোরালো নয়। সব দুঃস্থ লোককে আশ্রয় দিতে পারছিনে বলে তাদের মধ্যে কাউকেও আশ্রয় দেব না?

এমন সময় সুরেশ্বর ও মিনি এসে বল্লে—এসো এ্যালিস, এসো বিমল, একটা জিনিস দেখে যাও।

ওরা বাগানের বেঞ্চি থেকে উঠে মন্দিরের উঁচু চত্বরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দেখলে, ওদের আগে দুটি চীনা তরুণ-তরুণী মন্দিরে উঠছে। তাদের হাতে ছোট ছোট ধ্বজা, মোমবাতি ও ফুল।

মিনি বল্লে—ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ছেলেটি বেশ ইংরাজি জানে। ওর ডাক পড়েছে যুদ্ধে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে ওই মেয়েটিকে কাল বিয়ে করেছে; অনেকদিন থেকে মেয়েটি ওর বাগদত্তা। ফা-চিন মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে এসেছে—

বিমল ও এ্যালিস নিজেদের অজ্ঞাতসারে শিউরে উঠল। বর্তমান যুগের ভীষণ মারণাস্ত্রের সামনে যুদ্ধ। আয়ু ফুরিয়ে যেতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। একটা বোমার অপেক্ষা মাত্র। তরুণীর বয়স অল্প—ষোল-সতেরো।

চীনদেশে সম্ভ্রান্ত-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নেই।

তরুণ-তরুণীর মুখ প্রফুল্ল ও হাস্যময়। কোনো দিকে ওদের লক্ষ্য নেই। মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে মোমবাতি জ্বলছে। ওরা খোদাই-করা কাঠের চৌকাট পার হয়ে রাজকুমারী ফা-চিন এর কৃত্রিম সমাধির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলে, ফুল ছড়িয়ে দিলে, দুজনে পাশাপাশি বসে রইল খানিকক্ষণ চুপ করে। তারপর ওরা উঠল—ঘর থেকে বাইরে এসে মন্দির-চত্বরে দাঁড়াল, দুজনে হাত ধরে আছে—দুজনের হাসি-হাসি মুখ।

এ্যালিস বল্লে—মিনি, ওদের এখানে দাঁড়াতে বলো-না! আমাদের অনুরোধ—

মিনি বল্লে—আপনারা একটু দয়া করে যদি দাঁড়ান—মন্দিরের চত্বরে—

যুবক ওদের দিকে হাসিমুখে চাইলে, তারপর মেয়েটিকে চীনাভাষায় কী বল্লে। তরুণীও অল্প হাসিমুখে ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে চোখ নিচু করলে।

যুবক হাসিমুখে বল্লে—ফটো নেবে বুঝি? আলো নেই মোটে—ফটো উঠবে?

এ্যালিস এই সময় মন্দিরের বাইরের ফুলের দোকান থেকে একরাশ ফুল কিনে নিয়ে এল। বৃদ্ধ লিকেও সে ডেকে এনেছে বাগান থেকে। হাসিমুখে বল্লে—ড্যাডি, এই ফুল নিয়ে ওদের আশীর্বাদ করুন—তোমরাও সবাই ফুল নাও।

যুবকের সঙ্গে প্রোফেসর লি চীনাভাষায় কী কথাবার্তা বল্লেন, তারপর সকলে অর্ধচক্রাকারে ঘিরে দাঁড়াল নবদম্পতিকে।

প্রোফেসর লি চীনাভাষায় গম্ভীর স্বরে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করে ওদের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিলেন—তারপর সকলে ফুল ছড়ালে ওদের ওপর। এ্যালিস ও মিনির কী হাসি ফুল ছড়াতে ছড়াতে!

তরুণ-তরুণী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল—সন্ধ্যা নেমেছে। কোথাও আর রোদ নেই—এই পবিত্র, প্রাচীন ফা-চিন মন্দির, পাইনবন, লালমাছের চৌবাচ্চা, শান্ত গম্ভীর সন্ধ্যা—এই কলহাস্যমুখরা বিদেশিনী মেয়ে দুটি,—এই নবদম্পতি। দেখে মনেও হয় না এই পবিত্র

স্থানের তিন মাইলের মধ্যে মানুষ মানুষকে অকারণে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে বিষবাষ্প দিয়ে, বোমা দিয়ে, কলের কামান দিয়ে। যুদ্ধ বর্বরের ব্যবসায়। অথচ এই হাসি, এই আনন্দ, তরুণ দম্পতির কত আশা, উৎসাহ!

এ্যালিস ঠিকই বলেছে। সব যাবে—কাল সকালেই হয়তো যাবে, জাপানি বোমায়। পবিত্র ফা-চিন মন্দির যাবে, পাইন গাছের সারি যাবে, লালমাছ যাবে, এই তরুণ দম্পতি যাবে, সে যাবে, মিনি, এ্যালিস, সুরেশ্বর, বৃদ্ধ লি—সব যাবে। যুদ্ধ বর্বরের ব্যবসায়।

ফুল ছড়ানো শেষ হয়েছে। মন্দিরের বাঁকানো ঢালু ছাদে পোষা পায়রার দল উড়ে এসে বসেছে। পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটা ফুলে ভর্তি। নবদম্পতি তখন হাসছে—এ একটা ভারি অপ্রত্যাশিত আমোদের ব্যাপার হয়েছে তাদের কাছে। ওদের হাসি ও আনন্দ যেন দানবীয় শক্তির ওপর,—মৃত্যুর ওপর,—মানুষের জয়লাভ। মহাচীনের নবজন্ম হয়েছে এই তরুণ-তরুণীতে। স্বর্গ থেকে ফা-চিন-এর পবিত্র অমর আত্মা ওদের আশীর্বাদ করুন।

এ্যালিস এসে বিমলের হাত ধরল।

—চল যাই বিমল। হাসপাতালে ডিউটি রয়েছে—তোমার আমার এক্ষুনি—

মিসমিদের কবচ

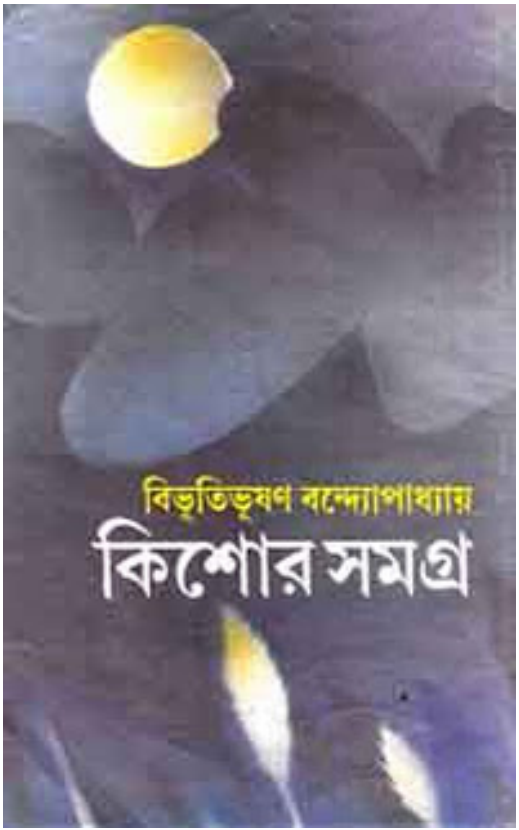

মিসমিদের কবচ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্যামপুর গ্রামে সেদিন নন্দোৎসব।

শ্যামপুরের পাশের গ্রামে আমার মাতুলালয়। চৌধুরীবাড়ির উৎসবে আমার মামার বাড়ির সকলের সঙ্গে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—সুতরাং সেখানে গেলাম।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা একটা সতরঞ্চ পেতে বৈঠকখানায় বসে আসর জমিয়েচেন। আমার বড় মামা বিদেশে থাকেন, সম্প্রতি ছুটি নিয়ে দেশে এসেচেন—সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা করলো।

—এই যে আশুবাবু, সব ভাল তো? নমস্কার।

—নমস্কার। একরকম চলে যাচ্ছে—আপনাদের সব ভাল?

—ভাল আর কই? জ্বরজারি সব। ম্যালেরিয়ার সময় এখন, বুঝতেই পারচেন।

—আপনার সঙ্গে এটি কে?

—আমার ভাগ্নে, সুশীল। আজই এসেচে—নিয়ে এলাম তাই।

—বেশ করেচেন, বেশ করেচেন, আনবেনই তো। কী করেন বাবাজি?

এখানে আমি মামাকে চোখ টিপবার সুবিধে না পেয়ে তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলি টিপে দিলাম।

মামা বল্লেন—আপিসে চাকরি করে কলকাতায়।

—বেশ, বেশ। এস বাবাজি, বস এসে এদিকে।

মামার আঙুল টিপবার কারণটা বলি। আমি কলকাতার বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিবারণ সোমের অধীনে শিক্ষানবিশি করি। কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না আমার।

নন্দোৎসব এবং আনুষঙ্গিক ভোজনপর্ব শেষ হল। আমরা বিদায় নেবার যোগাড় করচি, এমন সময় গ্রামের জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার মামাকে ডেকে বল্লেন—কাল আপনাদের পুকুরে মাছ ধরতে যাবার ইচ্ছে আছে। সুবিধে হবে কি?

—বিলক্ষণ! খুব সুবিধে হবে! আসুন-না গাঙ্গুলিমশায়, আমার ওখানেই তা হলে দুপুরে আহারাদি করবেন কিন্তু।

—না না, তা আবার কেন? আপনার পুকুরে মাছ ধরতে দিচ্চেন এই কত, আবার খেয়ে বিব্রত করতে যাব কেন?

—তা হলে মাছ ধরাও হবে না বলে দিচ্চি। মাছ ধরতে যাবেন কেবল ওই এক শর্তে।

গাঙ্গুলিমশায় হেসে রাজি হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালের দিকে হরিশ গাঙ্গুলিমশায় মামাদের বাড়িতে এলেন। পল্লি গ্রামের পাকা ঘুঘু মাছ-ধরায়, সঙ্গে ছ'গাছা ছোট-বড় ছিপ, দু'খানা হুইল লাগানো—বাকি সব বিনা হুইলের, টিনে ময়দার চার, কেঁচো, পিঁপড়ের ডিম, তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম, আরও কত কি।

মামাকে হেসে বল্লেন—এলাম বড়বাবু, আপনাকে বিরক্ত করতে। একটা লোক দিয়ে গোটাকতক কঞ্চি কাটিয়ে যদি দেন—কেঁচোর চার লাগাতে হবে।

মামা জিগ্যেস করলেন—এখন বসবেন, না, ওবেলা?

—না, এবেলা বসা হবে না। মাছ চারে লাগাতে দু'ঘণ্টা দেরি হবে। ততক্ষণে

খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া যায়। একটু সকাল-সকাল যদি আহারের ব্যবস্থা....

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব হয়ে গেছে। আমিও জানি, আপনি এসেই খেতে বসার জন্যে তাগাদা দেবেন। মাছ যারা ধরে, তাদের কাছে খাওয়া-টাওয়া কিছুই নয় খুব জানি। আর ঘন্টাখানেক পরেই জায়গা করে দেব খাওয়ার।

যথাসময়ে হরিশ গাঙ্গুলি খেতে বসলেন এবং একা প্রায় তিনজনের উপযুক্ত খাদ্য উদরসাৎ করলেন।

আমি কলকাতার ছেলে, দেখে তো অবাক!

আমার মামা জিজ্ঞেস করলেন—গাঙ্গুলিমশায়, আর একটু পায়েস?

—তা একটুখানি নাহয়....ওসব তো খেতে পাইনে! একা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাই। বাড়িতে মেয়েমানুষ নেই, বৌমারা থাকেন বিদেশে আমার ছেলের কাছে। কে ওসব করে দেবে?

—গাঙ্গুলিমশায় কি একাই থাকেন?

—একাই থাকি বইকি। ছেলেরা কলকাতায় চাকরি করে, আমার শহরে থাকা পোষায় না। তা ছাড়া কিছু নগদি লেনদেনের কারবারও করি, প্রায় তিন হাজার টাকার ওপর। টাকার দু'আনা মাসে সুদ। আপনার কাছে আর লুকিয়ে কী করব? কাজেই বাড়ি না থাকলে চলে কৈ? লোকে প্রায়ই আসচে টাকা দিতে-নিতে।

গাঙ্গুলিমশায় এই কথাগুলো যেন বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই বল্লেন।

আমি পল্লিগ্রাম সম্বন্ধে তত অভিজ্ঞ না হলেও আমার মনে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দিলে। টাকাকড়ির কথা এভাবে লোকজনের কাছে বলে লাভ কী! বলা নিরাপদও নয়—শোভনতা ও রুচির কথা যদি বাদই দিই।

গাঙ্গুলিমশায়কে আমার বেশ লাগল।

মাছ ধরতে-ধরতে আমার সঙ্গে তিনি অনেক গল্প করলেন।

...থাকেন তিনি খুব সামান্য ভাবে—কোনো আড়ম্বর নেই—খাওয়াদাওয়া বিষয়েও কোনো ঝঞ্ঝাট নেই তাঁর।...এই ধরনের অনেক কথাই হল।

মাছ তিনি ধরলেন বড়-বড় দুটো। ছোট গোটা চার-পাঁচ। আমার মামাকে অর্ধেকগুলি দিতে চাইলেন, মামা নিতে চাইলেন না। বল্লেন—কেন গাঙ্গুলিমশায়? পুকুরে মাছ ধরতে এসেছেন, তার খাজনা নাকি?

গাঙ্গুলিমশায় জিব কেটে বল্লেন—আরে রামো! তাই বলে কি বলচি? রাখুন অন্তত গোটা-দুই!

—না গাঙ্গুলিমশায়, মাপ করবেন, তা নিতে পারবো না। ও নেওয়ার নিয়ম নেই আমাদের।

অগত্যা গাঙ্গুলিমশায় চলে গেলেন। আমায় বলে গেলেন—তুমি বাবাজি একদিন আমার ওখানে যেও একটা ছুটিতে। তোমার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ হল আজ।

কে জানত যে তাঁর বাড়িতে আমাকে অল্পদিনের মধ্যেই যেতে হবে; তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে—অন্য উদ্দেশ্যে।

গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে খোসগল্প করার জন্যে নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাঙ্গুলিমশায় চলে গেলে আমি মামাকে বল্লাম—আপনি মাছ নিলেন না কেন? উনি দুঃখিত হলেন নিশ্চয়।

মামা হেসে বল্লেন—তুমি জান না, নিলেই দুঃখিত হতেন—উনি বড় কৃপণ।

—তা কথার ভাবে বুঝেচি।

—কী করে বুঝলে?

—অন্য কিছু নয়, বৌ-ছেলেরা কলকাতায় থাকে, উনি থাকেন দেশের বাড়িতে। একটা চাকর কি রাঁধুনি রাখেন না, হাত পুড়িয়ে এ-বয়সে রেঁধে খেতে হয় তাও স্বীকার। অথচ হাতে দু'পয়সা বেশ আছে।

—আর কিছু লক্ষ করলে?

—বড় গল্প-বলা স্বভাব। আমার ধারণা, একটু বাড়িয়েও বলেন।

—ঠিক ধরেচ। মাছ নিইনি তার আর-একটা কারণ, উনি মাছ দিয়ে গেলে সব জায়গায় সে-গল্প করে বেড়াবেন, আর লোক ভাববে আমরা কী চামার—পুকুরে মাছ ধরেচে বলে ওঁর কাছ থেকে মাছ নিইচি।

—না মামা, এটা আপনার ভুল। এ-কথা ভাববার কারণ কী লোকদের? তা কখনও কেউ ভাবে?

—তা যাই হোক, মোটের ওপর আমি ওটা পছন্দ করিনে।

—উনি একটা বড় ভুল করেন মামাবাবু। টাকার কথা অমন বলে বেড়ান কেন?

—ওটা ওঁর স্বভাব। সর্বত্র ওই করবেন। যেখানে বসবেন, সেখানেই টাকার গল্প। করেও আজ আসচেন বহুদিন। দেখাতে চান, হাতে দু'পয়সা আছে।

—আমার মনে হয় ও-স্বভাবটা ভাল নয়—বিশেষ করে এসব পাড়াগাঁয়ে। একদিন আপনি একটু সাবধান করে দেবেন না?

—সে হবে না। তুমি ওঁকে জান না। বড্ড একগুঁয়ে, কথা তো শুনবেনই না—আরও ভাববেন, নিশ্চয়ই আমার কোনো মতলব আছে।

আমি সেদিন কলকাতায় চলে এলাম বিকেলে ট্রেনে। আমার ওপরওয়ালা নিবারণবাবু লিখেছেন, খুব শিগগির আমায় একবার এলাহাবাদে যেতে হবে বিশেষ একটা জরুরি কাজে। অপিসে যেতেই খবর পেলাম, তিনি আর-একটা কাজে দু'দিনের জন্য পাটনা গিয়েছেন চলে—আমার এলাহাবাদ যাবার খরচের টাকা ও একখানা চিঠি রেখে দিয়েচেন তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে!

আমার কাছে তাঁর ড্রয়ারের চাবি থাকে। ড্রয়ার খুলে চিঠিখানা পড়ে দেখলাম, বিশেষ কোনো গুরুতর কাজ নয়—এলাহাবাদ গভর্নমেন্ট থাম্ব-ইমপ্রেশন-ব্যুরোতে যেতে হবে, কয়েকটি দাগী বদমাইশের বুড়ো-আঙুলের ছাপের একটা ফটো নিতে।

মিঃ সোম বুড়ো-আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

এলাহাবাদের কাজ শেষ করতে আমার লাগল মাত্র একদিন, আট-দশদিন রয়ে গেলাম তবুও।

সেদিন সকালবেলা হঠাৎ মিঃ সোমের এক টেলিগ্রাম পেলাম। একটা জরুরি কাজের জন্য আমায় সেইদিনই কলকাতায় ফিরতে লিখেচেন। আমি যেন এলাহাবাদে দেরি না করি।

ভোরে হাওড়ায় ট্রেন এসে দাঁড়াতেই দেখি, মিঃ সোম প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম, কারণ, এরকম কখনও উনি আসেন না।

আমায় বল্লেন—সুশীল, তুমি আজই মামার বাড়ি যাও। তোমার মামা কাল দু'খানা আর্জেন্ট-টেলিগ্রাম করেছেন তোমায় সেখানে যাবার জন্যে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম—মামার বাড়ি কারো অসুখ? সবাই ভাল আছে তো?

—সেসব না বলেই মনে হল। টেলিগ্রামের মধ্যে কারো অসুখের উল্লেখ নেই।

—কোনো লোক আসেনি সেখান থেকে?

—না। আমি তার করে দিয়েচি, তুমি এলাহাবাদে গিয়েচ। আজই তোমরা ফিরবার তারিখ তাও জানিয়ে দিয়েচি।

আমি বাসায় না গিয়ে সোজা শেয়ালদ' ষ্টেশনে চলে এলাম মামার বাড়ি যাবার জন্যে।

মিঃ সোম আমার সঙ্গে এলেন শেয়ালদ' পর্যন্ত—বারবার করে বলে দিলেন, কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটলে তাঁকে যেন খবর দিই—তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন।

মামার বাড়ি পা দিতেই বড় মামা বল্লেন—এসেছ সুশীল? যাক, বড্ড ভাবছিলাম।

—কী ব্যাপার মামাবাবু! সবাই ভাল তো?

—এখানকার কিছু ব্যাপার নয়। শ্যামপুরের হরিশ গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েছেন। সেখানে এখুনি যেতে হবে।

আমি ভীত ও বিস্মিত হয়ে বল্লাম—গাঙ্গুলিমশায়! সেদিন যিনি মাছ ধরে গেলেন! খুন হয়েচেন?

—হ্যাঁ, চল একবার সেখানে। শিগগির স্নানাহার করে নাও। কারণ, সারাদিনই হয়তো কাটবে সেখানে।

বেলা দুটোর সময় শ্যামপুরে এসে পৌঁছুলাম। ছোট্ট গ্রাম। কখনও ওখানে কারো একটা ঘটি চুরি হয়নি—সেখানে খুন হয়ে গিয়েচে, সুতরাং গ্রামের লোকে দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেছে। গ্রামের মাঝখানে বারোয়ারি—পূজামণ্ডপে জড়ো হয়ে সেই কথারই আলোচনা করছে সবাই।

আমার মামা এখানে এর পূর্বে অনেকবার এসেছিলেন এই ঘটনা উপলক্ষে, তা সকলের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল। আমার কথা বিশেষ কেউ জিগ্যেস করলে না বা আমার সম্বন্ধে কেউ কোন আগ্রহও দেখালে না। কেউ জানে না, আমি প্রাইভেট-ডিটেকটিভ মিঃ সোমের শিক্ষানবিশ ছাত্র—এসব অজ পাড়াগাঁয়ে ওঁর নামই কেউ শোনেনি—আমাকে সেখানে কে চিনবে?

মামা জিগ্যেস করলেন—লাশ নিয়ে গিয়েচে?

ওরা বল্লে—আজ সকালে নিয়ে গেল। পুলিশ এসেছিল।

আমি ওদের বল্লাম—ব্যাপার কীভাবে ঘটল? আজ হল শনিবার। কবে তিনি খুন হয়েচেন?

গ্রামের লোকে যেরকম বল্লে তাতে মনে হল, সে-কথা কেউ জানে না। নানা লোক নানা কথা বলতে লাগল। পুলিশের কাছেও এরা এইরকমই বলে ব্যাপারটাকে রীতিমতো গোলমেলে করে তুলেচে।

আমি আড়ালে মামাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লাম—আপনি কী মনে করে এখানে এনেচেন আমায়?

মামা বল্লেন—তুমি সব ব্যাপার শুনে নাও, চল, অনেক কথা আছে। এই খুনের রহস্য তোমায় আবিষ্কার করতে হবে—তবে বুঝব মিঃ সোমের কাছে তোমায় শিক্ষানবিশি করতে দিয়ে আমি ভুল করিনি। এখানে কেউ জানে না তুমি কি কাজ কর—সে তোমার একটা সুবিধে।

—সুবিধেও বটে, আবার অসুবিধেও বটে।

—কেন?

—বাইরের বাজে লোককে কেউ আগ্রহ করে কিছু বলবে না। গোলমাল একটু থামলে একজন ভাল লোককে বেচে নিয়ে সব ঘটনা খুঁটিয়ে জানতে হবে। গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে কোথায়?

—সে লাশের সঙ্গে মহকুমায় গিয়েচে। সেখানে লাশ কাটাকুটি করবে ডাক্তারে, তারপর দাহকার্য করে ফিরবে।

—লাশ দেখলে বড্ড সুবিধে হত। সেটা আর হল না।

—সেইজন্যেই তো বলছি, তুমি কেমন কাজ শিখচ, এটা তোমার পরীক্ষা। এতে যদি পাস কর তবে বুঝব তুমি মিঃ সোমের উপযুক্ত ছাত্র। নয়তো তোমাকে আমি আর ওখানে রাখব না—এ আমরা এক-কথা জেনো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তারপর গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি গেলাম।

গিয়ে দেখি, যেখানটাতে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি—তার দু'দিকে বনজঙ্গল। একদিকে দূরে একটা গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা, একদিকে একটি হচ্ছে বাড়ি।

আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের কথা জিগ্যেস করে জানলাম, সে এখনও মহকুমা থেকে ফেরেনি। তবে একটি প্রৌঢ়ার সঙ্গে দেখা হল—শুনলাম তিনি গাঙ্গুলিমশায়ের আত্মীয়া।

তাঁকে জিগ্যেস করলাম—গাঙ্গুলিমশায়কে শেষ দেখেছিলেন কবে?

—বুধবার।

—কখন?

—বিকেল পাঁচটার সময়।

—কীভাবে দেখেছিলেন?

—সেদিন হাটবার ছিল—উনি হাটে যাবার আগে আমার কাছে পয়সা চেয়েছিলেন।

—কিসের পয়সা?

—সুদের পয়সা। আমি ওঁর কাছে দুটো টাকা ধার নিয়েছিলাম ও-মাসে।

—আপনার পর আর কেউ দেখেছিল?

গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির ঠিক পশ্চিমগায়ে যে-বাড়ি, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে পৌঢ়া বল্লেন—ওই বাড়ির রায়-পিসি আমার পরও তাঁকে দেখেছিলেন।

আমি বৃদ্ধা রায়-পিসির বাড়ি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই বৃদ্ধা আমায় আশীর্বাদ করে একখানা পিঁড়ি বার করে দিয়ে বল্লেন—বস বাবা।

আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে বল্লাম—আপনি একা থাকেন নাকি এ-বাড়িতে?

—হ্যাঁ বাবা। আমার তো কেউ নেই—মেয়ে-জামাই আছে, তারা দেখাশুনা করে।

—মেয়ে-জামাই এখানে থাকেন?

—এখানেও থাকে, আবার তাদের দেশ এই এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে সাধুহাটি গাঁয়ে, সেখানেও থাকে।

—গাঙ্গুলিমশায়কে আপনি বুধবারে কখন দেখেন?

—রাত্তিরে যখন উনি হাট থেকে ফিরলেন—তখন আমি বাইরের রোয়াকে বসে জপ করছিলাম। তারপর আর চোখে না দেখলেও ওঁর গলার আওয়াজ শুনেচি রাত দশটা পর্যন্ত—উনি ওঁর রান্নাঘরে রাঁধছিলেন আলো জ্বেলে, আমি যখন শুতে যাই তখন পর্যন্ত।

—তখন রাত কত হবে?

—তা কি বাবা জানি? আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক—ঘড়ি তো নেই বাড়িতে? তবে তখন ফরিদপুরের গাড়ি চলে গিয়েচে। আমরা শব্দ শুনে বুঝি কখন কোন গাড়ি এল গেল।

—একা থাকতেন, আর রাত পর্যন্ত রান্না করছিলেন—এত কী রান্না?

—সেদিন মাংস এনেছিলেন হাট থেকে। মাংস সেদ্ধ হতে দেরি হচ্ছিল।

—আপনি কী করে জানলেন?

—পরে আমরা জেনেছিলাম—হাটে যারা ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে মাংস কিনেছিল—তারা বলেছিল। তাছাড়া যখন রান্নাঘর খোলা হল—বাবাগো!

বলে বৃদ্ধা যেন সে-দৃশ্যের বীভৎসতা মনের পাশে আবার দেখতে পেয়ে শিউরে উঠে কথা বন্ধ করলেন। সঙ্গে যে-প্রৌঢ়া আত্মীয়াটি ছিলেন গাঙ্গুলিমশায়ের, তিনিও বল্লেন—ও বাবা, সে রান্নাঘরের কথা মনে হলে এখনও গা ডোল দেয়!

আমি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলাম—কেন? কেন?—কী ছিল রান্নাঘরে?

বৃদ্ধা বল্লেন—থালার চারিদিকে ভাত ছড়ানো—মাংসের ছিবড়ে আর হাড়গোড় ছড়ানো। বাটিতে তখনও মাংস আর ঝোল রয়েচে—ঘরের মেজেতে ধস্তাধস্তির চিহ্ন—তিনি খেতে বসেছিলেন এবং তাঁর খাওয়া শেষ হবার আগেই যারা তাঁকে খুন করে তারা এসে পড়ে।

পৌঢ়াও বল্লেন—হ্যাঁ বাবা, এ সবাই দেখেচে। পুলিশও এসে রান্নাঘর দেখে গিয়েচে। সকলেরই মনে হল, ব্রাহ্মণের খাওয়া শেষ হবার আগেই খুনীরা এসে তার ওপর পড়ে।

—আচ্ছা বেশ, এ গেল বুধবার রাতের ব্যাপার। সেদিনই হাট ছিল তো?

—হ্যাঁ বাবা, তার পরদিন সকালে উঠে আমরা দেখলাম, ওঁর ঘরের দরজা বাইরের দিকে তালা-চাবি দেওয়া। প্রথম সকলেই ভাবলে উনি কোথাও কাজে গিয়েচেন, ফিরে এসে রান্নাবান্না করবেন। কিন্তু যখন বিকেল হয়ে গেল, ফিরলেন না—তখন আমরা ভাবলাম, উনি ওঁর ছেলেদের কাছে কলকাতায় গেছেন।

—তারপর?

—বিস্যুদবার গেল, শুক্রবার গেল, শুক্রবার বিকেলের দিকে বন্ধ-ঘরের মধ্যে থেকে কিসের দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল—তাও সবাই ভাবলে, ভাদ্রমাস, গাঙ্গুলিমশায় হয়তো তাল কুড়িয়ে ঘরের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন তা-ই পচে অমন-গন্ধ বেরুচ্চে।

—শনিবার আপনারা কোন সময় টের পেলেন যে তিনি খুন হয়েচেন?

—শনিবার আমি গিয়ে গ্রামের ভদ্রলোকদের কাছে সব বললাম। অনেকেই জানত না যে, গাঙ্গুলিমশায়কে এ কদিন গাঁয়ে দেখা যায়নি। তখন সকলেই এল। গন্ধ তখন খুব বেড়েচে। পচা তালের গন্ধ বলে মনে হচ্ছে না।

—কী করলেন আপনারা?

—তখন সকলে জানলা খোলবার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু সব জানলা ভেতর থেকে

বন্ধ। দোর ভাঙাই সাব্যস্ত হল। পরের ঘরের দোর ভেঙে ঢোকা ঠিক নয়—এরপর যদি তা নিয়ে কোন কথা ওঠে! তখন চৌকিদার আর দফাদার ডেকে এনে তাদের সামনে দোর ভাঙা হল।

—কী দেখা গেল?

—দেখা গেল, তিনি ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছেন। মাথায় ভারী জিনিস দিয়ে মারার দাগ। মেজে খুঁড়ে রাশীকৃত মাটি বার করা, ঘরের বাক্স-প্যাঁটরা সব ভাঙা, ডালা খোলা—সব তচ্‌নচ্ করেচে জিনিসপত্র—তারপর ওঁর ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হল।

—এ ছাড়া আর কিছু আপনারা জানেন না?

—না বাবা, আর আমরা কিছু জানিনে।

গাঙ্গুলিমশায়ের প্রতিবেশিনী সেই বৃদ্ধাকে জিগ্যেস করলাম—রাত্রে কোনরকম শব্দ শুনেছিলেন গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি থেকে?

—কিছু না। অনেক রাত্তিরে আমি যখন শুতে যাই—তখনও ওঁর রান্নাঘরে আলো জ্বলতে দেখেচি। আমি ভাবলাম, গাঙ্গুলিমশায় আজ এখনও দেখি রান্না করচেন।

—কেন, এরকম ভাবলেন কেন?

—এত রাত পর্যন্ত তো উনি রান্নাঘরে থাকেন না; সকাল-রাত্তিরেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েন। বিশেষ করে সেদিন গিয়েছে ঘোর অন্ধকার রাত্তির—অমাবস্যা, তার ওপর টিপ্-টিপ্ বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছিল সন্ধ্যে থেকেই।

—তখন তো আর আপনি জানতেন না যে, উনি হাট থেকে মাংস কিনে এনেচেন?

—না, এমন কিছুই জানিনে।.....হ্যাঁ বাবা।....যখন এত করে জিগ্যেস করচ, তখন একটা কথা আমার এখন মনে হচ্চে—

—কী, কী, বলুন।

—উনি ভাত খাওয়ার পরে রোজ রাত্তিরে কুকুর ডেকে এঁটো পাতা, কি পাতের ভাত তাদের দিতেন, রোজ-রোজ ওঁর গলার ডাক শোনা যেত। সেদিন আমি আর তা শুনিনি।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হয়তো?

—না বাবা, বুড়ো মানুষ—ঘুম সহজে আসে না। চুপ করে শুয়ে থাকি বিছানায়। সেদিন আর ওঁর কুকুরকে ডাক দেওয়ার আওয়াজ আমার কানেই যায়নি।

ভালো করে জেরা করার ফল অনেক সময় বড় চমৎকার হয়। মিঃ সোম প্রায়ই বলেন—লোককে বারবার করে প্রশ্ন জিগ্যেস করবে। যা হয়তো তার মনে নেই, বা, খুঁটিনাটির ওপর সে তত জোর দেয়নি—তোমার জেরায় তাও তার মনে পড়বে। সত্য বের হয়ে আসে অনেক সময় ভাল জেরার গুণে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিনই আমার সঙ্গে গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের দেখা হল। সে তার পিতার দাহকার্য শেষ করে ফিরে আসছে কাচাগলায়।

আমি তাকে আড়ালে ডেকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলাম। শ্রীগোপালের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। সে আমাকে সব রকমের সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দিলে।

আমি বল্লাম—কারো ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

—কার কথা বলব বলুন। বাবার একটা দোষ ছিল, টাকার কথা জাহির করে বেড়াতেন সবার কাছে। কত জায়গায় এ সব কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে কে এ-কাজ করলে কী করে বলি?

—আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করব—কিছু মনে করবেন না। আপনার বাবার কত টাকা ছিল জানেন?

—বাবা কখনও আমাদের বলতেন না। তবে, আন্দাজ, দু'হাজারের বেশি নগদ টাকা ছিল না।

—সে-টাকা কোথায় থাকত?

—সেটা জানতাম। ঘরের মেজেতে বাবা পুঁতে রাখতেন—কতবার বলেচি, টাকা ব্যাঙ্কে রাখুন। সেকেলে লোক, ব্যাঙ্ক বুঝতেন না।

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর পর বাড়ি এসে আপনি মেজে খুঁড়ে কিছু পেয়েছিলেন?

—মেজে তো খুঁড়ে রেখেছিল যারা খুন করেচে তারাই। আমি এক পয়সাও পাই নি—তবে একটা কথা বলি। দু'হাজার টাকার সব টাকাই তো মেজেতে পোঁতা ছিল না—বাবা টাকা ধার দিতেন কিনা! কিছু টাকা লোকজনকে ধার দেওয়া ছিল।

—কত টাকা আন্দাজ?

—সেদিক থেকে মজা শুনুন; বাবার খাতাপত্র সব ওইসঙ্গে চুরি হয়ে গিয়েচে! খাতা না দেখলে বলা যাবে না কত টাকা ধার দেওয়া ছিল।

—খাতাপত্র নিজেই লিখতেন?

—তার মধ্যেও গোলমাল আছে। আগে নিজেই লিখতেন, ইদানীং চোখে দেখতে পেতেন না বলে একে-ওকে ধরে লিখিয়ে নিতেন।

—কাকে-কাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন জানেন?

—বেশির ভাগ লেখাতেন সদ্‌গোপ বাড়ির ননী ঘোষকে দিয়ে। সে জমিদারি-সেরেস্তায় কাজ করে—তার হাতের লেখাও ভাল। বাবার কথা সে খুব শুনত।

—ননী ঘোষের বয়েস কত?

—ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

—ননী ঘোষ লোক কেমন? তার ওপর সন্দেহ হয়?

—মুশকিল হয়েচে, বাবা তো একজনকে দিয়ে লেখাতেন না! যখন যাকে পেতেন, তখন তাকেই ধরে লিখিয়ে নিতেন যে! স্কুলের ছেলে গণেশ বলে আছে, ওই মুখুয্যেবাড়ি থেকে পড়ে—তাকেও দেখি একদিন ডেকে এনেছেন। শুধু ননী ঘেষের ওপর সন্দেহ করে কী করব?

—আর কাকে দেখেচেন?

—আর মনে হচ্চে না।

—আপনি হিসাবের খাতা দেখে বলে দিতে পারেন, কোন হাতের লেখা কার?

—ননীর হাতের লেখা আমি চিনি। তার হাতের লেখা বলতে পারি—কিন্তু সে-খাতাই-বা কোথায়? খুনেরা সে-খাতা তো নিয়ে গিয়েচে!

—কাকে বেশি টাকা ধার দেওয়া ছিল, জানেন?

—কাউকে বেশি টাকা দিতেন না বাবা। দশ, পাঁচ, কুড়ি—বড়জোর ত্রিশের বেশি টাকা একজনকেও তিনি দিতেন না।

শ্যামপুরের জমিদারবাড়ি সে-বেলা খাওয়াদাওয়া করলাম।

একটা বড় চত্বর, তার চারিধারে নারিকেলগাছের সারি, জামরুলগাছ, বোম্বাই-আমের গাছ, আতাগাছ। বেশ ছায়াভরা উপবন যেন! ডিটেকটিভগিরি করে হয়তো ভবিষ্যতে খাব—তা বলে প্রকৃতির শোভা যখন মন হরণ করে—এমন মেঘমেদুর বর্ষা-দিনে গাছপালার শ্যামশোভা উপভোগ করতে ছাড়ি কেন?

বসলুম এসে চত্বরের একপাশে, নির্জন গাছের তলায়।

বসে-বসে ভাবতে লাগলুম:

.... কী করা যায় এখন? মামা বড় কঠিন পরীক্ষা আমার সামনে এনে ফেলেচেন।

মিঃ সোমের উপযুক্ত ছাত্র কি-না আমি, এবার তা প্রমাণ করার দিন এসেচে।

কিন্তু বসে-বসে মিঃ সোমের কাছে যতগুলি প্রণালী শিখেচি খুনের কিনারা করবার—সবগুলি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী—স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ডের ডিটেকটিভের প্রণালী। এখানে তার কোনোটিই খাটবে না। আঙুলের ছাপ নেওয়ার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা হয় নি—সাত-আটদিন পরে এখন জিনিসপত্রের গায়ে খুনীর আঙুলের ছাপ অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে।

পায়ের দাগ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা।

খুন হবার পর এত লোক গাঙ্গুলিমশায়ের ঘরে ঢুকেচে—তাদের সকলের পায়ের দাগের সঙ্গে খুনীর পায়ের দাগ একাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়েচে। গ্রামের কৌতূহলী লোকেরা আমায় কী বিপদেই ফেলেচে! তারা জানে না, একজন শিক্ষানবিশ ডিটেকটিবের কী সর্বনাশ তারা করেচে!

আর একটা ব্যাপার, খুনটা টাটকা নয়, সাতদিন আগে খুন হয়ে লাশ পর্যন্ত দাহ শেষ—সব ফিনিশ—গোলমাল চুকে গিয়েচে।

চোখে দেখি নি পর্যন্ত সেটা—অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন-টিহ্নগুলো দেখলেও তো যা হয় একটা ধারণা করা যেত। এ একেবারে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া! ভীষণ সমস্যা!

মিঃ সোমকে কি একখানা চিঠি লিখে তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠাব? এমন অবস্থায় পড়লে তিনি নিজে কী করতেন জানাতে বলব?

কিন্তু তাও তো উচিত নয়!

মামা যেমন বলেচেন, এটা যদি আমার পরীক্ষা হয়, তবে পরীক্ষার হলে যেমন ছেলেরা কাউকে কিছু জিগ্যেস করে নেয় না—আমায় তা-ই করতে হবে।

যদি এর কিনারা করতে পারি, তবে মামা বলেচেন, আমাকে এ-লাইনে রাখবেন—নয়তো মিঃ সোমের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবেন, নিয়ে হয়তো কোন আর্টিস্টের কাছে রেখে ছবি আঁকতে শেখাবেন, বা বড় দরজির কাছে রেখে শার্ট তৈরি, পাঞ্জাবি তৈরি শেখাবেন। তবে শিক্ষানবিশের প্রথম পরীক্ষা-হিসেবে পরীক্ষা যে বেশ কঠিন, এতে কোনো ভুল নেই।....

বসে-বসে আরও অনেক কথা ভাবলুম:

....হিসেবের খাতা যে লিখত, সে নিশ্চয় জানত ঘরে কত টাকা মজুত, বাইরে কত টাকা ছড়ানো। তার পক্ষে জিনিসটা জানা যত সহজ, অপরের পক্ষে তত সহজ নয়।

এ-বিষয়েও একটা গোলমাল আছে। গাঙ্গুলিমশায় টাকার গর্ব মুখে করে বেড়াতেন যেখানে-সেখানে। কত লোক শুনেচে—কত লোক হয়তো জানত।

একটা কথা আমার হঠাৎ মনে এল।

কিন্তু, কাকে কথাটা জিগ্যেস করি?

ননী ঘোষের বাড়ি গিয়ে ননী ঘোষের সঙ্গে দেখা করা একবার বিশেষ দরকার। তাকেই এ-কথা জিগ্যেস করতে হবে। সে নাও বলতে পারে অবিশ্যি—তবুও একবার জিগ্যেস করতে দোষ নেই।....

ননী ঘোষ বাড়িতেই ছিল। আমায় সে চেনে না, একটু তাচ্ছিল্য ও ব্যস্ততার সঙ্গে বল্লে—কী দরকার বাবু? বাড়ি কোথায় আপনার?

আমি বল্লাম—তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে। ঠিক উত্তর দাও। মিথ্যে বল্লে বিপদে পড়ে যাবে।

ননীর মুখ শুকিয়ে গেল। দেখলাম সে ভয় পেয়েচে। বুঝেচে যে, আমি গাঙ্গুলিমশায়ের খুন-সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছি—নিশ্চয়ই পুলিশের সাদা পোশাক-পরা ডিটেক্‌টিভ।

সে এবার বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বল্লে—বাবু, যা জিগ্যেস করেন, করুন।

—গাঙ্গুলিমশায়ের খাতা তুমি লিখতে?

ননী ইতস্তত করে বল্লে—তা ইয়ে—আমিও লিখেচি দু'-একদিন—আর ওই গণেশ বলে একটা স্কুলের ছেলে আচে, তাকে দিয়েও—

আমি ধমক দিয়ে বল্লাম—স্কুলের ছেলের কথা হচ্ছে না—তুমি লিখতে কি না?

ননী ভয়ে-ভয়ে বল্লে—আজ্ঞে, তা লেখতাম।

—কতদিন লিখেচ? মিথ্যে কথা বল্লেই ধরা পড়ে যাবে। ঠিক বলবে।

—প্রায়ই লেখতাম। দু'বছর ধরে লিখচি।

—আর কে লিখত?

—ওই যে স্কুলের গণেশ—

—তার কথা ছেড়ে দাও, তার বয়েস কত?

—পনেরো-ষোলো হবে।

—আর কে লিখত?

—আর, সরফরাজ তরফদার লিখত, সে এখন—

—সরফরাজ তরফদারের বয়েস কত? কী করে?

—সে এখন মারা গিয়েছে।

—বাদ দাও সে-কথা। কতদিন মারা গিয়েচে?

—দু'বছর হবে।

—এইবার একটা কথা জিগ্যেস করি—গাঙ্গুলিমশায়ের কত টাকা বাইরে ছিল, জান?

—প্রায় দু'হাজার টাকা।

—মিথ্যে বল না। খাতা পুলিশের হাতে পড়েচে—মিথ্যে বল্লে মারা যাবে।

—না বাবু, মিথ্যে বলিনি। দু'হাজার হবে।

—ঘরে মজুত কত ছিল?

—তা জানিনে।

—আবার বাজে কথা? ঠিক বল।

—বাবু, আমায় মেরেই ফেলুন আর যা-ই করুন—মজুত-টাকা কত তা আমি কী করে বলব? গাঙ্গুলিমশায় আমায় সে-টাকা দেখায়নি তো! খাতায় মজুত-তহবিল লেখা থাকত না।

—একটা আন্দাজ তো আছে? আন্দাজ কী ছিল বলে তোমার মনে হয়?

—আন্দাজ আর সাত-আটশো টাকা।

—কী করে আন্দাজ করলে?

—ওঁর মুখের কথা থেকে তাই আন্দাজ হতো।

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর কতদিন আগে তুমি শেষ খাতা লিখেছিলে?

—প্রায় দু'মাস আগে। দু'মাসের মধ্যে আমি খাতা লিখিনি—আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলচি। তা ছাড়া, খাতা বেরুলে হাতের লেখা দেখেই তা আপনি বুঝবেন।

—কোন মোটা টাকা কি তাঁর মরণের আগে কোন খাতকে শোধ করেছিল বলে তুমি মনে কর?

—না বাবু! ঊর্ধ্বসংখ্যা ত্রিশ টাকার বেশি তিনি কাউকে ধার দিতেন না, সেটা খুব ভাল করেই জানি। মোটা টাকা মানে, দুশো, একশো টাকা কাউকে তিনি কখনও দেননি।

—এমন তো হতে পারে, পাঁচজন খাতকে ত্রিশ টাকা করে শোধ দিয়ে গেল একদিনে? দেড়শো টাকা হল?

—তা হতে পারে বাবু, কিন্তু তা সম্ভব নয়। একদিনে পাঁচজন খাতকে টাকা শোধ দেবে না। আর-একটা কথা বাবু। চাষী-খাতক সব—ভাদ্রমাস ধান হবার সময় নয়—এখন যে চাষী-প্রজারা টাকা শোধ দিয়ে যাবে, তা মনে হয় না। ওরা শোধ দেয় পৌষ মাসে—আবার ধার নেয় ধান-পাট বুনবার সময়ে চৈত্র-বৈশাখ মাসে। এ-সময় লেনদেন বন্ধ থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কোন কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না ননীর কাছে। তবুও আমার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে গেল না। ননী হয় সম্পূর্ণ নির্দোষ, নয়তো সে অত্যন্ত ধূর্ত। মিঃ সোম একটা কথা সব-সময়ে বলেন, "বাইরের চেহারা বা কথাবার্তা দ্বারা কখনও মানুষের আসল রূপ জানবার চেষ্টা কোরো না—করলেই ঠকতে হবে। ভীষণ চেহারার লোকের মধ্যে অনেক সময় সাধুপুরুষ বাস করে—আবার অত্যন্ত সুশ্রী ভদ্রবেশী লোকের মধ্যে সমাজের কণ্টকস্বরূপ দানব-প্রকৃতির বদমাইশ বাস করে। এ আমি যে কতবার দেখেচি!"

ননীর বাড়ি থেকে ফিরে এসে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির পেছনটা একবার ভাল করে দেখবার জন্য গেলাম।

গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়িতে একখানামাত্র খড়ের ঘর। তার সঙ্গে লাগাও ছোট্ট রান্নাঘর। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে যাওয়া যায়। এসব আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখলাম।

তাকে বল্লাম—আপনার পিতার হত্যাকারীকে যদি খুঁজে বের করতে পারি, আপনি খুব খুশি হবেন?

সে প্রায় কেঁদে ফেলে বল্লে—খুশী কি, আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব।

—টাকা দিতে হবে না। আমায় সাহায্য করুন। আর-কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনে।

—নিশ্চয় করব। বলুন কী করতে হবে।

—আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন আপাততঃ। তারপর বলব যখন যা করতে হবে। আচ্ছা, চলুন তো বাড়ির পিছন দিকটা একবার দেখি?

—বড্ড জঙ্গল, যাবেন ওদিকে?

—জঙ্গল দেখলে তো আমাদের চলবে না—চলুন দেখি।

সত্যই ঘন আগাছার জঙ্গল আর বড়-বড় বনগাছের ভিড় বাড়ির পেছনেই। পাড়াগাঁয়ে যেমন হয়ে থাকে—বিশেষ করে এই শ্যামপুরে জঙ্গল একটু বেশি। বড়-বড় ভিটে লোকশূন্য ও জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বহুকাল থেকে। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে দেশ উৎসন্নে গিয়েছিল বিশ-ত্রিশ বছর আগে। এখন পাড়ায়-পাড়ায় নলকূপ হয়েচে জেলাবোর্ডের অনুগ্রহে, ম্যালেরিয়াও অনেক কমেচে—কিন্তু লোক আর ফিরে আসেনি।

জঙ্গলের মধ্যে বর্ষার দিনে মশার কামড় খেয়ে হাত-পা ফুলে উঠল। আমি প্রত্যেক স্থান তন্নতন্ন করে দেখলাম। সাত-আটদিনের পূর্বের ঘটনা, পায়ের চিহ্ন যদি কোথাও থাকতে পারে—তবে এখানেই তা থাকা সম্ভব।

কিন্তু জায়গাটা দেখে হতাশ হতে হল।

জমিটা মুথো-ঘাসে ঢাকা—বর্ষায় সে-ঘাস বেড়ে হাতখানেক লম্বা হয়েচে। তার ওপর পায়ের দাগ থাকা সম্ভবপর নয়।

আমার মনে হল, খুনী রাত্রে এসেছিল ঠিক এই পথে। সামনের পথ লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে—কখনওই সে-পথে আসতে সাহস করেনি।

অনেকক্ষণ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেও সন্দেহজনক কোনো জিনিস চোখে পড়ল না—কেবল এক জায়গায় একটা শেওড়াগাছের ডাল ভাঙা অবস্থায় দেখে আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলেকে বল্লাম—এই ডালটা ভেঙে কে দাঁতন করেছিল, আপনি?

গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে আশ্চর্য হয়ে বল্লে—না, আমি এ-জঙ্গলে দাঁতনকাঠি ভাঙতে আসব কেন?

—তাই জিগ্যেস করচি।

—আপনি কী করে জানলেন, ডাল ভেঙে কেউ দাঁতন করেচে?

—ভাল করে চেয়ে দেখুন। একরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুচড়ে ভেঙেচে ডালটা—তা ছাড়া এতগুলো শেওড়া-ডালের মধ্যে একটিমাত্র ডাল ভাঙা। মানুষের হাতে ভাঙা বেশ বোঝা যাচ্চে। দাঁতনকাঠি সংগ্রহ ছাড়া অন্য কী উদ্দেশ্যে এভাবে একটা ডাল কেউ ভাঙতে পারে?

—আপনার দেখবার চোখ তো অদ্ভুত! আমার তো মশাই ও চোখেই পড়ত না!

—আচ্ছা, দেখে বলুন তো, কতদিন আগে এ-ডালটা ভাঙা হয়েচে?

—অনেকদিন আগে।

—খুব বেশি দিন আগে না। মোচড়ানো অংশের গোড়াটা দেখে মনে হয়, ছ'সাতদিন আগে। এর চেয়েও নিখুঁতভাবে বলা যায়। ঐ অংশের সেলুলোজ অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করলে ধরা পড়বে। আমি এই গাছের ভাঙা ডালটা কেটে নিয়ে যাব, একটা দা আনুন তো দয়া করে?

গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের মুখ দেখে বুঝলাম সে বেশ একটু অবাক হয়েচে। ভাঙা-দাঁতনকাঠি নিয়ে আমার এত মাথাব্যথার কারণ কী বুঝতে পারচে না।

সে পিছন ফিরে দা আনতে যেতে উদ্যত হল—কিন্তু দু'-চার পা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে ঘাসের মধ্যে থেকে একটা জিনিস হাতে তুলে নিয়ে বল্লে—এটা কী?

আমি তার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে দেখলাম, সেটা একটা কাঠের ছোট্ট গোলাকৃতি পাত। ভাল করে আলোয় নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখলাম, পাতের গায়ে একটা খোদাইকাজ। একটা ফুল, ফুলটার নিচে একটা শেয়ালের মতো জানোয়ার।

শ্রীগোপাল বল্লে—এটা কী বলুন তো?

আমি বুঝতে পারলাম না, কী জিনিস এটা হতে পারে তাও আন্দাজ করতে পারলাম না।

জিনিসটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। যাবার আগে শেওড়াগাছের ভাঙা ডালের গোড়াটা কেটে নিয়ে এলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন থানায় গিয়ে দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আমার পরিচয় দিলাম।

তিনি আমায় সমাদর করে বসালেন—আমায় বল্লেন, তাঁর দ্বারা যতদূর সাহায্য হওয়া সম্ভব, তা তিনি করবেন।

আমি বল্লাম—আপনি এ-সম্বন্ধে কিছু তদন্ত করেচেন?

—তদন্ত করা শেষ করেচি। তবে, আসামী বের করা ডিটেকটিভ ভিন্ন সম্ভব নয় এক্ষেত্রে।

—ননী ঘোষকে আমার সন্দেহ হয়।

—আমারও হয়, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ হবে না।

—ওকে চালান দিন না, ভয় খেয়ে যাক! খুনের রাত্রে ও অনুপস্থিত ছিল। কোথায় ছিল তার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারে না।

—আপনি ওকে চালান দিতে পরামর্শ দেন?

—দিলে ভাল হয়। এর মধ্যে আর-একটা উদ্দেশ্য আছে—বুঝেচেন নিশ্চয়ই।

দারোগাবাবু হেসে বল্লেন—এতদিন পুলিশের চাকরি করে তা আর বুঝিনি মশায়? ওকে চালান দিলে সতিকার হত্যাকারী কিছু অসতর্ক হয়ে পড়বে এবং যদি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তবে বেরিয়ে আসবে—এই তো?

—ঠিক তা-ই—যদিও ননী ঘোষকে আমি বেশ সন্দেহ করি। লোকটা ধূর্ত-প্রকৃতির।

—কাল আমি লোকজন নিয়ে গ্রামে গিয়ে ডেকে বলব—ননীকে কালই চালান দেব।

—চালান দেওয়ার সময়ে গ্রামের সব লোকের সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার।

দারোগাবাবু বল্লেন—দাঁড়ান, একটা কথা আছে। হিসেবের খাতার একখানা পাতা সেদিন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম গাঙ্গুলিমশায়ের ঘরে। পাতাখানা একবার দেখুন।

একখানা হাতচিঠে-কাগজের পাতা নিয়ে এসে দারোগাবাবু আমার হাতে দিলেন।

আমি হাতে নিয়ে বল্লাম—এ তো ননীর হাতে লেখা নয়!

—না, এ গণেশের হাতের লেখাও নয়।

—সরফরাজ তরফদারও নয়। কারণ, সে মারা যাওয়ার পরে এ-লেখা। তারিখ দেখুন।

—তবে, খুনের অনেক দিন আগে এ-লেখা হয়েচে—চার মাসেরও বেশি আগে।

—ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়চে মশায়। আমি একটা জিনিস আপনাকে তবে দেখাই।

দারোগাবাবুর হাতে কাঠের পাতটা দিয়ে বল্লাম—এ জিনিসটা দেখুন।

দারোগাবাবু সেটা হাতে নিয়ে বল্লেন—কী এটা?

—কী জিনিসটা তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে এটা কুড়িয়ে পেয়েচি। আর-একটা জিনিস দেখুন।

বলে শেওড়াডালের গোড়াটা তাঁর হাতে দিতেই তিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—এ তো একটা শুকনো গাছের ডাল—এতে কী হবে?

—ওতেই একটা মস্ত সন্ধান দিয়েচে। জানেন? যে খুন করেচে, সে ভোররাত পর্যন্ত গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি ছাড়েনি। ভোরের দিকে রাত পোহাতে দেরি নেই দেখে সরে পড়েচে। যাবার সময় অভ্যেসের বশে শেওড়াডালের দাঁতন করেচে।

দারোগামশায় হো-হো করে হেসে উঠে বল্লেন—আপনারা যে দেখচি মশায়, স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন!

এত কল্পনা করে পুলিশের কাজ চলে? কোথায় একটা দাঁতনকাঠির ভাঙা গোড়া!

—আমি জানি আমার গুরু মিঃ সোম একবার একটা ভাঙা দেশলাইয়ের কাঠিকে সূত্র ধরে আসামী পাকড়েছিলেন।

দারোগাবাবু হাসতে হাসতে বল্লেন—বেশ, আপনিও ধরুন-না দাঁতনকাঠি থেকে, আমার আপত্তি কী?

—যদি আমি এটাকে এত প্রয়োজনীয় মনে না করতাম, তবে এটা এতদিন সঙ্গে নিয়ে বেড়াই? যে-দুটো জিনিস পেয়েচি, তাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে—এও আমরা বিশ্বাস।

—কী রকম?

—যে দাঁতনকাঠি ভেঙেচে—তার বা তাদের দলের লোকের এই কাঠের পাতখানাও!

—পাতখানা কী?

—সে-কথা পরে বলব! আর-একটা সন্ধান দিয়েচে এই দাঁতনকাঠিটা।

—কী?

—সেটা এই : দোষীর বা দোষীর দলের কারো দাঁতন করবার অভ্যেস আছে। দাঁতন করবার যার প্রতিদিনের অভ্যেস নেই—সে এরকম দাঁতন নিপুণভাবে মোচড় দিয়ে ভাঙতে জানবে না। এবং সম্ভবত সে বাঙালি এবং পল্লিগ্রামবাসী। হিন্দুস্থানীরা দাঁতন করে, কিন্তু দেখবেন, তারা শেওড়াডালের দাঁতন করতে জানে না—তারা নিম বা বাবলাগাছের দাঁতনকাঠি ব্যবহার করে সাধারণত। এ-লোকটা বাঙালি এ-বিষয়ে ভুল নেই।

সেইদিনই আমি কলকাতায় মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা করলাম। শেওড়াডালের গোড়াটা আমি তাঁকে দেখাইনি—কাঠের পাতটা তাঁর হাতে দিয়ে বল্লাম—এটা কী বলে আপনি মনে করেন?

তিনি জিনিসটা দেখে বল্লেন—এ তুমি কোথায় পেলে?

—সে-কথা আপনাকে এখন বলব না, ক্ষমা করবেন।

—এটা আসামে মিসমি-জাতির মধ্যে প্রচলিত রক্ষাকবচ। দেখবে? আমার কাছে আছে।

মিঃ সোমের বাড়িতে নানা দেশের অদ্ভুত জিনিসের একটা প্রাইভেট মিউজিয়ামমতো আছে। তিনি তাঁর সংগৃহীত দ্রব্যগুলোর মধ্যে থেকে সেরকম একটা কাঠের পাত এনে আমার হাতে দিলেন।

আমি বল্লাম—আপনারটা একটু বড়। কিন্তু চিহ্ন একই—ফুল আর শেয়াল।

—ওটা ফুল নয়, নক্ষত্র—দেবতার প্রতীক, আর নিচে উপাসনাকারী মানুষের প্রতীক—পশু।

—কোন দেশের জিনিস বল্লেন?

—নাগা পর্বতের নানা স্থানে এ-কবচ প্রচলিত—বিশেষ করে ডিব্রুসদিয়া অঞ্চলে।

আমি তাঁর হাত থেকে আমার পাতটা নিয়ে তারপর বল্লাম—এই শেওড়াডালটা ক'দিনের

ভাঙা বলে মনে হয়?

তিনি বল্লেন—ভাল করে দেখে দেব? আচ্ছা, বস।

সেটা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটু পরে ফিরে এসে বল্লেন—আট দিন আগে ভাঙা।

আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম নিজের বাসায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমার মনে একটা বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠেচে। গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করতে এবং খুনের পরে তাঁর ঘরের মধ্যে খুঁড়ে দেখতে খুনীর লেগেছিল সারারাত। যুক্তির দিক থেকে হয়তো এর অনেক দোষ বের করা যাবে—কিন্তু আমি অনেক সময় অনুমানের ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হয়ে সত্যের সন্ধান পেয়েছি।

কিন্তু ননী ঘোষকে আমি এখনও রেহাই দিইনি। শ্যামপুরে ফিরেই আমি আবার তার সঙ্গে দেখা করলাম! আমায় দেখে ননীর মুখ শুকিয়ে গেল—তাও আমার চোখ এড়াল না।

বল্লাম—শোনো ননী, আবার এলাম তোমায় জ্বালাতে—কতকগুলো কথা জিগ্যেস করব।

—আজ্ঞে, বলুন!

—গাঙ্গুলিমশায় যেদিন খুন হন, সে-রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

ননীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বল্লে, আজ্ঞে ...

—বল কোথায় ছিলে? বাড়ি ছিলে না—

—আজ্ঞে না। সাময়টায় শ্বশুরবাড়ি যেতে যেতে সেদিন দেবনাথপুরের হাটতলায় রাত কাটাই।

—কেউ দেখেচে তোমায়?

ননী বল্লে—আজ্ঞে, তা যদিও দেখেনি—

—কেন দেখেনি?

—রাত হয়ে গেল দেখে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখন কেউ সেখানে ছিল না।

—খেয়াঘাট পার হওনি দেবনাথপুরে?

—হ্যাঁ বাবু। অনেক লোক একসঙ্গে পার হয়েছিল। আমায় তো পাটনি চিনে রাখেনি।

—বাড়ি এসেছিলে কবে?

—শনিবার দুপুরবেলা।

—গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েচেন কার মুখে শুনলে?

—আজ্ঞে, গাঁয়ে ঢুকেই মাঠে কাপালিদের মুখে শুনি।

—কার মুখে শুনেছিলে তার নাম বল।

—আজ্ঞে, ঠিক মনে হচ্ছে না, বোধ হয় হীরু কাপালি—

—তার কাছে গিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারবে?

ননী ইতস্তত করে বল্লে—আজ্ঞে, ঠিক তো মনে নেই; যদি হীরু না হয়?

ননীর কথায় আমার সন্দেহ আরো বেশি হল। সে-রাত্রে ও ঘরে ছিল না, অথচ কোথায় ছিল তার পরিষ্কার প্রমাণও দিতে পাচ্চে না। গোপনে সন্ধান নিয়ে আরও জানলাম, ননী সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিল। আজ দু'দিন হল এসেচে। ননীকে জিগ্যেস করে কোনো লাভ নেই, ও সত্যি কথা বলবে না। একটা কিছু কাণ্ড ও ঘটাচ্চে নাকি তলে-তলে?

কিছু বোঝা যাচ্চে না।

দু'দিন পরে শ্রীগোপাল এসে আমায় খবর দিলে, গ্রামের মহীন সেকরাকে সে ডেকে এনেচে—আমার সঙ্গে দেখা করবে, বিশেষ কাজ আছে।

মহীন সেকরার বয়স প্রায় পঞ্চাশের ওপর। নিতান্ত ভালমানুষ গ্রাম্য-সেকরা, ঘুরপেঁচ জানে না বলেই মনে হল।

শ্রীগোপালকে বল্লাম—একে কেন এনেছ?

—এ কী বলচে শুনুন।

—কী মহীন?

—বাবু, ননী ঘোষ আমার কাছে এগারো ভরি সোনার তাবিজ আর হার তৈরি করে নিয়েচে—আজ তিন-চারদিন আগে।

—দাম কত?

—সাতাশ টাকা করে ভরি হিসেব করুন।

—টাকা নগদ দিয়েছিল?

—হ্যাঁ বাবু।

—সে-টাকা তোমার কাছে আছে? নোট, না নগদ?

—নগদ। টাকা নেই বাবু, তাই দিয়ে মহাজনের ঘর থেকে সোনা কিনে এনে গহনা গড়ি।

—দু'-একটা টাকাও নেই?

—না বাবু।

—তোমার মহাজনের কাছে আছে?

—বাবু, রাণাঘাটের শীতল পোদ্দারের দোকানে কত সোনা কেনা-বেচা হচ্চে দিন। আমার সে টাকা কি তারা বসিয়ে রেখেচে?

—শীতল পোদ্দার নাম? আমার সঙ্গে তুমি চল রাণাঘাটে আজই।

বেলা তিনটের ট্রেনে মহীন সেকরাকে নিয়ে রাণাঘাটে শীতল পোদ্দারের দোকানে হাজির হলাম। সঙ্গে মহীনকে দেখে বুড়ো পোদ্দারমশায় ভাবলে, বড় খরিদ্দার একজন এনেছে মহীন। তাদের আদর-অভ্যর্থনাকে উপেক্ষা করে আমি আসল কাজের কথা পাড়লাম, একটু কড়া—রুক্ষস্বরে।

বল্লাম—সেদিন এই মহীন আপনাদের ঘর থেকে সোনা কিনেছিল এগারো ভরি?

পোদ্দারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল ভয়ে—ভাবলে, এ নিশ্চয়ই পুলিশের হাঙ্গামা। সে ভয়ে-ভয়ে বল্লে—হ্যাঁ বাবু, কিনেছিল।

—টাকা নগদ দেয়?

—তা দিয়েছিল।

—সে-টাকা আছে?

—না বাবু, টাকা কি কখনও থাকে? আমাদের বড় কারবার, কোথাকার টাকা কোথায় গিয়েচে!

আমিও ওকে ভয় দেখানোর জন্যে কড়া সুরে বল্লাম—ঠিক কথা বল। টাকা যদি থাকে আনিয়ে দাও—তোমার ভয় নেই। চুরির ব্যাপার নয়, মহীনের কোনো দোষ নেই। তোমাদের কোনো পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হবে না—কেবল কোর্টে সাক্ষী দিতে হতে পারে। টাকা বের কর।

মহীনও বল্লে—পোদ্দারমশায়, আমাদের কোনো ভয় নেই, বাবু বলেচেন। টাকা যদি থাকে, দেখান বাবুকে।

পোদ্দার বল্লে—কিন্তু বাবু, একটা কথা। টাকা তো সব সমান, টাকার গায়ে কি নাম লেখা আছে?

—সে-কথায় তোমার দরকার নেই। নাম লেখা থাক, না থাক,—টাকা তুমি বের কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শীতল টাকা বের করে নিয়ে এল একটা থলির মধ্যে থেকে। বল্লে—সেদিনকার তহবিল আলাদা করা ছিল। সোনা বিক্রির তহবিল আমাদের আলাদা থাকে, কারণ, এই নিয়ে মহাজনের সোনা কিনতে যেতে হয়। টাকা হাতে নিয়ে দেখবার আগেই শীতল একটা কথা বল্লে—যা আমার কাছে আশ্চর্য বলে মনে হল। সে বল্লে—বাবু, এগুলো পুরোনো টাকা, পোঁতা-টোতা ছিল বলে মনে হয়, এ চুরির টাকা নয়।

আমি প্রায় চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। মহীন সেকরার মুখ দেখি বিবর্ণ হয়ে উঠেচে।

আমি বল্লাম—তুমি কী করে জানলে এ পুরোনো টাকা?

—দেখুন আপনিও হাতে নিয়ে! পুরোনো কলঙ্ক-ধরা রুপো দেখলে আমাদের চোখে কি চিনতে বাকি থাকে বাবু? এই নিয়ে কারবার করচি যখন!

—কতদিনের পুরোনো টাকা এ?

—বিশ-পঁচিশ বছরের।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, বিশ বৎসরের পরের কোনো সালের অঙ্ক টাকার গায়ে লেখা নেই। বল্লাম—মাটিতে পোঁতা টাকা বলে ঠিক মনে হচ্চে?

—নিশ্চয়ই বাবু। পেতলের হাঁড়িতে পোঁতা ছিল। পেতলের কলঙ্ক লেগেচে টাকার গায়ে।

আচ্ছা, তুমি এ-টাকা আলাদা করে রেখে দাও। আমি পুলিশ নই, কিন্তু পুলিশ শিগগির এসে এ-টাকা চাইবে মনে থাকে যেন।

শীতল পোদ্দার আমার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বল্লে—দোহাই বাবু, দেখবেন, যেন আমি এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ি। কোনো দোষে দোষী নই বাবু, মহীন আমার পুরোনো খাতক আর খদ্দের, ও কোথা থেকে টাকা এনেচে তা আমি কেমন করে জানব বাবু, বলুন?

মহীনকে নিয়ে দোকানের বাইরে চলে এলাম। দেখি, ও ভয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠেচে। বল্লাম—কী মহীন, তোমার ভয় কী? তুমি গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করনি তো?

মহীন বল্লে—খুন? গাঙ্গুলিমশায়কে? কী যে বলেন বাবু!

দেখলাম ওর সর্বশরীর যেমন থরথর করে কাঁপচে।

কেন, ওর এত ভয় হল কিসের জন্যে?

আমরা ডিটেকটিভ, আসামী ধরতে বেরিয়ে কাউকে সাধু বলে ভাবা আমাদের স্বভাব নয়। মিঃ সোম আমার শিক্ষাগুরু—তাঁর একটি মূল্যবান্ উপদেশ হচ্ছে, যে-বাড়িতে খুন হয়েচে বা চুরি হয়েচে—সে বাড়ির প্রত্যেককেই ভাববে খুনী ও চোর। প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখবে, তবেই খুনের কিনারা করতে পারবে—নতুবা পদে-পদে ঠকতে হবে।

ননী ঘোষ তো আছেই এর মধ্যে, এ-সন্দেহ আমার এখন বদ্ধমূল হল। বিশেষ করে,

টাকা দেখবার পরে আদৌ সে-সন্দেহ না থাকবারই কথা।

কিন্তু এখন আবার একটা নতুন সন্দেহ এসে উপস্থিত হল।

এই মহীন সেকরার সঙ্গে খুনের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

কথাটা ট্রেনে বসে ভাবলাম। মহীনও কামরার এক পাশে বসে আছে। সে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি—জানলা দিয়ে পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে ভীত চোখে বাইরের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মহীনের যোগাযোগে ননী ঘোষ খুন করেনি তো? দুজনে মিলে হয়তো এ-কাজ করেচে। কিংবা এমনও কি হতে পারে না যে মহীনই খুন করেচে, ননী ঘোষ নির্দোষ?

তবে একটা কথা, ননী ঘোষের হাতেই খাতাপত্র—কত টাকা আসচে-যাচ্ছে, ননীই তো জানত, মহীন সেকরা সে-খবর কী করে রাখবে। ....

তখুনি একটা কথা মনে পড়ল। গাঙ্গুলিমশায় ছিলেন সরলপ্রাণ লোক, যেখানে-সেখানে নিজের টাকাকড়ির গল্প করে বেড়াতেন, সবাই জানে।

মহীনকে বল্লাম—তোমার দোকানে অনেকে বেড়াতে যায়, না?

মহীন যেন চমকে উঠে বল্লে—হ্যাঁ বাবু।

—গাঙ্গুলিমশায়ও যেতেন?

—তা যেতেন বইকি বাবু!

—গিয়ে গল্পটল্প করতেন?

—তা করতেন বইকি বাবু।

—টাকাকড়ির কথা কখনও বলতেন তোমার দোকানে বসে?

—সেটা তো তাঁর স্বভাব ছিল—সে-কথাও বলতেন মাঝে-মাঝে।

—ননী ঘোষের সঙ্গে তোমার খুব মাখামাখি ভাব ছিল?

—আমার দোকানে আসতো গহনা গড়াতে। আমার খদ্দের। এ থেকে যা আলাপ, তা ছাড়া সে আমার গাঁয়ের লোক। খুব মাখামাখি আর এমন কী ভাব থাকবে? যেমন থাকে।

—তুমি আর ননী দু'জনে মিলে গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করে টাকা ভাগাভাগি করে নিয়েচ—কেমন কি না?

এই প্রশ্ন করেই আমি ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম। ভয়ের রেখা ফুটে উঠল ওর মুখে। ও আমার মুখের দিকে বড়-বড় চোখ করে বল্লে—কী যে বলেন বাবু! আমি বেহ্মহত্যার পাতক হব টাকার জন্যে! দোহাই ধর্ম, আপনাকে সত্যিকথা বলছি বাবু।

কিছু বুঝতে পারা গেল না। কেউ-কেউ থাকে, নিপুণ ধরনের স্বাভাবিক অভিনেতা। তাদের কথাবার্তা, হাবভাবে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়—এ আমি কতবার দেখেছি।

শ্যামপুরে ফিরে আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের সঙ্গে দেখা করলাম। শ্রীগোপাল বল্লে—থানা থেকে দারোগাবাবু আর ইন্‌স্পেক্টরবাবু এসেছিলেন। আপনাকে খুঁজছিলেন।

—তুমি গহনার কথা কিছু বল্লে নাকি তাঁদের?

—না। আমি কেন সে-কথা বলতে যাব? আমাকে কোন কথা তো বলে দেননি।

—বেশ করেচ।

—ওঁরা আপনার সেই কাঠের তক্তামতো-জিনিসটা দেখতে চাইছিলেন।

—কেন?

—সে-কথা কিছু বলেননি।

—তাঁরাও দেখে কিছু করতে পারেন, আমি তাঁদের দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাঁরা পারবেন বলে আমার ধারণা নেই!

বিকেলের দিকে আমি নির্জনে বসে অনেকক্ষণ ভাবলাম। .... আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিস্‌মি-জাতির কাষ্ঠনির্মিত রক্ষাকবচের সঙ্গে এই খুনীর যোগ আছে। সেই রক্ষাকবচপ্রাপ্তি এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে, আমার কাছে সেটা রীতিমতো সমস্যা হয়ে উঠচে ক্রমশ।

ননী ঘোষের সঙ্গেও এর সম্পর্ক এমন নিবিড় হয়ে উঠেচে, যেটা আর কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। শীতল পোদ্দারের দোকানের টাকার কথা যদি পুলিশকে বলি, তবে তারা এখুনি ননীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু সে-দিক থেকে মস্ত বাধা হচ্ছে, সে-টাকা যে ননী ঘোষ দিয়েছিল মহীনকে তার প্রমাণ কি?

মহীনের কথার উপর নির্ভর করা ছাড়া এক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রমাণ নেই!

শীতল পোদ্দারও তো ভুল করতে পারে!

হয়তো এমনও হতে পারে, মহীন সেকরাই আসল খুনী। তার দোকানে বসে গাঙ্গুলিমশায় কখনও টাকার গল্প করে থাকবেন—তারপর সুবিধে পেয়ে মহীন গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করেছে, পোঁতা-টাকা পোদ্দারের দোকানে চালিয়ে এখন ননীর ওপর দোষ চাপাচ্ছে ....

ননী ঘোষের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দেখা করলাম।

ওকে দেখেই কিন্তু আমার মনে কেমন সন্দেহ হল, লোকটার মধ্যে কোথায় কী গলদ আছে, ও খুব সাঁচ্চা লোক নয়। আমাকে দেখে প্রতিবারই ও কেমন হয়ে যায়!

লোকটা ধূর্তও বটে। ওর চোখ-মুখের ভাবেও সেটা বোঝা যায় বেশ।

ওকে জিগ্যেস করলাম—তুমি মহীনের দোকান থেকে তাবিজ গড়িয়েচ সম্প্রতি?

ননী বিবর্ণমুখে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ বাবু!

—অত টাকা হঠাৎ পেলে কোথায়?

—হঠাৎ কেন বাবু! আমরা তিনপুরুষে ঘি-মাখনের ব্যবসা করি। টাকা হাতে ছিল, তা ভাবলাম, নগদ টাকা পাড়াগাঁয়ে রাখা—

—টাকা নগদ দিয়েছিলে, না নোটে?

—নগদ।

—সব টাকা তোমার ঘি-মাখন বিক্রির টাকা?

—হ্যাঁ বাবু।

ননীকে ছেড়ে দিয়ে গ্রামের মধ্যে বেড়াতে বেরুলাম। ননী অত্যন্ত ধূর্ত লোক, ওর কাছ থেকে কথা বের করা চলবে না দেখা যাচ্ছে।

বেড়াতে-বেড়াতে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির কাছে গিয়ে পড়েচি, এমন সময় দেখি, কে একজন ভদ্রলোক গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলচেন।

আমাকে দেখে শ্রীগোপাল বল্লে—এই যে! আসুন, চা খাবেন।

—না, এখন খাব না। ব্যস্ত আছি।

—আসুন, আলাপ করিয়ে দিই.... ইনি সুশীল রায়, আর ইনি জানকীনাথ বড়ুয়া, আমাদের পাড়ার জামাই—আমার বাড়ির পাশের ওই বুড়ি-দিদিমার জামাই। উনিও একটু একটু মানে—ওঁকে সব বলেছিলাম।

আমি বুঝলাম, জানকী বড়ুয়া আর যা-ই হোক, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর-একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। মনটা হঠাৎ যেন বিরূপ হয়ে উঠল শ্রীগোপালের প্রতি। সে আমার

ওপর এরই মধ্যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে এবং কোথা থেকে আর-একজন গোয়েন্দা আমদানি করে তাকে সব ঘটনা খুলে বলছিল, আমাকে আসতে দেখে থেমে গিয়েচে।

আমি জানকীবাবুকে বল্লাম—আপনি কী বুঝচেন?

—কী সম্বন্ধে?

—খুন সম্বন্ধে।

—কিছুই না। তবে আমার মনে হয়—

—কী, বলুন।

—এখানকার লোকেই খুন করেচে।

—আপনি বলচেন, এই গাঁয়ের লোক?

—এই গাঁয়ের জানাশোনা লোক ভিন্ন এ-কাজ হয়নি। ননী ঘোষের সম্বন্ধে আপনার মনে কী হয়?

আমি বিস্মিতভাবে জানকীবাবুর মুখের দিকে চাইলাম! তা হলে শ্রীগোপাল দেখচি ননী ঘোষের কথাও এই ভদ্রলোকের কাছে বলেচে! ভারি রাগ হল শ্রীগোপালের ব্যবহারে।

আমার ওপর তা হলে আদৌ আস্থা নেই ওর দেখচি।

একবার মনে হল, জানকীবাবুর কথার কোনো উত্তর আমি দেব না। অবশেষে ভদ্রতাবোধেরই জয় হল। বল্লাম—ননী ঘোষের কথা আপনাকে কে বল্লে?

—কেন, শ্রীগোপালের মুখে সব শুনেচি।

—আপনি তাকে সন্দেহ করেন?

—খুব করি। তার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করা দরকার। তার হাতেই যখন টাকার হিসেব লেখা হত ....

—দেখুন-না, ভালই তো।

হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বললেন—আচ্ছা, আপনি ঘটনাস্থলে ভাল করে খুঁজেছিলেন?

—খুঁজেছিলাম বইকি।

—কিছু পেয়েছিলেন?

আমি জানকীবাবুর এ-প্রশ্নে দস্তুরমত বিস্মিত হলাম। যদি তিনি নিজেও একজন গোয়েন্দা হন, তবে তাঁর পক্ষে অন্য একজন সমব্যবসায়ী লোককে এ-কথা জিগ্যেস করা শোভনতা ও সৌজন্যের বিরুদ্ধে, বিশেষত যখন আগে থেকেই এ-ব্যাপারের অনুসন্ধানে আমি নিযুক্ত আছি।

আমি নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলাম—না, এমন বিশেষ কিছু না।

জানকীবাবু পুনরায় জিগ্যেস করলেন—তা হলে কিছুই পাননি?

—কিছুই না তেমন।

কাঠের পাতের কথাটা জানকীবাবুকে বলবার আমার ইচ্ছে হল না। জানকীবাবুকে বলে কী হবে? তিনি কি বুঝতে পারবেন জিনিসটা আসলে কী? মিঃ সোমের সাহায্য ব্যতীত কি আমারই বোঝার কোনো সাধ্য ছিল? মিঃ সোমের মতো পণ্ডিত ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা খুব বেশি নেই এদেশে এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

জানকীবাবু চলে গেলে আমি শ্রীগোপালকে বল্লাম—তুমি একে কী বলেছিলে?

—কি বলব!

—ননী ঘোষের কথা বলেচ?

—হ্যাঁ, তা বলেছি।

আমি ওকে তিরস্কারের সুরে বল্লাম—আমাকে তোমার বিশ্বাস না হতে পারে—তা বলে আমার আবিষ্কৃত ঘটনাসূত্রগুলো তোমার অন্য ডিটেকটিভকে দেওয়ার কী অধিকার আছে?

শ্রীগোপাল চুপ করে রইল। ওর নির্বুদ্ধিতায় ও অবিবেচকতায় আমি যারপরনাই বিরক্তি বোধ করলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি মহীন সেকরার সঙ্গে আবার দেখা করতে গেলাম। মহীন আমায় দেখে ভয়ে-ভয়ে একটা টুল পেতে দিল বসবার জন্যে।

আমি বল্লাম—মহীন, একটা সত্য কথা বলবে?

—কী, বলুন!

—তোমার সঙ্গে ননীর ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল কিছুকাল আগে?

মহীন আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বল্লে—ননী বলেছে বুঝি? সব মিথ্যে কথা ওর বাবু, সব মিথ্যে।

আমি কড়াসুরে বল্লাম—ঝগড়া হয়েছিল তা হলে? সত্যি বল।

মহীন চুপ করে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে-আস্তে বল্লে—হয়েছিল বাবু, কিন্তু আমার তাতে কোনো দোষ ....

—আমি সে-কথা বলিনি—ঝগড়া হয়েছিল কি না তাই জিগ্যেস করছি।

—হ্যাঁ বাবু।

—কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, বল এবার।

—সোনার দর নিয়ে বাবু।

—আচ্ছা, তুমি শ্রীগোপালের কাছে ননী ঘোষের তাবিজ গড়ানোর কথা এইজন্যে বলেছিলে—কেমন, ঠিক কি?

—হ্যাঁ বাবু।

—তুমি তখন ভেবেছিলে যে, ননী ঘোষই খুন করেচে?

—তা—না—

—ঠিক বল।

—না বাবু।

—তা হলে তুমিও যে দোষী হবে আইনত; তা-ই ভাবচ বুঝি?

মহীন সেকরা ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, বল্লে—বাবু, তা—তা—

—তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্যে থানায় খবর দেব!

মহীন আমার পা জড়িয়ে ধরে বল্লে—দোহাই বাবু, আমার সব কথা শুনুন আগে। আপনি দেশের লোক—আমার সর্বনাশ করবেন না বাবু—কাচ্চা-বাচ্চা মারা যাবে।

—কী, বল!

—তখন আমিও লুটের টাকা বলে সন্দেহ করিনি। কী করে করব! বলুন বাবু, তা কি সম্ভব?

—তবে, কখন সন্দেহ করলে?

—বাবু, শ্রীগোপালই আমায় বল্লে, আপনি ননী ঘোষকে সন্দেহ করেন। তখন আমি ভাবলাম, গহনার কথাটা প্রমাণ না করলে আমি মারা যাব এর পরে। তাই বলেছিলাম।

শ্রীগোপালের নির্বুদ্ধিতা দেখছি নানা দিক থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। যদি ওর বাবার খুনের আসামী ধরা না পড়ে, তবে সেটা ওর নির্বুদ্ধিতার জন্যেই ঘটবে।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাটা শ্রীগোপালকে বলবার জন্যে তার বাড়ির দিকে চল্লাম।

রাস্তাটা বাড়ির পেছনের দিকে—শিগগির হবে বলে 'শর্টকাট' করতে গেলাম বনের মধ্য দিয়ে। সেই বন—যেখানে আমি সেদিন মিস্‌মি-জাতির কবচ ও দাঁতনকাঠির গোড়া সংগ্রহ করেছিলাম।

অন্ধকারেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা সাদামতো কী কিছুদূরে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। জিনিসটা নড়চে-চড়চে আবার! অন্ধকারের জন্যে ভয় যেন বুকের রক্ত হিম করে দিলে।

এই বনের পরেই গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি—গাঙ্গুলিমশায়ের ভূত নাকি রে বাবা!

হঠাৎ একটা টর্চ জ্বলে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে কে কড়া-গলায় হাঁকলে, কে ওখানে?

—আমিও তো তা-ই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম—কে আপনি?

—ও।

আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা মনুষ্যমূর্তি এবং টর্চের আলো-আঁধার কেটে গেলে দেখলাম, সে জানকীবাবু ভিটেকটিভ!

বিস্ময়ের সুরে বল্লাম—আপনি কী করছিলেন অন্ধকারে বনের মধ্যে?

জানকীবাবু অপ্রতিভ সুরে বল্লেন—আমি এই—এই—

—ও, বুঝেছি। কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এখানে।

—না না, কিছু না।

তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলি এগিয়ে। ভদ্রলোক শুধু অপ্রতিভ নয়, যেন হঠাৎ ভীত ও ত্রস্তও হয়ে পড়েচেন। কী মুশকিল! এসব পাড়াগাঁয়ে শহরের মতো বাথরুমের বন্দোবস্ত না থাকাতে সত্যিই অনেকের বড়ই অসুবিধে হয়।

জানকী বড়ুয়া প্রাইভেট-ডিটেকটিভকে এই অন্ধকারে গাঙ্গুলিমশায়ের ভূত বলে মনে হয়েছিল ভেবে আমার খুব হাসি পেল। ভদ্রলোককে কী বিপন্নই না করে তুলেছিলাম!

সেদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীগোপালের বাড়ি বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় জানকীবাবু আমার পাশে এসে বসলেন। তাঁকেও চা দেওয়া হল। জানকীবাবু দেখলাম বেশ মজলিসি লোক, চা খেতে-খেতে তিনি নানা মজার-মজার গল্প বলতে লাগলেন। আমায় বল্লেন—আমি তো মশায় গাঁয়ের জামাই, আজ চৌদ্দ বছর বিয়ে করেচি, কাকে না চিনি বলুন গ্রামে, সকলেই আমার আত্মীয়।

আমি বল্লাম—আপনি এখানে প্রায়ই যাতায়াত করেন? তা হলে তো হবেই আত্মীয়তা।

—আমার স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ বছর-তিনেক। তারপর আমি প্রায় আসিই না। তবে শাশুড়িঠাকরুন বৃদ্ধা হয়ে পড়েচেন, আমার আসার জন্যে চিঠি লেখেন, না এসে পারিনে।

—ছেলেপুলে কি আপনার?

—একটি ছেলে হয়েছিল, মারা গিয়েচে। এখন আর কিছুই নেই।

—ও।

হঠাৎ জানকীবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে আমায় জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা, গাঙ্গুলিমশায়ের খুন সম্বন্ধে পুলিশ কোনো সূত্র পেয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

—কেন বলুন তো?

—আমার বিশেষ কৌতূহল এ-সম্বন্ধে। গাঙ্গুলিমশায় আমার শ্বশুরের সমান ছিলেন। বড় স্নেহ করতেন আমায়। তাঁর খুনের ব্যাপারের একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। আমার মনে কোনো অহঙ্কার নেই মশায়। আমি এ-খুনের কিনারা করি, বা আপনি করুন, বা পুলিশই করুক, আমার পক্ষে সব সমান। যার দ্বারা হোক্ কাজ হলেই হল। নাম আমি চাইনে।

—নাম কে চায় বলুন? আমিও নয়।

—তবে আসুন-না আমরা মিলেমিশে কাজ করি? পুলিশকেও বলুন!

—পুলিশ তো খুব রাজি, তারা তো এতে খুব খুশি হবে।

—বেশ, তবে কাল থেকে।...

—আমার কোনো আপত্তি নেই।

—আচ্ছা, প্রথম কথা—আপনি কিছু সূত্র পেয়েচেন কি না আমায় বলুন। আমি যা পেয়েছি আপনাকে বলি।

—আমি এখানে এখন বলব না। পরে আপনাকে জানাব।

—ননী ঘোষের ব্যাপারটা আপনি কী মনে করেন?

—সেদিন তো আপনাকে বলেচি। ওকে আমার সন্দেহ হয়। আপনি ওকে সন্দেহ করেন?

—নিশ্চয়ই করি।

—আপনি ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পেয়েচেন?

—সেই গহনার ব্যাপারটাই তো ওর বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় প্রমাণ।

—তা আমারও মনে হয়েচে, কিন্তু ওর মধ্যে গোলমালও যথেষ্ট।

—মহীন্ সেকরাকে নিয়ে তো? আমি মহীন্‌কে সন্দেহ করিনে।

—কেন বলুন তো?

—মহীন্ তো খাতা লিখত না গাঙ্গুলিমশায়ের। ভেবে দেখুন কথাটা।

—সেসব আমিও ভেবেচি। তাতেও জিনিসটা পরিষ্কার হয় না।

—চলুন-না, দু'জনে একবার ননীর কাছে যাই!

—তার কাছে আমি গিয়েছিলাম। তাতে কোনো ফল হবে না।

—হিসাবের খাতাখানা কোথায়?

—পুলিশের জিম্মায়।

—আপনি ভাল করে দেখেচেন খাতাখানা?

—দেখেচি বলেই তো ননীকে জড়াতে পারিনে ভাল করে।

—কেন?

—শুধু ননীর হাতের লেখা নয়, আরও অনেকের হাতের লেখা তাতে আছে।

—কার কার?

জানকীবাবু ব্যগ্রভাবে এ-প্রশ্নটা করে আমার মুখের দিকে যেন উৎকণ্ঠিত-আগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলেন। আমি মৃত মুসলমান ভদ্রলোকটি ও স্কুলের ছাত্রটির কথা

তাঁকে বল্লাম। জানকীবাবু বল্লেন—ও, এই! সে তো আমি জানি—শ্রীগোপালের মুখে শুনেছি।

—যা শুনেচেন, তার বেশি আমারও কিছু বলার নেই।

পরদিন সকালে ননী ঘোষ এসে আমার কাছে হাজির হল। বল্লে—বাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কী?

—জানকীবাবু এ-গাঁয়ের জামাই বলে খাতির করি। কিন্তু উনি কাল রাতে আমায় যে-রকম গালমন্দ দিয়ে এসেচেন, তাতে আমি বড় দুঃখিত। বাবু, যদি দোষ করে থাকি, পুলিশে দিন—গালমন্দ কেন?

—তুমি বড় চালাক লোক ননী। আমি সব বুঝি। পুলিশে দেবার হলে, তোমাকে একবারও হাজতের বাইরে রাখব ভেবেচ?

—বাবুও কি আমাকে এখনও সন্দেহ করেন?

লোকটা সাংঘাতিক ধূর্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ-খুন যে-ই করুক, ননী তার মধ্যে নিশ্চয়ই জড়িত। অথচ ও ভেবেচে যে, আমার চোখে ধুলো দেবে!

বল্লাম—সে-কথা এখন নয়। এক মাসের মধ্যেই জানতে পারবে।

—বাবু, আপনি আমাকে যতই সন্দেহ করুন, ধর্ম যতদিন মাথার উপর আছে...

ধূর্ত লোকেরাই ধর্মের দোহাই পাড়ে বেশি। লোকটার উপর সন্দেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

সারাদিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

সন্ধ্যার পরে আহারাদি সেরে অনেকক্ষণ বই পড়লাম। তারপর আলো নিবিয়ে নিদ্রা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেন জানি না—অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হল না এবং বোধহয় সেজন্যই সেই রাত্রে আমার প্রাণ বেঁচে গেল।

ব্যাপারটা কী হল খুলে বলি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেও এক কৃষ্ণপক্ষের গভীর অন্ধকার রাত্রি। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি পড়চে আবার থেমে যাচ্ছে, অথচ গুমোট কাটেনি। আমার ঘরটার উত্তরদিকে একটামাত্র কাঠের গরাদে দেওয়া জানলা, জানলার সামনাসামনি দরজা। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে জানলা নেই—একটা ঘুলঘুলি আছে মাত্র।

রাত প্রায় একটা কি তার বেশি। আমার ঘুম আসেনি, তবে সামান্য একটু তন্দ্রার ভাব এসেচে।

হঠাৎ বাইরে ঘুলঘুলির ঠিক নিচেই যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল! গরু কি ছাগলের পায়ের শব্দ হওয়া বিচিত্র নয়—বিশেষ গ্রাহ্য করলাম না।

তারপর শব্দটা সেদিক থেকে আমার শিয়রের জানলার কাছে এসে থামল। তখনও আমি ভাবছি, ওটা গরুর পায়ের শব্দ। এমন সময় আমার বিস্মিত-দৃষ্টির সামনে দিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে কার একটা সুদীর্ঘ হাত একেবারে আমার বুকের কাছে—ঠিক বুকের ওপর

এসে পৌঁছল—হাতে ধারাল একখানা সোজা-ছোরা—অন্ধকারেও যেন ঝকঝক করচে!

ততক্ষণে আমার বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত কেটে গিয়েচে।

আমি তাড়াতাড়ি পাশমোড়া দিয়ে ছোরাসমেত হাতখানা ধরতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য একটা বাঁশের লাঠিকে চেপে ধরলাম।

পরক্ষণেই কে এক জোর ঝটকায় লাঠিখানা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে। সঙ্গে-সঙ্গে ছোরার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের আঘাতে আমার হাতের কব্জি ও বুকের খানিকটা চিরে রক্তারক্তি হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ জ্বেলে দেখি, বিছানা রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েচে। তক্ষুনি নেকড়া ছিঁড়ে হাতে জলপটি বেঁধে লণ্ঠন জ্বাললাম।

লাঠির অগ্রভাগে তীক্ষ্ণাস্ত্র ছোরা বাঁধা ছিল—আমার বুক লক্ষ্য করে ঠিক কুড়ুলের কোপের ধরনে লাঠি উচিয়ে কোপ মারলেই ছোরা পিঠের ওদিক দিয়ে ফুঁড়ে বেরুত। তারপর বাঁধন আলগা করে ছোরাখানা আমার বিছানার পাশে কিংবা আমার বুকের ওপর ফেলে রাখলেই আমি যে আত্মহত্যা করেচি, এ-কথা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্য লোককে ভুল বোঝানো চলত।

আমি নিরস্ত্র ছিলাম না—মিঃ সোমের ছাত্র আমি। আমার বালিশের তলায় ছ'নলা অটোম্যাটিক ওয়েবলি লুকোনো। সেটা হাতে করে তখুনি বাইরে এসে টর্চ ধরে ঘরের সর্বত্র খুঁজলাম—জানলার কাছে জুতে সুদ্ধ টাটকা পায়ের দাগ।

ভাল করে টর্চ ফেলে দেখলাম।

কী জুতো? ....রবার-সোল, না, চামড়া?....অন্ধকারে ভাল বোঝা গেল না।

এখুনি এই জুতোর সোলের একটা ছাঁচ নেওয়া দরকার। কিন্তু তার কোনো উপকরণ, দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ আমার কাছে নেই।

আমার মনে কেমন ভয় করতে লাগল, আকাশের দিকে চাইলাম। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর মেঘান্ধকার রজনী।

এমনি রাতে ঠিক গত কৃষ্ণপক্ষেই গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েছিলেন।

আমি শ্রীগোপালের বাড়ি গিয়ে ডাকলাম—শ্রীগোপাল, শ্রীগোপাল, ওঠো—ওঠো!

শ্রীগোপাল জড়িত-কণ্ঠে উত্তর দিলে—কে?

—বাইরে এস—আলো নিয়ে এস—সব বলচি।

শ্রীগোপাল একটা কেরোসিনের টেমি জ্বালিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে বিস্মিতমুখে বের হয়ে এসে বল্লে—কে? ও, আপনি? এত রাত্রে কি মনে করে?

—চল বসি—সব বলচি। এক গ্লাস জল খাওয়াও তো দেখি!

—চা খাবেন? স্টোভ আছে। চা-খোর আমি, সব মজুত রাখি—করে দিই।

চা খেয়ে আমি আর বসতে পারচি না। ঘুমে যেন চোখ ঢুলে আসচে। শ্রীগোপাল বল্লে—বাকি রাতটুকু আমার এখানেই শুয়ে কাটিয়ে দেবেন এখন।

ব্যাপার সব শুনে শ্রীগোপাল বল্লে—এর মধ্যে ননী আছে বলে মনে হয়। এ তারই কাজ।

—না।

—না? বলেন কী!

—না, এ ননীর কাজ নয়।

—কী করে জানলেন?

—এখানকার লোক ছোরার ব্যবহার জানে না—বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে ছোরার ব্যবহার নেই।

—তবে?

—এ-কাজ যে করেচে সে বাংলার বাইরে থাকে। তুমি কাউকে রাতের কথা বোলো না কিন্তু।

—আপনাকে খুন করতে আসার উদ্দেশ্য?

—আমি দোষী খুঁজে বার করবার কাজে পুলিশকে সাহায্য করচি—এ ছাড়া আর অন্য কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

ভোর হল। আমি উঠে আমার ঘরে চলে গেলাম।

জানলার বাইরে সেই পায়ের দাগ তেমনি রয়েচে। রবার-সোলের জুতো বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। ক'নম্বরের জুতো তাও জানা গেল।

বিকেলে আমি ভাবলাম, একবার মামার বাড়ি যাব। এ-গ্রামে ডাক্তার নেই ভাল—মামার বাড়ি গিয়ে আমার ক্ষতস্থানটা দেখিয়ে ওষুধ দিয়ে নিয়ে আসব। ঘরের মধ্যে জামা গায়ে দিতে গিয়ে মনে হল—আমার ঘরের মধ্যে কে যেন ঢুকেছিল।

কিছুই থাকে না ঘরে। একটা ছোট চামড়ার সুটকেস—তাতে খানকতক কাপড়জামা। কে ঘরের মধ্যে ঢুকে সুটকেসটা মেজেতে ফেলে তার মধ্যে হাতড়ে কী খুঁজেচে—কাপড়-জামা, বা একটা মানিব্যাগে গোটা-দুই টাকা ছিল—সেগুলো ছোঁয়নি। বালিশের তলা—এমন-কি, তোশকটার তলা পর্যন্ত খুঁজেচে।

আমি প্রথমটা ভাবলাম, এ কোনো ছিঁচকে-চোরের কাজ। কিন্তু চোর টাকা নেয়নি—তবে কি রিভলভারটা চুরি করতে এসেছিল? সেটা আমার পকেটেই আছে অবিশ্যি—সে উদ্দেশ্য থাকা বিচিত্র নয়।

জানকীবাবুকে ডেকে সব কথা বল্লাম। জানকীবাবু শুনে বল্লেন—চলুন, জায়গাটা একবার দেখে আসি।

ঘরে ঢুকে আমরা সব দিক ভাল করে খুঁজে দেখলাম। সব ঠিক আছে। জানকীবাবু আমার চেয়েও ভাল করে খুঁজলেন, তিনিও কিছু বুঝতে পেরেচেন বলে মনে হল না।

বল্লাম—দেখলেন তো?

—টাকাকড়ি কিছু যায়নি?

—কিছু না।

—আর কোনো জিনিস আপনার ঘরে ছিল?

—কী জিনিস?

—অন্য কোনো দরকারি—ইয়ে—মানে—মূল্যবান?

—এখানে মূল্যবান জিনিস কী থাকবে?

—তাই তো!

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল! মিস্‌মিদের সেই কবচ আর দাঁতনকাঠির টুকরোটা আমি এই ঘরে কাল পর্যন্ত রেখেছিলাম, কিন্তু কাল কী মনে করে শ্রীগোপালের বাড়ি যাবার সময় সে জিনিস দু'টি আমি পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিলাম—এখনও পর্যন্ত সে দু'টি আমার পকেটেই আছে। কিন্তু কথাটা জানকীবাবুকে বলি-বলি করেও বলা হল না।

জানকীবাবু যাবার সময় বল্লেন—ননীর ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

—হয় খানিকটা।

—একবার ওকে ডাকিয়ে দেখি?

—এখন নয়। আমি মামার বাড়ি যাই, তারপর ওকে ডেকে জিগ্যেস করবেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি জানকীবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মামার বাড়ি চলে এলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমার মামার বাড়ির পাশে সুরেশ ডাক্তারের বাড়ি। সে আমার সমবয়সী—গ্রামে প্র্যাকটিস করে। মোটামুটি যা রোজগার করে, তাতে তার চলে যায়। ওর কাছে ক্ষতস্থান ধুয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে আবার শ্রীগোপালদের গ্রামেই ফিরলাম। জানকীবাবুর সঙ্গে পথে দেখা। তিনি বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েচেন। আমায় বল্লেন—আজই ফিরলেন?

তাঁর কথার উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ল, মিস্‌মিদের কবচখানা আমার পকেটেই আছে এখনও—সামনে রাত আসচে আবার, ও-জিনিসটা সঙ্গে এনে ভাল করিনি, মামার বাড়ি রেখে আসাই উচিত ছিল বোধহয়।

জানকীবাবুর পরামর্শটা একবার নিলে কেমন হয়, জিনিসটা দেখিয়ে?

কিন্তু ভাবলাম, এ-জিনিসটা ওঁর হাতে দিতে গেলে এখন বহু কৈফিয়ত দিতে হবে ওইসঙ্গে। হয়তো তিনি জিনিসটার গুরুত্ব বুঝবেন না—দরকার কী দেখানোর?

জানকীবাবুর শ্বশুরবাড়ি শ্রীগোপালের বাড়ির পাশেই।

ওর বৃদ্ধা শাশুড়ী, দেখি, বাইরের রোয়াকে বসে মালা জপ করচেন। আমি তাঁকে আরও কিছু জিগ্যেস করবার জন্যে সেখানে গিয়ে বসলাম।

বুড়ি বল্লে—এস দাদা, বস।

—ভাল আছেন, দিদিমা?

—আমাদের আবার ভালমন্দ—তোমরা ভাল থাকলেই আমাদের ভাল।

—আপনি বুঝি একাই থাকেন?

—আর কে থাকবে বল—আছেই-বা কে? এক মেয়ে ছিল, মারা গিয়েচে।

—তবে তো আপনার বড় কষ্ট, দিদিমা!

—কী করব দাদা, অদৃষ্টে দুঃখ থাকলে কেউ কি ঠ্যাকাতে পারে?

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। বুড়ির সামনের গোয়ালের ছিটেবেড়ায় একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েচে—জিনিসটা হচ্ছে, খুব বড় একটা পাতার টোকা। পাতাগুলো শুকনো তামাকপাতার মত ঈষৎ লালচে। পাতার বোনা ওরকম টোকা বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে কখনো দেখিনি।

জিগ্যেস করলাম—দিদিমা, ও জিনিসটা কী? এখানে তৈরি হয়?

বৃদ্ধা বল্লেন—ওটা এ-দেশের নয় দাদা।

—কোথায় পেয়েছিলেন ওটা?

—আমার জামাই এনে দিয়েছিল।

—আপনার জামাই? জানকীবাবু বুঝি?

—হ্যাঁ দাদা। ও আসামে চা-বাগানে থাকত কিনা, ওই আর বছর এনেছিল।

হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগল....আসাম!....চা-বাগান! এই ক্ষুদ্র

গ্রামের সঙ্গে সুদূর আসামের যোগ কীভাবে স্থাপিত হতে পারে—এ আমার নিকট একটা মস্তবড় সমস্যা। একটা ক্ষীণ সূত্র মিলেচে।

আমি বল্লাম—জানকীবাবু বুঝি আসামে থাকতেন?

—হ্যাঁ দাদা, অনেক দিন ছিল। এখন আর থাকে না। আমার সে মেয়ে মারা গিয়েচে কিনা! তবুও জামাই মাঝে-মাঝে আসে। গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে বড় ভাব ছিল। এলেই ওখানে বসে গল্প, চা খাওয়া—

—ও!

—বুড়ো খুন হয়েছে শুনে জামাইয়ের কী দুঃখু!

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর ক'দিন পরে এলেন উনি?

—তিন-চার দিন পরে দাদা!

—আপনার মেয়ে মারা গিয়েচেন কতদিন হল দিদিমা?

—তা, বছর-তিনেক হল—এই শ্রাবণে।

—মেয়ে মারা যাওয়ার পর উনি যেমন আসছিলেন, তেমনই আসতেন, না মধ্যে কিছুদিন আসা বন্ধ ছিল?

—বছর-দুই আর আসেনি। মন তো খারাপ হয়, বুঝতেই পার দাদা। তারপর এল এবার শীতকালে। এখানে রইল মাসখানেক। বেশ মন লেগে গেল। সেই থেকে প্রায়ই আসে।

আমি বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সেদিন আর কোথাও বেরুলাম না। পরদিন সকালে উঠে স্থির করলাম একবার থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার। বিশেষ আবশ্যক।

পথেই জানকীবাবুর সঙ্গে দেখা। আমায় জিগ্যেস করলেন—এই যে! বেড়াচ্ছেন বুঝি?

আমি বল্লাম—চলুন, ঘুরে আসা যাক একটু। আপত্তি আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন—না যাই।

—আচ্ছা জানকীবাবু, আপনি মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন?

—হ্যাঁ, খানিকটা করিও বটে, খানিকটা নাও বটে। কেন বলুন তো?

—আমার নিজের ওতে একেবারেই বিশ্বাস নেই। তাই বলচি। আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেচেন, আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি।

হঠাৎ জানকীবাবু আমার চোখের সামনে এমন একটা কাণ্ড করলেন, যাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্যে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কাণ্ডটা একটা কিছুই নয়, খুবই সাধারণ।

জানকীবাবু পথের পাশে ঝোপের জঙ্গলের দিকে চেয়ে বল্লেন—দাঁড়ান, একটা দাঁতন ভেঙে নিই। সকালবেলাটা....

তারপর তিনি আমার সামনে পথের ধারে একটা শেওড়াডাল ঘুরিয়ে ভেঙে নিলেন দাঁতনকাঠির জন্যে।

আমার ভাবান্তর অতি অল্পক্ষণের জন্যে।

পরক্ষণেই আমি সামলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুরে এসে আমি ভাঙা-শেওড়াডালটা ভাল করে লক্ষ করে দেখি। সঙ্গে সেখানকার সেই দাঁতনকাঠির শুকনো গোড়াটা এনেছিলাম।

যে বিশেষ ভঙ্গিতে আগের গাছটা ভাঙা হয়েচে, এটাও অবিকল তেমনি ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভাঙা!

কোনো তফাত নেই।

আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল। আসাম, দাঁতনকাঠি—দুটো অতি সাধারণ, অথচ অত্যন্ত অদ্ভুত সূত্র।

জানকীবাবুর এখানে গত এক বছর ধরে ঘনঘন আসা-যাওয়া, পত্নীবিয়োগসত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ি আসার তাগিদ, গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব!

মিঃ সোম একবার আমায় বলেছিলেন, অপরাধী বলে যাকে সন্দেহ করবে, তখন তার পদমর্যাদা বা বাইরের ভদ্রতা—এমনকি সম্বন্ধ, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদিকে আদৌ আমল দেবে না।

জানকীবাবুর সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ জাগল মনে।

একটা সূত্র এবার অনুসন্ধান করা দরকার। অত্যন্ত দরকারি একটা সূত্র।

সকালে উঠে গিয়ে দারোগার সঙ্গে দেখা করলাম থানায়।

দারোগাবাবু আমায় দেখে বল্লেন—কী? কোনো সন্ধান করা গেল?

—করে ফেলেচি প্রায়। এখন—যে-খাতার পাতাখানা আপনার কাছে আছে, সেইখানা একবার দরকার।

—ব্যাপার কী, শুনি?

—এখন কিছু বলচিনে। হাতের লেখা মেলানো ব্যাপার আছে একটা।

—কী রকম!

গাঙ্গুলিমশায়ের খাতা লিখত যে-ক'জন—তাদের সবার হাতের লেখা জানি, কেবল একটা হাতের লেখার ছিল অভাব—তাই না?

—সে তো আমিই আপনাকে বলি।

—এখন সেই লোক কে হতে পারে, তার একটা আন্দাজ করে ফেলেচি। তার হাতের লেখার সঙ্গে এখন সেই পাতার লেখাটা মিলিয়ে দেখতে হবে।

—লোকটার বর্তমান হাতের লেখা পাওয়ার সুবিধে হবে?

—যোগাড় করতে চেষ্টা করছি। যদি মেলে, আমি সন্দেহক্রমে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব।

—আমায় বলবেন, আমি গিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসব। ওয়ারেন্ট বের করিয়ে নিতে যা দেরি।

—বাকিটুকু কিন্তু আপনাদের হাতে।

—সে ভাববেন না, যদি আপনার সংগৃহীত প্রমাণের জোর থাকে, তবে বাকি সব আমি করে নেব। এই কাজ করচি আজ সতেরো বছর!

আমি গ্রামে ফিরে একদিনও চুপ করে রইলাম না।

এসব ব্যাপারে দেরি করতে নেই, করলেই ঠকতে হয়। জানকীবাবুর শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করলাম। শুনলাম, জানকীবাবু মাছ ধরতে গিয়েচেন কোথাকার পুকুরে—আর মাত্র দু'দিন তিনি এখানে আছেন—এই দু'দিনের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে।

আমি বল্লাম—দিদিমা, জানকীবাবু আপনাকে কিছু-কিছু টাকা পাঠান শুনেচি?

—না দাদা, ও-কথা কার কাছে শুনেচ? জামাই তেমন লোকই নয়।

—পাঠান না?

—আরও উল্টে নেয় ছাড়া দেয় না। মেয়ে থাকতে তবুও যা দিত, এখন একেবারে উপুড়-হাতটি করে না কোনোদিন।

—যাক, চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজখবর নেন তো—তা হলেই হল।

—তাও কখন-কখন। বছরে একবার বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে একখানা লেখে।

খাম না পোস্টকার্ড?

—হ্যাঁ, খাম না রেজিস্টারি চিঠি। তুমিও যেমন দাদা! মেয়ে বেঁচে না থাকলেই জামাই পর হয়ে যায়। তার উপর কি কোনো দাবি থাকে দাদা? দু'লাইন লিখে সেরে দেয়।

—কই, দেখি? আছে নাকি চিঠি?

—ওই চালের বাতায় গোঁজা আছে, দেখ না।

খুঁজে-খুঁজে নাম দেখে একখানা পুরনো পোস্টকার্ড চালের বাতা থেকে খুঁজে বের করে বৃদ্ধাকে পড়ে শোনালুম। বৃদ্ধা বললেন—ওই চিঠি দাদা।

আরও দু'-একটা কথা বলে চিঠিখানা নিয়ে চলে এলাম সঙ্গে করে। জানকীবাবু যদি এ-কথা শুনতেও পান যে, তাঁর লেখা চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, তাতেও আমার কোনো ক্ষতির কারণ নেই। থানায় দারোগার সামনে বসে হাতের লেখা দুটো মেলানো হল।

অদ্ভুত ধরনের মিল। দু'-একটা অক্ষর লেখবার বিশেষ ভঙ্গিটা উভয় হাতের লেখাতেই একইরকম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দারোগাবাবু বল্লেন—তবুও এক হাতের লেখা-বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া দরকার নয় কি?

—সে তো কোর্টে প্রমাণের সময়। এখন ওসব দরকার নেই। আপনি সন্দেহক্রমে চালান দিন।

—আমায় অন্য কারণগুলো সব বলুন।

—একে-একে সব বলব—তার আগে একবার কলকাতায় যাওয়া দরকার।

মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা করলাম কলকাতায়। সব বললাম তাঁকে খুলে।

তিনি বল্লেন—একটা কথা বলি। তোমাদের সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ-সূত্রাদির চেয়েও একটা বড় জিনিস আছে। এটা সূত্র ধরে অপরাধী বের করতে বড্ড সাহায্য করে। অন্তত আমায় তো অনেকবার যথেষ্ট সাহায্য করেচে। সেটা হল—অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্ক chance-এর আঁক কষে বোঝা যায় যে, একজন লোক যে আসামে বলবে, অথচ দাঁতন করবে, অথচ তার হাতের লেখার সঙ্গে যাকে সন্দেহ করা হচ্চে তার হাতের লেখার হুবহু মিল থাকবে, এ-ধরনের ব্যাপার হয়তো তিন হাজারের মধ্যে একটা ঘটে। এক্ষেত্রে যে সেরকম ঘটেছে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই—সুতরাং ধরে নিতে হবে এ সেই লোকই।

সেদিন কলকাতা থেকে চলে এলাম। আসবার সময় একবার থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বল্লেন, আপনি লোক পাঠালেই আমি সব ব্যবস্থা করব।

—ওয়ারেন্ট বের হয়েচে?

—এখনও হস্তগত হয়নি, আজকাল পেয়ে যাব।

গ্রামে ফিরে দু'-তিন দিন চুপচাপ রইলাম শ্রীগোপালের বাড়িতে। খবর নিয়ে জানলাম, জানকীবাবু দু'-একদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবেন। থানার দারোগার কাছে চিঠি দিয়ে আসতে বলে দিলাম।

পকেটে মিস্‌মিদের কবচখানা রেখে আমি জানকীবাবুর সন্ধানে ফিরতে থাকি এবং একটু পরে পেয়েও যাই। জানকীবাবুকে কৌশল করে নির্জনে গাঁয়ের মাঠের দিকে নিয়ে গেলাম।

আজ একবার শেষ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার!

জানকীবাবু বল্লেন—আপনার কাজ কতদূর এগুলো?

—এক পাও না। আপনি কী বলেন?

—আমি তো ভাবচি, ননীর সম্বন্ধে থানায় গিয়ে বলব।

—সন্দেহের কারণ পেয়েচেন?

—না পেলে কি আর বলচি?

—আচ্ছা জানকীবাবু, আপনি বুঝি আসামে ছিলেন?

—কে বল্লে?

—আমি শুনলাম যেন সেদিন কার মুখে।

—না, আমি কখনও আসামে ছিলাম না। যিনি বলেচেন, তিনি জানেন না।

আমার মনে ভীষণ সন্দেহ হল। জানকীবাবু এ-কথা শুনতে চান কেন? তবে কি তিনি মিস্‌মিদের কবচ হারানোর এবং বিশেষ করে সেখানা যদি আমার হাতে পড়ে বা পুলিশের কোনো সুযোগ্য ডিটেকটিভের হাতে পড়ে তবে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত?

আমি তখন আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি। বল্লাম—মানে, অন্য কেউ বলেনি, আপনার দেওয়া একটা পাতার টোকা সেদিন আপনার শ্বশুরবাড়িতে দেখে ভাবলাম এ-টোকা আসাম সদিয়া-অঞ্চল ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না—মিস্‌মিদের দেশে অমন টোকার ব্যবহার আছে।

—আপনার ভুল ধারণা।

আমি তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে পকেট থেকে মিস্‌মিদের কাঠের কবচখানা বের করে তাঁর সামনে ধরে বল্লাম—দেখুন দিকি এ জিনিসটা কী? .... চেনেন? যে-রাত্রে গাঙ্গুলিমশায় খুন হন, সে-রাত্রে তাঁর বাড়ির পেছনে এটা কুড়িয়ে পাই। আসামে মিস্‌মি-জাতের মধ্যে এই ধরনের কাঠের কবচ পাওয়া যায় কিনা—তাই।

আমার খবরের সঙ্গে-সঙ্গে জানকীবাবুর মুখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেল—কিন্তু অত্যন্ত অল্পকালের জন্যে। পরমুহূর্তেই ভীষণ ক্রোধে তাঁর নাক ফুলে উঠল, চোখ বড়-বড় হল! হঠাৎ আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো বাঘের মতো এবং সঙ্গে-সঙ্গে কবচসুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরে জিনিসটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি দু'হাতে আমার গলা চেপে ধরলেন পাগলের মতো।

আমি এর জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম।

বরং জানকীবাবুই আমার ষষুৎসুর আড়াই-পেঁচির ছুটের জন্যে ছিলেন না তৈরি।

তিনি হাতের মাপের অন্তত তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন।

আমি হেসে বল্লাম—এ-লাইনে যখন নেমেচেন, তখন অন্তত দু-একটা প্যাঁচ জেনে রাখা আপনার নিতান্ত দরকার ছিল জানকীবাবু! কবচ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন না। কবচ আপনাকে ছেড়ে দিয়েচে। এখন এটা আমার হাতে। এখন ভাগ্যদেবী আমায় দয়া করবেন।

—কী বলচেন আপনি?

—এ-কথার জবাব দেবেন অন্য জায়গায়। দাঁড়ান একটু এখানে।

থানার দারোগাবাবু কাছেই ছিলেন, আমার ইঙ্গিতে তিনি এসে হাসিমুখে বল্লেন—দয়া করে একটু এগিয়ে আসুন জানকীবাবু। খুনের অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম .... এই, লাগাও!

কনস্টেবলরা এগিয়ে গিয়ে জানকীবাবুর হাতে হাতকড়ি লাগান।

জানকীবাবু কী বলতে চাইলেন। দারোগাবাবু বল্লেন—আপনি এখন যা-কিছু বলবেন, আপনার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হবে, বুঝেসুঝে কথা বলবেন।

জানকীবাবুর বিরুদ্ধে পুলিশ আরও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করে। গাঙ্গুলিমশায় খুন হওয়ার পাঁচদিনের মধ্যে তিনি জেলার লোন আফিস-ব্যাঙ্কে সাড়ে ন'শো টাকা জমা রেখেচেন, পুলিশের খানাতল্লাসিতে তার কাগজ বার হয়ে পড়ল।

তারপর বিচারে জানকীবাবুর যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একটা বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল জানবার। জানকীবাবুর সঙ্গে আমি জেলের মধ্যে দেখা করলাম। তখন তাঁর প্রতি দণ্ডাদেশ হয়ে গিয়েচে।

আমাকে দেখে জানকীবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছেন জানকীবাবু?

—ধন্যবাদ! কোনো কথা জিগ্যেস করতে হবে না আপনাকে।

—একটু বেশি রাগ করেচেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার কর্তব্য পালন করতে হয়েছে, তা বুঝতেই পারচেন।

—থাক, ওতেই হবে।

—দেখুন জানকীবাবু, মনের অগোচরে পাপ নেই। আপনি খুব ভালভাবেই জানেন, আপনি কতদূর হীন কাজ করেচেন। একজন অসহায়, সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—যিনি আপনাকে গাঁয়ের জামাই জেনে আপনার প্রতি আত্মীয়ের মতো—এমনকি আপনার শ্বশুরের মতো ব্যবহার করতেন, আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তাঁর টাকাকড়ির হিসেব আপনাকে দিয়ে লেখাতেন—তাঁকে আপনি খুন করেচেন। পরকালে এর জবাবদিহি দিতে হবে যখন, তখন কী করবেন ভাবলেন না একবার?

—মশায়, আপনাকে পাদ্রিসাহেবের মতো লেকচার দিতে হবে না। আপনি যদি এখনই এখান থেকে না যান—আমি ওয়ার্ডারকে ডেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেব—বিরক্ত করবেন না।

লোকটা সত্যিই অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। নররক্তে হাত কলুষিত করেছে, অথচ এখনও মনে অনুতাপের অঙ্কুর পর্যন্ত জাগেনি ওর।

আমি বল্লাম—আপনি সংসারে একা, ছেলেপুলে নেই, স্ত্রী নেই। তাঁরা স্বর্গে গিয়েচেন, কিন্তু আপনার এই কাজ স্বর্গ থেকে কি তারা দেখবেন না আপনি ভেবেচেন? তাঁদের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে? জানকীবাবু চুপ করে রইলেন এবার।

আমি ভাবলাম, ওষুধ ধরেচে। আগের কথাটা আরও সুস্পষ্টভাবে বললাম। জানি না

আজও জানকীবাবুর হৃদয়ের নিভৃত কোণে তাঁর পরলোকগত স্ত্রী-পুত্রের জন্য এতটুকু স্নেহপ্রীতি জাগ্রত আছে কি না। কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তাঁর মনের সেদিকটাকে আঘাত দেবার চেষ্টা করলাম—বহুদিনের মরচেপড়া হৃদয়ের দোর যদি এতটুকু খোলে।

বল্লাম—ভেবে দেখুন জানকীবাবু, আপনার কাছে কত পবিত্র স্মৃতির আধার হওয়া উচিত যে-গ্রাম, সেই গ্রামে বসে আপনি নরহত্যা করেচেন—এ যে কত পাপের কাজ তা যদি আজও বোঝেন তবুও অনুতাপের আগুনে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অনুতাপে মানুষকে নিষ্পাপ করে, মহাপুরুষেরা বলেচেন। আপনি বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, মহাপুরুষদের বাণী তা বলে মিথ্যা হয়ে যাবে না।

জানকীবাবু আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—মশায়, আপনি কী কাজ করেন? এই কি আপনার পেশা?

—খারাপ পেশা নয় তা স্বীকার করবেন বোধহয়!

—খারাপ আর কী!

—দোষীকে প্রায়শ্চিত্ত করবার সুবিধে করে দিই, যাতে তার পরকালে ভাল হয়।

—আচ্ছা, এ আপনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

—নিশ্চয়ই করি।

—তবে শুনুন বলি, বসুন।

—বেশ কথা, বলুন।

—আমার দ্বারাই এ-কাজ হয়েচে।

—অর্থাৎ গাঙ্গুলিমশায়কে আপনি ....

—ও-কথা আর বলবেন না!

—বেশ। কেন করলেন?

—সে অনেক কথা। আমার উপায় ছিল না।

—কেন?

—আমি ব্যবসা করতুম শুনেচেন তো? ব্যবসা ফেল পড়ে কর্পদকশূন্য হয়ে পড়েছিলাম, চারিদিকে দেনা। লোভ সামলাতে পারল্লাম না।

—আপনার সান্ত্বনা আপনার কাছে। কিন্তু এটা লাগসই কৈফিয়ত হল না।

—আমি তা জানি। দুর্বল মন আমাদের—কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে বড় ইচ্ছে হয়।

—স্বচ্ছন্দে বলুন।

—আপনি ওই কবচখানা পেয়েছিলেন যেদিন, সেদিন আপনি বুঝতে পেরেছিলেন ওখানা কী?

—না।

—কবে পারলেন?

—আমার শিক্ষাগুরু মিঃ সোমের কাছে কবচের বিষয় সব জেনেছিলাম। আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করব?

—বলুন।

—আপনি কেন আবার এ-গ্রামে এসেছিলেন, খুনের পরে?

—আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝেচেন।

—আন্দাজ করেছি। কবচখানা হারিয়ে গিয়েছিল খুনের রাত্রে? ওখানা খুঁজে

এসেছিলেন।

—ঠিক তা-ই।

—সেদিন গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে অন্ধকারে ওটা খুঁজছিলেন কেন, দিনমানে না খুঁজে?

—দিনেই খুঁজতে শুরু করেছিলাম, রাত হয়ে পড়ল।

—ওখানেই যে হারিয়েছিলেন, তা জানলেন কী করে?

—ওটা সম্পূর্ণ আন্দাজি-ব্যাপার! কোনো জায়গায় যখন খুঁজে পেলাম না তখন মনে পড়ল, ওই জঙ্গলে দাঁতন ভেঙেছিলাম, তখন পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে। তাই—

আমি ওঁর মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে দেখলাম। বল্লাম—সব কথা খুলে বলুন। আমি এখনও আপনার সব কথা শুনিনি। তবে আপনার মুখ দেখে তা বুঝতে পারচি।

জানকীবাবু ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন, যেন তাঁর গোপনীয় কথা শুনবার জন্যে জেলের সেই ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে কেউ লুকিয়ে ওত পেতে বসে রয়েচে। তাঁর এ ভাব-পরিবর্তনে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভয়ে-দুঃখে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

আমায় বল্লেন—ওখানা এখন কোথায়?

—একজিবিট হিসেবে কোর্টেই জমা আছে।

—তারপর কে নিয়ে নেবে?

—আপনার সম্পত্তি, আপনার ওয়ারিশান কোর্টে দরখাস্ত করলে—

জানকীবাবু ভয়ে যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুকে দুহাত দিয়ে ঠেলে দেবার ভঙ্গিতে হাত নাড়তে-নাড়তে বল্লেন—না না, আমি ও চাইনে, আমার ওয়ারিশান কেউ নেই, ও আমি চাইনে—ওই সর্বনেশে কবচই আমাকে আজ এ-অবস্থায় এনেচে। আপনি জানেন না ও কী!

এই পর্যন্ত বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। যেন অনেকখানি বেশি বলে ফেলেচেন—যা বলবার ইচ্ছে ছিল তার চেয়েও বেশি। আর তিনি কিছু বলতে চান না বা ইচ্ছে করেন না।

আমি বল্লাম—আপনি যদি না নিতে চান, আমি কাছে রাখতে পারি।

—আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বল্লেন—আপনি সাহস করেন?

—এর মধ্যে সাহস্য করবার কী আছে? আমায় দেবেন।

—আপনি আমায় পুলিশে ধরিয়ে দিয়েচেন, আপনি আমার শত্রু—তবুও এখন ভেবে দেখচি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে দিয়েচেন আপনি। আপনার ওপর আমার রাগ নেই। আমি আপনাকে বন্ধুর মতো পরামর্শ দিচ্চি—ও-কবচ আপনি কাছে রাখতে যাবেন না।

—কেন?

—সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বল্লাম—ও-জিনিসটা দূরে রেখে চলবেন।

আমি যেজন্যে আজ জানকীবাবুর কাছে এসেছিলাম, সে উদ্দেশ্য সফল হতে চলেচে। আমি এসেছিলাম আজ ওঁর মুখে কবচের ইতিহাস কিছু শুনব বলে। আমার ওভাবে কথা পাড়বার মূলে ওই একটাই উদ্দেশ্য ছিল। অনুনয়ের সুরে কোনো কথা বলে জানকীবাবুর কাছে কাজ আদায় করা যাবে না এ আমি আগেই বুঝেছিলাম। সুতরাং আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লাম—আমার কোনো কুসংস্কার নেই জানবেন।

জানকীবাবু খোঁচা খেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বল্লেন—কুসংস্কার কাকে বলেন আপনি?

—আপনার মতো ওইসব মন্ত্রতন্ত্র কবচে বিশ্বাস—ওর নাম যদি কুসংস্কার না হয়, তবে কুসংস্কার আর কাকে বলব?

জানকীবাবু ক্রোধের সুরে বল্লেন—আপনি হয়তো ভাল ডিটেকটিভ হতে পারেন, কিন্তু দুনিয়ার সব জিনিসই তা বলে আপনি জানবেন?

আমি পূর্বের মতো তাচ্ছিল্যের সুরেই বল্লাম—আমার শিক্ষাগুরু একজন আছেন, তাঁর বাড়িতে ওরকম একখানা কবচ আছে।

—কে তিনি?

—মিঃ সোম, বিখ্যাত প্রাইভেট-ডিটেকটিভ।

—যিনিই হোন, আমার তা জানবার দরকার নেই। একটা কথা আপনাকে বলি। যদি আপনি তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, তবে অবিলম্বে তাঁকে বলবেন সেখানা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে। কতদিন থেকে তাঁর সঙ্গে সেখানা আছে, জানেন?

—তা জানিনে, তবে খুব অল্পদিনও নয়। দু' তিন বছর হবে।

—আর আমার সঙ্গে এ-কবচ আছে আজ সাত বছর। কিন্তু থাকগে।

বলেই জানকীবাবু চুপ করলেন। আর যেন তিনি মুখই খুলবেন না, এমন ভাব দেখালেন।

আমি বল্লাম—বলুন, কী বলতে চাইছিলেন?

—অন্য কিছু নয়, ও-কবচখানা আপনি আপনার গুরুকে টান মেরে ভাসিয়ে দিতে বলবেন—আর, এখানাও আপনি কাছে রাখবেন না।

—আমি তো বলেচি আমার কোনো কুসংস্কার নেই।

—অভিজ্ঞতা দ্বারা যা জেনেচি, তাকে কুসংস্কার বলে মানতে রাজি নই। বেশি তর্ক আপনার সঙ্গে করব না। আপনি থাকুন কি উচ্ছন্ন যান, তাতে আমার কী?

—এই যে খানিক আগে বলছিলেন, আমার ওপর আপনার কোনো রাগ নেই?

—ছিল না, কিন্তু আপনার নির্বুদ্ধিতা আর দেমাক দেখে রাগ হয়ে পড়েছে।

—দেমাক দেখলেন কোথায়? আপনি তো কোনো কারণ দেখাননি! শুধুই বলে যাচ্ছেন—কবচ ফেলে দাও। আজকালকার কোনো দেশে এসব মন্ত্রেতন্ত্রে বিশ্বাস করে ভেবেচেন?

একখানা কাঠের পাত মানুষের অনিষ্ট করতে পারে বলে আপনিও বিশ্বাস করেন?

—আমিও আগে ঠিক এই কথাই ভাবতাম, কিন্তু এখন আমি বুঝেছি। কিন্তু বুঝেছি এমন সময় যে, যখন আর কোনো চারা নেই।

—জিনিসটা কী, খুলে বলুন-না দয়া করে।

—শুনবেন তবে? ওই কবচই আমার এই সর্বনাশের কারণ।

আমি বুঝেছিলাম এ-সম্বন্ধে জানকীবাবু কী একটা কথা আমার কাছে চেপে যাচ্ছেন। আগে একবার বলতে গিয়েও বলেননি, হঠাৎ গুম খেয়ে চুপ করে গিয়ে অন্য কথা পেড়েছিলেন। এবার হয়তো তার পুনরাবৃত্তি করবেন।

সুতরাং, আমি যেন তাঁর আসল কথার অর্থ বুঝতে পারিনি এমন ভাব দেখিয়ে বল্লাম—তা বটে। একদিক থেকে দেখতে হলে, ওই কবচখানাই তো আপনার বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী!

জানকীবাবু আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—আপনি কী বুঝেছেন, বলুন তো? কীভাবে দায়ী?

—মানে, ওখানা না হারিয়ে গেলে তো আপনি আজ ধরা পড়তেন না—যদি ওখানা পকেট থেকে না পড়ে যেত?

—কিছুই বোঝেননি।

—এ ছাড়া আর কী বুঝবার আছে?

—আজ যে আমি একজন খুনী, তাও জানবেন ওই সর্বনেশে কবচের জন্যে। কবচ যদি আমার কাছে না থাকত তবে আজ আমি একজন মার্চেন্ট—হতে পারে ব্যবসাতে লোকসান দিয়েছিলাম—কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান কার না হয়? আমার বুকে সাহস ছিল, লোকসান আমি লাভে দাঁড় করাতে পারতাম। কিন্তু ওই কবচ তা আমায় করতে দেয়নি। ওই কবচ আমার ইহকাল-পরকাল সবই নষ্ট করেচে!

জানকীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, গল্প বলবার আসন্ন নেশায় তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেচেন। চুপ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

জানকীবাবু বল্লেন—আজ প্রায় পঁচিশ বছর আমি সদিয়া-অঞ্চলে ব্যবসা করচি। পরশুরামপুর-তীর্থের নাম শুনেছেন?

—খুব।

—ঘন জঙ্গলের পাশে ওই তীর্থটা পড়ে। ওখান থেকে আরও সত্তর মাইল দূরে ভীষণ দুর্গম বনের মধ্যে আমি জঙ্গল ইজারা নিয়ে পাটের ব্যবসা সুরু করি। ওখানে দফলা, মিরি, মিস্‌মি এসব নামের পার্বত্য-জাতির বাস। একদিন একটা বনের মধ্যে কুলিদের নিয়ে ঢুকেছি। জায়গাটার একদিকে ঝরনা, একদিকে উঁচু পাহাড়, তার গায়ে ঘন বাঁশবন। ওদিকে প্রায় সব পাহাড়েই বাঁশবন অত্যন্ত বেশি। কখনও গিয়েচেন ওদিকে?

আমি বল্লাম—না, তবে খাসিয়া পাহাড়ে এমন বাঁশবন দেখেচি, শিলং যাওয়ার পথে।

জানকীবাবুর গল্পটা আমি আমার নিজের ধরনেই বলি।

—সেই পাহাড়ী-বাঁশবনে বন কাটাবার জন্যে ঢুকে তাঁরা দেখলেন, এক জায়গায় একটা বড় শালগাছের নিচে আমাদের দেশের বৃষ-কাষ্ঠের মতো লম্বা ধরনের কাঠের খোদাই এক বিকট মূর্তি দেবতার বিগ্রহ।

কুলিরা বল্লে—বাবু, এ মিস্‌মিদের অপদেবতার মূর্তি, ওদিকে যাবেন না।

জানকীবাবুর সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, তাঁর শখ হল মূর্তিটার ফটো নেবেন। কুলিরা বারণ করলে, জানকীবাবু তাদের কথায় কর্ণপাত না করে ক্যামেরা তেপায়ার উপর দাঁড় করিয়েছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধ মিস্‌মি এসে তাদের ভাষায় কী বল্লে। জানকীবাবুর একজন কুলি সে ভাষা জানত। সে বল্লে—বাবু, ফটো নিও না, ও বারণ করচে।

অন্য-অন্য কুলিরাও বল্লে—বাবু, এরা জবর জাত—সরকারকে পর্যন্ত মানে না। ওদের দেবতাকে অপমান করলে গাঁ-সুদ্ধ তীর-ধনুক নিয়ে এসে হাজির হয়ে আমাদের সবগুলোকে গাছের সঙ্গে গেঁথে ফেলবে। ওরা দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না, কারো তোয়াক্কা রাখে না—ওদের দেবতার ফটো খিচবার দরকার নেই।

জানকীবাবু ক্যামেরা বন্ধ করলেন—এতগুলো লোকের কথা ঠেলতে পারলেন না। তারপর নিজের কাজকর্ম সেরে তিনি যখন জঙ্গল থেকে ফিরবেন, তখন আর-একবার সেই দেবমূর্তি দেখবার বড় আগ্রহ হল।

সন্ধ্যার তখন বেশি দেরি নেই, পাহাড়ী-বাঁশবনের নিবিড় ছায়া-গহন পথে বন্য-জন্তুদের অতর্কিত আক্রমণের ভয়, বেণুঘনশীর্ষে ক্ষীণ সূর্যালোক ও পার্বত্য-উপত্যকার নিস্তব্ধতা সকলের মনে একটা রহস্যের ভাব এনে দিয়েচে, কুলিদের বারণ সত্ত্বেও তিনি সেখানে

গেলেন।

সবাই ভীত ও বিস্মিত হয়ে উঠল যখন সেখানে গিয়ে দেখলে, কোন সময় সেখানে একটি শিশু বলি দেওয়া হয়েচে। শিশুটির ধড় ও মুণ্ড পৃথক-পৃথক পড়ে আছে, কাঠে-খোদাই বৃষকাষ্ঠজাতীয় দেবতার পাদমূলে! অনেকটা জায়গা নিয়ে কাঁচা আধশুকনো রক্ত।

সেখানে সেদিন আর তাঁরা বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না। ....

জানকীবাবু বল্লেন—আমার কুগ্রহ মশায়, আর যদি সেখানে না যাই তবে সবচেয়ে ভাল হয়, কিন্তু তা না করে আমি আবার পরের দিন সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। কুলিদের মধ্যে একজন লোক আমায় যথেষ্ট নিষেধ করেছিল, সে বলেছিল, 'বাবু, তুমি কলকাতার লোক, এসব দেশের গতিক কিছু জান না। জংলি-দেবতা হলেও ওদের একটা শক্তি আছে—তা তোমাকে ওদের পথে নিয়ে যাবে, তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে—ওখানে অত যাতায়াত কোরো না বাবু।' কিন্তু কারো কথা শুনলাম না, গেলাম শেষপর্যন্ত। লুকিয়েই গেলাম, পাছে কুলিরা টের পায়।

কেন যে জানকীবাবু সেখানে গেলেন, তিনি তা আজও ভাল জানেন না।

কিংবা হয়তো রক্তপিপাসু বর্বর দেবতার শক্তিই তাঁকে সেখানে যাবার প্ররোচনা দিয়েছিল .... কে জানে!

জানকীবাবু বল্লেন—ক্যামেরা নিয়ে যদি যেতাম, তা হলে তো বুঝতাম ফটো নিতে যাচ্ছি—তাই বলছিলাম, কেন যে সেখানে গেলাম, তা নিজেই ভাল জানিনে।

আমি বল্লাম—সে-মূর্তির ফটো নিয়েছিলেন?

—না, কোনোদিনই না। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ করেছিলাম, এখন তা বুঝতে পারচি।

জানকীবাবু যখন সেখানে গেলেন, তখন ঠিক থমথম করচে দুপুরবেলা, পাহাড়ী-পাখিদের ডাক থেমে গিয়েচে, বনতল নীরব, বাঁশের ঝাড়ে-ঝাড়ে শুকনো বাঁশের খোলা পাতা পড়বার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

দেবমূর্তির কাছে যাবার অত্যন্ত লোভ হল—কারণ, কুলিরা সঙ্গে থাকায় এতক্ষণ তা তিনি করতে পারেননি।

গিয়ে দেখলেন, শিশুর শবের চিহ্নও সেখানে নেই। রাত্রে বন্যজন্তুতে খেয়েই ফেলুক, বা জংলিরাই নিজেরা খাবার জন্যে সরিয়ে নিয়ে যাক! অনেকক্ষণ তিনি মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন—কেমন এক ধরনের মোহ, একটা সুতীব্র আকর্ষণ! সত্যিকার নরবলি দেওয়া হয় যে-দেবতার কাছে, এমন দেবতা কখনও দেখেননি বলেই বোধহয় আকর্ষণটা বেশি প্রবল হল, কিংবা অন্যকিছু তা বলতে পারেন না তিনি।

সেই সময় ওই কাঠের কবচখানা দেবমূর্তির গলায় ঝুলতে দেখে জানকীবাবু কিছু না ভেবে—চারদিকে চেয়ে কেউ কোথাও নেই দেখে—সেখানা চট করে মূর্তিটার গলা থেকে খুলে নিলেন। ....

আমি বিস্মিত সুরে বল্লাম—খুলে নিলেন! কী ভেবে নিলেন হঠাৎ?

—ভাবলাম একটা নিদর্শন নিয়ে যাব এদেশের জঙ্গলের দেবতার, আমাদের দেশের পাঁচজনের কাছে দেখাব! নরবলি খায় যে-দেবতা, তার সম্বন্ধে যখন বৈঠকখানা জাঁকিয়ে বসে গল্প করব তখন সঙ্গে-সঙ্গে এখানাও বার করে দেখাব। লোককে আশ্চর্য করে দেব, বোধহয় এরকমই একটা উদ্দেশ্য তখন থেকে থাকবে। কিন্তু যখন নিলাম গলা থেকে খুলে, তখনই মশায় আমার সর্বশরীর যেন কেঁপে উঠল! যেন মনে হল একটা কী অমঙ্গল ঘনিয়ে

আসচে আমার জীবনে। ও-ধরনের দুর্বলতাকে কখনওই আমল দিইনি—সেটা খুলে নিয়ে পকেটজাত করে ফেললাম একেবারে। মিস্‌মিদের অনেকে এরকম কবচ গলায় ধারণ করে, সেটাও দেখেচি, কিন্তু তারপরে। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার সময় বিশেষ করে এ-কবচ তারা পরবেই।

—তারপর?

—তারপর আর কিছুই না। সাত বছর কবচ আছে আমার কাছে। জংলি-জাতের জংলি-দেবতার কবচ, ও ধীরে-ধীরে আমায় নামিয়েচে এই সাত বছরে। এক-একটা জিনিসের এক-একটা শক্তি আছে। আমায় জাল করিয়েচে, পাওনাদারের টাকা মেরে দেবার ফন্দি দিয়েচে—শেষকালে মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে দিলে পর্যন্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যবসাদার ছিলুম মশায়—আজ কোথায় এসে নেমেচি দেখুন! এ-প্রবৃত্তি জাগাবার মূলে ওই কবচখানা! আমি দেখেচি, যখনই ওখানা আমার কাছে থাকত, তখনই নানারকম দুষ্টবুদ্ধি জাগত মনে—কাকে মারি, কাকে ফাঁকি দিই। লোভ জিনিসটা দুর্দমনীয় হয়ে উঠত। গাঙ্গুলিমশায়ের খুনের দিনের রাত্রে আমি দশটার গাড়িতে অন্ধকারে ইস্টিশানে নামি। কেউ আমায় দেখেনি। আমার পকেটে ঐ কবচ—কিন্তু যাক সে-কথা, আর এখন বলব-না!

—বলুন না।

—না। আমার ঘাড় থেকে এখন ভূত নেমে গিয়েচে, আর সে-ছবি মনে করতে পারব না। এখন মনে করলে ভয় হয়। নিজের কাজ করেই কবচ সরে পড়ল সে-রাত্রেই। আমার সর্বনাশ করে ওর প্রতিহিংসা পূর্ণ হল বোধহয়—কে বলবে বলুন! স্টীমারে আমায় একজন বারণ করেছিল কিন্তু। আসাম থেকে ফিরবার পথে ব্রহ্মপুত্রের ওপর স্টীমারে একজন বৃদ্ধ আসামি ভদ্রলোককে ওখানা দেখাই। তিনি আমায় বল্লেন, 'এ কোথায় পেলেন আপনি? এ মিরি আর মিস্‌মিদের কবচ, পশু এখানে মানুষের স্থান নিয়েচে, ওরা যখন অপরের গ্রাম আক্রমণ করতে যেত—অপরকে খুন-জখম করতে যেত—তখন দেবতার মন্ত্রপূত এই কবচ পরত গলায়। এ আপনি কাছে রাখবেন না, আপনাকে এ অমঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে।' তখনও যদি তার কথা শুনি তা হলে কি আজ এমন হয়? তাই আপনাকে আমি বলচি, আমি তো গেলামই—ও-কবচ আপনি আপনার কাছে কখনও রাখবেন না।

জানকীবাবু চুপ করলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তা পূর্ণ হয়েচে। জানকীবাবুর মুখে কবচের ইতিহাসটা শুনবার জন্যেই আসা।

বল্লাম—আমি যা-করেচি, কর্তব্যের খাতিরে করেচি। আমার বিরুদ্ধে রাগ পুষে রাখবেন না মনে। আমায় ক্ষমা করবেন। নমস্কার!

বিদায় নিয়ে চলে এলাম ওঁর কাছ থেকে।

*

যতদূর জানি—এখন তিনি আন্দামানে।

তালনবমী

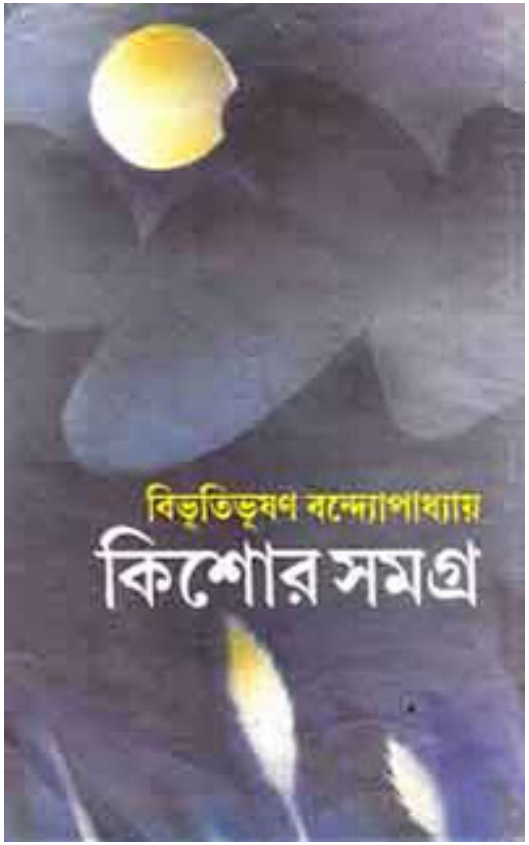

তালনবমী

ঝমঝম বর্ষা।

ভাদ্র মাসের দিন। আজ দিন পনেরো ধরে বর্ষা নেমেছে, তার আর বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই। ক্ষুদিরাম ভট্চাজের বাড়ি আজ দুদিন হাঁড়ি চড়েনি।

ক্ষুদিরাম সামান্য আয়ের গৃহস্থ। জমিজমার সামান্য কিছু আয় এবং দু-চার ঘর শিষ্য-যজমানের বাড়ি ঘুরে-ঘুরে কায়ক্লেশে সংসার চলে। এই ভীষণ বর্ষায় গ্রামের কত গৃহস্থের বাড়িতেই পুত্র-কন্যা অনাহারে আছে,—ক্ষুদিরাম তো সামান্য গৃহস্থ মাত্র! যজমান-বাড়ি থেকে যে-কটি ধান এসেছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েচে।—ভাদ্রের শেষে আউশ ধান চাষীদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাবে।

নেপাল ও গোপাল ক্ষুদিরামের দুই ছেলে। নেপালের বয়স বছর বারো, গোপালের দশ। কদিন থেকে পেট ভরে না-খেতে পেয়ে ওরা দুই ভায়েই সংসারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেচে।

নেপাল বললে, "এই গোপলা, খিদে পেয়েচে না তোর?"

গোপাল ছিপ চাঁচতে চাঁচতে বললে, "হুঁ, দাদা!"

"মাকে গিয়ে বল; আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।"

"মা বকে; তুমি যাও দাদা!"

"বক্‌ক গে। আমার নাম করে মাকে বলতে পারবি নে?"

এমন সময় পাড়ার শিবু বাঁড়ুজ্যের ছেলে চুনিকে আসতে দেখে নেপাল ডাকলে, "ও চুনি, শুনে যা!"

চুনি বয়সে নেপালের চেয়ে বড়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে, বেশ চেহারা। নেপালের ডাকে সে ওদের উঠোনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "কী?"

"আয় না ভেতরে।"

"না যাব না, বেলা যাচ্ছে। আমি জটি পিসিমাদের বাড়ি যাচ্ছি। মা সেখানে রয়েচে কিনা, ডাকতে যাচ্ছি।"

"কেন, তোর মা এখন সেখানে যে?"

"ওদের ডাল ভাঙতে গিয়েচে। তালনবমীর বের্তো আসচে এই মঙ্গলবার; ওদের বাড়ি লোকজন খাবে।"

"সত্যি?"

"তা জানিস নে বুঝি? আমাদের বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করবে। গাঁয়েও বলবে।"

"আমাদেরও করবে?"

"সবাইকে যখন নেমন্তন্ন করবে, তোদের কি বাদ দেবে?"

চুনি চলে গেলে নেপাল ছোট ভাইকে বললে, "আজ কী বার রে? তা তুই কী জানিস? আজ শুক্কুরবার বোধ হয়। মঙ্গলবারে নেমন্তন্ন।"

"গোপাল বললে, "কী মজা! না দাদা?"

"চুপ করে থাক,—তোর বুদ্ধিশুদ্ধি নেই; তালনবমীর বের্তোয় তালের বড়া করে, তুই জানিস?"

গোপাল সেটা জানত না। কিন্তু দাদার মুখে শুনে খুব খুশি হয়ে উঠল। সত্যিই তা যদি হয়, তবে সে-সুখাদ্য খাবার সম্ভাবনা বহুদূরবর্তী নয়, ঘনিয়ে এসেচে কাছে। আজ কী বার সে জানে না, সামনের মঙ্গলবারে। নিশ্চয় তার আর বেশি দেরি নেই।

দাদার সঙ্গে বাড়ি যাবার পথে পড়ে জটি পিসিমার বাড়ি। নেপাল বললে, "তুই দাঁড়া, ওদের বাড়ি ঢুকে দেখে আসি। ওদের বাড়ি তালের দরকার হবে, যদি তাল কেনে।"

এ-গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকাণ্ড তালদিঘি, নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে।

জটি পিসিমা সামনেই দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভাল নাম হরিমতী ; গ্রামসুদ্ধ ছেলেমেয়ে তাঁকে ডাকে জটি পিসিমা।

পিসিমা বললেন, "কী রে?"

"তাল নেবেন পিসিমা?"

"হ্যাঁ, নেব বই কি। আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার।"

ঠিক এই সময় দাদার পিছু পিছু গোপালও এসে দাঁড়িয়েচে। জটি পিসিমা বললেন, "পেছনে কে রে? গোপাল? তা সন্ধেবেলা দুই ভায়ে গিয়েছিলি কোথায়?"

নেপাল সলজ্জমুখে বললে, "মাছ ধরতে।"

"পেলি?"

"ওই দুটো পুঁটি আর একটা ছোট বেলে...তা হলে যাই পিসিমা?"

"আচ্ছা, এসোগে বাবা, সন্ধে হয়ে গেল ; অন্ধকারে চলাফেরা করা ভাল নয় বর্ষাকালে।"

জটি পিসিমা তাল সম্বন্ধে আর কোনো আগ্রহ দেখালেন না বা তালনবমীর ব্রত উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করার উল্লেখও করলেন না,—যদিও দুজনেরই আশা ছিল হয়তো জটি পিসিমা তাদের দেখলেই নিমন্ত্রণ করবেন এখন। দরজার কাছে গিয়ে নেপাল আবার পেছন ফিরে জিগ্যেস করলে, "তাল নেবেন তা হলে?"

"তাল? তা দিয়ে যেও বাবা। কটা করে পয়সায়?"

"দুটো করে দিচ্ছি পিসিমা। তা নেবেন আপনি, তিনটে করেই নেবেন।"

"বেশ কালো হেঁড়ে তাল তো? আমাদের তালের পিঠে হবে তালনবমীর দিন—ভাল তাল চাই।"

"মিশকালো তাল পাবেন। দেখে নেবেন আপনি।"

গোপাল বাইরে এসেই দাদাকে বললে, "কবে তাল দিবি দাদা?"

"কাল।"

"তুই ওদের কাছে পয়সা নিস নে দাদা!"

নেপাল আশ্চর্য হয়ে বললে, "কেন রে?"

"তা হলে আমাদের নেমন্তন্ন করবে, দেখিস এখন।"

"দূর! তা হয় না। আমি কষ্ট করে তাল কুড়ব—আর পয়সা নেব না?"

রাত্রে বৃষ্টি নামে। হু-হু বাদলার হাওয়া সেইসঙ্গে। পুর্বদিকের জানলার কপাট দড়িবাঁধা ; হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সারারাত খট্‌খট্ শব্দ করে ঝড়বৃষ্টির দিনে। গোপালের ঘুম হয় না, তার যেন ভয় ভয় করে। সে শুয়ে শুয়ে ভাবচে—দাদা তাল যদি বিক্রি করে,—তবে ওরা আর নেমন্তন্ন করবে না। তা কখনও করে?

খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। কেউই তখন ওঠেনি। রাত্রের

বৃষ্টি থেকে গিয়েচে,—সামান্য একটু টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশে সেই তালদিঘির ধারে। মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। গ্রামের উত্তরপাড়ার গণেশ কাওরা লাঙল ঘাড়ে এই এত সকালে মাঠে যাচ্ছে। ওকে দেখে বললে, "কী খোকা ঠাকুর, যাচ্ছ কনে এত ভোরে?"

"তাল কুড়ুতে দিঘির পাড়ে।"

"বড্ড সাপের ভয় খোকাঠাকুর। বর্ষাকালে ওখানে যেও না একা-একা।"।

গোপাল ভয়ে ভয়ে দিঘির তালপুকুরের তালের বনে ঢুকে তাল খুঁজতে লাগল। বড় আর কালো কুচ্‌কুচে একটামাত্র তাল প্রায় জলের ধারে পড়ে ; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসবার পথে আরও গোটা-তিনেক ছোট তাল পাওয়া গেল। ছেলেমানুষ, এত তাল বয়ে আনার সাধ্য নেই, দুটি মাত্র তাল নিয়ে সোজা একেবারে জটি পিসিমার বাড়ি হাজির।

জটি পিসিমা সবেমাত্র সদর দোর খুলে দোরগোড়ায় জলের ধারা দিচ্ছেন, ওকে এত সকালে দেখে অবাক্ হয়ে বললেন, "কিরে খোকা?"

গোপাল একগাল হেসে বললে, "তোমার জন্যে তাল এনিচি পিসিমা!"

জটি পিসিমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

গোপাল একবার ভাবলে, তালনবমী কবে জিগ্যেস করে ; কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার। সারাদিন গোপালের মন খেলাধুলোর ফাঁকে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঘন বর্ষার দুপুরে, মুখ উঁচু করে দেখে—নারকোল গাছের মাথা থেকে পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়চে, বাঁশঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়চে বাদলার হাওয়ায়, বকুলতলার ডোবার কটকটে ব্যাঙের দল থেকে থেকে ডাকচে।

গোপাল জিগ্যেস করলে, "ব্যাঙগুলো আজকাল তেমন ডাকে না কেন মা?"

গোপালের মা বলেন, "নতুন জলে ডাকে, এখন পুরনো জলে তত আমোদ নেই ওদের।"

"আজ কি বার, মা?"

"সোমবার। কেন রে? বারের খোঁজে তোর কী দরকার?"

"মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা?"

"তা হয়তো হবে। কী জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কী দরকার আমার?"

সারাদিন কেটে গেল। নেপাল বিকেলের দিকে জিগ্যেস করলে, "জটি পিসিমার বাড়িতে তাল দিইছিলি আজ সকালে? কোথায় পেলি তুই? আমি তাল দিতে গেলে পিসিমা বললেন, 'গোপাল তাল দিয়ে গেচে, পয়সা নেয়নি।'—কেন দিতে গেলি তুই? একটা পয়সা হলে দুজনে মুড়ি কিনে খেতাম!"

"ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস দাদা, কাল তো তালনবমী!"

"সে এমনিই নেমন্তন্ন করবে, পয়সা দিলেও করবে। তুই একটা বোকা!"

"আচ্ছা দাদা, কাল তো মঙ্গলবার, না?"

"হুঁ।"

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ির পাশের বড় বকুল গাছটায় জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে ; জানলা দিয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে—কাল সকালটা হলে হয়। কতক্ষণে যে রাত পোহাবে!....

জটি পিসিমা আদর করে ওকে বললেন খাওয়ানোর সময়, "খোকা, কাঁকুড়ের ডাল্‌না

আর নিবি? মুগের ডাল বেশি করে মেখে নে।" জটি পিসিমার বড় মেয়ে লাবণ্য-দি একখানা থালায় গরম-গরম তিল-পিটুলি ভাজা এনে ওর সামনে ধরে হেসে বললে, "খোকা, কখানা নিবি তিল-পিটুলি?"—বলেই লাবণ্য-দি থালাখানা উপুড় করে তার পাতে ঢেলে দিলে। তার পর জটি পিসিমা আনলেন পায়েস আর তালের বড়া। হেসে বললেন, "খোকা তুই তাল কুড়িয়ে দিয়েছিলি, তাই পায়েস হল!...খা,—খুব খা—আজ যে তালনবমী রে!"—কত কী চমৎকার ধরনের রাঁধা তরকারির গন্ধ-বাতাসে! খেজুর গুড়ের পায়েসের সুগন্ধ—বাতাসে! গোপালের মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠলো। সে বসে বসে খাচ্ছে, কেবলই খাচ্ছে!...সবারই খাওয়া শেষ, ও তবুও খেয়েই যাচ্ছে, লাবণ্য-দি হেসে হেসে বলছে, "আর নিবি তিল-পিটুলি?"

"ও গোপাল?"

হঠাৎ গোপাল চোখ চেয়ে দেখলে—জানলার পাশে বর্ষার জলে ভেজা ঝোপঝাড়, তাদের সেই আতা গাছটা...সে শুয়ে আছে তাদের বাড়িতে। মার হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুম ভেঙেচে, মা পাশে দাঁড়িয়ে বলচেন, "ওঠ ওঠ, বেলা হয়েচে কত! মেঘ করে আছে তাই বোঝা যাচ্ছে না।"

বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আজ কী বার, মা...?"

"মঙ্গলবার।"

তাও তো বটে! আজই তো তালনবমী! ঘুমের মধ্যে ওসব কী হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল!

বেলা আরও বাড়ল, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে যদিও বোঝা গেল না বেলা কতটা হয়েছে। গোপাল দরজার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠায় বসে রইল। বৃষ্টি নেই একটুও, মেঘ-জমকালো আকাশ। বাদলের সজল হাওয়ায় গা শিরশির করে। গোপাল আশায় আশায় বসে রইল বটে, কিন্তু কই, পিসিমাদের বাড়ি থেকে কেউ তো নেমন্তন্ন করতে এল না।

অনেক বেলায় তাদের পাড়ার জগবন্ধু চক্কোত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। তাদের পেছনে রাখাল রায় ও তাঁর ছেলে সানু; তার পেছনে কালীবর বাঁড়ুজ্যের বড় ছেলে পাঁচু আর ও-পাড়ার হরেন...

গোপাল ভাবলে এরা যায় কোথায়?

এ-দলটি চলে যাবার কিছু পরে বুড়ো নবীন ভট্চাজ ও তার ছোট ভাই দীনু, সঙ্গে এক-পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেছে।

দীনু ভট্চাজের ছেলে কুড়োরাম ওকে দেখে বললে, "এখানে বসে কেন রে? যাবিনে?"

গোপাল বললে, "কোথায় যাচ্ছিস তোরা?"

"জটি পিসিমাদের বাড়ি তালনবমীর নেমন্তন্ন খেতে। করেনি তোদের? ওরা বেছে বেছে বলেচে কিনা, সবাইকে তো বলেনি...."

গোপাল হঠাৎ রাগে, অভিমানে যেন দিশেহারা হয়ে গেল। রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন? আমরা এর পরে যাব..."

রাগ করবার মতো কী কথা সে বলেছে বুঝতে না পেরে কুড়োরাম অবাক্ হয়ে বললে, "বারে! তা অত রাগ করিস কেন? কী হয়েছে?"

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল এসে পড়ল—বোধহয় সংসারের অবিচার দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে কদিন থেকে! কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হল! তার সজল ঝাপসা দৃষ্টির সামনে পাড়ার হারু, হিতেন, দেবেন, গুটকে তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে একে তার বাড়ির সামনে দিয়ে জটি পিসিমাদের বাড়ির দিকে চলে গেল.....

রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ

জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদেরও সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়! মানুষের বিচার, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাহাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না, শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়।

আমার জীবনে একবার এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার যুক্তিযুক্ত কারণ তখন বা আজ কোনোদিনই খুঁজিয়া পাই নাই—পাঠকদের কাছে তাই সেটি বর্ণনা করিয়াই আমি খালাস, তাঁহারা যদি সে-রহস্যের কোনো স্বাভাবিক সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন, যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিব।

ঘটনাটা এইবার বলি।

কয়েক বছর আগেকার কথা। মানভূম জেলার চেরো নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে তখন মাস্টারি করি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, চেরো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনতর যে এখানে কিছুদিন বসবাস করিলে বাংলাদেশের একঘেয়ে সমতলভূমির কোনো পল্লি আর চোখে ভাল লাগে না। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালু সানুদেশ জুড়িয়া লম্বালম্বিভাবে সারা গ্রামের বাড়িগুলি অবস্থিত—সর্বশেষ সারির বাড়িগুলির খিড়কি দরজা খুলিলেই দেখা যায় পাহাড়ের উপরকার শাল, মহুয়া, কুরচি, বিল্ববৃক্ষের পাতলা জঙ্গল, একটা সুবৃহৎ বটগাছ ও তাহার তলায় বাঁধানো বেদি, ছোটবড় শিলাখণ্ড ও ভেলা কাঁটার ঝোপ।

আমি যখন প্রথম ও-গ্রামে গেলাম তখন একদিন পাহাড়ের মাথায় বেড়াইতে উঠিয়া এক জায়গায় শালবনের মধ্যে একটা পাথরের ভাঙা মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সঙ্গে ছিল আমার দুটি উপরের ক্লাসের ছাত্র—তাহারা মানভূমবাসী বাঙালি। একটা কথা—চেরো গ্রামে বেশির ভাগ অধিবাসী মাদ্রাজি, যদিও তাহারা বেশ বাংলা বলিতে পারে, অনেকে বাংলা আচার-ব্যবহারও অবলম্বন করিয়াছে। কী করিয়া মানভূম জেলার মাঝখানে এতগুলি মাদ্রাজি অধিবাসী আসিয়া বসবাস করিল, তাহার ইতিহাস আমি বলিতে পারি না।

মন্দিরটি কালো পাথরের এবং একটু অদ্ভুত গঠনের। অনেকটা যেন চাঁচড়া রাজবাড়ির দশমহাবিদ্যার মন্দিরের মতো ধানটা—এ-অঞ্চলে এরূপ গঠনের মন্দির আমার চোখে পড়ে নাই—তা ছাড়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও বিগ্রহশূন্য। দক্ষিণের দেওয়ালের পাথরের চাঁই কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, দরজা নাই, শুধু আছে পাথরের চৌকাঠ। মন্দিরের মধ্যে ও

চারিপাশে বনতুলসীর ঘন জঙ্গল—সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে সেই পাথরের বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দির আমার মনে কেমন এক অনুভূতির সঞ্চার করিল। আশ্চর্যের বিষয়,—অনুভূতিটা ভয়ের। ভাঙা মন্দির দেখিয়া মনে ভয় কেন হইল এ-কথা তারপর বাড়ি ফিরিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছি। তবুও অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম মন্দিরটা ভাল করিয়া দেখিতে, একজন ছাত্র বাধা দিয়া বলিল, "যাবেন না স্যার ওদিকে..."

"কেন?"

"জায়গাটা ভাল না। সাপের ভয় আছে সন্ধেবেলা। তা ছাড়া লোকে বলে অনেক রকম ভয়ভীত আছে—মানে অমঙ্গলের ভয়। কেউ ওদিকে যায় না।"

"ওটা কি মন্দির?

"ওটা রঙ্কিণী দেবীর মন্দির, স্যার! কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বুড়ো লোকেরাও কোনোদিন ওখানে পূজো হ'তে দেখেনি—মূর্তিও নেই বহুকাল। ওইরকম জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদার আমলেরও আগে থেকে।....চলুন স্যার নামি।"

ছেলে দুটা যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল নামিবার জন্য।

রঙ্কিনী দেবী বা তাঁহার মন্দির সম্বন্ধে দু-একজন বৃদ্ধ লোককে ইহার পর প্রশ্নও করিয়াছিলাম—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ করিয়াছি, তাহারা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় যেন, আমার মনে হইয়াছে রঙ্কিণী দেবীসংক্রান্ত কথাবার্তা বলিতেও তাহারা ভয় পায়।

আমিও আর সে-বিষয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়িয়া দিলাম।

বছরখানেক কাটিয়া গেল।

স্কুলে ছেলে কম, কাজকর্ম খুব হাল্কা, অবসর-সময়ে এ-গ্রামে ও-গ্রামে বেড়াইয়া এ-অঞ্চলের প্রাচীন পট, পুঁথি, ঘট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এ-বাতিক আমার অনেকদিন হইতেই আছে। নূতন জায়গায় আসিয়া বাতিকটা বাড়িয়া গেল।

চেরো গ্রাম হইতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। এখানে খাড়া উঁচু একটা অদ্ভুত গঠনের পাহাড়ের মাথায় জয়চণ্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে। পৌষ মাসে বড় মেলা বসে। বি-এন-আর লাইনের একটা ছোট স্টেশন আছে এখানে।

এই পাহাড়ের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক ঘর মানভূমপ্রবাসী উড়িয়া ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাণ্ডা নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হইয়া গেল—তিনি বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক রকমের গল্প করিতেন। পট, পুঁথি, ঘটসংগ্রহের অবকাশে আমি জয়চণ্ডীতলা গ্রামে চন্দ্রমোহন পাণ্ডার নিকট বসিয়া তাঁহার মুখে এদেশের কথা শুনিতাম। চন্দ্র পাণ্ডা আবার স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টারও। এদেশে প্রচলিত কত রকম আজগুবি ধরনের সাপের, ভূতের, ডাকাতের ও বাঘের (বিশেষ করিয়া বাঘের—কারণ বাঘের উপদ্রব এখানে খুব বেশি) গল্প যে বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি এবং এইসব গল্প শুনিবার লোভে কত আষাঢ়ের ঘন বর্ষার দিনে বৃদ্ধ পোস্টমাস্টারের বাড়িতে গিয়া যে হানা দিয়াছি, তাহার হিসাব দিতে পারিব না।

মানভূমের এইসব আরণ্য অঞ্চল সভ্যজগতের কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত, এখানকার জীবনযাত্রাও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যতই অদ্ভুত ধরনের গল্প হউক, জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছায়ায় শালবনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার বাঁকা মানভূমের বাংলায় সেগুলি শুনিবার সময় মনে হইত—এদেশে এরূপ ঘটিবে ইহা আর বিচিত্র কী! কলিকাতা বালিগঞ্জের কথা তো ইহা নয়।

কথায় কথায় চন্দ্র পাণ্ডা একদিন বলিলেন, "চেরো পাহাড়ের রঙ্কিণী দেবীর মন্দির

দেখেচেন?" আমি একটু আশ্চর্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম।

রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত আমি আর কোনো কথা কাহারও মুখে শুনি নাই, সেদিন সন্ধ্যায় আমার ছাত্রটির নিকট যাহা সামান্য কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া।

বলিলাম, "মন্দির দেখেচি, কিন্তু রঙ্কিণী দেবীর কথা জানবার জন্যে যাকেই জিগ্যেস করেচি সে-ই চুপ করে গিয়েচে কিংবা অন্য কথা পেড়েচে—এর কারণ কিছু বলবেন?"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "রঙ্কিণী দেবীর নামে সবাই ভয় খায়।"

"কেন বলুন তো?"

"মানভূম জেলায় আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করত। তাদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদেরও ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিণী দেবী হিন্দু দেব-দেবীর মতো নয়, অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর—আগে ওই মন্দিরে নরবলি হত—ষাট বছর আগেও রঙ্কিণী মন্দিরে নরবলি হয়েচে। অনেকে বিশ্বাস করে রঙ্কিণী দেবী অসন্তুষ্ট হলে রক্ষা নেই—অপমৃত্যু আর অমঙ্গল আসবে তা হলে। এরকম অনেকবার হয়েচে নাকি। একটা প্রবাদ আছে এ-অঞ্চলে, দেশে মড়ক হবার আগে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়া রক্তমাখা দেখা যেত। আমি যখন প্রথমে এ-দেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা—তখন প্রাচীন লোকদের মুখে এ-কথা শুনেছিলাম।"

"রঙ্কিণী দেবীর বিগ্রহ দেখেছিলেন মন্দিরে?"

"না, আমি এসে পর্যন্ত ওই ভাঙা মন্দিরই দেখচি। এখান থেকে কারা বিগ্রহটি নিয়ে যায় অন্য কোন্ দেশে। রঙ্কিণী দেবীর এসব কথা আমি শুনতাম ওই মন্দিরের সেবাইত বংশের এক বৃদ্ধের মুখে। তাঁর বাড়ি ছিল ওই চেরো গ্রামেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসি—তখন তাঁর বাড়ি অনেকবার গিয়েচি। দেবীর খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার কথাও তাঁর মুখে শুনি। এখন তাঁদের বংশে আর কেউ নেই। তার পর চেরো গ্রামেও আর বহুদিন যাইনি—বয়েস হয়েচে, বড় বেশি কোথাও বেরুইনে।"

"বিগ্রহের মূর্তি কী?"

"শুনেছিলাম কালীমূর্তি। আগে নাকি হাতে সত্যিকার নরমুণ্ড থাকত অসভ্যদের আমলে। কত নরবলি হয়েচে তার লেখাজোখা নেই—এখনও মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঢিবি আছে—খুঁড়লে নরমুণ্ড পাওয়া যায়।"

সাধে এদেশের লোক ভয় পায়! শুনিয়া সন্ধ্যার পরে জয়চণ্ডীতলা হইতে ফিরিবার পথে আমারই গা ছমছম করিতে লাগিল।

আরও বছর দুই সুখে-দুঃখে কাটিল। জায়গাটা আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে হয়তো সেখানে আরও অনেকদিন থাকিয়া যাইতাম—কিন্তু স্কুল লইয়াই বাঙালিদের সঙ্গে মাদ্রাজিদের বিবাদ বাধিল। মাদ্রাজিরা স্কুলের জন্যে বেশি টাকাকড়ি দিত, তাহারা দাবি করিতে লাগিল কমিটিতে তাহাদের লোক বেশি থাকিবে—ইংরাজির মাস্টার একজন মাদ্রাজি রাখিতেই হইবে, ইত্যাদি। আমি ইংরাজি পড়াইতাম—মাঝে হইতে আমার চাকুরি রাখা দায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের দেশে একটি হাই স্কুল হইয়াছিল, পূর্বে একবার তাহারা আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ম্যালেরিয়ার ভয়ে যাইতে চাহি নাই—এখন বেগতিক বুঝিয়া দেশে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কারণে চেরো গ্রামের মাস্টারি আমার ছাড়িতে হয় নাই। কিসের জন্য ছাড়িয়া দিলাম পরে সে-কথা বলিব।

এই সময় একদিন চন্দ্র পাণ্ডা চেরো গ্রামে কী কার্য উপলক্ষে আসিলেন। আমি তাঁহাকে

অনুরোধ করিলাম আমার বাসায় একটু চা খাইতে হইবে। তাঁহার গরুর গাড়ি সমেত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসাবাড়িতে আনিলাম।

বৃদ্ধ ইতিপূর্বে কখনও আমার বাসায় আসেন নাই ; বাড়িতে ঢুকিয়াই চারিদিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "এই বাড়িতে থাকেন আপনি?"

বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট্ট গাঁ, বাড়ি তো পাওয়া যায় না—আগে স্কুলের একটা ঘরে থাকতাম। বছরখানেক হল স্কুলের সেক্রেটারি রঘুনাথন এটা ঠিক করে দিয়েচেন।"

পুরানো আমলের পাথরের গাঁথুনির বাড়ি। বেশ বড় বড় তিনটি কামরা, একদিকে একটা সরু যাতায়াতের বারান্দা। জবরদস্ত গড়ন, যেন খিলজিদের আমলের দুর্গ কি জেলখানা—হাজার ভূমিকম্পেও এ-বাড়ির একটু চুন বালি খসাইতে পারিবে না। বৃদ্ধ বসিয়া আবার বাড়িটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলাম বাড়িটার গড়ন তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, বলিলাম, "সেকালের গড়ন, খুব টনকো—আগাগোড়া পাথরের।"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "না, সেজন্য নয়। আমি এই বাড়িতে প্রায় ত্রিশ বছর আগে যথেষ্ট যাতায়াত করতাম—এই বাড়িই হল রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের। ওদের বংশে এখন আর কেউ নেই। আপনি যে এ বাড়িতে আছেন তা জানতাম না।....তা বেশ বেশ। অনেকদিন পরে বাড়িটাতে ঢুকলাম কিনা, আমার বড় অদ্ভুত লাগচে। তখন বয়েস ছিল ত্রিশ, আর এখন হল প্রায় ষাট।" তারপর অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। চা পান করিয়া বৃদ্ধ গরুর গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

আরও বছরখানেক কাটিয়াছে। দেশের স্কুলে চাকুরির আশ্বাস পাইলেও আমি এখনও যাই নাই, কারণ এখানকার বাঙালি-মাদ্রাজি সমস্যা একরূপ মিটিয়া আসিয়াছে, আপাতত আমার চাকুরিটা বজায় রহিল বলিয়াই তো মনে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ।

পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে আমারই এক ছাত্রের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম—মধ্যে রবিবার পড়াতে শনিবার গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হই, রবিবার ও সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলা আবশ্যক বাসায় আমি একাই থাকি। স্কুলের চাকর রাখহরি আমার রাঁধে, এ কয়দিন স্কুলের ছুটি ছিল, রাখহরিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়াই রাখহরি বলিয়া উঠিল, "এঃ বাবু, এ কিসের রক্ত! দেখুন..."

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম।

তা-ই বটে! বাহিরের দরজায় চৌকাঠের ঠিক ভিতর দিক হইতে রক্তের ধারা উঠান বাহিয়া যেন চলিয়াছে। একটানা ধারা নয়, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা অবিচ্ছিন্ন সারি। একেবারে টাটকা রক্ত—এইমাত্র সদ্য যেন কাহারও মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আমি তো অবাক! কিসের রক্তের ধারা এ! কোথা হইতেই বা আসিল, আর দুদিন তো বাসা বন্ধ ছিল—বাড়ির ভিতরের উঠানে রক্তের দাগ আসে কোথা হইতে—তাহার উপর সদ্য তাজা রক্ত!

অবশ্য কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুরের কথা মনে পড়িল। এ-ক্ষেত্রে পড়াই স্বাভাবিক। চাকরকে বলিলাম, "দেখ তো রে, রক্তটা কোন্ দিকে যাচ্চে—এ সেই বড় হুলো বেড়ালটার কাজ..."

রক্তের ধারাটা গিয়াছে দেখা গেল সিঁড়ির নিচের চোরকুঠুরির দিকে। ছোট্ট ঘর, ভীষণ অন্ধকার এবং যত রাজ্যের ভাঙাচোরা পুরনো মালে ভর্তি বলিয়া আমি কোনোদিন চোরকুঠুরি খুলি নাই। চোরকুঠুরির দরজা পার হইয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে রক্তের ধারাটার গতি

দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকাল ধরিয়া ঘরটা বাহির হইতে তালা বন্ধ, যদি বিড়ালের ব্যাপারই হয়, বিড়াল ঢুকিতেও তো ছিদ্রপথ দরকার হয়।

চোরকুঠুরির তালা লোহার শিকের চাড় দিয়া খোলা হইল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল ঘরটা পুরনো, ভাঙা, তোবড়ানো টিনের বাক্স, পুরনো ছেঁড়া গদি, খাটের পায়া, মরিচাধরা সড়কি, ভাঙা টিন, শাবল প্রভৃতি ঠাসা বোঝাই। ঘরের মেঝেতে সোজা রক্তের দাগ এক কোণের দিকে গিয়াছে—রাখহরি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কী বাবু! এতে কী করে এমনধারা রক্ত লাগল...."

তারপর সে কি একটা জিনিস হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখুন, কাণ্ডটা বাবু..' জিনিসটাকে হাতে লইয়া সে বাহিরে আসিতে তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

একখানা মরিচাধরা হাতলবিহীন ভাঙা খাঁড়া বা রাম-দা—আগার দিকটা চওড়া ও বাঁকানো—বড় চওড়া ফলাটা তাজা রক্তে টকটকে রাঙা! একটু-আধটু রক্ত নয়, ফলাতে আগাগোড়া রক্ত মাখানো, মনে হয় যেন খাঁড়াখানা হইতে এখনি টপটপ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে!

সেই মুহূর্তে একসঙ্গে আমার অনেক কথা মনে হইল। দুই বৎসর পূর্বে চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শোনা সেই গল্প। রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের ভদ্রাসন বাড়ি এটা। পুরনো জিনিসের গুদাম এই চোরকুঠুরিতে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়াখানা তাহারাই রাখিয়াছিল হয়তো....মড়কের আগে বিগ্রহের খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার প্রবাদ।

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

মড়ক কোথায় ভাবিতে পারিতাম যদি সময় পাইতাম সন্দেহ করিবার। কিন্তু তাহা পাই নাই। পরদিন সন্ধ্যার সময় চেরো গ্রামে প্রথম কলেরা রোগীর খবর পাওয়া গেল। তিন দিনের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া মড়ক দেখা দিল—প্রথমে চেরো, তারপর পাশের গ্রাম কাজরা, ক্রমে জয়চণ্ডীতলা পর্যন্ত মড়ক বিস্তৃত হইল। লোক মরিয়া ধুলধাবাড় হইতে লাগিল। চেরো গ্রামের মাদ্রাজি বংশ প্রায় কাবার হইবার যোগাড় হইল।

মড়কের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশে পলাইয়া আসিলাম ; তারপর আর কখনও চেরোতে যাই নাই—গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বেই দেশের স্কুলের চাকুরিটা পাইয়াছিলাম।

সেই হইতে রঙ্কিণী দেবীকে মনে মনে ভক্তি করি। তিনি অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকেই অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুল বোঝে।

মেডেল

কয়েক বছর পূর্বে এ-ঘটনা ঘটেচে, তাই এখন মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে ; আমারই কোনো প্রকার শারীরিক অসুস্থতার দরুন হয়তো চোখে ভুল দেখে থাকবো বা ওইরকম কিছু—কিন্তু আমার মন বলে, তা নয়, ঘটনাটা মিথ্যে ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। আমার তখনকারের অভিজ্ঞতাই সত্যি, এখন যা ভাবচি, তা-ই মিথ্যে।

ঘটনাটি খুলে বলা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে গোড়াতেই বলে রাখি যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে আমার শরীরে কোনো

রোগ-বালাই নেই। আমার মন বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং যে-সময়ের কথা বলচি, এখন থেকে বছর চারেক আগে, তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। আমার স্কুলমাস্টারের জীবনে অত্যাশ্চর্য বা অবিশ্বাস্য ধরনের কখনও কিছু দেখিনি। অন্য পাঁচজন স্কুলমাস্টারের মতোই অত্যন্ত সাধারণ ও একঘেয়ে রুটিন-বাঁধা কর্তব্যের মধ্যে দিয়েই দিন কাটিয়ে চলেছি আজ বহু বৎসর।

সে-বছর বর্ষাকালে, গরমের ছুটির কিছু পরে একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি, এমন সময় একটি ছেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে হাত-কাড়াকাড়ি করে কী একটা কেড়ে বা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করচে, আমার চোখে পড়ল। আমি ওদের দুজনকে অমনোযোগিতার জন্যে ধমক দিতে, অন্য একটি ছেলে বলে উঠল, "স্যার, কামিখ্যে সুধীরের মেডেল কেড়ে নিচ্ছে..."

"কার মেডেল? কিসের মেডেল?"

সুধীর নামে ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমার মেডেল, স্যার!"

অন্য ছেলেটির দিকে চেয়ে বললুম, "ওর মেডেল তুমি নিচ্ছিলে, কামিখ্যে?"

কামিখ্যে ওরফে কামাখ্যাচরণ মৌলিক নামে ছেলেটি বললে, "নিচ্ছিলুম না স্যার, দেখতে চাইছিলুম; তা, ও দেবে না...."

"ওর মেডেল যদি ও না দেয়, তোমার কেড়ে নেবার কী অধিকার আছে? বোসো, ও-রকম আর করবে না..."

কথা শেষ করে সুধীরের দিকে চেয়ে ক্লাসের ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সখ্য থাকার ঔচিত্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেবার পরে ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, "কই, কী মেডেল দেখি? কোথায় পেলে মেডেল?"

ভেবেছিলুম আজকাল কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যেসব ব্যাডমিন্টন খেলা, সাঁতারের বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারই কোনো কিছুতে সুধীর হয়তো চতুর্থ স্থান বা ওই ধরনের কোনো সাফল্যলাভ করে ছোট্ট এতটুকু একটা আধুলির মত মেডেল পেয়ে থাকবে—এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, সে সেটা ক্লাসে এনে পাঁচজনকে গর্ব-ভরে দেখাতে চাইবে; এমনকি এই ছুতো অবলম্বন করে ক্লাসসুদ্ধু হেডমাস্টারের কাছে দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে একবেলার জন্যে ছুটিও চাইতে পারে। সুতরাং মেডেলটা যখন আমার হাতে এসে পৌঁছুল, তখন সেটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হাত পেতে নিলুম; কিন্তু মেডেলটার দিকে একবার চেয়ে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসলুম। না, এ তো পাড়ার ব্যাডমিন্টন ক্লাবের বাজে মেডেল নয়, মেডেলটা পুরনো, বড় ও ভারি চমৎকার গড়ন!—কী জিনিস দেখি?

মেডেলের গায়ে কী লেখা রয়েচে, আধো-অন্ধকার ক্লাসরুমে ভাল পড়তে পারলুম না—ও-পিঠ উল্টে দেখি, মহারানী ভিক্টোরিয়ার অল্প-বয়সের মূর্তি খোদাই করা। পকেটে চশমা নেই, মনে হল অফিসঘরের টেবিলে ফেলে এসেচি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছেলে ভিড় করচে আমার চেয়ারের চারিপাশে—মেডেল দেখবার জন্যে। তাদের ধমক দিয়ে বললুম, "যাও, বোসোগে সব, ভিড় কোরো না এখানে।"

একটা ছেলেকে বললুম, "কী লেখা আছে মেডেলের গায়ে পড়ো তো!"

ক্লাস ফোরের ছেলে—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পড়লে, "ক্রাইমিয়া, সিবাস্টোপোল, ভিক্টোরিয়া রেজিনা..."

"ও-পিঠে?"

"সার্জেন্ট এস্. বি. পার্কিন্স্, সিক্সথ ড্রাগন গার্ডস্—আটারোশো' চুয়ান্ন সাল..."

দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলুম। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় সিবাস্টোপোলের রণক্ষেত্রে

কোনো সাহসের কাজ করবার জন্যে এই মেডেল দেওয়া হয়েছিল ইংলন্ডের সামরিক দপ্তর থেকে ড্রাগন গার্ডস সৈন্যদলের সার্জেন্ট পার্কিন্সকে। এ তো সাধারণ জিনিস মোটেই নয়!

ক্রাইমিয়া....সিবাস্টোপোল?...চার্জ অফ দি লাইট ব্রিগেড! কিন্তু কলকাতার নীলমণি দাসের লেনের সুধীর সাহার কাছে সে-মেডেল কোথা থেকে আসে?

"এদিকে এসো, এ-মেডেল কোথায় পেয়েচ?"

"ওটা আমার স্যার!"

"তোমার তা বুঝলুম। পেলে কোথায়?"

"আমার দাদু দিয়েচেন স্যার!"

"তোমার দাদু কোথায় পেয়েছিলেন জানো?"

"হ্যাঁ স্যার, জানি। আমার দাদুর বাবার কাছে এক সাহেব জমা রেখে গিয়েছিল।"

"কী ভাবে?"

"আমাদের মদের দোকান ছিল কিনা, স্যার! মদ খেয়ে টাকা কম পড়লে ওটা বাঁধা রেখে গিয়েছিল, আর নিয়ে যায়নি—দাদুর মুখে শুনেচি।"

হিসেব করে দেখলাম ছিয়াশি বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে সেই বছরটি থেকে, যে-বছরে সার্জেন্ট পার্কিন্স্ (সে যে-ই হোক) এ মেডেল পায়। তখন তার বয়স যদি কুড়ি বছরও থেকে থাকে, এখন তার বয়স হওয়া উচিত একশো ছয়। সুতরাং সে মরে ভূত হয়ে গেছে কোন কালে!

সেদিন ছিল শনিবার, সকাল সকাল স্কুল ছুটি হবে এবং অনেক দিন পরে সেদিন দেশে যাব পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলুম। আমার এক গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশায় ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, বেশ পড়াশুনো আছে, গ্রামেই থাকেন। ভাবলুম, তাঁকে মেডেলটা দেখালে খুশি হবেন খুব। সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটি চেয়ে নিলুম, সোমবারে ফেরত দেব বললুম। স্কুলের ছুটির পরে বাসা থেকে সুটকেস্ নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে আড়াইটের গাড়ি ধরলুম। দেশের স্টেশনে যখন নামলুম, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। দুমাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই হয়তো পৌঁছুতে পারা যেত—কিন্তু আমি খুব জোরে হাঁটি নি।

ভাদ্রমাসের শেষ, অথচ বৃষ্টি তত বেশি না হওয়ায় পথঘাট বেশ শুকনো খট্‌খটে। পথের ধারের বর্ষা-শ্যামল গাছপালা চোখে বড় ভাল লাগছিল অনেক দিন কলকাতা বাসের পরে—তাই জোরে পা না চালিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিলুম। এখানে প্রথমেই বলি, আমার বাড়িতে কেউ থাকে না। পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা, আমি গেলে রান্না করে দিয়ে আসতেন বরাবর। আমার এক বাল্যবন্ধু বৃন্দাবন, অনেক বছর ধরে বিদেশে থাকে, পিসিমার মুখে শুনলুম, আজ দিন পনেরো হল বৃন্দাবন বাড়ি এসেচে। শুনে বড় আনন্দ হল, সন্ধ্যার পরেই ওর সঙ্গে দেখা করব ঠিক করে, চা খেয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বার হলুম—যাবার সময় সুটকেসটা খুলে মেডেলটা পকেটে নিলুম, বৃন্দাবনকেও দেখাব।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি—বর্ষার দরুন নদীর জল ভয়ানক বেড়েচে, নদীর জল কূল ছাপিয়ে দুধারের মাঠে পড়েচে। অনেকক্ষণ বসে রইলুম, সন্ধ্যার অন্ধকার নামল একটু একটু, বাদুড়ের দল বাসায় ফিরচে। কেউ কোনো দিকে নেই।—এক জায়গায় বর্ষার তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে গিয়েচে। অনেকটা উঁচু পাড়, নিচে খরস্রোতা বর্ষার নদী। জায়গাটা দিয়ে যেতে যেতে একবার কী-রকম ভেঙেচে দেখবার ইচ্ছে গেল। পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে জলের আবর্ত দেখচি, পাড়টা সেখানে অনেকখানি উঁচু, জল অনেক নিচে—হঠাৎ আমার মনে একটা

অদ্ভুত ইচ্ছা জেগে উঠল—আমি লাফ দিয়ে পাড় থেকে জলে পড়ব !....দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছাটা যেন ক্রমে বেড়ে উঠচে....লাফাই....দিই লাফ... ! অথচ বর্ষার খরস্রোতা নদী, কুটো ফেললে দুখানা হয়ে যায় ! আমি সাঁতার জানি না,—গভীর জল পাড়ের নিচেই। ইচ্ছাটা কিছুতেই যেন সামলাতে পারচিনে ! এমনকি আমার মনে হল আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাকে লাফ দিতেই হবে, নইলে আমার জীবনের সুখ চলে যাবে !....

তাড়াতাড়ি নদীর পাড় থেকে এক রকম জোর করেই চলে এলুম। কারণ যেন মনে হচ্ছিল এর পর আমার আর যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, পা দুটো যেন ক্রমশ সীসের মতো ভারি হয়ে উঠচে—এর পর ওই বিপজ্জনক নদীর পাড় থেকে পা দুটোকে নাড়াবার ক্ষমতা চলে যাবে আমার !....

নদীর ধার থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি আসবার পথে ওসব ইচ্ছে আর কিছু নেই। আমি নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম—কী অদ্ভুত ! এ রকম হওয়ার মানে কী? ট্রেনে বসে আতিমাত্রায় ধূমপান করেছিলাম মনে পড়ল। ওই ভাদ্রমাসের গরমে অত ধূমপান করা ঠিক হয়নি, তার ওপর বাড়ি এসে দু-তিন পেয়ালা চা খেয়েচি। এ সবেই ওরকমটা হয়ে থাকবে।—নিশ্চয়ই তাই।

বৃন্দাবনের বাড়ি গেলুম। বৃন্দাবনকে অনেক দিন পরে দেখে সত্যিই আনন্দ হল। দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত বসে অনেক গল্প করলুম। অনেক-বছর-ধরে-জমানো অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী। বড় গরম আজ, কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। ভাদ্রমাসের গুমোট গরম। বৃন্দাবন বললে, 'চল ভাই, ছাদে গিয়ে বসে গল্প করি, তবুও একটু হাওয়া পাওয়া যাবে।...তুই আমাদের এখানে খেয়ে যাবি—মা বলে দিয়েচেন। তোদের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েচে।"

দুজনে ছাদে উঠলুম। বাড়িটা দোতলা। দোতলার ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর আছে। আমি জানতুম, বৃন্দাবনের কাকা ওই ঘরটায় থাকেন। দোতলার ছাদে উঠে দেখলুম—বাড়ির পেছন দিকটায় বাঁশের ভারা-বাঁধা। বললুম, "বাড়িতে রাজমিস্ত্রি খাটচে বুঝি, বৃন্দাবন?"

"হ্যাঁ ভাই, কাকার ঘরটা মেরামত হবে ; উত্তর দিকে দেওয়ালটার গা থেকে নোনাধরা ইটগুলো বার করা হচ্ছে।"

বৃন্দাবন দোতলায় ঘরটার মধ্যে ঢুকল—আমার কিন্তু মনে কেমন একটা অস্থির ভাব ! খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে গল্প করে আমি একটু জল খেতে চাইলুম। বৃন্দাবন জল আনতে নিচে নেমে গেল, আমি ছাদে পায়চারি করতে লাগলুম। ছাদে কেউ নেই। অন্ধকার ছাদটা।...যে-দিকটায় রাজমিস্ত্রিরা ভারা বেঁধে কাজ করচে, পায়চারি করতে করতে সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখচি, হঠাৎ আমার মনে হল—ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়িনে কেন?

বেশ হবে !...লাফ দেব? প্রায় দুর্দমনীয় ইচ্ছা হল লাফ দেবার। লাফ দেওয়াই ভাল !....লাফ দিতেই হবে !....দিই লাফ?...এমন সময় বৃন্দাবন ছাদের ওপর এসে বললে, "আয় ঘরের মধ্যে, মা চা পাঠিয়ে দিচ্চেন, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

আরও প্রায় আধঘণ্টা কথা বলবার পরে, নিচে থেকে চা ও খাবার এসে পৌঁছুল। আমরা দুই বন্ধুতে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করলুম। তার পর বৃন্দাবন খাওয়ার কতদূর যোগাড় হল দেখতে নিচে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরের ছাদে খোলা হাওয়ায় আবার বেড়াতে লাগলুম। রাজমিস্ত্রিদের ভারার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল—লাফ এবার দিতেই হবে। কেউ

নেই ছাদে। কেউ বাধা দিতে আসবে না—এই উপযুক্ত অবসর। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের গভীর তলার কে যেন বলচে—'লাফ দিও না, মূর্খ! লাফ দিও না, পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবে।'....আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করচে !....

কতক্ষণ পরে জানিনে, এবং কিসে থেকে কী হল তাও জানিনে,—হঠাৎ বৃন্দাবনের চিৎকারে আমার চমক ভাঙল। দেখি, বৃন্দাবান আমাকে হাত ধরে টেনে তুলচে !

"একী সর্বনাশ ! তুই লাফ দিয়ে পড়লি দেখলুম যেন ! ভাগ্যিস, বাঁশে পা-বেধে গিয়েচে তাই রক্ষে...কী হল তোর?"

আমার মাথা যেন কেমন ঘুরছিল, গা ঝিমঝিম করছিল। বৃন্দাবনকে বললুম "আমি ভাই কিছুই জানিনে তো !...."

বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমায় শুইয়ে দিলে। সকলে বললে ট্রেনে আসার দরুন আর গরমে শরীর কী রকম খারাপ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। আমি জানি মাথা ঘুরে পড়ি আমি যাইনি, লাফ আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছিলুম—তবে ঠিক যে সময়টাতে আমি লাফ দিয়েচি সে-সময়ের কথাটা আমি অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারলুম না।

বিছানায় শুয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলুম। পাশ ফিরতে হঠাৎ যেন কী একটা শক্ত জিনিস বুকের কাছে ঠেকল। পকেটে হাত দিয়ে দেখি—সুধীরের সেই মেডেলটা।

আশ্চর্য, এটার কথা এতক্ষণ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম ! বৃন্দাবনকে সেটা দেখালুম। ওদের বাড়ির সকলে মেডেলটা হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে।

রাত্তিরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। আমার বাড়িতে কেউ নেই বর্তমানে, একাই থাকি এক ঘরে। একটা জিনিস লক্ষ করচি ; যখন থেকে বৃন্দাবনের বাড়ি থেকে বার হয়ে পথে পা দিয়েছি, তখন থেকে কেমন এক ধরনের ভয় করচে আমার ! বাড়িতে যখন ঢুকলুম, তখন ভয়টা যেন বাড়ল। একা ঘরে কতবার এর আগে শুয়েচি—এমন ভয় হয়নি মনে কোনো দিন।...না, শরীরটা সত্যিই খারাপ। শরীর খারাপ থাকলে মনও দুর্বল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার শিয়রের কাছে একটা বড় জানলা—জানলা দিয়ে বাড়ির পেছনের বন-বাগান চোখে পড়ে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে—কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর জ্যোৎস্না। হাওয়া আসবে বলে জানলা খুলে রেখেচি। কতক্ষণ ঘুম হয়েছিল জানি নে, ঘণ্টাখানেকের বেশি হবে না—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হতে লাগল আমার শিয়রের দিকের জানলায় কে দাঁড়িয়ে ! যেন মাথা তুলে সেদিকে চেয়ে দেখলেই তাকে দেখা যাবে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় হল। অথচ কিসের যে ভয় জানিনে। এমন ভয় যে, কিছুতেই শিয়রের জানলার দিকে তাকাতে পারলুম না। চোখে না দেখতেও আমার বেশ মনে হল, জানলার গরাদেতে দুটো হাত রেখে কে দাঁড়িয়ে আছে—জ্বলন্ত চোখে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েচে—আমি ওদিকে চাইলেই দেখতে পাব।

প্রাণপণে চোখ বুজে শুয়ে রইলুম,—কিছুতেই চাইব না। ঘুমুবার চেষ্টা করলুম,—কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও কি ইঁদুর পচেছে? কিসের পচা গন্ধ? যেন আয়োডিন, লিন্ট, মলম প্রভৃতি উগ্র গন্ধের সঙ্গে পচা ক্ষতের গন্ধ মেশানো ! এতকাল বাড়িতে থাকা নেই, যার ওপর বাড়িঘর পরিষ্কার রাখার ভার, সে কিছুই দেখাশোনা করে না বোঝা গেল।

কে যেন আমার মনের ভেতর বলচে, "চেয়ে দ্যাখো, তোমার মাথার শিয়রের জানলার দিকে চেয়ে দ্যাখো না।"

ঘরের চারিধারে কিসের যেন একটা প্রভাব—কোনো অমঙ্গলজনক, হিংস্র, উগ্র, অশান্ত

ধরনের ব্যাপারটা,—ঠিক বলে বোঝানো যায় না। আমি যেন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সে এমন বিপদ, যা আমাকে মরণের দোর পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে—এমন কি সে-দোরের চৌকাঠ পার করে অন্ধকার মৃত্যুপুরীর হিমশীতল নীরবতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতেও পারে !....

...আমি চাইব না...কিছুতেই চাইব না শিয়রের জানলার দিকে।

কিন্তু যে-প্রভাবই হোক, আমার ঘরের মধ্যে, দেওয়ালের এ-পিঠে তার অধিকার নেই। বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষেরা বাস্তু শালগ্রামের অর্চনা করেচেন এ-ঘরে...এর মধ্যে কারো কিছু খাটবে না। আমার মনই আবার এ-কথাগুলি যেন বললে ! অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে মন কৃত কথা কয় !

জানলার ধারে কী যেন একটা শব্দ হল !

অদ্ভুত ধরনের শব্দটা। কে যেন জানলার গরাদের ওপর টোকা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইচে !....একবার, দুবার, তিনবার....ভয়ে আমার বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে লাগল..কাউকে ডাকব চিৎকার করে?...একবার চেয়ে দেখব জানলার দিকে জিনিসটা কী? হঠাৎ আমার মনে পড়ল একটা ধাড়ি বেঁজি অনেকদিন থেকে বাইরের দেওয়ালে, কড়িকাঠের খোলে বাসা বেঁধে আছে..আজ বিকেলেও সেটাকে একবার দেখেচি। জানলার ওপরকার কাঠে সেটা পোকামাকড় বা জোনাকি ধরছে...এ তারই শব্দ।

কথাটা মনে হতেই মনের মধ্যে সাহস আবার ফিরে এল।...উঁঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন !....শরীর অসুস্থ থাকলে কত সামান্য কারণ থেকে ভয় পায় মানুষ ! পাশ ফিরে এবার ঘুমুবার চেষ্টা করলুম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু আমার এ ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না! এ-ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই গেল না যে, আজ রাত্রে আমি একা নাই—আরও কে এখানেই আছে! নিদ্রাহীন চোখে সে আমার ওপর খরদৃষ্টি দিয়ে পাহারা রেখেচে—আমায় সে নিরাপদে বিশ্রাম করতে দেবে না আজ।....

বার বার ঘুম আসে, আবার তন্দ্রা ছুটে যায়, অমনি জেগে উঠি ; কিন্তু চোখ চাইতে, বা বিছানার ওপর উঠে বসতে সাহস হয় না...আর সেই শব্দটা মাঝে মাঝে জানলার গরাদের ওপর হতে শুনি--খুব মৃদু করাঘাতের শব্দ যেন !....যেন শব্দটা বলচে—"চেয়ে দ্যাখো....পেছন ফিরে জানলার দিকে চেয়ে দ্যাখো..."

ঘামে দেখি বিছানা ভেসে গিয়েচে, ভাদ্রের গুমট গরম কিনা ! এই অবস্থায় ভোর হল। দিনের আলো ফুটলে, লোকজনের শব্দ কানে যেতে রাত্রের ভয়টা মন থেকে কোথায় গেল মিলিয়ে ! নিশ্চিন্ত মনে বেলা ন'টা পর্যন্ত ঘুম দিলুম। তার পর উঠে, চা খেয়ে পাড়ায় বেড়াতে বার হওয়া গেল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল—তখন আমি তার বিশেষ কোন মূল্য দিই নি—কিন্তু পরে সব কথা মনে মনে আলোচনা করে দেখে সেটা ভারি আশ্চর্য বলেই মনে হয়েছিল। ও-পাড়ার পথে আমার সেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা, তাঁকে দেখাবার জন্যে আমি মেডেলটা কাল রাত্রে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলুম—কিন্তু বৃন্দাবনের বাড়িতে নিমন্ত্রণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি....

আমায় দেখে তিনি বললেন, "এই যে সুরেন, ভাল আছ? কাল তুমি এসেচ দেখলুম, তখন অনেক রাত, তা আর ডাকলুম না। বোধহয় বৃন্দাবনের বাড়ি থেকে ফিরছিলে? আমি তখন ছাদে পায়চারি করচি, যে গরম গিয়েচে বাবা কাল রাত্তিরে....তোমার সঙ্গে লোক রয়েচে দেখে আরও ডাকলুম না। ও লোকটি কে? খুব লম্বা বটে—যেন শিখ কি পাঞ্জাবির মতো লম্বা—তোমার বন্ধু বুঝি? বাঙালির মধ্যে এমন চেহারা—বেশ, বেশ !"

আমি অবাক হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললুম, "আমার সঙ্গে লম্বা লোক কাল রাত্তিরে ! সে কী জ্যাঠামশায়?"

জ্যাঠামশায় আমার চেয়েও অবাক হয়ে বললেন, "তোমার সঙ্গে লোক ছিল না বলচ? একা যাচ্ছিলে? আমার চোখের দৃষ্টি একেবারে কি এত খারাপ হয়ে যাবে বাবা...."

আমি হেসে বললুম, "তাই হবে, জ্যাঠামশায়। চোখে কী রকম ঝাপসা দেখে থাকবেন। বয়েস হয়েচে তো?...আমার সঙ্গে কেউ ছিল না, তা ছাড়া আপনাদের বাড়ির সামনের আমগাছটার ছায়া...কী রকম আলো-আঁধার দেখেচেন চোখে...অমন ভুল হয়।"

জ্যাঠামশায় যেন রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন, "কী আশ্চর্য কাণ্ড ! এতটা ভুল হবে চোখে? আমগাছের এদিকে যখন তুমি টর্চ জ্বাললে, তখন দেখলুম তুমি আর তোমার পেছনে একজন লম্বা মতো লোক....তার পর তুমি টর্চ নিবিয়ে আমগাছের ছায়ার মধ্যে ঢুকলে, তখনও জ্যোৎস্নার আলো আর আমগাছের ছায়ার অন্ধকারে আমি বেশ দেখতে পেলুম লোকটি তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছে...তোমার মাথার চেয়েও যেন এক হাত লম্বা..তোমার একেবারে ঠিক পেছনে...তবে খুব ভাল তো দেখতে পেলুম না..অতদূর থেকে আর আলো-অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না তো ! এমনকি একবার এ-পর্যন্ত মনে হল তোমায় ডেকে জিজ্ঞেস করি তোমার বন্ধুটি কে।...একেবারে এত ভুল হবে চোখের?"

জ্যাঠামশায়কে পুনরায় বুঝিয়ে বললুম, আমার সঙ্গে কাল কেউ ছিল না। আমি একাই ছিলুম, সুতরাং তাঁর দৃষ্টিশক্তির গোলমাল ছাড়া এ-ব্যাপারে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না।

সারাদিন বৃন্দাবনের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটানো গেল। গতকাল রাত্রে ভয়ের ব্যাপার দিনের আলোয় এত হাস্যকর বলে আমার নিজের কাছেই মনে হল যে, বৃন্দাবনকে সে কথাটা বলিও নি।

রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরব। বৃন্দাবনের বাড়ি থেকে চা খেয়ে বাড়ি এসে সুটকেসটা নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েচি, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ নেমেচে। বাউরিপাড়ার বড় বাগানটার মধ্যে দিয়ে আসচি...বাগানটা পার হতে প্রায় পাঁচ-ছ মিনিট লাগে—যতো বড় বাগান।

বাগানের ঠিক মাঝামাঝি এসে হঠাৎ পেছন ফিরে চাইলুম কী ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আচমকা ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঠ হয়ে গেল।

কে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে?

রাস্তা থেকে একটু পাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে আধো-অন্ধকারে এক অদ্ভুত মূর্তি ! খুব লম্বা, তার মাথায় ঘোড়ার বালামচির সেই এক লম্বা ধরনের টুপি, পাতলা লোহার চেন দিয়ে থুতনির সঙ্গে বাঁধা—ছবিতে গোরা সৈনিকদের মাথায় যে-ধরনের টুপি দেখা যায়।....মূর্তিটা যেন নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ! আমার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ কি তারও কম দূরে ! মরিয়ার মতো আর একটু এগিয়ে গেলুম। এই ভয়ানক কৌতূহল আমাকে চরিতার্থ করতেই হবে যেন ! মূর্তি নড়ে না—যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি। কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখচি সাত-আট গজ মাত্র দূরে তখন মূর্তিটা। আর ঘোড়ার বালামচির লম্বা টুপি ও ইস্পাতের চেনের স্ট্র্যাপ্ স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

আমার পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, সারা দেহ কেমন অবশ হয়ে আসছে, মাথাটা

হঠাৎ বড় হালকা হয়ে গিয়েচে! বোধহয় আর আধ মিনিট এভাবে থাকলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতুম—কারণ সেই ভীষণ মূর্তিটার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে—আমার পা দুটো বেজায় ভারি হয়েচে—নাড়বার উপায় নেই মূর্তির সামনে থেকে....

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাউরিবাগানের পথে লণ্ঠন নিয়ে কারা ঢুকল। দু-তিনজন লোকের গলার শব্দ শুনে আমার সাহস ফিরে এল। আমি ওদের ডাক দিলুম চিৎকার করে। ওরা ছুটে এল। আমায় ওখানে বনের মধ্যে দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বললে, "ওখানে কী বাবু? কী হয়েচে?"

তারপর লণ্ঠন তুলে ওরা আমার মুখ দেখে বললে, "ও, আপনি? কী হয়েচে আপনার? মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে—ভয়টয় পেলেন নাকি? বাউরিবাগান জায়গাটা ভাল না। সন্ধের পর এখানে অনেকে ভয় পায়।"

ওদের লণ্ঠনটা যখন উঁচু করে তুলে ধরলে আমার মুখে, সেই আলোয় দেখলুম—সামনের মূর্তিটা তখনও সেখানে ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে! একজন বললে, "কি দেখছিলেন ওখানে দাঁড়িয়ে বাবু—এই যাঁড়াগাছটা?"

আর একজন বললে, "গাছটার ডালপালা কেটে মাথায় ঝোপের মতো করে রেখেছে। যেন মানুষ বলে অন্ধকারে ভুল হয় বটে...চলে আসুন বাবু!"

আমিও দেখলুম যাঁড়াগাছই বটে। মাথার দিকের পাতাগুলো ছেঁটে গাছটাকে দেখতে হয়েচে ঠিক হর্সগার্ডস্‌দের ঘোড়ার বালামচির টুপি! লোকের চোখের কি ভুলই হয়? কাল আমি আবার জ্যাঠামশায়কে চশমা নিতে বলছিলুম! ভেবে লজ্জা হল মনে মনে। তিনি বৃদ্ধ লোক, তাঁর চোখের ভুল তো হতেই পারে—আমারই যখন এই অবস্থা!

ওরা আমায় আলো ধরে স্টেশনে পৌঁছে দিলে।

পরের দিন স্কুলে সুধীরের মেডেলটা ফেরত দিলুম।

সুধীর বললে, "আপনাকে দাদু একবার ডেকেচেন, আমার সঙ্গে ছুটির পর আমাদের বাড়ি আসুন। নিয়ে যেতে বলেচেন।"

সুধীরের দাদু বললেন, "যাক, আমার বড় ভয় হয়েছিল, মাস্টারবাবু! সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটা নিয়ে গিয়েছেন দেশে শুনলাম কিনা? আপনার দেশের ঠিকানা জানতুম না—তা হলে একটা তার করে দিতুম!...ও-মেডেলটা আমার বাবাকে একজন গোরা সৈন্য দিয়ে যায়—আমি তখন জন্মাইনি। বাঁধা দিয়েছিল আর উদ্ধার করতে পারে নি। বেজায় মাতাল আর গোঁয়ার ছিল লোকটা। ও-মেডেলের বিপদ হচ্ছে—আমাদের বংশের লোক ছাড়া অন্য কেউ নিলে তার বড় বিপদ ঘটে। আমার এক ভগ্নীপতি একবার কিছুতেই শুনলে না—অনেককাল আগের কথা—বাড়ি নিয়ে গেল মেডেল দেখাতে; সেই দিনই সন্ধের সময় ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। মৃতদেহের পকেট থেকে মেডেলটা বেরুল।...."

আমি কলের পুতুলের মতো শুধু বললুম, "ছাদ থেকে?...পকেটে মেডেল পাওয়া গেল?..."

"হ্যাঁ, মাস্টারবাবু। আমার নিজের ভগ্নীপতি, মিথ্যে কথা তো বলব না। আজ সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা।...ওটা আরও দু-একজন নিয়েচে—তক্ষুনি ফেরত দিয়ে গিয়েচে। বলে রাতে ভয় পায়, গা ছমছম করে। কে যেন পেছনে ফলো করচে বলে মনে হয়! ও বাইরের লোকের সহ্য হয় না। প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়।..তাই ভাবছিলুম একটা তার করে দেব..."

একটা কথা বলা দরকার। মাসখানেক পরে আমি আবার দেশে যাই। বাউরিবাগানে ঢুকে যেখানে সে-রাত্রে ভয় পেয়েছিলুম, সেদিকে চেয়ে দেখে সে যাঁড়াগাছটা কোথাও আমার চোখে পড়ল না। যে-আমগাছটার ধারে যাঁড়াগাছটা দেখেছিলুম, সেখানে দিনমানে বেশ ভাল করে দেখেছি—কোথাও সে যাঁড়াগাছ নেই—বা গাছ কেটে নিলে যে-গুঁড়িটি থাকবে, তারও কোনো চিহ্ন নেই। কস্মিনকালে সেখানে একটা বড় যাঁড়াগাছ ছিল বলে মনেও হয় না জায়গাটা দেখে।....

মসলাভূত

বড়বাজারের মসলাপোস্তায় দুপুরের বাজার সবে আরম্ভ হয়েচে। হাজারি বিশ্বাস প্রকাণ্ড ভুঁড়িটি নিয়ে দিব্যি আরামে তার মসলার দোকানে বসে আছে। বাজার একটু মন্দা। অনেক দোকানেই বেচা-কেনা একেবারে নেই বললেই চলে, তবে বিদেশি খদ্দেরের ভিড় একটু বেশি। হাজারির দোকানে লোকজন অপেক্ষাকৃত কম। ডান হাতে তালপাতার পাখার বাতাস টানতে টানতে হাজারি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কার পরিচিত গলার স্বর শুনে সে চমকে উঠল।

—"বলি ও বিশ্বেস,—বিশ্বেস মশাই!—" বার দুই হাঁক ছেড়ে যতীন ভদ্র তার ডান-হাতের লাঠিটা একটা কোণে রেখে দিয়ে সম্মুখের খালি টুলটার উপর ধপাস করে বসল।

যতীন হাজারি বিশ্বাসের সমবয়স্ক—অনেক দিনের বন্ধু। ভাগ্যলক্ষ্মী এতকাল তার ওপর অপ্রসন্ন ছিল। হালে সে হাজারির পরামর্শে মসলার বাজারে দালালি আরম্ভ করেচে। দু'পয়সা পাচ্ছেও সে। যতীনের মোটা গলার কড়া আওয়াজ পেয়ে হাজারি খুব আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে বসল। হাজারি বিলক্ষণ জানত যে, যতীন যখনই আসে কোনো একটা দাঁও বিষয়ে পাকাপাকি খবর না নিয়ে সে আসে না। তাই সে যতীনকে খুবই খাতির করে।

যতীন বললে, "দ্যাখো, শুধু দোকানদার হয়ে খদ্দেরের আশায় রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকলে তাতে আর টাকা আসে না—ঘুমই আসে। পাঁচটা খবরাখবর রাখতে হয়, বুঝলে?"

হাজারি বললে, "এসো এসো, যতীন। ভাল আছ? অনেক দিন দেখি নি। কিছু খবর আছে নাকি?"

'সেই খবর দিতেই তো আসা। এ-বাজারে শুধু গণেশের পায়ে মাথা ঠুকলেই টাকা করা যায় না—। অনেক হদিশ জানতে হয়—অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে টাকা, বুঝলে?...এখন কী দেবে বলো। জানই তো যতীন ভদ্র বকে একটু বেশি, কিন্তু খবর যা আনে তা একদম পাকা। যাক, এখন আসল কথা তোমায় যা বলি বেশ মন দিয়ে শোনো...."

যতীন অতঃপর হাজারিকে কাছে বসিয়ে চুপিচুপি তার কথাটা বলে গেল। যতীনের কথায় টাকার গন্ধ পেয়ে হাজারি কান খাড়া করে এমনি একাগ্রভাবে শুনে যেতে লাগল, যে, সত্যনারায়ণের পাঁচালিও লোকে অতটা মন দিয়ে শোনে না।

ব্যাপারটি এই।—

গ্রেহাম ট্রেডিং কোম্পানির একটা মস্ত মাল-জাহাজ এস. এস. রেঙ্গুন, ডাচ্ ইস্ট

ইন্ডিজের কোনো এক বন্দর থেকে প্রচুর মাল নিয়ে কলকাতায় আসছিল। যতরকম মাল বোঝাই ছিল, তার মধ্যে মসলার বস্তাই সবচেয়ে বেশি। লঙ্কা, হলুদ, জিরে, তেজপাতা প্রভৃতি কত রকমের মসলা! প্রতিটি বস্তা ওজনে আড়াই মণের কম নয়। এরকম শত শত বস্তার গাদায় জাহাজখানা আগাগোড়া ঠাসা। সেই মালজাহাজখানি গঙ্গার ভেতরে ঢুকতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে শেষরাত্রির ভাঁটার মুখে গঙ্গার চোরাবালির চরায় ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। জাহাজ যখন সবে ডায়মন্ড হারবার পেরিয়ে গঙ্গায় এসেচে—তখন এই ব্যাপার। সারেং শত চেষ্টা করেও কিছুতে সামাল দিতে পারলে না। জাহাজডুবির সঙ্গে কতক লোকও জলে ডুবে মারা যায়। জাহাজের কতক মাল নষ্ট হয়ে যায় আর বাদবাকি মাল সব গঙ্গার জলে ভাসতে থাকে। মসলার বস্তাগুলো প্রায়ই ডোবেনি—বিশেষ ক্ষতিও হয়নি। দূর থেকে এ মসলাবস্তার গাদাগুলো ভেসে যেতে দেখে পোর্টকমিশনারের লোকেরা সেসব তুলে পারে টেনে নেয়। কাল সাড়ে আটটার সময় নিলাম ডেকে সেই বস্তাবন্দি মসলাগুলো বিক্রি করা হবে।

ধড়িবাজ হাজারি বিশ্বাস যতীনের কথাবার্তা শুনে চট করে সব বুঝে নিলে। কত লোককে চরিয়ে কত পাকা ধানে মই দিয়ে তবে সে আজ এত টাকার মালিক। কথাবার্তা তখনই সব ঠিক হয়ে গেল। যাবার সময় যতীন আবার হাজারিকে বেশ করে মনে করিয়ে দিয়ে বললে, "দেখো ভায়া! টাকা যদি পিটতে চাও তবে এ-সুযোগ কিছুতেই ছাড়া নয়। জলের দামে মাল বিকিয়ে যাচ্ছে। কাল সকাল সাড়ে আটটায় নিলেম। আমি সাতটার সময়েই এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।"

পরদিন হাজারি যতীনকে নিয়ে যথাসময়ে খিদিরপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। নিলামের জায়গায় পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই, দূর থেকে কলরব শোনা যাচ্ছে। যতীন আগে আগে চলেচে—হাজারি পেছনে পেছনে ছুটচে। এতবড় সস্তার কিস্তিটা ফসকে না যায়! হাজারি যতীনকে বরাবর নিলামের কাছে বস্তাগুলো গুনতি করতে পাঠিয়ে দিয়েই নিজে সটান এক দৌড়ে সাহেবের কাছে গিয়ে মস্ত বড় এক সেলাম করলে। সাহেবের সঙ্গে দুমিনিট ফিসফাস করে কী কথাবার্তা বলে হাজারি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে নিলামের ডাক বন্ধ করে দিলে।

যতীন বললে, "কী খবর ভায়া—সুবিধে করতে পেরেছ তো?"

হাজারি খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললে, "পরে বলব। কাজ হাসিল। এখন কত বস্তা গুনলে বলো দেখি?"

"একশো বস্তা গোনা হয়ে গেছে।"

বাস্তবিক, উঁচু উঁচু গাদা-করা মসলার বস্তাগুলোর দিকে চেয়ে হাজারির চোখ জুড়িয়ে গেল। সে যেদিকেই তাকায়, দেখে যে অগুনতি বস্তা সারবন্দি খামের মতো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঃ, এমন দাঁও জীবনে কারো ভাগ্যে একবার বই দুবার আসে না! এখন মসলাপোস্তায় কোনোরকমে তার গুদোমে এগুলো চালান দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

"আর দেরি নয়"—হাজারি যতীনকে তাড়া দিয়ে ডেকে বললে, "ওহে ভায়া, শুভ কাজে আর বিলম্ব কেন? এখন লরি ডেকে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করে পোস্তায় চালান দিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ এগিয়ে যাই।"

একেবারে সব মাল লরিতে ধরল না। দ্বিতীয় ক্ষেপ বস্তা চাপিয়ে যতীন যখন পোস্তায় ফিরে গেল তখনও বিকেল আছে। সে এসে দেখে, সবই অব্যবস্থা। রাশীকৃত বস্তার গাদা হাজারির দোকানের সামনে ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাত্র তিনটি লোক এতগুলো মাল তোলবার জন্যে লাগানো হয়েচে। চতুর্দিকে লোকের মহা ভিড়—হৈ হৈ ব্যাপার! এদিকে

পুলিশ তাড়া দিচ্ছে—"জলদি মাল হটাও!" হাজারি কেবল চেঁচাচ্ছে। সে যেন কিছুই গোছগাছ করে উঠতে পারছে না।

কাণ্ডকারখানা দেখে যতীন নিজেই কোমর বেঁধে লেগে গেল। প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পূর্বেই সব মাল তোলা হয়ে গেল। বস্তাগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে দেখা গেল ঘরে আর কুলোয় না। তখন বস্তার ওপর বস্তা চাপিয়ে দিয়ে কড়িকাঠ পর্যন্ত মাল ঠাসা হল। গম্বুজের মতো এক-একটা ফুলো ফুলো বস্তা, আর বস্তাগুলো উঁচুও কি কম! এইভাবে বস্তা ভরাট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যতীন আর হাজারি যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত দশটা। সে-রাত্রে গুদামে তালা লাগিয়ে দিয়ে প্রতিদিনের মত হাজারির চাকর বাইরে শুয়ে রইল।

শেষরাত্রে মসলার গুদোমে কী একটা শব্দ শুনতে পেয়ে আশেপাশে দোকানদারদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা চোরের আশঙ্কা করে চাকরটাকে ডেকে তুললে। চাকরটা শশব্যস্ত হয়ে আলো জ্বেলে বেশ পরখ করে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। কিন্তু চোর ঘরে ঢুকল কী করে? গুদোমের দরজার তালাবন্ধ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদে আবার দুম্ দুম্ শব্দ! সকলে কান খাড়া করে রইল। বেশ মনে হল এবারকার শব্দটা যেন হাজারির মসলার গুদোমের ভেতর থেকেই আসচে। অথচ ঘরের দোর-জানলা বন্ধ, বাইরে থেকে মোটা তালা দেওয়া। কী আশ্চর্য, চোর ভেতরে যাবেই-বা কী করে? আর চোরটোর যদি না এল তবে শব্দও-বা করে কে? মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, ঘরের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার জন্যে কারা ভেতর-দরজায় ধাক্কা মারচে। শেষরাতের বাকি সময়টা এইভাবেই শব্দ শুনে কেটে গেল। আরও আশ্চর্য, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুদোমঘর থেকে শব্দও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সে-রাত্রি এই পর্যন্ত।

পরদিন সকালে মসলাপট্টির দোকানদারদের মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে হাজারির দোকানে বিষম কাণ্ড, ভীষণ চুরি! আসলে সত্যি যা নয় তার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মিথ্যে রটাতে লাগল। ক্রমে কথাটা হাজারির কানে উঠল। হাজারি বিশ্বাস খবর পাওয়ামাত্র দৌড়ে এসে তালা খুলে গুদোমে ঢুকে দেখে বস্তাগুলো ঠিকই আছে, একটি মালও বেহাত হয়নি। কী ব্যাপার? তখন সে ভাবলে কিছু নয়; তার মসলা-বস্তাগুলো দেখে যাদের চোখ টাটিয়েছিল—এ নিশ্চয়ই সেই বদমাশদের মিথ্যে কারসাজি; তারাই মজা দেখবার জন্যে চুরির গুজব রটিয়েচে, কিন্তু হরে চাকরটাও যে বললে, ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছিল? এই শব্দ-রহস্যটা হাজারি কিছুতেই কিনারা করতে পারলে না। চোর যদি এসেই থাকবে, তবে কিছু নিলেও না, উপরন্তু শব্দ করে জানান দিয়ে চলে গেল—এ কী ব্যাপার? তবে কি তাকে ভয় দেখাবার জন্যেই রাত্রিবেলা দুর্বৃত্তেরা এইসব আয়োজন করচ? সাতপাঁচ ভেবে হাজারি সেদিনকার মতো কথাটা চেপে গেল, ভাবলে আজ রাতে আর বাড়ি না গিয়ে নিজেই দোকান পাহারা দেবে!

করলেও তাই। রাত্রে ঘুমোবার আগে হাজারি বেশ করে চাকরটাকে নিয়ে গুদোমের উপর থেকে আরম্ভ করে নিচে পর্যন্ত পাতিপাতি প্রত্যেকটি বস্তার গাদা দেখতে লাগল। তারপর ভেতর থেকে জানলাটা খুলে রেখে ঘরে তালা লাগিয়ে দিল। তবে, আজ একটা নয়—হবসের চার লিভারের দুটো মস্ত ভারী তালা। হাজারি চাকরটাকে নিয়ে ঘরের সামনে শুয়ে নানা কথাবার্তার পর যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন রাত দুপুর।

শেষরাত্রের দিকে কী একটা শব্দ হতেই হাজারির ঘুম ভেঙে গেল। হরে চাকরটা আগেই একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। গত রাত্রের ব্যাপারও তার বেশ মনে আছে। তাই সে নিজে

আর কোনো কথা না বলে চুপ করেই পড়ে ছিল। কিন্তু খানিক বাদেই ও আবার কিসের শব্দ? ধপাস্—ধুপ্—দম্—দুম্—দাম্! ঘরের ভেতর বস্তায় বস্তায় কী বিষম ধস্তা-ধস্তি! যেন দৈত্য-দানবে লড়াই বেধেচে। হরে আর হাজারি তখন ধড়মড় করে এক লাফে বিছানা ছেড়ে আলো জ্বালিয়ে দেখতে লাগল তালা ঠিক আছে কি না। তালা দুটো ঠিকই আছে। হাজারি জানলার ফাঁকে চোখ তাকিয়ে দেখতে পেলে—দুটো প্রকাণ্ড বস্তা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ঢুঁ মারছে। ভয়ে হাজারির চোখ দুটো ডাগর হয়ে উঠে। বস্তা জীবন্ত হয়ে উঠল নাকি? না, সে চোখে ভুল দেখছে? না, অনিদ্রায় আর দুর্ভাবনায় তার মাথার ঠিক নেই? হাজারি ভয়ে ভয়ে খানিকটা চোখ বুজে রইল।

হাজারি চোখ যখন খুললে তখন ভোরের আলো জানলার গরাদ দিয়ে স্পষ্ট দেখা দিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-টব্দও সব থেমে গিয়েচে। হরে অমনি বলে উঠলো, "বাবু, সেদিনও দেখেচি—ভোর হতেই শব্দ থেমে যায়।" হাজারি আর দ্বিরুক্তি না করে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখলে কোথাও কিছু নেই। মালপত্র ঠিকই আছে, তবে কালকের থেকে আজ তফাত এই যে বস্তাগুলো যেটি যে জায়গায় দাঁড় করানো ছিল, সেটি ঠিক সেখানে নেই। প্রত্যেক বস্তাই যেন সরে সরে তফাত হয়ে গেছে। একটা বস্তা আর একটার ঘাড়ে কাত হয়ে পড়েচে। বিশেষ করে পেছন দিকের কতকগুলো বস্তা হাগুল-বাগুল অবস্থায় পড়ে রয়েচে!—হাজারি মহা ভাবনায় পড়ে গেল। চোরই যদি হয় তবে শব্দের সৃষ্টিপাত কেন? আর চোর ঢোকেই-বা কোথা থেকে? আর বেরিয়েই-বা যায় কেমন করে? অসম্ভব! তবে কি জাহাজডুবির লোকগুলো ডুবে মরে ভূত হয়ে মসলাবস্তায় যে যার ঢুকে বসে আছে?

লাটের মাল কিনে অবধি দুরাত্রি তো এই ভাবে কাটাল। আজ তৃতীয় রাত্রি। হাজারির রোখ অসম্ভব বেড়ে গেলে। আজ সে মরিয়া হয়ে দুজন লোক নিয়ে সারা রাত্রি গুদামের বাইরে জেগে বসে রইল। হাতের কাছে যাকেই সে পাবে, কিছুতেই আজ আর তাকে আস্ত রাখবে না। তার এই অভীষ্টসিদ্ধি করার জন্যে দিনমানেই সে খুব ঘুমিয়ে নিয়েচে—পাছে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। টং টং টং টং—পাশের ঘরের ঘড়িতে চারটে বেজে গেল। হাজারির চোখের পাতা পড়ে না। সে ঠায় জেগে আছে। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু হঠাৎ এ কী কাণ্ড! শত শত লোক একত্র খুব দম দিয়ে নিশ্বাস টেনে ছেড়ে দিলে যেমন একটা ঝড়ের মতো সাঁই সাঁই করে শব্দ হয়—অবিকল তেমনি একটা শব্দ শোনা গেল।

হাজারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েই একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল। দরজার দোরগোড়ায় যে-দুটো লোক শুয়ে ছিল, হাজারি চট্ করে তাদের জাগিয়ে দিয়ে বললে, "তোরা শিগ্‌গির ঘরের পেছনটায় দৌড়ে গিয়ে দেখ দেখি—চোরেরা সেখানে কোনো সিঁধ কেটেচে নাকি।" তারপর হাজারি গুদোমের তালা খুলে ফেললে।

কিসের সিঁধ, আর কোথায়-বা চোর! বস্তাগুলো যে সব হাই ছেড়ে সারবন্দি দাঁড়াতে লাগল! হরে চাকরটা ভয়ের সুরে বসলে, "বাবু এদিকে চেয়ে দেখুন!"—হাজারি দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে বললে, "এ্যাঁ, বলে কী? আমার মসলার বস্তারা নাচচে?" চাকর দুজন এ দৃশ্য দেখেই ভয়ে দে চম্পট।

তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড!

বস্তাগুলো সব একটির পর একটি ঠকঠক করে ঠিকরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সৈন্ধব লবণের প্রকাণ্ড জাঁদরেল গোছের বস্তাটা তো সর্বাগ্রে বেরিয়ে পড়েই সটান গঙ্গার দিকে দে ছুট। অন্য বস্তাগুলো সব সারি দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ধিনিক ধিনিক করে খানিকটা নেচে নিয়ে তারপর সামনে লাফিয়ে মার্চ করে স্ট্যান্ডরোড ট্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে চলতে লাগল।

নিলামে কেনা বস্তাগুলো দলের অগ্রণী হয়ে চলেচে, পেছনে পেছনে চলেচে সারবন্দী গুদোমের অন্য অন্য বস্তা। এইভাবে হাজারির মসলার গুদোম উজাড় হয়ে গেল!

শেষ রাত্রি। আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ। গঙ্গার জলে মেটে জ্যোৎস্না। হাজারি বিশ্বাস একা দাঁড়িয়ে। একি সত্যি, না স্বপ্ন! নির্বাক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখচে। লোক ডেকে চেঁচিয়ে উঠবে সে শক্তিও তার লুপ্ত। সারবন্দি মসলার বস্তাগুলো গঙ্গার ধারে পৌঁছল এবং গঙ্গার উঁচু বাঁধানো পোস্তার ওপর থেকে ধপাস ধপাস করে নিচে গঙ্গার জলে দিলে ডুব। এইভাবে পরপর সমস্ত বস্তা একে একে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল! এবারেও আগে ডুবল নিলামের বস্তাগুলো—তারপর গুদোমের অন্য অন্য বস্তা।

এক রাত্রির মধ্যে হাজারি বিলক্ষণ নিঃস্ব হয়ে গেল।

এই ঘটনা শোনার পর হাজারির প্রতিবেশী দোকানদারেরা সকলেই বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে একবাক্যে বললে, "হুঁ, হুঁ, আমরা অনেক আগেই জানতুম। ভরা অমাবস্যায় জাহাজডুবি! আর সেই লাটের মাল কিনলে কিপ্টে হাজারি বিশ্বেস! ভাগ্যিস বুদ্ধি করে আমরা ঘেঁষিনি! এ-মাল কিনলে আমাদেরও কি রক্ষা থাকত!"

বামা

আমার যখন বাইশ চব্বিশ বছর বয়স তখন নানা দেশ বেড়ানোর একটা কাজ জুটে গেল আমার অদৃষ্টে। তখন আমি দৈব ঔষধের মাদুলি বিক্রি করে বেড়াতুম। চুঁচড়োর শচীশ কবিরাজের তরফ থেকে মাইনে ও রাহাখরচ পেতুম। অল্প বয়সের প্রথম চাকরি, খুব উৎসাহের সঙ্গেই করতুম।

আমাকে কাপড়চোপড় পরতে হত সাধু ও সাত্ত্বিক বামুনের মতো। ওটা ছিল ব্যবসায়ের অঙ্গ। গিরিমাটির রঙে ছোপানো কাপড় পরনে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় মালা, হাতে থাকত একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তারই মধ্যে মাদুলি ও অন্যান্য ওষুধ থাকত।

বছর তিনেক সেই চাকরি করি,তারপর শরীরে সইল না বলে ছেড়ে দিলুম।

একবার যাচ্ছি বর্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর বলে একটা গ্রামে। এটা মাদুলি বিক্রির জন্যে নয়; মাখমপুরে শচীশ কবিরাজের শ্বশুরের বাড়ি। সেখানকার জমিজমার ওয়ারিশান দাঁড়িয়েছিলেন শচীশবাবু—শ্বশুরের ছেলেপুলে না থাকায়। আমাকে পাঠিয়েছিলেন পৌষ-কিস্তির সময় জমিজমার খাজনা যতটা পারি আদায় করে আনতে।

কিন্তু তা হলেও পরনে আমার গেরুয়া কাপড়, হাতে মাদুলি ও ওষুধভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি সবই ছিল, যদি পথেঘাটে কিছু বিক্রি হয়ে যায়, কমিশনটা তো আমি পাব!

কখনও ও-অঞ্চলে যাইনি। মেমারি স্টেশনে নেমে বেলা দুটোর সময়ে হাঁটচি তো হেঁটেই চলেচি, পথ আর ফুরোয় না। এক জায়গায় একটা ছোট বাজার পড়ল, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পথ হাঁটি।

গ্রামে গ্রামে ওষুধ বিক্রি করে বেশ কিছু রোজগারও করা গেল, দেরিও হল বিশেষ করে সেইজন্যে। আর একটা বাজার পড়ল। সেখানে দোকানদারদের কাছে শুনলুম, আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে অন্তত রাত ন'টা বাজবে। কিন্তু সকলেই বললে, "সন্ধের পরে আগে গিয়ে আর পথ হাঁটবেন না, ঠাকুরমশায়। এইসব দেশে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বড় ভয়, বিদেশি দেখলে মেরেধরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রায়ই বনের ধারে বড় বড় মাঠের মধ্যে ঘাপটি মেরে

বসে থাকে। সাবধান, একটা দিঘি পড়বে মাঠের মধ্যে ক্রোশ তিনেক দূরে, জায়গাটা ভাল নয়....”

বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, এমন সময় দূরে একটা তালগাছ-ঘেরা দিঘি দেখা গেল বটে। আমার বুক টিপটিপ করে উঠল। দিঘির ওপাশে সঞ্জয়পুর বলে এক'টা গ্রাম, সেখানেই রাত্রের জন্যে আশ্রয় নেওয়ার কথা বাজারে বলে দিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা তো হয়ে গেল তালদিঘির এদিকেই—অন্ধকার হবার দেরি নেই, কোথায়-বা সঞ্জয়পুর, কোথায়-বা কী?

মনে ভারি ভয় হল। কি করি এখন? সঙ্গে মাদুলি ও ওষুধ বিক্রির দরুন অনেক টাকা। পরক্ষণেই ভাবলাম, কিছু না পারি, দৌড়তে তো পারব? না হয় ব্যাগটই যাবে,—প্রাণ তো বাঁচবে।

ভয়ে ভয়ে দিঘির কাছাকাছি তো এলুম। বড় সেকেলে দিঘি, খুব উঁচু পাড়, পাড়ের দুধারে বড় বড় তালগাছের সারি। তার ধার দিয়েই রাস্তা। দিঘির পাড়ে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই। যে ভয় করেছিলুম, দেখলুম সবই ভুয়ো। মানুষ মিথ্যে যে কেন এরকম ভয় দেখায়!

প্রকাণ্ড দিঘিটার পাড় যেমন ঘুরে তালবনের সারি ওদিঘির উঁচু পাড়কে পেছনে ফেলেচি, সামনেই দেখি ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরে একটা গ্রাম লি-লি করছে—নিশ্চয় ওটা সেই সঞ্জয়পুর।....বাঁচা গেল বাবা! কী ভয়টাই দেখিয়েছিল লোকে! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাছেই লোকের বসতি, গাঁয়ের গরু-বাছুর চরছে মাঠে—কেন এসব জায়গার বিপদ থাকবে?

আমি এইরকম ভাবচি, এমন সময় তালপুকুরের ওদিকের পাড়ের আড়ালে যে-পথটা, সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। বৃদ্ধ বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এই বয়সেও মাংসপেশী বেশ সবল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোট একটা লাঠি।

বৃদ্ধ আমায় বললে, “ঠাকুরমশায় কোথায় যাবেন?”

“যাব মাখমপুর....”

“মাখমপুর! সে যে এখনও তিন ক্রোশ পথ...কাদের বাড়ি যাবেন?”

“শচীশ কবিরাজের বাড়ি।”

“ঠাকুরমশায় কি কবিরাজমশায়ের গোমস্তা?”

“গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে।”

“এ-অঞ্চলে কাউকে চেনেন?...মশাইয়ের নিজের বাড়ি কোথায়?”

“আমি এদিকে কখনও আসিনি, কাউকে চিনিও নে। মাখমপুরেও নুতন যাচ্ছি....”

“সেখানেও কেউ তা হলে আপনাকে চেনে না?”

“নাঃ, কে চিনবে?”

আমার এই কথায়, আমার যেন মনে হল বুড়ো একটু কী ভাবলে, তারপর আমায় বললে, “কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি...রাত্রে আজ দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন। আমরা জাতে বারুই, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবান্না করে খাবেন...আসুন দয়া করে....”

আমি বৃদ্ধের কথায় ভারি সন্তুষ্ট হলুম। সত্যিই তো, সেকালের লোকেরা অন্য ধরনের শিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করেই এদের তৃপ্তি। বৃদ্ধ এই প্রস্তাব না করলে রাঢ়-অঞ্চলের অজানা মেঠো পথ বেয়ে এই সুমুখ-আঁধার রাতে আমার যেতেই তো হত মাখমপুরে, তিন ক্রোশ হেঁটে।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড় মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ি। বৃদ্ধের নাম নফরচন্দ্র দাস। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উঠতেই একটা কুকুর ঘেউঘেউ করে উঠল।

কুকুরের এই ডাকটা আমার ভাল লাগল না; এর আমি কোনো কারণ দিতে পারব না,—কিন্তু এই কুকুরের চিৎকারে যেন একটা ছন্নছাড়া অমঙ্গলজনক অর্থ আছে—মঙ্গলসন্ধ্যায় কোনো গৃহস্থবাড়িতে আসি নি, যেন শ্মশানভূমিতে এসেচি....

বৃদ্ধের বাড়ি দেখে মনে হল বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ির উঠোনে সারি সারি তিনটে বড় বড় ধানের গোলা—গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে প্রায় কুড়ি বাইশটা। অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড় বড় আটচালার ঘর। বাইরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে আর একখানা কুঠরি।

আমার কথাটা ভাল করে বুঝতে গেলে এই কুঠরিটার কথা আর একটু ভাল করে শুনতে হবে। কুঠরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটা কামরাও বলা যায়, কারণ একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছন দিকের সঙ্গে সংলগ্ন; অথচ দোর বন্ধ করে দিলে বাইরের বাড়ির সঙ্গে এর সম্পর্ক চলে গিয়ে এটা ভেতরবাড়ির একখানা ঘরের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমায় বাসা দেওয়া হল এই কুঠরিতে। কুঠরির একপাশে ছোট একটা চালা। সেখানে আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়েচে। হাত-মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে আমি বিশ্রাম করচি।

গৃহস্বামী এসে বললে, “ঠাকুরমশায় রান্না চাপান, আর রাত করেন কেন?”

আমি রান্নাচালায় বসে রান্না চড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি একটি বাড়ির বৌ ভেতর থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে এসে আমার রান্নাচালার সামনে দিয়ে ঢুকল ও ঝাঁট দিতে লাগল।

কুঠরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে সেখান থেকে কুঠরিটার ভেতর দেখা যায়। আমি দু-একবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম বৌটি ঝাঁট দিতে দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। দুতিন বার বেশ ভাল করে লক্ষ করে মনে হল বৌটি ইচ্ছে করেই আমার দিকে অমন করে চাইচে।

আমি দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলুম। ব্যাপার কী? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লির গৃহস্থ-বধূ—এমন ব্যবহার তো ভাল নয়! কী হাঙ্গামায় আবার পড়ে যাব রে বাবা! কর্তাকে কাছে বসিয়ে রাঁধতে রাঁধতে গল্প করব নাকি?

এমন সময় বৌটি ঝাঁট শেষ করে চলে গেল। কিন্তু বোধহয় পাঁচ মিনিট পরেই আবার এল। দেখে মনে হল সে যেন খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এবারও সে কুঠরির মধ্যে ঢুকে এটা-ওটা সরাতে লাগল এবং আমার দিকে চাইতে লাগল, তারপর হঠাৎ রান্নাচালার দরজায় এসে চকিতদৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে আরও সরে এল এবং নিচু সুরে বললে, “ঠাকুরমশায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে”—বলেই চট করে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

শুনে তো আর আমি নেই! হাতের খুন্তি হাতেই রইল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—আর সারা হাত-পা অবশ ও ঝিমঝিম করতে লাগল। বলে কী! দিব্যি গেরস্তবাড়ি, গোলাপালা, ঘরদোর—ডাকাত কী রকম?

কিন্তু পালাবই-বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েচে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ বসে লোকজনের সঙ্গে কথা কইচে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো সন্দেহ করবে!

কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচি একেবারে—হাতে-পায়ে জোর নেই, কিছু ভাববারও

শক্তি লোপ পেয়েচে। মিনিট পাঁচেক এমনিভাবে কাটল—এমন সময়ে দেখি সেই বৌটি আবার কী একটা কাজে কুঠরির মধ্যে ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি কথা বলবার পূর্বেই আমি বললুম, "তুমি যে হও, তুমি পরম দয়াময়ী—বলে দাও কোন পথে কী ভাবে পালাব...."

বৌটি চাপা গলায় বললে, "সেইজন্যেই এলুম। সব দেখে এলুম। পালাবার পথ নেই—ওরা ঘাঁটি আগলে রেখেচে...."

আমি বললুম, "তবে উপায়?"

মেয়েটি বললে, "একটিমাত্র উপায় অছে। তাও আমি ভেবে এসেচি। আমি এ-বাড়িতে আর ব্রহ্মহত্যা হতে দেব না—অনেক সহ্য করেচি, আর করব না—দাঁড়ান ঠাকুরমশায়, আর একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।"

মিনিট পাঁচেক পরে বৌটি আবার এল, চকিত দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে বললে, "শুনুন, আমার উপায়—এই কথা কটা মনে রাখুন। মনে যদি রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারব।—আমার নাম বামা, আমি এ-বাড়ির মেজবৌ, আমার বাপের বাড়ির গ্রামের নাম কুসুমপুর, জেলা বর্ধমান, থানা রায়না—আমার বাপের নাম হরিদাস মজুমদার, জ্যাঠামশায়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার, আমরা দুই বোন, আমার দিদির নাম ক্ষান্তমণি, বিয়ে হয়েচে সামন্তপুর-তেওটা, বর্ধমান জেলা। শ্বশুরের নাম দুর্লভ দাস—সবাই জাতে বারুই। আমার বাবা, জ্যাঠামশায় সব বেঁচে আছেন, কিন্তু মা নেই—"

আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেতে বসেচে—যা বলে মেয়েটি তা-ই করে যাই। এতে কী হবে? বৌটি কিন্তু এক-একবার বাড়ির মধ্যে যায়, আবার অল্প দুমিনিটের জন্যে ফিরে এসে আমায় তালিম দিয়ে যায়—"মনে আছে তো? জ্যাঠামশায়ের নাম কী?"

আমি বললুম, "হরিদাস মজুমদার...."

"না—না, পাঁচকড়ি মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার..আমার দিদির নাম কি? শ্বশুরবাড়ি কোন গাঁয়ে...."

"ক্ষান্তমণি। শ্বশুর বাড়ি হল—শ্বশুরবাড়ি...."

"আপনি সব মাটি করলেন দেখচি! নামন্তপুর-তেওটা, বলুন...."

"সামন্তপুর-তেওটা—শ্বশুরের নাম রামযদু দাস—দুর্লভরাম দাস...."

অবশেষে মিনিট দশ-বারোর মধ্যে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এসেচে।

বৌটি বললে, "রান্না-খাওয়া করে নিন ঠাকুরমশায়, কোনো ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ির নাম-ধাম যখন জানা হয়ে গেছে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেচি। এখন শুনুন—খাওয়াদাওয়ার পরেই শ্বশুরমশায়ের কাছে আমার বাপের বাড়ির পরিচয় দিয়ে বলবেন—আপনি তাদের গুরুবংশ, আমার নাম বলে জিগ্যেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েচে কোথায়, জান নাকি? গলা যেন না কাঁপে, কোনরকম সন্দেহ যেন না হয়....আমি চললুম, আবার আসব আপনি শ্বশুরকে বলবার পরে; কিন্তু দেরি করবেন না বেশি, বিপদ কখন হয় বলা তো যায় না।

রান্না-খাওয়া শেষ না করলেও তো সন্দেহ করতে পারে। রান্না-খাওয়া করতেই হল। রাত্রের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে এসেচে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহারাদির পর নিজের কুঠুরিতে বসেচি, আর আমার মনে হচ্ছে এ-বাড়ির সবাই যেন খাঁড়ায়, রাম-দাতে শান দিচ্ছে, আমার গলাটি কাটবার জন্যে।

এই সময় গৃহস্বামী স্বয়ং আমার জন্যে পান নিয়ে এল। বললে, "কি ঠাকুরমশায়, আহারাদি হল? এখন দিব্যি করে শুয়ে পড়ুন। মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; রাত হয়েচে, আর দেরি করবেন না...."

আমি বললুম, "হ্যাঁ, একটি কথা বলি...আমাদের এক মন্ত্রশিষ্য, বাড়ি কুসুমপুর, থানা রায়না, নাম পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম বামা—এদিকেই কোথায় বিয়ে হয়েচে। তারাও জাতে তোমাদের বাবুই কিনা—তাই হয়তো চিনলেও চিনতে পারো। মেয়েটির জ্যাঠা দুর্লভরাম—ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিল মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি খোঁজ করে একবার সেখানে যেতে....তা যখন এলুমই এদেশে...."

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ কেমন যেন হয়ে গেল, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, "কুসুমপুরের হরিদাস মজুমদার? বামা?...আপনি তাদের চিনলেন কি করে?"

বামার কথা স্মরণ করে গলা না কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে বললুম, "আমি যে তাদের গুরুবংশ—আমার বাবার ওরা মন্ত্রশিষ্য কিনা!"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, "বসুন, আমি আসচি...."

আমি একটা কুঠরির মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনও কিছু যায়নি। আর এরা যে গুরুদেবকেই রেহাই দেবে তা কে বলেচে?

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এল; পেছনে পেছনে সেই বধূটি, আর একজন ষণ্ডামার্ক গোছের যুবক এবং একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক—সম্ভবত বৃদ্ধের স্ত্রী।

বৃদ্ধ বললে, "ওই যে বামা, ঠাকুরমশায়। আমারই মেজছেলের সঙ্গে...এই আমার মেজছেলে শম্ভু...গড় কর সব, গড় কর...মেজবৌমা, দ্যাখো তো চিনতে পারো এঁকে?

চমৎকার অভিনেত্রী বটে বামা! অদ্ভুত অভিনয় করে গেল বটে।

ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে গলায় আঁচল দিয়ে। জীবনদাত্রী, দয়াময়ী বামা! আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়ল।

তারপর সে রাত্রি তো কেটে গেল। খাবার জল দেবার ছুতো করে এসে বামা আমায় আশ্বাস দিয়ে গেল। বললে, "বিপদ কেটে গিয়েছে; আমার চোখে না পড়লে সর্বনাশ হত, ভিটেতে ব্রহ্মহত্যে হত। অনেক হয়েছে,—এই কুঠরিতে,—এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোঁতা..."

আমার মনের অবস্থা বলবার নয়। বললুম, "পুলিশ কি গাঁয়ের লোক কিছু টের পায় না,—কিছু বলে না?"

"কে কী বলবে! এ ফাঁসুড়ে ডাকাতের গাঁ। সবাই এরকম। আগে জানলে কি বাবা এখানে বিয়ে দিতেন? বিয়ের পর সব ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। এখন আমার একটি সন্তান হয়েছে—এ-পাপভিটেয় বাস করলে তার অকল্যাণ হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কী করবে? মাথার ওপর শ্বশুরমশায় রয়েচেন—পুরনো ডাকাত, দাদারা রয়েচে....আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আর ভয় নেই...."

সকাল হল। বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরু-প্রণামী দিলে। বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম, "তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্বাদ করি চিরসুখী হও মা...."

বামার মতো বুদ্ধিমতী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়েনি। কতকাল হয়ে গেল, এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই দয়াময়ী পল্লিবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বামাচরণের গুপ্তধনপ্রাপ্তি

বামাচরণের জন্মের সময় নকীপুরের যদু চক্কোত্তি বলেছিলেন, "এ-ছেলে একদিন রাজা হবে।"

যদু চক্কোত্তি এ-অঞ্চলের মধ্যে একজন বড় জ্যোতিষী, তাঁর কথার দাম আছে। কিন্তু বামাচরণের জন্মদিনটির পরে বহু বছর কেটে গিয়েচে, রাজা হওয়া তো দূরের কথা, রাজসভার একজন ভালগোছের প্রহরী হবার লক্ষণও তো বামাচরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

অল্পবয়সে বামাচরণ তার মামার বাড়ি থেকে স্কুলে পড়ত। ফোর্থক্লাসে ওঠবার সময়ে ফেল করে সে লেখাপড়া দিলে ছেড়ে। বললে, "ছোট ছোট ছেলেরা উঠবে নিচে থেকে আমার ক্লাসে—তাদের সঙ্গে পড়তে লজ্জা করে।"

সুতরাং বামাচরণের লেখাপড়া হল না। মামারা বললে, "লেখাপড়া যদি না কর বাপু, তবে এখানে বসে বসে অন্নধ্বংস করে আর কী করবে, বাড়ি চলে যাও।"

বাড়ি এসে যখন সে বসল, তখন তার বয়েস চৌদ্দ-পনের বছর। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, সেখান থেকে চাকরির চেষ্টা করা চলে না।

এই সময়ে তার এক ভগ্নীপতি তাদের বাড়িতে এলেন কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে। তিনি পশ্চিমে কোথায় রেলে চাকরি করেন, বামাচরণকে উপদেশ দিয়ে গেলেন—টেলিগ্রাফ শিখতে। তা হলে রেলের চাকরি হবার সম্ভাবনা আছে। কলকাতা থেকে তিনি বামাচরণকে একটা টেকিকলও আনিয়ে দিয়ে গেলেন, আর টেলিগ্রাম শেখবার একখানা বই।

বামাচরণ সর্বদা গম্ভীর চালে থাকত, সমবয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিশলে তার মান যাবে। আর একটা মজা ছিল তার, সে তাদের নানারকম বৈষয়িক উপদেশ দিত।

যেমন হয়তো ছেলের দল ওদের বাড়ির সামনে কয়েতবেলের গাছে উঠে মহা হৈ-চৈ করচে, ও এসে গম্ভীর মুখে বললে, "এই সব, নাম—গাছ থেকে নাম!"

বামাচরণ বললে, "কয়েতবেল তো খাচ্ছিস, এদিকে ঘরে যে অনেকের চাল নেই, সে খোঁজ রাখিস? শুধু কয়েতবেলে কি আর পেট ভরবে? যা, হাতে দুপয়সা রোজগার হয় তার চেষ্টা করগে যা।"

বামাচরণের বিজ্ঞ ধরনের কথাবার্তার বেশ কাজ হল। পাড়াগাঁ জায়গা, সকলেরই অবস্থা অল্পবিস্তর খারাপ, প্রত্যেক ছেলেই জানে যে তার বাপ-মার অবস্থা ভাল নয়। অতএব বামাচরণের কথায় অনেকেরই মনের মধ্যে কোথায় ঘা লাগল—তারা মাথা নীচু করে যে যার বাড়ি চলে গেল।

এই সময়ে ওর ভগ্নীপতি এসে ওকে টেকিকল দিয়ে গেলেন।

গ্রামের ছেলেরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখত, বামাচরণ দিনরাত গম্ভীরমুখে ওদের বাড়ির পশ্চিমের ঘরে বসে টেকিকলটাতে টরে-টক্কা অভ্যাস করচে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, দোল নেই, রাস নেই, শনিবার-রবিবার নেই। কী সে অধ্যবসায়! দ্রোণাচার্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতে অর্জুনও বোধহয় এত অধ্যবসায়, এত মনোযোগ দেখান নি—তা তিনি মল্লভূমিতে কাঠের বিবিধ পাখি বিদ্ধ করে যতই নাম করুন গিয়ে। বছরখানেক টেলিগ্রাফ শেখবার পর বামাচরণ রেলে চাকরির চেষ্টা করলে; কিন্তু অদৃষ্টের দোষে কোথাও কিছু হল না। গাঁয়ের ছেলেদের সে বলত, "জানিস, ই-আর-আর-রেলের টি-আই সাহেব আমার দরখাস্তের জবাব দিয়েচে? তার নিজের হাতের সই আছে।"

ছেলেদের মধ্যে দু-একজন সম্ভ্রমের সঙ্গে জিগ্যেস করত, "কী লিখেছে বামারচরণ-দা?"

"লিখেছে, এখন চাকরি হবে না, পোস্ট খালি নেই। খালি হলে জানাবে। দাঁড়া..."

তারপর সে পশ্চিমের কোঠায় তার ঘর থেকে একখানা লম্বা খাম নিয়ে এসে তার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা ইংরেজি লেখা কাগজ বার করে সকলের সামনে বাতাসে দুবার উঁচু করে উড়িয়ে বলত, "এই দ্যাখো।"

কিন্তু এত করেও কিছু হল না, মাসের পর মাস গেল, টি-আই সাহেবের সে-চিঠি আর পৌঁছুল না।

হঠাৎ মেঘ-ভাঙা আকাশে একদিন চাঁদ উঠল। বামারচরণের পিতা ছিলেন সেকালের ফৌজদারি কাছারির নাজির। যখন তিনি মেহেরপুরে, সে-সময়ে বম্‌পাশ সাহেব মেহেরপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সাহেব নাজিরমহাশয়কে খুবই খাতির করত, ভাল বাসত।

বামাচরণের বাবা বৃদ্ধবয়সে পেনশনভোগী অবস্থায় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে সমবেত বৃদ্ধমণ্ডলীর কাছে চাকরিজীবনের গল্প করতে করতে বলতেন, "বম্‌পাশ সাহেবকে তো আমিই কাজ শিখিয়েছি, ছোকরা সিভিলিয়ান, নতুন বিলেত থেকে এসেছে তখন—ট্রেজারি অফিসের হিসেব রাখতে রাখতে জান বেরিয়ে যেত। আমায় বলত, 'শোনো নাজির, এ আমার পোষাবে না, গাঁজা-আফিমের হিসেব রাখতে আর ওজন করতে করতে প্রাণ বেরুল।' কত কষ্টে বুঝিয়ে সাহেবকে শান্ত করতুম।"

সে গ্রামে গবর্নমেন্টের চাকরি বামচরণের বাবা ছাড়া কেউ করেনি—সবাই হাঁ করে থাকত; পেনশনও ভোগ করচেন তিনি আজ বাইশ-তেইশ বছর কি তারও বেশি।

বামাচরণের বয়স যখন আঠারো-উনিশ বছর, তখন বামাচরণের বাবা গ্রামে বসে 'হিতবাদী' কাগজে দেখলেন বম্‌পাশ সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এসেছে।

তিনি গেলেন কলকাতায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। বম্‌পাশ সাহেবও আর ছোকরা নেই, পঞ্চাশের ওপর বয়স হয়েছে। পুরনো নাজিরকে চিনতে পারলে, জিজ্ঞেস করলে, "আমি তোমার কী উপকার করতে পারি, নাজির?"

এক কথায় বামাচরণের চাকরি ঠিক হয়ে গেল। খুলনায় সার্ভে ক্যাম্প পড়েচে, জমি জরিপ হচ্ছে। বামাচরণের বাবা একগাল হেসে সকলকে কথাটা জানালেন। বামাচরণের বাড়িতে সত্য-নারায়ণের সিন্নি দেওয়া হল।

গাঁয়ের প্রতিবেশীরা যখন প্রসাদ খাচ্ছে ভেতরের ঘরের বারান্দায় বসে, তখন বামাচরণের বাবা সবিস্তারে তাদের সামনে তাঁর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন, "সাহেব বললে, নাজির, তোমার ছেলে যদি এনট্রান্স পাস করত তবে আমি ওকে সাবডেপুটি করে দিয়ে যেতাম আজ।"

বামাচরণ চাকরি করতে গেল, সঙ্গে তার বৃদ্ধ পিতা গেলেন। কারণ বামাচরণের মা বললেন, ছেলেকে অত দূর দেশে একলা তিনি পাঠাতে পারবেন না।

আবার সেই অদৃষ্ট এসে বাধা দিলে। মাস দুইয়ের মধ্যে বামাচরণের বাবা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এলেন। শোনা গেল বামাচরণ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সেখানে নাকি থাকার কষ্ট, নদীর জল লোনা,কাছেই সুন্দরবন, সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়, জঙ্গল থেকে কাঠ ভেঙে এনে রান্না করতে হয়। সেখানে কি ওই কচি ছেলে থাকতে পারে?

বামাচরণের বাবা বললেন, "কোনো ভয় নেই। আমি আবার যাচ্ছি সাহেবের কাছে, আর একটা ভাল জায়গায় চাকরি যাতে হয়।"

কিন্তু এবার সাহেব বেজায় চটে গিয়েচে দেখা গেল, না জানিয়ে চাকরি ছেড়ে আসাতে। সাহেবের আরদালি বললে, সাহেবের এখন দেখা করবার সময় হবে না।

বামাচরণের বাবা এতটা ভাবেন নি, তিনি হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু সেই যে তাঁর মন কেমন ভেঙে গেল, এরপর আর বেশিদিন বাঁচেন নি।

ক্রমে দিন চলে গেল। বামাচরণেরও বয়স হয়ে উঠল। বাবা বেঁচে থাকতেই তার বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন, দু-একটি ছেলেপুলেও হল।

গ্রামের যেসব ছোট ছোট ছেলেদের বামাচরণ গম্ভীর মুখে উপদেশ দিয়ে বেড়াত, তাদের মধ্যে অনেকে এখন বিদেশে বেরিয়ে ভাল লেখাপড়া শিখেচে, দু-একজন ভাল চাকরিও পেয়েচে। বাপের পেন্‌সনের টাকায় সংসার একরকম চলত, বাপের মৃত্যুর পর বড় সংসার ঘাড়ে পড়াতে বামাচরণ চোখে অন্ধকার দেখলে।

নিজের ছেলেমেয়ে দু'তিনটি, এক বিধবা ভগ্নী বাড়িতে, তারও দু'তিনটি ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধা মা,—অনেকগুলি পুষ্যি খেতে, চলে কিসে এতগুলি প্রাণীর?

* * *

এইসব কথাই সে ভাবচিল আজ নদীর ধারে বড়-ভাঙনের চটকা গাছতলায় মাছ ধরতে বসে। বেলা পড়ে এসেচে, কচুরিপানার দামগুলো উজান মুখে চলেচে,—বোধহয় জোয়ার এল।

সামনের চটকা গাছটায় রোদ রাঙা হয়ে আসচে। রোজ এইখানটিতে বামাচরণ মাছ ধরতে আসে। তাদের গ্রাম থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে নদীর বড় বাঁকের মুখে, জায়গাটা চারিদিকে নির্জন।

এখন তার মনে হয় খুলনার চাকরিটা ছেড়েও এসেচে আজ চৌদ্দ-পনের বছর হবে।

হঠাৎ নদীর উঁচু পাড়ের দিকে তার নজর পড়ল,—ওটা কি?

পাড়টা সেখানে খুব উঁচু ও খাড়া—হাত ত্রিশ-চল্লিশ উঁচু সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে। পাড়ের খানিকটা ভেঙে পরেচে বোধহয় দু-একদিন হল। সেই পাড়ের গায়ে একটা বড় কলসি পাড় ভাঙার দরুন বেরিয়ে পড়েচে—অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। বাকি অর্ধেকটা মাটির মধ্যে পোঁতা।

বামাচরণের চট করে মনে পড়ে গেল, সে গ্রামের বুড়োদের মুখে শুনেচে এই বাঁকের মুখে আগে—বহুকাল আগে, খুব সমৃদ্ধ গোয়ালাদের গ্রাম ছিল, অনেক লোকের বাস ছিল। কলসিটা জমির ওপর থেকে হাত চার-পাঁচ নিচে পোঁতা অবস্থায় রয়েচে। সেকালে লোকে কলসি করে টাকা পুঁতে রেখে দিত—এ নিশ্চয়ই টাকার কলসি।

বামাচরণ এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে আর কেউ কাছাকাছি আছে কি না। স্থানটা নির্জন, অন্য লোক এদিকে আসে না। কলসিটা আর কেউ দেখেনি নিশ্চয়ই। তা ছাড়া মোটে কাল রাত্রে এই পাড় ভেঙেচে, কে আর লক্ষ করেচে একটা কানাভাঙা কলসি? কে-ই তার পর এসেচে এদিকে?

অবশ্য নৌকো থেকে দেখা পাওয়ার কথা। কিন্তু জেলে-ডিঙি এতদূরে আসে না, গাঁ থেকে ওই কদমতলা পর্যন্ত তাদের দৌড়। এতদূরে কেউ কোমড় জাল পাতে না।

বামাচরণ সেখানে আর দাঁড়ালে না, ছিপ গুটিয়ে উঠে বাড়ির দিকে রওনা হল। তাকে এখানে কেউ না দেখে ফেলে!

বাড়িতে এসে সে ভাবতে বসল। এখন সে কী করবে? আজ রাত্রেই অবশ্য কলসিটা তুলে আনতেই হবে। কিন্তু একা সে কী করে পারবে? জমির ওপর থেকে খোঁড়া অসম্ভব। যদি শাবলের ঘায়ে কলসিটা নদীগর্ভে পড়ে যায়, তা হলে স্রোতের মুখে হয়তো কোথায় ভেসে চলে যাবে, নয়তো ডুবে যাবে।

তা নয়, নিচে থেকে মই লাগিয়ে উঠতে হবে কলসি পর্যন্ত, তার পর সন্তর্পণে খুঁড়ে কলসি বার করতে হবে। তাতে অন্তত দুজন লোকের দরকার; মই নিচে থেকে একজন ধরে থাকা চাই, কলসি নামাবার সময়েও সাহায্য পাওয়া দরকার।

অনেক ভাবনাচিন্তার পরে বামাচরণ বড় ছেলে নিতাইকে সঙ্গে নেওয়া ঠিক করলে। নিতাই এই বারো বছরে পড়েছে, গ্রাম্য স্কুলে পড়ে, খেলাধুলায় খুব পটু আর সাহসীও বটে। বামাচরণ ছেলেকে বললে, "তোর মাকে বলিস নে, রাত্তিরে যাবি আমার সঙ্গে একটা জায়গায়।"

পিতাপুত্রে মই, শাবল, একগাছা শক্ত দড়ি নিয়ে রাতদুপুরের পরে নদীর ধারে চট্‌কা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

বুকের মধ্যে টিপটিপ করচে বামাচরণের, কী জানি কী হয়!

বামাচরণের ছেলে কিছুই জানে না কী ব্যাপার, বাবার কথায় সে এসেচে। কেন এসেচে তার বাবা তাকে বলেনি। কিন্তু সে জিনিসটা খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই জেলেরা কোথাও জলের ভেতর বাঁশের ঘুনিতে বড় মাছ জিইয়ে রেখেচে—সেই মাছ চুরি করতে তার বাবা তাকে সঙ্গে করে এনেচে। কিন্তু মই কী হবে?

জায়গাটা দেখেও সে অবাক হয়ে গেল। বাবাকে বললে, "বাবা, এতদূরে তো জেলেরা কোমড় ফেলে না? এ তো চটকাতলার বাঁক...."

তার বাবা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "জেলেদের সঙ্গে আমাদের কী দরকার? নে, মইটা এখানে বেশ করে লাগা..."

অতিকষ্টে বামাচরণ মই বেয়ে উপরে উঠল। নিতাই খুব অবাক হয়ে গিয়েচে—পাড়ের ওপর মই দিয়ে উঠে কী হবে, কী আছে ওখানে? সে একটু হতাশও যে না হয়েচে—এমন নয়। বড় মাছ নয়, তা হলে হয়তো বাবা কোনো ওষুধের শেকড় কি মুথোঘাসের শেকড় তুলতে এসেচে। অনেক সময় রাত্রেই ওষুধের গাছ তুলতে হয়, সে জানে।

তার ভয়ও হচ্ছিল, চারিদিকে অন্ধকার, নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে ডাঙায় ছোট ছোট ঢেউ লেগে। এখানে ভূতের উপদ্রবের কথা অনেক বলে, শ্বশান এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। নিতাইয়ের গা-টা ছমছম করে উঠল।

তার বাবা ওপরে গিয়ে পাহাড়ের গা খুঁড়তে লাগল। সে নিচে থেকে অন্ধকারে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না বাবা কী খুঁজচে। একবার সে বললে, "কী বাবা, মুথোর শেকড়?"

বামাচরণ চাপাগলায় বললে, "আঃ, চুপ কর না! মই ধরে থাক, তোর সে-কথায় দরকার কী?"

নিতাই চুপ করে রইল, কিন্তু ওষুধ খুঁড়তেও কি এত সময় লাগে? সে অন্ধকারের মধ্যে মইয়ের নিচে একা দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করছিল, বাবার ভয়ে কিছু বলতেও পারছে না।

অবশেষে অতি কষ্টে ভারী ও কালো একটা কলসি নিয়ে বামাচরণ মই থেকে নামল।

নিতাই অবাক হয়ে বললে, "কী বাবা এতে?"

"চুপ কর না, কেবল চেঁচামেচি! তোর সব কথায় কী দরকার? শাবল আর মইটা নিতে পারবি একলা?"

কেউ না দেখে এজন্যে বামাচরণ বাঁশবনের পথ দিয়ে চলল। বেশি রাত্রে গ্রামে চৌকিদার পাহারা দিতে বার হয়, কী জানি যদি সে এ-অবস্থায় হঠাৎ চৌকিদারের সামনেই পড়ে যায়!

বামাচরণের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করচে। কলসিটা বেজায় ভারী। নিশ্চয়ই কোনো ভারী জিনিসে ভর্তি! কলসির মুখটা একখানা পাথরের ছোট খুরি দিয়ে চাপা ছিল—বহুদিন মাটির মধ্যে থাকার দরুন সেটা এমন দারুণ এঁটে গিয়েচে যে অস্ত্র দিয়ে চার না দিলে খোলা যাবে না।

বাড়ি পৌঁছেই বামাচরণ বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলে। স্ত্রীকে বললে, "একটা আলো নিয়ে এসো তো!"

ওর আর বিলম্ব সইচে না। এখুনি কলসির মুখ খুলে দেখবে।

নিতাইয়ের মা একটা কাচ-ভাঙা সেকেলে হিজ্‌কসের লণ্ঠন নিয়ে উঁচু করে ধরলে। বিস্ময়ের সুরে বললে, "কলসিটাতে কী? কলসির মতো দেখতে,—ওটাকে আনলে কোথা থেকে গো?"

অধীর কৌতূহলে ও আগ্রহে বামাচরণ শাবলের এক ঘা দিয়ে কলসিটা ফাটিয়ে ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে কালো আলকাতরার মতো কী একটা দুর্গন্ধ পদার্থ মেঝেময় ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

নিতাইয়ের মা অবাক, স্বামী পাগল হয়ে গেল নাকি পয়সার দুর্ভাবনায় এতদিন পরে?

"রাতদুপুরে কিসের একটা কলসি কোথা থেকে উঠিয়ে এনে কী কাণ্ড বাধালে দ্যাখো তো!"

বামাচরণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এত কষ্ট তবে সব বৃথা! রুপোর গুঁড়োও এতটুকু নেই কলসিটাতে। কোথায় এক কলসি টাকা বা মোহর—আর তার বদলে—এগুলো কী কালো কালো? অদৃষ্ট একেই বলে।

সারারাত্রি বামাচরণের ঘুম হল না। সত্যিই তার অদৃষ্ট ভাল নয়। এমন জায়গায় পোঁতা কলসি পেয়েও তার মধ্যে থেকে বেরোয় কালো আলকাতরা! না হলে বম্‌পাশ সাহেবের দেওয়া এমন চাকরি সে ছেড়ে দিয়ে আসে? পেয়ে হারানোই তার অদৃষ্ট।

পরদিন সকালে লোকজনকে আলকাতরার মতো জিনিসটা দেখাতে কেউ কিছু বলতে পারে না। অবশেষে মামুদপুরের বাজারের বুড়ো কবিরাজমশায় দেখে বললেন, "এ পুরনো ঘি। বহুকালের পুরনো ঘি। কতটা আছে? এর দাম খুব। বিক্রি করবে? কলকাতায় বৌবাজারের সেনেদের দোকানে পেলেই নেবে।"

বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে বামাচরণ কলকাতায় এল।

বৌবাজারে সেনেদের মস্ত কবিরাজি দোকান, সারা ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কারবার। ঘি দেখে তারা বললে, 'হ্যাঁ, জিনিসটা খুবই ভাল, অন্তত দুশো বছরের পুরোন। তোমাদের ঘরে ছিল?"

বামাচরণ সংক্ষেপে কলসিপ্রাপ্তির কথা বর্ণনা করলে। তারপর দরদস্তুর চলল, ওরা সাত টাকার বেশি দর দিতে রাজি নয়, তারপর উঠল দশ টাকায়, তার বেশি কিছুতেই নয়। বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে না আনলে কিন্তু বামাচরণ দুটাকা সেরেও জিনিসটা দিয়ে ফেলত।

একজন হিন্দুস্থানি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন; তিনি উঠে

এসে বুড়ো কবিরাজকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আমি খয়রাগড়ের রাজার ম্যানেজার। আমি আপনাদের কথাবার্তা এতক্ষণ শুনছিলাম—রাজার মায়ের বয়স হয়েচে, হাঁপকাশের অসুখ। এই পুরনো ঘি কিনতেই আমি এদের দোকানে এসেছিলাম। এত বছরের পুরনো ঘি কলকাতায় কোনো দোকানে নেই। আমি আপনাদের জিনিস নেব। একশো টাকা করে সেরের দাম দেব আমি। ওজন করুন মাল।"

এ-কলসিতে মোট সাড়ে বারো সের ঘি ছিল। কিন্তু আদত কলসিটাতে বোধহয় আরও বেশি ছিল, কিন্তু সেটা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। বাকিটা ওরা নতুন কলসিতে পুরে এনেছিল।

ঘি বিক্রি করে মোট পাওয়া গেল সাড়ে বারোশো টাকা।

যদু চক্কোত্তি জ্যোতিষী ছিল বড়, সে মিথ্যে বলেনি—এখন তো বামাচরণের অনন্তকাল পড়ে রয়েচে। রাজা হওয়ার আশ্চর্যটা কী?

অরণ্যে

বেশি দিনের কথা নয়, গত ফাল্গুন মাসের কথা। দোলের ছুটিতে গালুডি বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে সিংভূম জেলার এই অঞ্চলে আমি অনেকবার গিয়েচি এবং এখানে আমার কয়েকটি বন্ধু বাড়িও করেচেন, ছুটিছাটাতে গিয়ে কিছুদিন যাপন করবার জন্যে।

গালুডি ক্ষুদ্র গ্রাম, এ থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে দূরে সব দিকেই পাহাড়ের শ্রেণী ও জঙ্গল। দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখার ওপারে সিদ্ধেশ্বর ও ধনঝরি শৈলমালা, তার ওদিকে তামাপাহাড় নামে একটি অনুচ্চ পাহাড়; এখানে কয়েক বৎসর পূর্বে একটা তামার খনি ছিল, কোম্পানি ফেল হয়ে যাওয়াতে ঘর, বাড়ি, কারখানা, চিমনি, ম্যানেজারের বাংলো সবই পড়ে আছে, মানুষজন নেই। জায়গাটার নাম রাখা মাইন্‌স্। এই নামে একটা ছোট রেলস্টেশনও আছে দেড় মাইল দূরে। রাখা মাইন্‌স্ এবং তার আশেপাশে ঘন জঙ্গল ও পাহাড়, মাঝে সাঁওতালি বন্য গ্রাম। এইসব বনে হস্তী আছে, শঙ্খচূড় সাপ আছে, ভাল্লুক তো আছেই। এই জঙ্গলে যখন-তখন চলাফেরা করা বিপজ্জনক, বন্দুক না নিয়ে কখনও যাওয়া উচিত নয়।

এই পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে একটা ভগ্নপ্রায় খড়ের বাংলোতে এক মাদ্রাজি কবিরাজ থাকতেন, তাঁর সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছিল। তাঁর মুখে গল্প শুনেচি—কিছুদিন আগে দুই বুনো হাতির লড়াই হয়েছিল পুরনো কারখানার কাছে। দুদিন ধরে লড়াই হয়, শেষকালে একটা হাতি মারা যায়। বেশি রাত্রে তাঁর বাংলোর বারান্দায় বাঘ ডাকে, সম্পূর্ণ দিনের আলো না ফুটলে তিনি কখনও বাংলোর বারান্দার দিকের দোর খোলেন না।

আমি ইতিপূর্বে অনেকবার যখন গালুডি গিয়েচি, তখন রাখা মাইন্‌স্ ও তার আশেপাশের বনে বেড়াতে গিয়েচি একা একা। একা যাওয়ার কারণ প্রথমত তো ওসব বনের মধ্যে স্বাস্থ্যান্বেষী অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত শৌখিন কলকাতার বাবুরা পায়ে হেঁটে যেতে রাজি হন না, দ্বিতীয়ত গভীর বনের মধ্যে বেড়ানোর শখও সবার থাকে না—এতে তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না অবশ্য। অনেকবার বেড়িয়ে বনের মধ্যে কিছু কিছু জায়গা পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয় তখন লোকে স্বভাবতই সেখানে একটু অসতর্ক হয়ে পড়ে। আমিও তা-ই হয়েছিলাম; ওদেশে বনে বেড়াতে হলে সাধারণত সকালের দিকে যাওয়াই নিয়ম,

বেলা দুটো-তিনটের পর অর্থাৎ পড়ন্ত বেলার দিকে বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে লোকালয়ের দিকে আসাই ভাল।

প্রথম প্রথম এ-নিয়ম খুবই মেনে এসেচি। একজন করে সাঁওতাল গাইড সঙ্গে না নিয়ে বনে যেতাম না। একবার সিদ্ধেশ্বরডুংরি বলে প্রায় পনেরো শো' ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলাম, সেবারও সঙ্গে ছিল একজন সাঁওতাল ছোকরা। পাহাড়ের ওপর অনেক উঁচুতে বুনো হাতি চারা কৈদগাছ ভেঙে দিয়েচে সেই পথপ্রদর্শক সাঁওতাল ছোকরা আমায় দেখায়। চীহড় ফল,—এক রকম বুনো সীমের মতো ফল, তার বীজ পুড়িয়ে খেতে ঠিক গোলআলুর মতো—সে-ই পুড়িয়ে খাইয়েছিল পাহাড়ের ওপরকার জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে। পাহাড়ের এক জায়গায় একটি গুহা দেখিয়ে বলেছিল, এ-গুহা এখান থেকে সুবর্ণরেখার ওপার পর্যন্ত চলে গিয়েচে।

এসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। যাঁরা ঘন অরণ্যানী, নির্জন শৈলমালার সৌন্দর্য ভালবাসেন তাঁদের এসব স্থানে আসা দরকার। বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষীণকায়া পার্বত্য নদী—হয়তো হাঁটুখানেক জল ঝিরঝির করে বইচে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে। দুধারেই জনহীন বনভূমি, কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল, ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, কত বিচিত্র বন্যপুষ্প, বন্য শেফালির বন। বারবার যাতায়াত করতে করতে ভয় ভেঙে গেল। যখন নিজের চোখে কখনও ভাল্লুক দেখলাম না, বা বুনো হাতির তাড়া সহ্য করতে হল না, তখন মনে হল অনর্থক কেন একজন গাইড নিয়ে গিয়ে পয়সা খরচ করা। যেতে হয় একাই যাব।

অর্থব্যয় ছাড়া গাইড নিয়ে ঘোরার অন্য অসুবিধাও ছিল। ধরুন, এক জায়গায় চমৎকার বন্য-পুষ্পের শোভা পাহাড়ের নীল চূড়া সুনীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, নিকটেই ক্ষুদ্র পার্বত্য ঝর্নার মৃদু কলধ্বনি, বনস্পতিদের শাখায় শাখায় বন্য পাখির কূজন,—আমার মনে হল এখানে অদূরবর্তী শিলাখণ্ডে পিয়াল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি, আপন মনে প্রকৃতির এই নিরালা রাজ্যে বসে নববিহগ-কাকলি শুনি ; কিন্তু গাইড দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে দেবে না, বলবে, "চলো বাবুজি, চলো, এখনও অনেক পথ বাকি !"—তা ছাড়া সঙ্গে লোক থাকলে মনের সে-শান্ত, সমাহিত ভাবও আসে না।

এইসব কারণে ইদানীং একাই বেড়াতে যেতাম বনের মধ্যে। কিন্তু যে-ঘটনার কথা এখানে বলব, তার পূর্বে সুবর্ণরেখার ওপারে দুতিন মাইল ছাড়া একা খুব বেশি দূরে যাই নি, বড়জোর গিয়েচি সিদ্ধেশ্বর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত। গিয়েচি, আবার বেলা পড়বার অনেক আগেই সুবর্ণরেখার তীরে ফিরে এসেচি।

দোলের ছুটিতে এবার গালুডি গিয়ে দেখি অপূর্ব নির্মেঘ নীল আকাশ। বনে বনে শাল-মঞ্জরীর সুগন্ধ, নব বসন্তে নতুন কচি-পাতা-ওঠা শাল, কেঁদ, পিয়াল, মহুয়া গাছে গাছে কুঁড়ি দেখা দিয়েচে। বসন্তের বন্যা এসেচে পাহাড়ি ঝর্নার মতো নেমে—বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র সজ্জায় বনে বনে।

একজন বৃদ্ধ সাঁওতালের মুখে শুনেছিলাম পাঁচ মাইল দূরে বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছোটখাটো জলপ্রপাত আছে—জায়গাটার নাম নিশিঝর্না। সেখানে নাকি বন আরও ঘন, পথে এক জায়গায় পুরনো আমলের একটা দেউল আছে ইত্যাদি। জায়গাটা দেখবার খুব ইচ্ছে হল। দোলের আগের দিন বেলা দশটার মধ্যে কিছু খেয়ে নিয়ে জায়গাটার উদ্দেশে বার হয়ে পড়লাম।

শীঘ্রই সুবর্ণরেখা পার হয়ে গিয়ে রাখা মাইন্‌স্‌-এর পথ ধরলাম। মুসাবনী রোড যেখানে রাখা মাইন্‌স্‌-এর চার নম্বর শ্যাফটের গভীর বনের মধ্যে গালুডির পাকা রাস্তার সঙ্গে

মিশেচে—সেখানে পৌঁছতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। তারপর বাঁধা সড়ক ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকে কুলামাড়ো বলে একটা ক্ষুদ্র বন্যগ্রাম পার হয়ে পায়ে-চলা সুঁড়িপথ ধরে জনঝরি পাহাড়ের নিচেকার ঘন বনের মধ্যে ঢুকলাম। পথ যে আমার একেবারে অপরিচিত তা নয়, আর বেশিদূর অগ্রসর না হলেও কুলামাড়ো গ্রামে সাঁওতালি উৎসবে সাঁওতালি নৃত্য দেখতে এর আগেও একবার এসেচি। সুতরাং আমার মনে দ্বিধা বা ভয় থাকবার কথা নয়, ছিলও না।

কুলামাড়ো পেছনে ফেলে চলেচি, আমার ডাইনে ধনঝরি পাহাড় সরু বন্যপথের সমান্তরালভাবে যেন বরাবর চলেচে উত্তর-দক্ষিণ কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে। বন ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে তা বেশ লক্ষ করচি। কিছুদূর গিয়ে বাঁদিক থেকেও আর একটা শৈলশ্রেণী যেন ক্রমশ সঙ্কির্ণ হয়ে আসচে। আমার জানা ছিল এই পথটা বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় ধনঝরি পাহাড় পার হয়ে ওপারে চলে গিয়ে আবার মুসাবনী রোডের সঙ্গে মিশেচে। সুতরাং মনে কোনো উদ্বেগ ছিল না। জানি, যেতে যেতে আপনা-আপনি মুসাবনী রোডে পড়বই। নিশিঝর্না কোথায় আমার জানা ছিল না ; আমি বনের মধ্যে যেতে যেতে কান খাড়া করে আছি কোথায় ঝর্নার শব্দ পাওয়া যায়। এক জায়গায় সত্যিই শব্দ পাওয়া গেল জলের, সুঁড়িপথটা ছেড়ে নিবিড়তর বনের মধ্যে ঢুকে দেখি একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী উপলরাশির উপর দিয়ে বয়ে চলেচে ; তার দুধারে এক প্রকাণ্ড বন্য গাছ—অজস্র বেগুনি রঙের ফুল ফুটে আছে। স্থানটি যেমন সুন্দর তেমনি স্নিগ্ধ, কতক্ষণ বসে রইলাম একটা শিলাখণ্ডে, উঠতে যেন ইচ্ছা করে না।

কিন্তু এই বনে থাকা তখন যে উচিত ছিল না, তা তখন বুঝিনি। প্রথমত তো বনের ওসব নিভৃত স্থানে—বিশেষ করে যেখানে জল থাকে, সেখানে বাঘ থাকা বিচিত্র নয়, দ্বিতীয়ত বেলা গেল, পথ তখনও কত বাকি সে-সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না—অথবা ধারণা থাকলেও ভুল ধারণা ছিল। যখন আবার সুঁড়িপথটায় উঠলাম তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে।

বনের এই অংশের শোভা অবর্ণনীয়। প্রথম বসন্তে কত কী বনের ফুল গাছের মাথা আলো করে রেখেচে, ধনঝরির নীল সানুদেশ এক দিকে খাড়া হয়ে উঠেচে ডাইনে, শালমঞ্জরীর সুবাসে উপত্যকার বাতাস নিবিড় হয়ে উঠেচে, বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে-গন্ধটি যেন আরও বাড়চে ; কতক্ষণ অন্যমনে চলেছি, সুঁড়িপথটাও কখন হারিয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখি আমার সামনেই ধনঝরি পাহাড়ের খুব উঁচু একটি অংশ, সেখানে পাহাড় টপকে ওপারে যাওয়ার কোনো উপায় নেই—পথও নেই। স্থানটি সম্পূর্ণ জনমানবহীন। সেই কুলামাড়ো গ্রাম ছাড়িয়ে এসে আর লোকালয় চোখে পড়েনি। বেলাও পড়েচে, একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তা ছাড়া সুঁড়িপথটাই-বা গেল কোথায়? বনের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পথ খুঁজতে গিয়ে আরও গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

এদিকে সূর্য হেলে পড়েচে। এ-বনের মধ্যে আর বেশিক্ষণ দেরি করা উচিত হবে না। ভাবলাম, আর নিশিঝর্না দেখে দরকার নেই, এবার যে-পথে এসেছি সেই পথেই ফিরি। কিন্তু কোথায় সে-পথ? ক্রমে এমন সব জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখান দিয়ে আসবার সময় আসিনি তা বেশ বুঝলাম। বনের মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়া খুব সহজ, বিশেষ করে এ ধরনের নিবিড় বনের মধ্যে। কিন্তু আমি জানি ধনঝারি উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে বিস্তৃত, বিশেষত সূর্য যখন এখনও আকাশে দেখা যাচ্ছে, তখন দিক-ভুলের সম্ভাবনা অন্তত নেই—এই একটা ভরসা ছিল মনে। কিন্তু ভরসা ভরসাই রয়ে গেল সেই পর্যন্ত, কোনো কাজে এল না। সূর্য ক্রমে পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেল। ছায়া ঘনিয়ে এল

বনে। যদিও সামনে জ্যোৎস্না রাত্রি, তবুও এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা রাত্রি কাটানোর সম্ভাবনায় বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠলাম না।

হঠাৎ মনে হল ধন্‌ঝরি পাহাড়ের ওপারেই তো মুসাবনী রোড। পাহাড়টা যদি কোনো রকমে টপকাতে পারি, এখনও রাত হয়নি, লোকালয়ে পৌঁছতে পারব। নতুবা ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে যতই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরব ততই সম্পূর্ণরূপে পথভ্রান্ত হয়ে পড়তে হবে। একটা জায়গায় মনে হল যেন ধন্‌ঝরি একটু নিচু হয়েচে। এই ধরনের নিচু খাঁজ দিয়েই আমার জানা পায়ে-চলার সুঁড়িপথটা গেছে—ঘন চুলের মধ্যে চেরা সিঁথির মতো ; পার্বত্য পথের কোনো চিহ্নই দেখছি না কোনো দিকে, তবুও এই অপেক্ষাকৃত নিচু থাক টপটে ধন্‌ঝরির ওপারে যাওয়া খুব কঠিন হবে না মনে হয়।

জুতো খুলে হাতে নিলাম। পাহাড়ের কিছুদূর উঠে গিয়ে দেখি নিচে বনের মধ্যে যত অন্ধকার ওপর ততটা নয়। জ্যোৎস্না উঠল, জ্যোৎস্না ফুটবে ভাল। প্রথম খানিকটা উঠেই মনে হল ভুল জায়গা দিয়ে পাহাড় পার হচ্ছি, এখান দিয়ে কখনও কেউ পাহাড় পার হয়নি—যেমন বড় বড় পাথরের চাঁই, তেমনি কাঁটা গাছ সর্বত্র। খালি পায়ে ধারালো পাথরের ওপর দিয়ে চলতে বিষম কষ্ট, অথচ জুতো পায়ে দেওয়াও চলে না।

পাহাড়ের ওপরে খানিকটা উঠে গেলাম দিব্যি। তার পরে এক জায়গায় গিয়ে দেখি সামনে একেবারে খাড়াই—দুরারোহ পাহাড় দেওয়ালের মতো উঠেচে। বড় বড় গাছের শেকড় ঝুলচে, যেন জলের তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে পড়েচে। আমি শিক্ষিত পর্বতারোহণকারী নই, সেই খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে ওঠা আমার পক্ষে তাই সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি একদিকে একটা মসৃণ প্রকাণ্ড শিলা আড়ভাবে শোয়ানো, সেখানা উচ্চতায় আন্দাজ কুড়ি-বাইশ হাত এবং চওড়ায় ত্রিশ-বত্রিশ হাত হবে। এ-ধরনের পাথরকে এদেশে 'রাগ' বলে। 'রাগ' পার হওয়া বিপজ্জনক, কারণ হাত-পা দিয়ে ধরবার এতে কিছু থাকে না। তবে এখানা অন্তত ৬০ ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে বলে ভরসা হল; এই একমাত্র পথে পাহাড়ের ওপরের দিকে ওঠা চলবে এখন।

জুতো যখন পায়ে নেই এক রকম করে চার হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে 'রাগ' পার হয়ে ওপরে উঠলাম। তার পরে ওঠার বিশেষ কষ্ট নেই, অর্জুন আর শুভ্র নিষ্পত্র শিরবৃক্ষের জঙ্গল, বাঁকাভাবে চাঁদের আলো এসে শিরবৃক্ষের দুধের মতো সাদা ধবধবে গুঁড়ির গায়ে পড়েচে। কারণ তখন প্রদোষের ঈষৎ অন্ধকার কেটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে। এক জায়গায় ওপর দিকে মনে হল যেন গাছে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কৌতূহল হল অত্যন্ত, আপনি-আপনি গাছে কী করে আগুন লাগবে? ওপরে উঠে গিয়ে দেখি সত্যিই এক জায়গায় একটা মোটা শেকড়ের গা দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে—তবে কী ভাবে শেকড়ে আগুন লাগল তা আজও বলতে পারি না।

তখন আমি অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়েচি, নিম্নের উপত্যকার গাছপালার মাথা কোঁকড়া-চুল কাফ্রিদের মাথার মতো দেখাচ্ছে ; চাঁদের আলো বনের নিবিড় অন্ধকার উপত্যকার মধ্যে এতটুকু ঢোকেনি, ওপর থেকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে চারিদিকে ধন্‌ঝরির বিভিন্ন চূড়ার বনরাজির মাথায় মাথায় শুভ্র ঢেউ। সে-জনমানবহীন শৈলমালার ঊর্ধ্ব সানুতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শুক্লা চতুর্দশী রাত্রির শোভা যে দেখেনি তাকে বলে বোঝানো যাবে না সে কী অপূর্ব ব্যাপার! একা যেন আমি পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কোনো দেবলোকে বিচরণশীল আত্মা ; আমার চোখের সম্মুখে যে-দৃশ্য দূর থেকে সুদূরে প্রসারিত, কোনো পার্থিব চক্ষু কোনোদিন তা দর্শন করেনি। কিন্তু সেখান দিয়ে পাহাড়

টপকাবার উপায় নেই—যতই উঠি ততই দেখি আমার চোখের সামনে অর্জুন ও শিরবৃক্ষের সাদা সাদা সোজা গুঁড়িগুলো থাকে থাকে উঠে যেন স্বর্গে উঠেচে। অর্থাৎ পাহাড়ের শিখরদেশের তখনও পর্যন্ত কোনো পাত্তাই নেই। তা ছাড়া ক্লান্তও খুব হয়ে পড়েচি। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে যেন ঢেঁকির পাড় পড়চে অতিরিক্ত শ্রমের ফলে। এই বন ভেঙে অতখানি উঠে ওপারের ঢালু দিয়ে নামতে পারব বলে মনে হল না—তার চেয়ে যে-পথে উঠেছি হাত-পা ভেঙে মরার চেয়ে নিম্ন উপত্যকায় নেমে জ্যোৎস্নার আলোয় আবার না হয় পথ খুঁজি।

বিপদ এল এতক্ষণে এই নামবার সময়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ; একেবারে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হল প্রায়। দুর্ঘটনা যখন আসে তখন এমনি অতর্কিতে আসে।

যতটা উঠেছিলাম জ্যোৎস্নার আলোতে একরকম করে নেমে এসে সেই 'রাগ'খানার কাছে পৌঁছলাম। 'রাগ' পার হয়ে নেমে গেলে উপত্যকা আর বেশি নিচে নয়।

'রাগ' বেয়েই নামতে হবে, কারণ অন্য দিকে নামবার কোনো উপায় নেই। অথচ 'রাগ' এমন মসৃণ যে হাত-পায়ে আঁকড়াবার কিছু নেই—এ-ধরনের পাথর বেয়ে ওঠা বরং সহজ, কিন্তু নামা অত্যন্ত কঠিন। তাড়াতাড়িতে আর একটা ভুল করলাম, উপুড় হয়ে না নেমে চিত হয়ে নামতে গেলাম। যা-ই হোক, খানিকটা তো নামলাম দিব্যি, তারপর পাথরখানার উপর দিকের যে-প্রান্ত হাত দিয়ে ধরেচি সেটা ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে সড় সড় করে খানিকটা নামলাম। তারপর পাথরের গায়ে এক জায়গায় একরাশ শুকনো পাতা জমে আছে, সেখানটিতে পাথরের কোনো খাঁজ আছে ভেবে পা নামিয়ে দিয়েছি, অমনি শুকনো পাতার রাস হুড়হুড় করে সরে গেল—সেই ঝোঁকে আমিও খানিকটা গড়িয়ে পড়লাম। অথচ পায়ে আটকাবার কোনো খাঁজ বা উঁচুনিচু জায়গা কিছুই পেলাম না।

তখন আমার অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠেচে। কোথাও কিছু ধরবার নেই—শ্লেটের মতো মসৃণ পাথরখানার কোনো জায়গায়। আমি চিত হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় তার ওপর শুয়ে আছি এবং আঙুল টিপে যা সামান্য কিছু ধরে আছি, সেটা ছেড়ে দিলেই নিচের দিকে গড়িয়ে পাথরের নুড়ির স্তূপের ওপর গিয়ে পড়ব। সে-পাথরের স্তূপ অন্তত ত্রিশ ফুট নিচে, তার ওপর পড়লে তীক্ষ্ণ ধারালো অসমান প্রস্তরখণ্ডে বিষম আহত হতে হবে। তারপর হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকলে এ-জনশূন্য পাহাড়ের ওপরে কে-ই-বা উদ্ধার করচে? এ অবস্থায় মৃত্যু ঘটা বিচিত্র কি?

যখন আমি বুঝলুম আমি খুব বিপদগ্রস্ত—তখন হাত-পায়ে যেন আর বল নেই। আঙুলে টিপে ধরব কী, আঙুলই অবশ হয়ে আসচে। এভাবে আর কিছুক্ষণ কাটালেই গড়িয়ে নিচে পড়ে যাব এবং সাংঘাতিক আহত হব।—তখন মনে হল ওঠবার সময় পাথরখানার এ-অংশ দিয়ে উঠিনি, কোণ ঘেঁষে উঠেছিলাম। সেখানে নিচে ছোটবড় অসমান শিলাখণ্ডের ধাপমতো ছিল, তখন দিনের আলো ছিল বলে দেখেশুনে ওঠবার সুবিধা ছিল, এখন রাত্রে বিশেষ করে ওপরের দিক থেকে নামবার সময় অতটা বুঝতে পারিনি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে চাইলাম, জলে ডোবার পূর্বমুহূর্তে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোনো আশ্রয় খোঁজে, তেমনি। হঠাৎ নজরে পড়ল হাতখানেক দূরে একটা অর্জুন গাছের মোটা শেকড় ওপরের একখানা শিলাখণ্ডের ফাটল থেকে বার হয়ে ঝুলচে। মরিয়ার মতো সাহসে ঝোঁক দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সেই শেকড়টি আঁকড়ে ধরতে গেলাম এবং ধরেও ফেললাম। এতে নিজেকে আরও বিপন্ন করেছিলাম—কারণ শেকড় হাতের নাগালে না এলে টাল খেয়ে পড়ে গিয়ে সজোরে নিচের প্রস্তররাশির উপর পড়ে চূর্ণ হয়ে যেতাম—ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়লে হয়তো চোট খেয়ে বেঁচে যেতাম, এতে কিন্তু বাঁচবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না।

'রাগ' থেকে শেকড় ধরে নেমে এসে সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঝাল বেরুচ্ছে বলে মনে হল!—নিশ্চিত দুর্ঘটনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে যেমন হয় মানুষের। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করে নিয়ে হাত-পায়ের অবশ ভাবটা কাটিয়ে আবার নামতে আরম্ভ করলাম এবং পনেরো মিনিটের মধ্যেই ঝনঝরির উপত্যকার সমতলভূমিতে পা দিলাম।

তখন আমার মনে সাহস বেড়ে গিয়েচে। গুরুতর দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সমতলভূমিতে কোনো বিপদই আর আমার কাছে বিপদ নয়। তখন রাত আন্দাজ দশটা হবে মনে হল। জ্যোৎস্না খুব ফুটেচে, বনের মধ্যে আগের মতো অত অন্ধকার নেই। প্রথমে সেই পার্বত্য নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম তার জলের কলধ্বনি শুনে। জল পান করে ও মাথায় মুখে জল দিয়ে শরীর ও মন সুস্থ হল। মনে তখন ভয় বা উদ্বেগ আদৌ নেই। সুতরাং ধীর মস্তিষ্ক নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সেই সুঁড়িপথটা প্রায় আধঘন্টা পরে বার করলাম।

কুলামাড়ে যখন এসে পৌঁছেচি তখন রাত বারোটার কম নয়। গ্রাম নিষুতি হয়ে গেছে বহুক্ষণ; আমায় দেখে গ্রাম্য কুকুরের দল মহা ঘেউঘেউ শুরু করলে। একটা ঘরের দাওয়ায় লোকেরা শুয়েছিল, কুকুরের ডাক শুনে তারা জাগল। আমায় দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় বনের মধ্যে যেতে দেখেছিল দুপুরের পরে—বললে, "খুব বেঁচে গিয়েছিস বাবু। শঙ্খচূড় সাপের সামনে পড়লে আর বাঁচতিস না। ধনঝরির বনে বড্ড শঙ্খচূড় সাপের ভয়।"

রাতটা সে-গ্রামে কাটিয়ে সকালের দিকে সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডিতে ফিরে এলাম।

গঙ্গাধরের বিপদ

অনেকদিন আগেকার কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সে-সময় মসলাপোস্তায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোটখাটো মসলার দোকান।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলি জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেক দিনের দোকান, যে-সময়ের কথা বলচি গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভাল যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগত প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কী লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। দোকানঘরের ভাড়া দুমাসের বাকি, মহাজনদের দেনা ঘাড়ে-দুপুরবেলা দোকানে বসে খেলো হুঁকো হাতে নিয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধের সময় গোমস্তা ভাড়া নিতে আসবে বলে শাসিয়ে গিয়েচে। কী বলা যায় তাকে।

এক পুরনো পরিচিত মহাজনের কথা মনে পড়ে গেল্। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারি মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েচে, শোধও করেচে, কিন্তু সুদের হার বড় বেশি বলে ইদানীং বছর কয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায়নি!

ভেবেচিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হল। সুদ বেশি বলে আর উপায় কী? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধের মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে দেরি হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হনহন করে হেঁটে আসচে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বললে, "এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা...."

সন্ধে হয়ে গিয়েচে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো গাছপালার

বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েচে টাকা! গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হল এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এল। ওই গাছগুলোর তলায়—সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েচে, মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। পরনে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নিচু করে হিন্দিতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বললে, "বাবু, সস্তায় মাল কিনবেন?"

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বললে, "কী মাল?"

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বললে, "এখানে কথা হবে না বাবু, পুলিশ ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন..."

ঝুপসি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বললে, 'জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট মাল—লুকিয়ে দেব।"

গঙ্গাধর চমকে উঠল।

সে কখনও ও ব্যবসা করেনি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কী সর্বনেশে জিনিস! ভাল লোকের পাল্লায় সে পড়েচে! না—সে কিনবে না!

লোকটা সম্ভবত পাঞ্জাবি মুসলমান। বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। অনুনয়ের সুরে বলে, 'বাবু, আপনি নিন! আপনার ভাল হবে। সিকি কড়িতে দেব....আমার মুশকিল হয়েচে আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিশের ভয় তো আছে! কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে; সেই হয়েচে আরও মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিশের ভয় হল যে কেন বাবু তা বুঝিনে। আগে যারা এ-ব্যবসা করত, তাদের কাছে যাচ্ছি, তারা আমার দিকে চেয়েও দেখচে না।....আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন, পরে দরদস্তুর হবে...."

লোকটার গলার সুরে একটা কী শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজল। কোকেনের ব্যবসাতে মানুষ রাতারাতি বড়লোক হয়েচে বটে! বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে এই ভয়ে বেশি জোরে ডাকতেও পারলে না। চাপা গলায় বাঙালি-হিন্দিতে ডাকলে, "কোথায় গিয়া, ও খাঁসাহেব?"

এদিকে-ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁসাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বললে, "জলদি চলে, অনেক দূর যানে হোগা।"

কী একটা যেন ঢাকবার জন্যে লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে। "আমার সঙ্গে এসো, মাল দেখাব।"

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেক দূরে গেল। যে-সময়ের কথা বলচি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকো কাদার ওপর পড়ে আছে, দু-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদাকাটার বন, পেছনে অনেক দূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁসাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বললে, "আমায় দেখতে পাচ্ছ তো?..."

"কেন পাব না? এমন বয়েস এখনও হয়নি যে এই সন্ধেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে

না।"

এবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে, "তোমার ডের কোথায়, খাঁসাহেব?"

লোকটা চকিতে পেছনে ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কেন, সে তোমার কী দরকার? পুলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাক যদি, তবে ভাল হবে না জেনো। মাল দেব, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে,—আমার বাসার খোঁজে তোমার কী কাজ?"

লোকটার চোখের চাউনি অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করল; খুব ভাল দেখা যায় না, কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠল। না, তার সঙ্গে টাকা রয়েচে—এ-অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধেবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েচে। লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বিশেষত, সে যে ভয় পেয়েচে এটা না-দেখানোই ভাল। দেখালে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না। ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূর গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে গুদামঘরের আশেপাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়; সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হল গুদামঘরটা পুরনো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে জায়গায় জায়গায়, চালের খোলা উড়ে গিয়েচে মাঝে মাঝে, সামনের দোরটা উই-ধরা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন।....

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হল। কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায় একা মানুষে আসে, বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে করে? সে আসত না কখনওই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙাল দেশ থেকে নতুন আসেনি। ওই লোকটির কথার সুরে কী জাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সে ছাড়ায়। এ-কথা এখন তার মনে হল।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁসাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের, যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুল। কোথাও যে চলে গিয়েছিল এমন মনে হয় না। পাকা আর ঝুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁসাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকল। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে আসতে বললে তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিমঝিম করচে, বুক টিপটিপ করচে। এই অন্ধকার গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও-লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জানত যে তার কাছে টাকা আছে, অনুসন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের দলের লোক কি না! গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে, দৌড়ে পালাবে? কিন্তু সে বুড়োমানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবি মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মতো গঙ্গাধর গুদামঘরের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য! গুদামের ওদিকের দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা! গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক

জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকে-মুখে লাগে। একটা কী রকম ভ্যাপসা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেজেটা স্যাঁসসেঁতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকেনি।

এদিকে আবার খাঁসাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ....মিনিট দুই হবে, কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা...আবার সেই ভয়টা হল। কোন এক ধরনের ভয়....কী যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই-বা কী রকম ভয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে।

মিনিট দুই পরেই খাঁসাহেব—এই তো আধো-অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে।.....

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বললে খাঁসাহেব। বললে, "তুমি কালা নাকি? এতক্ষণ কথা বলচি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে-জায়গায় আছে বললাম, তা দেখতে পেয়েচ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বললাম পিপে দুটো। হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে কেন?"

বা রে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গিয়েছে, মূঢ়ের মতো দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই, কোথায় শাবল?"

কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁসাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ় আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁসাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা, সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়চে....সব যেন ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে...খাঁসাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করচে। কিন্তু পেরে উঠচে না....সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল...এক...দুই...তিন...চার...

আর কোথায় খাঁসাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিশিয়ে গিয়েচে...একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপটা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চিৎকার করে গুদামঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশি ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভরে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায়নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারত না।

মাস দুই পরে মেটেবুরুজে খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিয়ে গিয়ে গঙ্গাধর টাকা নিয়ে যাবার দিন কী ঘটনা ঘটেছিল সেটা বললে। খোদাদাদ খাঁ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "সাহ্‌জি, ও হল আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনেরো আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখানে থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকর সঙ্গে ষড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখত কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে খুন হয়। কে বা কেন খুন করলে জানা যায়নি, কেউ ধরা পড়েনি। তবে দলের লোকই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয় আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রি করবার জন্যে, ওর পুরনো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা।...তা বাবু, সে গুদামঘরটা

কোথায় তুমি দেখাতে পারবে?"

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেত না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়ল, পুরনো ভাঙা গুদামঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য এতদিনেও কি বোঝেনি সে মারা গিয়েচে?....কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।

রাজপুত্র

কাঞ্চীর রাজপুত্র এবার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। রাজ্যময় ধুমধাম পড়ে গেছে। কাঞ্চীর উত্তর প্রান্তে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুমন্দির। পুরোহিত গেছেন সেখানকার আশীর্বাদি নির্মাল্য আনতে, লোক পাঠানো হয়েচে প্রয়াগতীর্থ থেকে জল আনবার জন্যে। সেই জলে স্নান করিয়ে বিষ্ণুর পূজা-নির্মাল্য তাঁর কপালে ঠেকিয়ে রাজপুত্রকে পুরনারীরা বরণ করবেন।

রাজা বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করেচেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। কোশলরাজের দূত কী এক প্রস্তাব নিয়ে এসেচে, রাজা তাই আজ সারাদিন ধরে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন—শরীর ও মন দুইইবড় ক্লান্ত। এমন সময় রাজকুমার কক্ষে ঢুকে পিতাকে প্রণাম করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা বললেন, "চন্দ্রসেন, তোমার কিছু বলবার আছে?"

রাজপুত্র বিনীত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "বাবা, গত বছর যখন গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসি তখন আপনি বলেছিলেন আমায় কিছুদিন দেশভ্রমণে যাবার অনুমতি দেবেন। আপনার অসুখের জন্যে এতদিন কোনো কথা বলিনি। আমি এইবার সে-বিষয়ে অনুমতি চাই।"

মহারাজ বিস্মিতসুরে বললেন, "কী বিষয়ে অনুমতি চাই বলো!"

"আমি দেশভ্রমণে যেতে চাই বাবা।"

"তুমি জান তোমার যৌবরাজ্যের অভিষেকের সব আয়োজন করা হয়েচে।"

"সেইজন্যেই তো আরও বেশি করে যেতে চাই, বাবা। আমি কাঞ্চী ছাড়া জীবনে কখনও কিছু দেখলুম না, কিছু জানলুম না—কানে শুনেচি উত্তরে হিমবান পর্বত আছে, দক্ষিণে সমুদ্র আছে, পশ্চিমে সিন্ধুনদ আছে—কাঞ্চী ছাড়া আরও কত রাজদেশ আছে, কিন্তু উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে আমি চোখ থেকেও অন্ধ। যার জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাকে দিয়ে দেশ-শাসন কী করে হবে! আমায় যেতে দিন বাবা!"

এর দুদিন পরে রাজ্যের লোক সবিস্ময়ে শুনলে রাজকুমার চন্দ্রসেনের অভিষেক-উৎসব সম্প্রতি স্থগিত থাকল—কারণ তিনি চলেছেন বিদেশ ভ্রমণে—একা, সঙ্গে তিনি কাউকে নিতে রাজি নন।

সত্যই রাজকুমার কাউকে সঙ্গে নেননি।

আজ সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চন্দ্রসেন তাঁর প্রিয় সাদা ঘোড়াটিতে চড়ে একা পথ চলেচেন। আর সঙ্গে থাকবার মধ্যে বাঁদিকে খাপে-ঝোলানো পিতৃদত্ত তলোয়ারখানি। আর আছে চোখে অসীম তৃষ্ণা, বুকে অদম্য সাহস ও নির্ভীকতা। কাঞ্চী রাজ্যের সীমা ছাড়িয়েও দুদিনের পথ চলে এসেছেন, কত গ্রাম, মাঠ,. বন, নদী পার হয়ে চলেচেন—সবই অচেনা,

এ তাঁর নিজের রাজ্য কাঞ্চী নয়, এখানে তিনি একজন অজানা পথিকমাত্র।

তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। এক নদীর ধারে তাঁর ঘোড়া এসে পৌঁছুল তাঁকে নিয়ে। প্রাকাণ্ড নদী—বৈকালের রাঙা আলোয় ওপারের বনরেখা অপূর্ব দেখাচ্ছে। অতবড় নদী কী করে পার হবেন, রাজকুমার চিন্তায় পড়লেন। কোনোদিকে মানুষের বাসের চিহ্ন নেই—সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে ধূসর হয়ে এল। বিজন নদী—তীরের ছন্নছাড়া চেহারাটা সুমুখ-আঁধার রাতে গাঢ় ছায়ায় যেন আরও বেশি ছন্নছাড়া হয়ে ফুটে উঠল।

ওপারে বহু দূরে একটা পাহাড়—নীল চূড়া একটু একটু চোখে পড়ে। রাজকুমার চেয়ে থাকতে থাকতে পাহাড়ের ওপর থেকে আগুনের রাঙা একটা হল্‌কা হঠাৎ আকাশের পানে লকলক করে জ্বলে উঠেই দপ করে নিবে গেল। রাজপুত্র অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েই আছেন, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড বাজপক্ষী সন্ধ্যার আকাশে ডানা মেলে উজান দিক থেকে উড়ে এসে তাঁর মাথার ওপর তিন-চার বার চক্রাকারে ঘুরে কোনদিকে অদৃশ্য হল।

রাজকুমারের নির্ভীক মনও একটুখানি কেঁপে উঠল। তিনি জানতেন তাঁদের বংশে কারুর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মাথার ওপর গৃধ্রজাতীয় পাখি তিনবার ওড়ে—কেউ কেউ বলেচেন, বিশেষ করে শাকুন-শাস্ত্রবিৎ কোনো গণৎকার সেবার বলেছিলেন যে, এই গৃধ্র তাঁদের পূর্বপুরুষদের হাতে অন্যায়ভাবে অবিচারে নিহত কোনো শত্রুর আত্মা—বহুকাল ধরে সে পৈশাচিক উল্লাসের সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যায় নিজ শত্রুর বংশধরের মৃত্যুর পূর্বাভাস। কোথা থেকে আসে, কোথায় আবার উড়ে চলে যায়—কেউ বলতে পারে না।

রাতের সঙ্গে সঙ্গে এল হাড়কাঁপুনে ধারালো শীত। একটা বড় গাছও কোথাও নেই যার তলায় আশ্রয় নিতে পারেন। অবশেষে একটা মাটির টিপির পেছনে ঘোড়া থেকে নেমে রাজপুত্র নিজের আসন বিছালেন—সেখানটাতে হাওয়া বেশি লাগে না—শুকনো লতাকাঠি কুড়িয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে সে-রাত্রের মতো তিনি সেখানেই রইলেন। উপায় কী?

গভীর রাত্রে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেল। বহুদূর যেন কাদের আর্তনাদ—মৃত্যুপথের পথিকদের অন্তিম চিৎকারের মতো করুণ। রাজপুত্র নিজের অলক্ষিতে একবার শিউরে উঠলেন। শয্যার পাশের আগুন নিবে গিয়েচে, উঠে ভাল করে আগুন জ্বালালেন। সারারাত্রের মধ্যে ঘুম এল না কিন্তু।

ভোরের দিকে একটা ডিঙি পাওয়া গেল। তাতে পার হয়ে রাজকুমার ওপারে গিয়ে উঠলেন। ডিঙির মাঝি আধ-পাগল এবং বোধহয় কানে আদৌ শুনতে পায় না। রাজকুমারের প্রশ্নের কোনো উত্তর সে দিতে পারলে না।

প্রথমে একটা মরুভূমির মতো মাঠ—ঘাস, খড়, গাছপালা কিছুই নেই—কাটা-রঙের বালির পাহাড় এখানে-ওখানে। অনেক দূরে গিয়ে একটা জনপদ। কিন্তু কেমন একটা নিরানন্দ ভাব চারদিকে। পথ দিয়ে পথিক চলে না, দোকান-পসারে খদ্দের নেই, নদীর ঘাটে স্নানার্থীর দল নেই, মাঠে চাষীরা চাষ করে না—যেন কেমন একটা বিষাদ ও অমঙ্গলের ছায়া চারিদিকে।

রাজকুমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়েছিলেন। নিকটেই একটি গৃহস্থের বাড়ি। সেখানে গিয়ে আশ্রয় চাইতেই তারা খুব যত্নের সঙ্গে আশ্রয় দিলে। অনেকদিন পরে রাজকুমার ভাল খাবার খেলেন, ভাল বিছানায় বিশ্রাম করতে পেলেন, মানুষের সঙ্গ অনেক দিন পরে বড় প্রিয় মনে হল। কয়েকদিন সেখানে রয়ে গেলেন তিনি। গৃহস্থের একটি ছোট মেয়ে ও ছোট ছেলের সঙ্গে রাজকুমারের বড় ভাব হল। তারা তাঁকে ফুল তুলে মালা গেঁথে

দেয়, দুপুরে তাঁর কাছে বসে গল্প শোনে, শত আবদার প্রতিদিন তাঁকে সহ্য করতে হয়। ছোট ছেলেটির উপদ্রবের তো আর অন্ত নেই।

অল্পদিনের মধ্যে রাজকুমার সে বাড়ির সবারই তো বটেই, গ্রামেরও সকল লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন। এত সুন্দর মুখশ্রী, এমন সুন্দর কান্তি, এমন মিষ্টি স্বভাবের মানুষ তারা কখনও দেখেনি। রাজকুমারের আসল পরিচয় কেউ জানে নি। তিনি কাউকে সেসব কথা বলেনি—সবাই ভাবে তিনি একজন গৃহহীন পথিক—হয়তো তাঁর কেউ কোথাও নেই। এতে সবারই স্নেহ তাঁর ওপর আরও বেড়ে যায়, কিসে তিনি সুখে থাকবেন, কিসে আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গ প্রবাসকষ্ট তাঁর কমবে—সবারই এ-চেষ্টা।

তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এমন সুন্দর চেহারার ছেলে, নিশ্চয়ই কোনো বড় ঘরের হবে। গ্রামের যিনি মণ্ডল, তাঁর এক মেয়ে পরমাসুন্দরী—সবাই বলে ওই ছেলেই এ-মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। বিধাতা ওর জন্যেই যেন এ-দেবতার মতো সৌম্যকান্তি ছেলেটিকে কোথা থেকে জুটিয়ে এনেচেন। মণ্ডলগৃহিণীও রাজকুমারকে একদিন দূর থেকে দেখে এত পছন্দ করলেন যে, তিনি স্বামীকে জানিয়ে দিলেন—যদি ঐ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় ভালই—নইলে মেয়ে চিরকুমারী থাকুক, তাঁর আপত্তি নেই।

রাজকুমার কিন্তু কিছুতেই তেমন আমোদ পান না। তাঁর মনে কী একটা বিপদের ছায়া সকল আনন্দকে ম্লান করে রাখে। একবার ভাবেন হয়তো বাপ-মাকে অনেকদিন দেখেননি বলে এমন হয়—কিন্তু তাঁর মন বলে, তা নয়, তা নয়,—ওসব সামান্য সুখদুঃখের ব্যাপার এ নয়—এ এমন একটা কিছু, যার কারণ আরও গভীর, জীবন-মরণ নিয়ে এর কারবার।

ক্রমে এল সে-মাসের কৃষ্ণপক্ষ। রাজকুমার অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন বাড়িতে সবারই চোখে জল—গ্রামসুদ্ধ লোক সকলে বিষণ্ণ, নিরানন্দ। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলে না, কারণ জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাওয়া যায় না। সবাই কিসের ভয়ে জুজু হয়ে আছে যেন।

অবশেষে রাজকুমার কথাটা শুনলেন। এখানে এক যোজন দূরে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ওপর রাজগুরু এক কাপালিকের সাধন-পীঠ। প্রতি অমাবস্যায় সেখানে নরবলির জন্য প্রতি গ্রাম থেকে পালাক্রমে একটি তরুণবয়স্ক লোক পাঠানো চাই-ই। রাজার হুকুম। এবার এ-গ্রামের পালা।

শোনামাত্র রাজকুমার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তাঁর পিতৃদত্ত তূণের তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ফলা-পরানো যে-বাণ তা কি শুধু নিরীহ পশুপক্ষী শিকারের জন্যে?

"ক্ষতি হতে ত্রাণ করে এই সে কারণ—মহান ক্ষত্রিয় নাম বিদিত জগতে।"—অস্ত্রগুরুর সে উপদেশ রাজকুমার কি ভুলে গিয়েচেন এত শিগগির!

অমাবস্যার দিন মণ্ডলের বাড়িতে পাশার সাহায্যে নির্ধারিত হবে এবার কে গ্রাম থেকে যাবে। রাজকুমার এ-কথা শুনলেন। অমাবস্যার পূর্বদিন গভীর রাত্রের অন্ধকারে তিনি চুপিচুপি শয্যাত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন—কেউ জানে না। সকালে উঠে তাঁকে আর কেউ দেখতে পেলে না।

মণ্ডলের বাড়িতে পাশার মজলিসে যার নাম উঠল সে এক গৃহস্থের একমাত্র পুত্র। সবাই চোখের জলে ভেসে তাকে বিদায় দিলে। তার বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চলল কাপালিকের কাছে—যদি হাতে-পায়ে ধরে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে এই দুরাশায়।

গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে গিয়ে তারা যা দেখলে, তাতে তারা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। বড় জামগাছটার তলায় দুটো মৃতদেহ ঃ একটা তাদের গ্রামের সেই তরুণ অতিথির, আর একটা কাপালিকের—দেখে মনে হয় দুজনেই পরস্পকে অস্ত্রাঘাত করেচে।

দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ সবাই ছুটে এল দেখতে। যে নিজের প্রাণ দিয়ে তাদের চিরকালের জন্যে বিপদমুক্ত করে গেল—রাজার ভয়ে গোপনে চোখের জলে ভেসে তার শেষ সৎকার সম্পন্ন করলে।

রাজকুমারের সত্যিকার পরিচয় সে-দেশের লোক তখন জানে নি।

চাউল

মানভূমের টাঁড় ও জঙ্গল জায়গা। একটু দূরে বড় পাহাড়শ্রেণী, অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বসন্তকালের শেষ, পলাশ ফুলবনে আগুন লাগিয়ে দিয়েচে, নাকটিটাড়ের উঁচু ডাঙা জমি থেকে যতদূর দেখা যায়, শুধু রক্তপলাশের বন দূরে নীল শৈলমালার কোল ছুঁয়েছে।

জঙ্গল দেখতে এসেচি এদিকে, কাছেই রাস্তার ধারে পলাশবনের প্রান্তে ডাকবাংলোতে থাকি, জঙ্গলের কাঠে কেমন আয় হবে তা-ই দেখে বেড়াই। একদিন সন্ধের আগে নাকটিটাড়ের বন দেখে ফিরচি, পথের ধারে একটা হরীতকী গাছের তলায় একটি লোক ও একটি ছোট মেয়ে বসে পুঁটলি খুলে কী খাচ্ছে। জনহীন পথিপার্শ্ব, কেউ কোনোদিকে নেই—সন্ধেরও আর অল্পই বিলম্ব, সামনে বাঘমুণ্ডীর বনময় পথ, এমন সময় লোকটা কী করে জানবার আগ্রহে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মাথার চুল কিছু কিছু পাকা, কিছু কাঁচা। পুঁটুলির মধ্যে খানদুই ছেঁড়া ন্যাকড়া, একখানা কাঁথা আর কিছু মকাই—সের দুই হবে, একটা খালি চায়ের কিংবা বিস্কুটের টিন। বোধহয় সেটাই তৈজসপত্রের অভাব পূর্ণ করচে সব দিক দিয়ে। সঙ্গের মেয়েটির বয়স চার কি পাঁচ। পরনে ছোট্ট একটু ময়লা ন্যাকড়া মেয়েটার, কোমরে ঘুন্সি।

আমি বললাম, "কোথায় যাবে হে, বাড়ি কোথায়?"

লোকটি মানভূমি বাংলায় বললে, "তোড়াং হে....টুকু আগুন আছে?"

"দেশলাই? আছে, দিচ্ছি।..... তোড়াং কতদূর এখানে থেকে?"

"টুকু দূর আছে বটে। পাঁচ কোশ হবেক।"

"কোথা থেকে আসা হচ্ছে এমন সন্ধ্যাবেলা?"

"হেই সেই পুরুলিয়া থিকে।....আগুন দাও বাবু। শোরিল এক্কেবারে কাবু হয়ে গিয়েছে। হেই মেয়েটার মা মরে গেল ওর দুবছর বয়সে। ওকে রেখে জঙ্গলে কাঠের কাম করতে যাইতে পারি নাই—তাই পুরুলিয়া গেঁইছিলি। ভিক্ষা মাঙি দুবছর রইঁয়েছিলি।"

লোকটির কথাবার্তার ধরন আমাকে আকৃষ্ট করলে। ডাকবাংলোতে সন্ধ্যার সময় ফিরেই-বা কী হবে এখন? সেখানেও সঙ্গিহীন ঘর-দোর। তার চেয়ে একটু গল্প করা যাক এর সঙ্গে। কাছে একটা বড় পাথর পড়ে ছিল, সেটার ওপরে বসে ওকে একটা বিড়ি দিলাম। নিজেও একটা ধরালাম। লোকটার বাড়ি নকি পাঁচ-ছ ক্রোশ দূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র বন্য গ্রামে, বাঘমুণ্ডী ও ঝালদা শৈলমালা ও অরণ্যের মধ্যবর্তী কোনো নিভৃত ছায়াগহন উপত্যকাভূমিতে, পলাশ, মহুয়া, বট, কেঁদ গাছের তলায়। ওর আর দুটি সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার পরে এই মেয়েটি হয় এবং মেয়েটির বয়স যখন দুবছর, তখন তার মাও হল মৃত্যুপথযাত্রী। লোকটা জঙ্গলের কাঠ ভেঙে এনে চন্দনকিয়ারীর হাটে বিক্রি করত এদেশের অনেক গ্রাম্যলোকের মতো। কিন্তু ঘরে কেউ নেই দুবছরের মেয়েকে দেখবার, তাকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চ পাহাড়ে উঠে রৌদ্র ও বর্ষায় কী করে কাঠ ভাঙে? তাই ঘরে আগড় বন্ধ করে ও

চলে গিয়েছিল অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় পুলয়া শহরে।

আমি বললাম, "কাঠের কাজে আয় হত কেমন?"

লোকটা বিড়িতে টান দিয়ে বলল, "বোঝা পিছু তিন আনা, চার আনা। জঙ্গলে ছাড় লিত দুপয়সা। চাল ছত্তা ছিলি। হঁয়ে যেত পেটের ভাত দুজনার। তারপর বাবু মেয়্যাটা হোলেক, ওর মা মর‍্যা গেলেক। তখন কচি মেয়্যাটারে ফেলে জঙ্গলে যেতে মন নাই সরলেক। বলি যাই পুরুলিয়া, ভারি শহর, পেটের ভাত দুজনার হইয়ে যাবেক।"

'পুরুলিয়া বড় জায়গা?"

"ওঃ বাবু, ইধার থিকে উধার যাওয়ার কূল-কিনারা দুবছরে নাই পাইলেক। ভারি শহর বাবু..." আমি ওকে আর একটা বিড়ি দিলাম। গল্প জমে উঠেচে। বললাম,—"তারপর... ?"

তারপর পুরুলিয়া শহরে কী ভাবে গেল, তার গল্প করলে। ওদের পাশের গাঁয়ের একজন লোক পুরুলিয়া শহরে কী একটা কাজ করে, তার ঠিকানা খুজে বার করতে দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়েছে, তখন এক ভদ্রলোকের বাড়ির ফটকে মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করতে দাঁড়াল। তারা দুটি পয়সা দিলে, দুপসার ছোলা কিনে বাপ-মেয়েতে রাত কাটিয়ে দিলে গাছতলায় শুয়ে। পুলিশে আবার শুতে দেয় না ; অর্ধেক রাত্রে এসে লণ্ঠনের আলো ফেলে বলে, "হিঁয়াসে হঠ যাও !" তার পরদিন আলাপি লোকের সন্ধান মিলল। গিয়ে দেখে দেশে সে-লোকটা যত বড়াই করে, আসলে সে তত বড় নয়। সামান্য একটা দু-কামরা ঘরে সে আর তার স্ত্রী থাকে—তামাক মেখে বিক্রি করে মাথায় নিয়ে, কখনও জলের কুঁজো পাইকেরি দরে কিনে ফিরি করে খুচরো বেচে—এইসব উঞ্ছবৃত্তি। অথচ দেশে বলেছিল সে বড়সাহেবের আরদালি।

যাহোক, অনেক বলা-কওয়াতে সে জায়গা একটু দিলে—ঘরের বাইরের দাওয়ার একপাশে শুয়ে থাকতে হবে, তবে নিজের এনে খাওয়াদাওয়া, তার ভার সে নেবে না। বছর দুই সেখানেই থেকে চলেছিল যা হয় একরকম—তারপর এই অকাল পড়ল, চালের দাম চড়ল—শহরে চালের দাম হল আঠারো টাকা। ভিক্ষে আর তেমন লোকে দিতে চায় না—তাও হয়তো চলত যা হয় করে, কিন্তু যাদের বাড়িতে থাকা তারা গোলমাল করতে লাগল। তারা আর জায়গা দিতে চায় না, বলে, "আমাদের লোক আসবে, বাড়ি ছেড়ে দাও।" রোজ গোলমাল করে, তাই আজ তিন দিন শহর থেকে বেরিয়ে জন্মভূমি তোড়াং গ্রামে চলেচে।

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ খালি বিস্কুটের টিন হাতে করে বাজাচ্ছিল।

ওর দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চেয়ে লোকটা বললে, "এর নাম রৈঁখেছে থুপী।"

আমি বাপের মনে আনন্দ দেবার জন্যে বললাম, "থুপী ? বেশ নাম !"

বাপ সগর্বে বললে, "হাঁ থুপী।" তারপর আমায় বললে, "বাবু, তামাক কিনবার পয়সা দিবেন দুটি ?"

আমি পয়সা সামান্যই নিয়ে বেড়াতে বার হয়েচি, জঙ্গলের পথে পয়সা কী করব ? ওকে দুটি মাত্র পয়সা দিতে পারলাম। থুপী কী একটা বললে ওর বাবাকে, বাবা তাকে কাঁধে নিয়ে চলল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম—

রাস্তা যেখানে উঁচু হয়ে ওদিকের সব দৃশ্য ঢেকে দিয়েচে, সেখানে ওর পাঁচ বছরের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে পুঁটুলি বগলে ও চলেচে—সেদিকেই অস্তদিগন্ত ও সূর্যাস্ত, রঙিন আকাশের পটে ওর মূর্তি দেখাচ্ছে ছবির মতো, কারণ আগেই বলেছি রাস্তা উঁচু হওয়ার দরুন

সেখানে আর কিছু দেখা যায় না, রাস্তাই সেখানে চক্রবালরেখার সৃষ্টি করেচে।

মনে মনে ভাবলাম, ওর কোথাও অন্ন নেই, গৃহ নেই—পাঁচ বছরের মেয়েকে কত স্নেহে কাঁধে তুলে ও যে চলল গ্রামের দিকে, সেখানে অন্ন কি জুটবে এ দুর্দিনে,—যদি পুরুলিয়া শহরে না জুটে থাকে ? কোন বৃথা আশার আকর্ষণ ওকে নিয়ে চলেচে গ্রামের মুখে ? তার পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।....

এ হল গত মাসের কথা। তখনও চাল ছিল ষোল টাকা আঠারো টাকা মণ, ক্রমে তা-ই দাঁড়াল বত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা। এই সময় একবার কার্য উপলক্ষে বিহার থেকে আমায় যেতে হল বাংলাদেশে, পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলায়। মানুষের এমন কষ্ট কখনও চোখে দেখিনি—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হবে।

যে আত্মীয়ের বাড়ি ছিলাম তাদের বাড়িতে সন্ধ্যা থেকে কত রাতপর্যন্ত শীর্ণ বভুক্ষু, কঙ্কালসার বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় কালো হাঁড়ি উঁচু করে তুলে দেখিয়ে বলচে,—"একটু ফ্যান দিন মা, একটু ফ্যান !" অনাহারে মৃত্যুর কত মর্মন্তুদ কাহিনী শুনে এলাম সারা পথ কুমিল্লা থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত—স্টিমারে, ট্রেনে।

বিহারে এসে দেখি এখানেও তাই। বহেরাগোড়া স্কুলে বোর্ডিঙে ড্রেন দিয়ে যে ভাতের ফ্যান গড়িয়ে পড়ে তা-ই ধরে খাবার জন্যে একপাল বুভুক্ষু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাঁড়ি হাতে দুবেলা বসে থাকে—তারই জন্যে কী কাড়াকাড়ি !

হেডমাস্টার বললেন, "এই গ্রামের ডোম আর কাহারদের ছেলেদের এখানেই পড়ে আছে ভাতের ফ্যানের জন্যে—সকাল থেকে এসে জোটে আর সারাদিন থাকে, রাত ন'টা পর্যন্ত। সামান্য দুটো ভাতের জন্যে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে।"

পুরুলিয়া থেকে আদ্রা যাচ্ছি, প্ল্যাটফর্মের খাবারের দোকানে খাবার খেয়ে পাতা ফেলে দিয়েচে লোকে—তা-ই চেটে চেটে খাচ্ছে উলঙ্গ, কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলেরা—অথচ সে-পাতায় কিছুই নেই ! কী চাটছে তারাই জানে !

এই অবস্থার মধ্যে ভাদ্রমাসের শেষে আমি এলাম এমন একটা জায়গায়, যেখানে অনেক লোক খাটচে একজন বড় কন্ট্রাক্টারের অধীনে ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটানো কাজে। জঙ্গলের মধ্যে পাথর ফাটিয়ে এরা টাটায় চালান দিচ্ছে, স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে নতুন ইজারা নেওয়া পাথর খাদান।

একদিন সেখানকার ছোট্ট ডাক্তারখানার সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। ডাক্তারখানাটার সংকীর্ণ বারান্দাতে একজন কুলি শুয়ে আছে। পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—ব্যাজে ভিজে রক্ত দরদরিয়ে পড়ে সিমেণ্টের রোয়াক ভিজিয়ে দিয়েচে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েচে ?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এমন মাঝে মাঝে এক-আধটা হচ্ছেই। ব্লাস্টিং করতে গিয়ে পাথর ছুটে লেগে মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েচে। সেলাই করে দিয়েচি, এখন টাটানগর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স আসচে।"

ভিড় একটু সরিয়ে কাছে গিয়ে দেখি একটা পাঁচ-ছ' বছরের মেয়ে ওর কাছে একটু দূরে বসে—কিন্তু সে কাঁদেও না, কিছুই না—নির্বিকার ভাবে বসে একটা খড় তুলে মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে।

আমি তাকেই দেখে চিনলাম—আটমাস পূর্বে মানভূমের বন্য অঞ্চলে দৃষ্ট সেই ক্ষুদ্র বালিকা থুপী।

আহত কুলির মুখ ভাল করে দেখে চিনলাম—এ সেই থুপীর বাবা, যে সগর্বে বলেছিল,

"এর নাম রেখেচি থুপী।"

আশেপাশের দু-একজনকে জিগ্যেস করলাম, "এ কোথা থেকে এসেছিল জান?"

একজন বললে, "মানভূম জিলা থেকে আজ্ঞে!"

"কী গাঁ?"

"তোড়াং।"

"ওর কোনো আপনার লোক এখানে নেই?"

"কে থাকবেক আজ্ঞে—ওর ওই বিটি ছানাটা আছে। কত কত ধুর থিক্যা এখেনে কাজ করতে এসেচে, চাল দেয় সেইজন্যে আজ্ঞে।"

'কোম্পানি কত করে চাল দেয়?"

"হপ্তায় পাঁচ সের মাথাপিছু।"

সুতরাং থুপীর বাপের ইতিহাস আমি অনেকটা অনুমান করে নিলাম। গ্রামে গিয়ে দেখলে বাড়ি ভেঙেচুড়ে গিয়েচে, চাল মেলে না, মিললেও ওর সামর্থ্যের বাইরের জিনিস তা কেনা। মকাই ও বিরি লরাই, তারপরে বুনো কচু ও ভুঁই-কুমড়োর মূল খেয়ে যতদিন চলবার—কারণ ঠিক এই ইতিহাস আমি বিভিন্ন অঞ্চলগুলি থেকে আগত প্রত্যেক কুলির মুখেই শুনেচি—শেষে এখানে ও এসে পড়ল মজুরি, বিশেষ করে চাল পাওয়ার লোভে। পয়সা দিলেও গ্রামে আজকাল চাল মিলচে না, আমি সেদিন বহেরাগোড়া অঞ্চলে দেখে এসেচি।

অ্যাম্বুলেন্স

গাড়ি এল। ধরাধরি করে থুপীর বাবাকে গাড়িতে ওঠানো হল—সে কেবলমাত্র একবার যন্ত্রণাসূচক 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া অত আদরের অত গর্বের বস্তু থুপীর নামও করলে না, তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

ডাক্তার বললেন, "টাটা এখান থেকে সাতাশ মাইল রাস্তা। ঝাঁকুনিতেই বোধহয় মারা যাবে—বিশেষ করে রক্ত বন্ধ হল না যখন এখন।"

দুধারে শালবনের মধ্যবর্তী রাঙা মরুম মাটির সোজা রাস্তা বেয়ে অ্যাম্বুলেন্সের মোটর ছুটল থুপীর বাবাকে নিয়ে—পুনরায় অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে; পুনরায় পশ্চিমের আকাশ লক্ষ্য করে জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে। অতি সাধের অনাথা থুপীকে কার কাছে রেখে চলল সে-হিসেব নেবার অবসর তখন তার নেই।

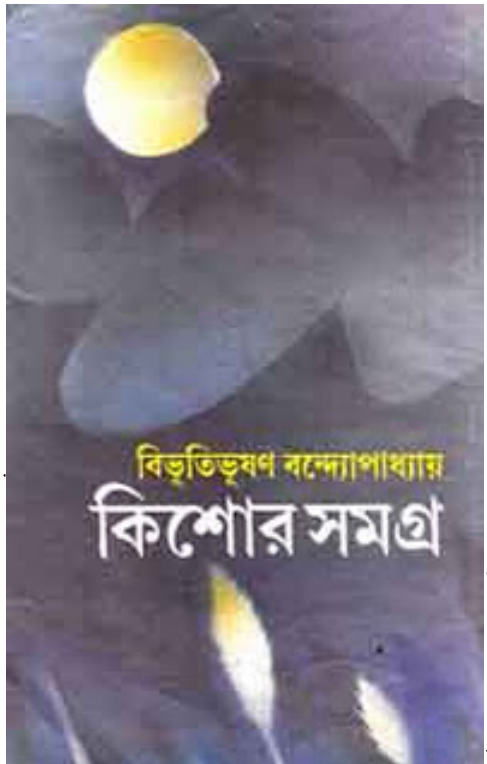

এক ॥ কুঠির মাঠ

মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝাপে ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল—ওহে হরি, ভূষণো গোয়ালার দরুন কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচ নাকি?

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল—ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা, খোকা আ-আ—পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়লে এরি মধ্যে। নাও এগিয়ে চল—

ছেলেটা বলিল—বনের মধ্যে কী গেল বাবা? বড়-বড় কান?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্যশিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল—কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড়-বড় কান?

হরিহর বলিল—কী জানি বাবা, তোমার কথার উত্তুর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অবধি শুরু করেচ এটা কী, ওটা কী ; কী গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি? নাও এগিয়ে চল দিকি—

বালক বাবার কথায় আগে-আগে চলিল।

হঠাৎ এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চিৎকার করিতে-করিতে ছুটিয়া গেল—ঐ যাচ্ছে বাবা, দেখ বাবা, ঐ গেল বাবা বড়-বড় কান, ঐ—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল—উহু-উহু-উ—কাঁটা-কাঁটা-কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া ধপ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল—আঃ, বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশোবার বারণ কচ্চি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঐ জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কী বাবা? হরিহর বলিল—কী তা কি আমি দেখেচি? শুওর-টুওর হবে—নাও চল, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

—শুওর না বাবা, ছোট্ট যে! পরে সে নিচু হইয়া দৃষ্টবস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

—চল-চল—হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না—চল দিকি। ...

নবীন পালিত বলিল—ও হল খরগোস, খোকা, খরগোস। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোস থাকে, তা-ই। বালক বর্ণ পরিচয়ের 'খ'-এ খরগোসের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এরকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোস!—জীবন্ত! একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়—ছবি না, কাঁচের

পুতুল না—একবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোস ! ! এই রকমই ভাটগাছ বৈচিগাছের ঝোপে ! জল মাটির তৈরি নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটা কী করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে-ঘেরা সরুপথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে-বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁকআলুর চাষ করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্মূল্যতা, আষাঢ়ুর বাজারে কুণ্ডুদের গোলদারী দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলির মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখি কৈ বাবা?

—এই দেখো এখন, বাবলাগাছে এখুনি এসে বসবে—

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাবলাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নিচু-নিচু কুলগাছে অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল।

হরিহর বলিল—কুঠি-কুঠি বলছিলে, ঐ দেখ, খোকা, সাহেবদের কুঠি—দেখচ?

নদীর ধারের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়া ছিল।

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ি হইতে এতদূরে আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ি, নিজেদের বাড়ির সামনেটা, বড় জোর রানুদিদিদের বাড়ি, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা ; কেবল এতদিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া, সে স্নানের ঘাট হইতে আবছায়া দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জ্বাল-ঘরটার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিত, আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—মা, ওদিকে কি সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা। ঐ মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নিচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ি ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নিচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রঙের ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল—হাঁ-হাঁ হাত দিও না, হাত দিও না—আল্-কুশি আল্-কুশি। কী যে তুমি কর বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখচি। আর কোনদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুণি হাত চুলকে হাতে ফোস্কা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে, তা তুমি কিছুতেই শুনবে না—

—হাত চুলকুবে কেন বাবা?

—হাত চুলকুবে, বিষ-বিষ—আল্-কুশিতে কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি-রি করে জ্বলবে এক্ষুণি—তখন তুমি চিৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে গিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এই এত রাত হল! তা ওকে

নিয়ে গিয়েচ, না-একটা দোলাই গায়ে না-কিছু!

হরিহর বলিল—আঃ, নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায় ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে—আল্-কুশির ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—কুঠির মাঠ দেখব, কুঠির মাঠ দেখব—কেমন, হল তো কুঠির মাঠ দেখা?

দুই॥ আমের কুসি

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে।

এমন সময় তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু—ও—অপু—

সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত।

দুর্গার বয়স দশ-এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা-পাতলা, রঙ অপুর মতো এতটা ফরসা নয়, একটু চাপা। হাতে কাঁচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর-ডাগর।

অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কী রে? দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নিচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসেনি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উহু—

দুর্গা চুপি-চুপি বলিল—একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসি জারাব—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথা পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল—আন দিকি একটু নুন আর তেল!

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে! আমার কাপড় যে বাসী!

—তুই যা-না শিগগির করে, আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েচে—শিগগির যা—

অপু বলিল—নারকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসব, তুই খিড়কি দোরে গিয়ে দ্যাখ মা আসচে কি না।

দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল—তেল-টেল যেন মেজেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে—তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল, বলিল—নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?—

—অতগুলো বুঝি হল? এই তো—ভারি বেশি—যা, আচ্ছা নে আর দুখানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েছে রে—একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেব তা হলে—

—লঙ্কা কী করে পাড়ব দিদি। মা যে তক্তার ওপর রেখে দেয়—আমি যে নাগাল পাইনে!

—তবে থাকগে যাক—আবার ওবেলা আনবো এখন। পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি ধরেচে, দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে।

খিড়কির দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শোনা গেল—দুগ্‌গা—ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাকচে, যা দেখে আয়—ওখানা খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠাল গাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে-খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতা-সূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যাল না বাঁদর—নুন লেগে রয়েচে যে!

পরে দুর্গা নিরীহ মুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কী মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাব? অত বড় মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায়-পাড়ায় টো-টো করে টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায় গেল?

অপু আসিয়া বলিল—মা খিদে পেয়েচে।

—রোসো, রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু, একটুখানি হাঁপ ছাড়তে দাও। তোমাদের রাতদিন খিদে, আর রাতদিনই ফাই-ফরমাশ! ও দুগ্‌গা, দ্যাখ তো বাছুরটা ডাক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এট্টু আটা বের করো-না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত সুরে বলিল—চাল-ভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে-খাইতে বলিল—উঃ, চিবনো যায় না, আম খেয়ে যা দাঁত টকে—

দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিগগেস করো-না? আমি এই তো এখন কাঁটালতলায় দাঁড়িয়ে—তুমি যখন ডাকলে তখন তো—

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা, ডেকে-ডেকে সারা হল! কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে-পিছনে অপুও দুধ-দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েচে! আর কোনদিন আম দেব—ছাই দেবো! এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাব, এত বড় গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়—দেব তোমায়? খেও এখন! হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে।

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে।

জিজ্ঞাসা করিল—অপুকে দেখছিনে?

সর্বজয়া বলিল—অপু তো ঘরে ঘুমুচ্চে।

—দুগ্‌গা বুঝি—

সে সেই খেয়ে বেরিয়েচে—সে বাড়ি থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে! কোথায় কার বাগানে, কার আমতলায় জামতলায় ঘুরচে—এই চত্তির মাসের রদ্দুর! ফের দেখ-না এই জ্বরে পড়ল বলে—অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাব কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

তিন ॥ গ্রীষ্ম-দুপুর

অপুদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক—দূরের কোনো দেশের কথা মনে হয়। কোন দেশ এ তাহার ঠিক ধারণা হইত

না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মায়ের মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে!

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়-মাখানো আনন্দভাবের সৃষ্টি করিত এবং সর্বাপেক্ষা কৌতূকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা যখন তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া যেন কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে, ঠিক সেই সময় মায়ের জন্য তাহার মন বড় কেমন করিয়া উঠিত; হঠাৎ তাহার মনে হইত যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এরকম হইয়াছে! ... আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট—আরও ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে!

চাহিয়া দেখিতে-দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহির-বাড়ি হইতে এক দৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত—দেখ-দেখ ছেলের কাণ্ড দেখ! ছাড়্—ছাড়্—দেখচিস্ সকড়ি-হাত? ... ছাড়ো মানিক আমার, সোনা আমার! তোমার জন্যে এই দেখ চিংড়ি মাছ ভাজচি—তুমি যে চিংড়ি মাছ ভাজা ভালবাস? হ্যাঁ, দুষ্টুমি কোরো না—ছাড়ো—

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনও-কখনও জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ির ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে-লিখিতে একমনে মায়ের মুখে মহাভারত—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে-শুনিতে তন্ময় হইয়া যায়। বেলা পড়িলে, মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক-এক দিন চাহিয়া দেখে—কর্ণ যেন ঐ অশ্বত্থ গাছটার ওপারে,আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে ... রোজই তোলে ... রোজই তোলে ...

এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে-শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হাল্‌কা কোনো গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ির পিছনে বাঁশ-বাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কী একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর ওঃ সে কী যুদ্ধ! কী যুদ্ধ! ... বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল! তারপর অর্জুন করলেন কী, ঢাল আর তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ! ...দুর্যোধন এলেন—ভীম এলেন--বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেছে—আর কিছু দেখা গেল না!

গ্রীষ্মকালের দিন—বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছেন—কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে—এমন সময়ে শেওড়া বনের দিক হইতে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ও কিরে অপু? অপু চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কী বকচিস্ বিড়বিড় করে, আর হাত-পা নাড়চিস্? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভায়ের কচিগালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল! কোথাকার একটা পাগল, কী বকছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জিতমুখে বারবার বলিতে লাগিল—যাঃ, বকছিলাম বুঝি? আচ্ছা, যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমায় সঙ্গে—পরে সে তাহার হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিকদূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখচিস্? কত নোনা পেকেচে? এখন কী করে পাড়া যায় বল দিকি—

অপু বলিল—উঃ, অনেক রে দিদি! একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল—তুই এক কাজ কর, ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে থেকে আঁকুসিটা নিয়ে আয় দিকি? আঁকুসি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিকি, আমি আনচি—

অপু আঁকুসি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার-পাঁচটার বেশি ফল পাড়িতে পারিল না। খুব উঁচু গাছ, সর্ব্বোচ্চ ডালে যে ফল দুর্গা আঁকুসি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আনব, মা'র হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুসিটা নে। নোলক পরবি? একটা নিচু ঝোপের মাথায় ওড়্-কলমি লতায় সাদা সাদা ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল—এদিকে সরে আয়, নোলক পরিয়ে দি। তাহার দিদি ওড়্-কলমি ফুলের নোলক পরিতে ভালবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে-মনে নোলক পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল বলে—নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছু বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই; কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া

কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়; এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের উভয়েরই খাইতে নিষেধ আছে। কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

দুর্গা একটা কুঁড়ি ভাঙিয়া সাদা জলের মতো যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে অপুর নাকে কুঁড়িটি আঁটিয়া দিল, নিজেও একটা পরিল; পরে ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া মুখ নিজের দিকে ভাল করিয়া ফিরাইয়া বলিল—দেখি, কেমন দেখাচ্চে? বাঃ, বেশ হয়েচে—চল মাকে দেখাইগে।

অপু লজ্জিতমুখে বলিল—না দিদি—

—চল না, খুলে ফেলিসনে যেন, বেশ হয়েচে!

বাড়ি আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল—ঐ লিচু জঙ্গলে—অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা—একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা—

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এদিকে দেখ মা—অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—ওমা! ও আবার কে রে? কে, চিনতে তো পারচি নে।

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল; বলিল—ঐ দিদি পরিয়ে দিয়েচে।

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্ রে অপু, ঐ কোথায় ডুগডুগি বাজচে, চল, বাঁদর খেলাতে এসেচে ঠিক। শিগগির আয়—আগে-আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে-পিছনে অপু ছুটিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া—বাঁদর নয়, ওপাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও এ-বাড়ি ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ-বাড়ির লোক কখনও কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা ও অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

চিনিবাস ভুবন মুখুয্যের বাড়ি গিয়া মাথার রেকাবি নামাইতেই বাড়ির ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে-করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়িতে পাঁচ-ছয়টা গোলা আছে।

ভুবন মুখুয্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজভাইয়ের বিধবা-স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী। বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজ-বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কি, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুয্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্য খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন-পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ-বৌ নিজের ছেলে, সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও-না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও-না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে!

চিনিবাস রেকাবি মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ি চলিল। দুর্গা বলিল—আয় অপু, চল দেখিগে টুনুদের বাড়ি।

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ-বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখতে পারিনে বাপু, ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব! নিজের বাড়ি আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না! তা না লোকের দোর-দোর—যেমনি মা তেমনি ছা।

ইহাদের বাড়ির বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—চিনিবাসের ভারি তো খাবার। বাবার কাছ থেকে দেখিস রথের সময় চারটে পয়সা নেবো—তুই দুটো—আমি দুটো। তুই আমি মুড়কি কিনে খাব।

খানিকটা পরে ভাবিয়া-ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের কতদিন আছে রে দিদি?

চার॥ দুগ্‌গাদিদি

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

একদিন সর্বজয়া একবাটি দুধে কিছু ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল।—দেখি হাঁ কর—তোমার কপালখানা—মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর দুধ—তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে আসে—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু—বাঁচবে কী খেয়ে?

দুর্গা বাড়ি ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধুলা, কপালের সামনে একগোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার-আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সবসময় আপন মনে ঘুরিতেছে; পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলাধুলা নাই। কোথায় কোন ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন্ গাছটায় আমের গুটি বাঁধিতেছে, কোন্ বাঁশতলার শেয়াকুল খাইতে মিষ্টি—এসব তাহার নখদর্পণে।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল—এলে? এস, ভাত তৈরি। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো—তারপর আবার কোনদিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন সকলের মেয়ে দেখ গে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপূজো করচে—আর অতবড় ধাড়ি-মেয়ে—দিনরাত কেবল টো-টো, সেই সকাল হতে-না-হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েচে, এখন এল বাড়ি, মাথাটার ছিরি দেখনা! না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো—

সর্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে ভুবন মুখুয্যের বাড়ির সেজ-ঠাকরুন, পিছনে-পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেবরের ছেলে সতু, তাহাদের পিছনে আরো চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সম্মুখ দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সেজ-ঠাকরুন কোনো দিকে না চাহিয়া বা বাড়ির কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন্-হন্ করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের দেওর-পোর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কৈ নিয়ে আয়—বের কর পুতুলের বাক্স, দেখি—

এ বাড়ির কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্বেই টুনু ও সতু দুজনে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর এক ছড়া পুঁতির মালা বাহির করিয়া বলিল—এই দেখ মা, আমার সেই মালাটা—সেদিন যে সেই খেলতে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোণ সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটি বাহির করিয়া বলিল—এই দেখ জেঠিমা আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ির সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে, এতক্ষণ পরে সর্বজয়া কথা খুঁজিয়া পাইয়া বলিল—কী, কী খুড়ীমা! কী হয়েছে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

—এই দেখ-না কী হয়েচে, কীর্তিখানা দেখ-না একবার! তোমার মেয়ে সেদিন খেলতে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে—মেয়ে ক'দিন থেকে খুঁজে-খুঁজে হয়রান। তারপর সতু গিয়ে বললে যে, তোর পুঁতির মালা দুগ্‌গাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম। দেখ একবার কাণ্ড! তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর—চোরের বেহদ্দ চোর। আর ওই দেখ-না—বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেরি সয় না—চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অভিযোগের অতর্কিততায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—এনিচিস এই মালা ওদের বাড়ি থেকে?

দুর্গা কোনো উত্তর দিতে-না-দিতেই সেজ-বৌ বলিলেন—না আনলে কি আর মিথ্যে করে বলচি নাকি! বলি এই আম কটা দেখ-না! সোনামুখীর আম চেন না কি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না সেজ-খুড়ী, আপনার মিথ্যে কথা, তা তো বলিনি। আমি ওকে জিগগেস করচি।

সেজ-ঠাকরুণ হাত নাড়িয়া ঝাঁঝের সহিত বলিলেন—জিগগেস কর আর যা কর বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্চি। এই বয়সে যখন চুরি বিদ্যে ধরেছে, তখন এরপর যা হবে সে টেরই পাবে। চল রে সতু, নে আমের গুটিগুলো বেঁধে নে—

দলবল সহ সেজ-ঠাকরুন দরজার বাহির হইয়া গেলেন।

অপমানে দুঃখে সর্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া, দুধ-ভাত-মাখা হাতেই দুড়দাড় করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপর চড় মারিতে-মারিতে বলিতে লাগিল—আপদ বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেচে, ম'লেও আপদ চুকে যায়। মরেও না যে বাঁচি—হাড় জুড়োয়! বেরো বাড়ি থেকে, দূর হয়ে যা—যা এখ্‌খুনি—বেরো—

দুর্গা মার খাইতে-খাইতে ভয়ে খিড়কি-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছার দু-এক গাছা সর্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল। অপু খাইতে-খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কি না তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনো দিন দেখে নাই; কিন্তু আমের গুটি চুরির জিনিস নয়, তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখী তলায় যে আম ক'টা পড়িয়াছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে। কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে—ও অপু, এবার সেই আমের গুটিগুলো জারাব, কেমন তো? কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ি উপস্থিত থাকার দরুন উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলা এভাবে লইয়া গেল—তাহার উপর আবার দিদি এরূপভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের একগাছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে, তখনই কী জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়, কেমন যেন মনে হয়—দিদির কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথী কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সমস্ত দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে, সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে। তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ভয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন

থাকিয়া-থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ি, পটলিদের বাড়ি, নেড়াদের বাড়ি—একে-একে সকল বাড়ি খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই।

রাজকৃষ্ণ পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জেঠিমা, আমার দিদিকে দেখেচ? সে আজ ভাত খায়নি, কিছু খায়নি—মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে—দেখেচ জেঠিমা?

বাড়ির পাশের পথ দিয়া যাইতে-যাইতে ভাবিল—বাঁশবনের কোথাও যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়কি-দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিয়া দেখিল, কেহ নাই! তাহার মা বোধহয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে।

ভুবন মুখুয্যের বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটাছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। রাণু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল—ভাই, অপু এসেচে—ও আমাদের দিকে হবে—আয় রে অপু।

অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি আজ খেলব না রাণুদি—দিদিকে দেখেচ?

রাণু জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা? না, তাকে তো দেখিনি! বকুলতলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই। সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ি হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বকুলগাছটা অনেকদূর পর্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই, যদি কোনদিকে গাছপালার আড়ালে থাকে! সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি! দিদি!

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলা বক পাখা ঝটপট করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বাড়ির পথে ফিরিতে-ফিরিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনে সেই গাবগাছটা! একা সন্ধ্যার পর এ গাব গাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া! সর্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে! কেন যে তাহার এই গাছটার নিচ দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ি যাইবার আরেকটা পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পটলিদের বাড়ির উঠান দিয়া গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পটলিদের ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ির রোয়াকে ছেলেপিলেদের লইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পটলির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন। উঠানের মাচাতলায় বিধু জেলেনী দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সার তাগাদা করিতেছে। অপু বলিল—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ঠাকমা—বকুলতলা থেকে আসতে-আসতে—

ঠাকুরমা বলিলেন—দুগ্‌গা এই তো বাড়ি গেল! এই কতক্ষণ যাচ্ছে, ছুটে যা দিকি—বোধহয় এখনও বাড়ি গিয়ে পৌঁছয়নি।

সে এক দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পটলির বোন রাজি চেঁচাইয়া বলিল—কাল সকালে আসিস অপু—আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেচি টেক্‌শেলের পিছনে নিমতলায়—দুগ্‌গাকে বলিস—

তাহাদের বাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। দুর্গা আর্তস্বরে চিৎকার করিতে-করিতে বাড়ির দরজা দিয়া দৌড়িয়া বাহির হইতেছে—পিছনে পিছনে তাহার মা কি একটা হাতে করিয়া মারিতে-মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইতে ধাবমান মেয়ের

পিছনে—চেঁচাইয়া বলিল—যাও, বেরোও, একেবারে জন্মের মতো যাও, আর কক্ষনো বাড়ি যেন ঢুকতে না হয়—বালাই, আপদ চুকে যাক—একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।... ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মতো আড়ষ্ট ও ভারী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়িতে ঢুকিয়া মাটির প্রদীপটা রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া-টিপিয়া বাড়ি ঢুকিতেই মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আবার এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচ।

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? দুপুরবেলা দিদি কী খাইল? সে কি আবার কোনো জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোনো কথা না বলিয়া সে কলের পুতুলের মতো মায়ের কথামতো কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে-ভয়ে প্রদীপটা উস্কাইয়া দিয়া নিজের ছোট বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ; কিন্তু তাহার দপ্তরে দুখানা মোটা-মোটা ভারী ইংরাজি কী বই, কবিরাজী ঔষধের তালিকা, একখানা পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালি, একখানা ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি যোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার খুলিয়া দেখে। খানিকক্ষণ দেয়ালের দিকে চাহিয়া সে কী ভাবিল; পরে আর একবার প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালীখানা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাইতেছে, এমন সময় সর্বজয়া এক বাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল—এস, খেয়ে নাও দিকি!

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটি উঠাইয়া লইয়া দুধ খাইতে লাগিল। অন্য দিন হইলে এত সহজে দুধ খাইতে তাহাকে রাজি করানো খুব কঠিন হইত। একটুখানি মাত্র খাইয়া সে মুখ হইতে বাটি নামাইল। সর্বজয়া বলিল—ওকী? নাও সবটুকু খেয়ে ফ্যালো—ওইটুকু দুধ ফেললে তবে বাঁচবে কী খেয়ে—

অপু বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্বজয়া দেখিল, সে মুখে বাটি ধরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু চুমুক দিতেছে না। তাহার বাটিসুদ্ধ হাতটা কাঁপিতেছে। পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে ফুঁপাইয়া উঠিল। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল—কী হল রে? কী হয়েচে? জিব কামড়ে ফেলেছিস?

অপু মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—দিদির জন্যে বড্ড মন কেমন করচে মা!

সর্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া, পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে শান্ত সুরে বলিতে লাগিল—কেঁদো না, অমন করে কাঁদে না। ঐ পটলাদের কি নেড়াদের বাড়ি বসে আছে—কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্টু মেয়ে নাকি? সেই দুপুরবেলা বেরুল—সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না—না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ওপাড়ার পালিতদের বাগানে বসেছিল, সেখানে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েছে, এক্ষুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি। কেঁদো না অমন করে—আবার জ্বর আসবে—ছি!

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া, বাকি দুধটুকু খাওয়াইবার জন্য বাটি তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল।—হাঁ করো দিকি, লক্ষ্মী, সোনা, উনি এলেই ডেকে

আনবেন এখন। একেবারে পাগল—কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে—আর এক চুমুক—হ্যাঁ.....

রাত অনেক হইয়াছে! উত্তরের ঘরের তক্তপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখনও রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছে। বাবা বাড়ি আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ি আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়াদাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, মা কী দিয়ে মেরেছিল রে সন্ধ্যেবেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েছে?

দুর্গার মুখে কোনো কথা নাই। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আমার ওপর রাগ করিচিস দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আস্তে-আস্তে বলিল—না বৈকি? তবে সতু কি করে টের পেলে যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় বিছানায় উঠিয়া বসিল। না, সত্যি আমি তোর গা ছুঁয়ে বলচি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে। কাল সতু বিকেল-বেলা এসেছিল, ওর সেই বড় রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেলছিলাম; তারপর বুঝলি দিদি, সতু তোর পুতুলের বাক্স খুলে কী দেখছিল; আমি বললাম, ভাই, তুমি দিদির বাক্সে হাত দিও না—দিদি আমাকে বকে; সেই সময় দেখেচে—

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—খুব লেগেচে, না রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল—আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি মেরেচে—রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কনকন কচ্ছে, এইখানে এই দ্যাখ হাত দিয়ে! এই—

—এইখানে? তাই তো রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি?

—থাক্‌গে। কাল পালিতদের বাগানে বিকেলবেলা যাব, বুঝলি? কামরাঙা যা পেক্কেচে! এই এত বড়—কাউকে বলিসনে! তুই আর আমি চুপি-চুপি যাব—আমি আজ দুপুরবেলা দুটো পেড়ে খেয়েচি—মিষ্টি যেন গুড়!

পাঁচ॥ নেবুর পাতায় করমচা

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ির সামনের বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলা পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়িটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধুলা, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, খড়, চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাড়ির বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল। অপুও দিদির পিছু-পিছু ছুটিল! দুর্গা ছুটিতে-ছুটিতে বলিল—শিগগির ছোট, তুই বরং সিঁদুরকৌটো তলায় থাক, আমি যাই সোনামুখী তলায়—দৌড়ো—দৌড়ো।

ধুলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড়-বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া-নেড়া দেখাইতেছে। গাছে-গাছে শোঁ-শোঁ—বোঁ-বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে—বাগানের শুকনা ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুকনা বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে

তুলিয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুকশিমা গাছের শুঁয়ার মতো পালকওয়ালা সাদা-সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না!

সোনামুখীতলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা উৎসাহে চিৎকার করিতে-করিতে লাফাইয়া এদিক-ওদিকে ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পড়ল রে দিদি—ঐ আর একটা রে দিদি!....চিৎকার যতটা করিতে লাগিল, তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোররবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না; যদি-বা শোনা যায়, ঠিক কোন জায়গা বরাবর শব্দ হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে পাইল দুটা। তাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই দ্যাখ দিদি কত বড়, দ্যাখ। ঐ একটা পড়ল—ওই ওদিকে—

এমন সময় হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুয্যের বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল—ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু কুড়ুচ্ছে!

দল আসিয়া সোনামুখী তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এসেচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচ? পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখছিস টুনু? যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেব।

রাণু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়ুক—আমরাও কুড়ুই।

—কুড়ুবে বই কি! ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও? না, যাও দুগ্‌গাদি—আমাদের তলায় থাকতে দেব না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না; কিন্তু সেদিন মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাঁধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল—অপু, আয় রে চলে। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল অপু, এখানে থাকতে না দিলে বয়ে গেল—বুঝলি তো? এখানকার চেয়েও বড়-বড় আম—তুই আমি মজা করে কুড়ুব এখন—চলে আয়।

রাণু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতু দা! রাণুর মনে দুর্গার চোখের ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন জায়গায় বড়-বড় আম রে দিদি? পুঁটুদের সল্‌তেখাগী তলায়? কোন তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড়-বড় গাছ আছে—চল।

গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌঁছানো যায়। অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ—গাছতলায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে এসব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মতো মোটা-মোটা অনেক কালের পুরনো গুলঞ্চলতা এ-গাছে ও-গাছে দুলিতেছে; বড়-বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোপজঙ্গল খুঁজিয়া তলায়-পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নয়ই, তাহার উপর আবার ঝড়ো মেঘ এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কী ভাল দেখা যায় না। তবুও

খুঁজিতে-খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু, বিষ্টি এল।

সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটির সোঁদা-সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল—এবং একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চড়বড় করিয়া চারিদিকের গাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই, এখানে বিষ্টি পড়বে না। দেখিতে-দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাটকা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যে নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বেশ বাড়িল। দুর্গা ও অপু যে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না ; কিন্তু পুবের হাওয়ায় জলের ঝাপটা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ি হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি, বড্ড যে বিষ্টি এল!

—তুই আমার কাছে আয়—দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে! বিষ্টি হল ভালই হল—আমরা আবার সোনামুখীতলায় যাব এখন, কেমন তো? দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করমচা,
হে বিষ্টি ধরে যা—

ক্কড়-ক্কড়-ক্কড়-কড়াৎ—প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চিরিয়া গেল। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি!

—ভয় কী রে? রাম-রাম বল—রাম-রাম-রাম-রাম—নেবুর পাতায় করমচা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করমচা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করমচা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করমচা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করমচা—

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—বাজ পড়িতেছে না কি? গাছের মাথায় বন-ধুঁদুলের ফল দুলিতেছে।

শীতে অপুর ঠকঠক্ করিয়া দাঁতে-দাঁত লাগিতেছিল। দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বারবার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করমচা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করমচা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করমচা—ভয়ে তাহারও স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশি বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া-যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্‌ছপ্ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুর-ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখিছিস ওদিকে? আশালতা বলিল—না খুড়ীমা, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে? হাসিয়া বলিল—কি বেঙডাকানি জল হয়ে গেল খুড়ীমা!

—সেই ঝড়ের আগে দুজন বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই বলে, আর ফেরেনি! এই ঝড়-বিষ্টি গেল, সন্দে হল, ও মা কোথায় গেল তবে?

সর্বজয়া উদ্বিগ্নমনে বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কী করিবে ভবিতেছে, এমন সময় খিড়কি-দরজা ঠেলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে-আগে একটা ঝুনা নারিকেল

হাতে ও পিছনে-পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ের কাছে গিয়া বলিল—ওমা আমার কী হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্তাভাত হইচিস? কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়? ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি! পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল কোথায় পেলি রে দুগ্‌গা?

অপু ও দুর্গা দুজনে চাপা কণ্ঠে বলিল—চুপ চুপ মা—সেজজেঠিমা বাগানে যাচ্ছে—এই গেল ; ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা?—ওর তলায় পড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্ছি, সেজজেঠিমাও ঢুকল।

দুর্গা বলিল—অপুকে তো ঠিক দেখেচে, আমাকেও বোধহয় দেখেচে ... পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখীর তলায় যদি আম পড়ে থাকে, তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা পড়ে রয়েচে। অপুকে বললাম—অপু, বাগলোটা নে—মা'র ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তার পরই দেখি—হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড়, না মা?

অপু হাত নাড়িয়া খুশির সুরে বলিল—আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট।

সর্বজয়া বলিল—বেশ বড় দোমালা নারকোলটা! ছেঁচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নোব। আয় সব কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ সব।

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখুয্যের বাড়ি গেল। ভুবন মুখুয্যের খিড়কি-দোর পর্যন্ত যাইতেই সে শুনিল, সেজঠাকরুন বাড়ির মধ্যে চিৎকার করিয়া বাড়ি মাথায় করিতেছেন—

—একটা মুঠো টাকা খরচ করে তবে বাগান নেওয়া—মাগনা তো নয়। তার ত্রেনোগছটা যদি হাঘরেদের জন্যে ঘরে ঢুকবার যো আছে! ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি—এই এত বড় নারকোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একবারে দুড়দুড় করে দৌড়?—এত শত্তুরতা যেন ভগবান সহ্যি না করেন—উচ্ছন্নে যাক—এই ভর সন্দেবেলা বলচি, আর যেন নারকোল খেতে না হয়—

সর্বজয়া খিড়কির বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল, যদি গালাগাল ওদের লাগে! বাবা! যে লোক! দাঁতে বিষ আছে! কী করি! কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুয্যে-বাড়ি ঢুকিল না—ভয়ে-ভয়ে জল তুলিবার ছোট্ট বালতিটা ও ঘড়া কাঁকে লইয়া বাড়ির দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে-আসিতে ভাবিল—যদি নারকোলটা ওদের ফেরত দিই তাহলে কি গাল লাগবে? তা কেন লাগবে—যার জিনিস তো ফেরত দেওয়া হল, তা কখনও লাগে?

বাড়িতে পা দিয়াই মেয়েকে বলিল—দুগ্‌গা, নারকোলটা সতুদের বাড়ি দিয়ে আয় গিয়ে। অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—একখুনি?

—হ্যাঁ, একখুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়কির দোর খোলা আছে। চট করে যা। বলে আয় আমরা কুড়িয়ে পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু একটু দাঁড়াবে না মা? বড্ড অন্ধকার হয়েছে, অপু, চল আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে-দিতে গলায় আঁচল দিয়া

প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল ওরা শত্তুরতা করে কুড়তে যায়নি সে তো তুমি জান, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রেখো, ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেও, দোহাই ঠাকুর।

ছয়॥ গুরুমশায়

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমশায় বাড়িতে একখানা মুদির দোকান করিতেন এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠো শিগগির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট। হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে, যাহারা দুষ্ট ছেলে, মা'র কথা শোনে না, ভাই-বোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনদিন ওরূপ করে না, তবে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠো অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেব এখন, পাঠশালায় বসে-বসে খেও, এখন ওঠো লক্ষ্মী মানিক! মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ! পরে সে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গি করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশি জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মা'র প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল। খাবার বাঁধিয়া দিবার সময়

বলিল—আমি কখখনো বাড়ি আসচিনে দেখো!

—ষাট্-ষাট, বাড়ি আসবিনে কী! ওকথা বলতে নেই, ছি—পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক, ভাল করে লেখাপড়া শিখো; তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার! কোনো ভয় নেই। ওগো তুমি গুরুমশায়কে বলে দিও, যেন ওকে কিছু না বলে।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটির সময় আমি আবার এসে তোকে বাড়ি নিয়ে যাব অপু। বসে-বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন। ... খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমশায় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব-লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড়-বড় ছেলে আপন-আপন চাটাই-এ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কী পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা বড় আঁচিল, সে দোকানের মাচার নিচে চাহিয়া কী লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘট আঁকিয়া কী করিতেছিল। একজন চুপি-চুপি বলিতেছিল, আমি এই ট্যারা দিলাম; অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই

আমার গোল্লা—সঙ্গে-সঙ্গে তাহার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল, ও মাঝে-মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

অপু নিজের শ্লেটে বড়-বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমশায় হঠাৎ বলিলেন—এই ফণে, শেলেটে ওসব কী হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল; কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত। তিনি বলিলেন, এই সতে, ফণের শেলেটটা নিয়ে আয় তো। তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে-না-হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে শেলেটে? সতে, ধরে নিয়ে আয় তো দুজনকে, কান ধরে নিয়ে আয়।

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল এবং যেভাবে বিপন্নমুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে-পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল; সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক-ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল। গুরুমহাশয় বলিলেন—হাসে কে রে? হাসচ কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ, এটা নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কী অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইঁট নিয়ে এস তো তেঁতুলতলা থেকে, বেশ বড় দেখে।

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল। কিন্তু ইঁট আনা হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়া হউক বা নতুন ভর্তি ছাত্র বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশি ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথমে কী করিয়া আষাড়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপ তুলিয়া বসিয়া-বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে-মাঝে তাদের সেই ছেঁড়া মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাগুরায়ের পাঁচালিখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকার বর্ষারাতে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেউ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কী সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক-একদিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত গ্রামের ও-পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে-কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ! তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে

বসিয়া খেলো হুঁকা টানিতেছেন ; মনে হইতেছে সান্ন্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশি আর বুঝি নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালাবন্ধ, বাড়িতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কী? সান্ন্যাল মহাশয় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেক দিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা ঠুক্‌ঠুক্‌ শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া সান্ন্যাল মহাশয় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু-সমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে-কাটিতে বাড়ি ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—এই যে প্রসন্ন, কী রকম অ্যে, বেশ জাল পেতে বসেচ যে! ক'টা মাছি পড়লো?

নামতা-মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্ন্যাল মহাশয় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেখানে হাতখানেক জমি উৎসাহে সে আগাইয়া বসিত। শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত—যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই ; সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখ দুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত!

এক-একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি কম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভাল খাবার পাওয়া যায়, সান্ন্যাল মহাশয় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে প্যাঁড়া কিনিয়া খাইবে।

কোন দেশে সান্ন্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশ্বত্থতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত—আচ্ছা, কোন ফল তোমরা খাইতে চাও বলো! পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও, ওখান হইতে লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে! রাজু রায় বলিতেন—ওসব মন্তর-তন্তরের খেলা আর কি! সেবার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচ কেউ? একশো বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সেও আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠতাম না! একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ-কুড়ি বয়েস, চাকদা থেকে গঙ্গাচান করে গরুর গাড়ি করে ফিরচি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ি—গাড়িতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কী রকম ভয়ভীতি ছিল, তা রাজকেষ্টভায়া জান নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁখানা বসেচে—ওই বরাবর এসে হল কী জন্যে? জন চারেক ষণ্ডামার্কো গোছের মিশকালো লোক এসে গাড়ির পিছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে রা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ির মধ্যে বসে আছি ; এদিকে তারাও গাড়ির বাঁশ ধরে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে,

সঙ্গেই আসচে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিটপিট্‌ করে পিছন দিকে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ করে দিলে। তারাও বেশ এগিয়ে যাচ্চে! এদিকে গাড়ি একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল, বাজার দেখা যাচ্চে ; তখন সেই লোক ক'জন বললে—ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বললে—সে হবে না ব্যাটারা ; আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বললে—আচ্ছা, যা ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিসনি! তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা! মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, অমনি ধরেই রয়েচে, আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই—চলেচ গাড়ির সঙ্গে ; একেবারে পেরেক আটা হয়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর-তন্তরের কথা—

গল্প বলিতে-বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকাভাবে আসিয়া পড়িত! কাঁঠালগাছের, জগডুমুরগাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চলতার গায়ে টুনটুনি পাখি মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালা-ঘরে বনের লতাপাতার গন্ধের সঙ্গে তালপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেজে ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া—সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সেই গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে-পিছনে সাজি মাটি দিয়া কাচা, সেলাই-করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে। তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মতো নরম, চিক্কণ, সুখস্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে ; তাহার ডাগর-ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়। এই গণ্ডিটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধার ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি—তাহার শিশুমন খৈ পায় না!

ঐ যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন, ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল, তুমি বরাবর সোজা যদি ও-পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও, তবে শাঁখারিপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে। বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে, কত মোহর-ভরা হাঁড়ি-কলসির কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বন-ঝোপের নিচে, কচু ওল বন-কলমির চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা—কেউ জানে না কোথায়!

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা। সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোনো গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল। সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল 'শিশুবোধক'। এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন—দেখি, শ্লেটে নাও, শ্রুতিলিখন লেখো।

মুখে-মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না—মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালি হইতে ছড়া মুখস্থ বলে তেমনি।

শুনিতে-শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলা অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পরপর সে কখনও শোনে নাই। সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না ; কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার-জড়ানো এই অপরিচিত শব্দ-সঙ্গীত অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল

এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুনই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দসমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বারবার উঁকি মারিতে লাগিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

'এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়—পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া'—ইত্যাদি।

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়—সেই যে বছর দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দুধারে যে কত কী অচেনা পাখি, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল—ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর দশঘরা হয়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে। ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত ও-পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে—রামায়ণ, মহাভারতের দেশে। সেই অশ্বত্থ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে তাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা!

শ্রুতিলিখন শুনিতে-শুনিতে সেই দুই বছর আগে দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল!

ওই পথের ওধারে—অনেক দূরে—কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি? বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কত দূরে সেই প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

সাত ॥ আতুরী ডাইনি

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। ভদ্রমাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্চিস রে অপু? চাল-ভাজা আর ছোলা-ভাজা ভাজচি—বেরুস না যেন। এক্ষুনি খাবি।

অপু শুনিয়াও শুনিল না। যদিও সে চাল-ছোলা-ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে, ইহা সে জানে; তবুও সে কী করিতে পারে? এতক্ষণ কী খেলাটাই-না চলিতেছে নীলুদের বাড়িতে, সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মা'র ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি? ও অপু, বা রে দেখ মজা ছেলের! গরম-গরম খাবি, আমি ঘাট থেকে তাড়াতাড়ি এসে ভাজতে লাগলাম! ও অপু—উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ি গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখির ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজি হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধানক্ষেতের ওপারেই

নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনও বেড়াইতে আসে নাই; তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডি ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল! একটুখানি পরেই সে বলিল—বাড়ি চল নীলুদা, আমার মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারব না। তুমি বাড়ি চল।

ফিরিতে গিয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া-ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে; এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কিরে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে; উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একপাশে একটা বিলাতি আমড়ার গাছ। তাহার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনির বাড়ি!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল। আতুরী ডাইনির বাড়ি! সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া তাহারা পড়িয়াছে! কে না জানে যে, ওই উঠানের গাছ হইতে চুরি করিয়া বিলাতি আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনিটা জেলেপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুপাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে-সঙ্গে বেচারির আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মতো মিটিয়া যায়? কে না জানে, সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট্ট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে? যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছু জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ি গিয়া খাইয়া-দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে—আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনির গল্প শুনিতে-শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্তিরে তুই ওসব গল্প বলিসনে দিদি, আমার ভয় করে—তুই সেই কুচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল দিকি!

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়িতে কেম আছে কি না এবং চাহিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল! বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনিই তাহাদের—এমনকি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে-পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না!

আতুরী বুড়ি ভুরু কুঁচকাইয়া, তোবড়ানো গালটা যেন আরও ঝুলাইয়া, ভাল করিয়া লক্ষ করিবার ভঙ্গিতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে-পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল!

অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পালাইবার পথ নাই। যে কারণেই হউক ডাইনির রাগটা যেন তাহার উপরই বেশি—এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া বোধ হয় কচুর পাতায় পুরিবে!

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে আজ মায়ের মনে যে কষ্ট দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার ফল এইবার ফলিতে চলিল! সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে, ও বুড়িপিসি, আমি আর কিছু

করব না। আমাকে ছেড়ে দাও; আমি ইদিকে আর কক্ষনো আসব না —আজ ছেড়ে দাও, ও বুড়িপিসি!

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ি বলিল—ভয় কী মোরে, ও বাবারা! মোরে ভয় কী? পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল—মুই কি ধরে নেব খোকারা? এস মোর বাড়িতি এস—আমচুর দেবানি, এস।

আমচুর! ডাইনি বুড়ি ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়িতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি....! ডাইনিরা রাক্ষুসীরা যে এরকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে—এরকম কত গল্প তো সে মা'র মুখে শুনিয়াছে!

এখন সে করে কী! উপায়?

বুড়ি তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে-আসিতে বলিল—ভয় কী মোরে ও বাবা? মুই কিছু বলব না, ভয় কী মোরে?

আর কী, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিতে আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পুরিল বলিয়া! সে আড়ষ্টকণ্ঠে দিশাহারাভাবে বলিয়া উঠিল—ও বুড়িপিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না। আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া পাড়তে আসিনি—আমার মা কাঁদবে।

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ি, ঘর, দোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া! কেহ কোনো দিকে নাই—কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনির ক্রূর-দৃষ্টি-মাখানো একজোড়া চোখ, আর বহুদূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক!

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরিয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল। নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে-পিছনে।

ইহাদের এত ভয়ের কারণ কী বুঝিতে না পারিয়া বুড়ি ভাবিল—মুই মাস্তিও যাইনি, ধস্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কী জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?

আট॥ রেলের পথ

এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা পাবে—ওর শরীরটা সারবে এখন। অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনও যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার, বড় জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে-মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে বৈকালে দিদির সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন হইতেই উৎসাহে তার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল। দিন গণতে-গণতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে

আষাড়ু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায়, সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে?

তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চল না! আমরা রেল-লাইন পেরিয়ে যাব এখন।

সেবার তাদের রাঙী-গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গায় দুই-তিন দিন ধরিয়া খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূরে ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কী দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—এক কাজ করবি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?

অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা, সে যে অনেক দূর! সেখানে কী করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি? কে বলেছে তোকে? ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো!

অপু বলিল—কাছে হলে তো দেখা যাবে! পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায় যদি, চল গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, বোধহয় যাওয়া যাবে না! কিছু তো দেখা যায় না—অত দূর গেলে আবার আসব কী করে?

তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল; লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়াভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই, গিয়ে দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসব এখন। হয়তো রেলের গাড়ি দেখা যাবে এখন। মাকে বলব বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

প্রথম তাহারা একটুখানি এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল—কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর-রোদে ভাইবোনে মাঠ-বিল-জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণমুখে ছুটিল।

দৌড়, দৌড়, দৌড়—

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয় খানিক দূরে গিয়া একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলাগাছে ভরা; এইখানে আসিয়া তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিল। কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে ও দুপাশে কেবল ধানক্ষেত-জলা আর বেতঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে পা পুঁতিয়া যায়। শেষে রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ের তলা হইতে দু-তিনবার কাঁটা টানিয়া-টানিয়া বাহির করিতে হইল। শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফিরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না। জলা ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহুকষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবে সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না,

পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছুদূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো একটা উঁচুমতো রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে-বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা-রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা-সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা; যতদূর দেখা যায় ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে। তাহার বাবা বলিল—ঐ দেখ খোকা রেলের রাস্তা।

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন?... উহার উপর দিয়া রেল গাড়ি যায়? .. কেন? ... মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন? .... পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না কেন? ...ওগুলোকে তার বলে? তারের মধ্যে শোঁ-শোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কী করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইস্টিশান? এদিকে কি ইস্টিশান?—কিছুক্ষণ এইভাবে ক্রমাগত প্রশ্ন চলিল।

শেষে অপু বলিল—বাবা, রেলগাড়ি কখন আসবে? আমি রেলগাড়ি দেখব বাবা।

—রেলগাড়ি এখন কী করে দেখবে? সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ি আসবে, এখনও চার-পাঁচ ঘণ্টা দেরি।

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাব, আমি কক্‌খনো দেখিনি, হ্যাঁ বাবা?

—ওরকম কোরো না, ঐ জন্যে তো তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কী করে দেখবে? সেই দুপুর অবধি বসে থাকতে হবে তা হলে এই ঠায় রোদ্দুরে! চল, আসবার দিন দেখাব। অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে-পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষণ মহাজন; বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। সে বাহিরের বড় আটচালা-ঘরে মহা সমাদরে তাহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরঘাটে আসিয়াছিল; জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল—পুকুর-পাড়ের বাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মতো আপন মনে কী বকিতেছে। সে ঘড়া নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেচ খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা। প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে, সে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—ওই ওদের বাড়ি।

বধূটি বলিল—বটঠাকুরদের বাড়ি? তুমি বটঠাকুরের গুরুমশায়ের ছেলে বুঝি? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ি পৃথক; লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি হইতে অতি সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ, কত কী জিনিস! তাহাদের বাড়িতে এরকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো! কড়ির আলনা, রঙ-বেরঙের ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখি, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ—আরও কত কী। দু-একটা জিনিস সে ভয়ে-ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল।

এতক্ষণ ভাল করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বধূটির মনে হইল যে, এ এখনও ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ বছরের ছেলের মতো কচি। এমন সুন্দর, অবোধ চোখের ভাব সে আর কোনো ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই; এমন রঙ, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর-ডাগর নিষ্পাপ চোখ! অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারি করিয়া তাহাকে খাইতে দিল। একটি বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ—এত ঘি-দেওয়া যে আঙুলে ঘি মাখামাখি হইয়া যায়! অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল—এমন অপূর্ব জিনিস আর কখনও সে খায় নাই তো! মোহনভোগে কিসমিস দেওয়া কেন? কৈ, তাহার মায়ের তৈরি মোহনভোগে তো কিসমিসও থাকে না, ঘিও থাকে না!

বাড়িতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ করে দিতে হবে। তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা, ওবেলা তোকে করে দেব। পরে সে শুধু সুজি কাঠখোলায় ভাজিয়া, জলে সিদ্ধ করিয়া ও গুড় মিশাইয়া, একটি পুলটিসের মতো দ্রব্য তৈয়ার করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে। মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ তাহার মনে হইল—এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারি মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাত! সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মা জানে না যে, এইভাবে মোহনভোগ তৈয়ারি করিতে হয়! সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল তাহার মা গরিব, তাহারা গরিব, তাই তাহাদের বাড়ি ভালো খাওয়াদাওয়া হয় না।

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ-প্রতিবেশীর বাড়ি অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুরবেলা সেই বাড়ির একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া, জল ছিটাইয়া, অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা; বেশ টকটকে ফর্সা রঙ, বড়-বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মতো। অমলার মা কাছে বসাইয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারি চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পর অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি দিয়া গেল।

সেদিন বৈকালে খেলিতে-খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাটকা-চেরা নতুন বাঁশের বেড়া—আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল। অমলা ছুটিয়া আসিয়া পাখানা বাঁশের ফাঁক হইতে সাবধানে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই হয়তো কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া, গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার কাছে বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না।

অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ি গেল। অমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাঁচের বর মেম-পুতুল, মোমের পাখি, শোলার গাছ—আরও কত কী দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা থেকে সেসব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। কত নতুন-নতুন খেলার জিনিস! একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে চাও তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিটপিট করিবে। একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মতো হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া

দুহাতে খঞ্জনি বাজাইতে থাকে। সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া ; রাণুদির কাকা তাহাদের বাড়ির দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ঐ রকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটা খড়্ খড়্ করিয়া মেজের উপর চলিতে থাকে ; অনেকদূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া ! সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কী রকম ঘোড়া, বেশ তো ! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত ?

তাহার পর অমলা তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল—সেটার মধ্যে রাঙা রঙের একখানা ছোট রাংতার মতো কী। অপু বলিল—ওটা কী ? রাংতা ? অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন ? সোনার পাত দেখনি ? অপু সোনার পাত দেখে নাই। সোনার রঙ কি অত রাঙা ? সোনার পাতখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটার এসব খেলনা কিছুই নেই—মরে কেবল শুকনো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি করে মার খায় ! তাহার দিদির বয়সী অন্য কোনো মেয়ের খেলনার ঐশ্বর্য যে কত বেশি, তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি গভীর করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত, আর একটা রবারের বাঁদর—তুমি যেদিকে তাকাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট্ করিত !

বধূর কাছে একজোড়া পুরনো তাস ছিল ; ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় জড়ো করা আছে মাত্র, অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে-মধ্যে নাড়েচাড়ে। রাণুদির বাড়িতে মাঝে-মাঝে দুপুরবেলা তাসের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া-বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি—কাগজ ধরা লইয়া প্রায়ই মারামারি হয়—বেশ খেলা !

সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক-একদিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়। তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না। সকলে বলে—ও কিচ্ছু খেলা জানে না।

সে যদি একজোড়া তাস পায়, তবে সে, মা আর দিদি খেলে। সন্ধ্যার পরে বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। খুব ছোট্ট একখানা ফুলকাটা রেকাবিতে আলাদা করিয়া নুন ও লেবু কেন ? নুন-লেবু তো মা পাতেই দেয়। প্রত্যেক তরকারির জন্যে আবার আলাদা-আলাদা বাটি !—উঃ, তরকারিই-বা কত !

অত বড় গলদা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য ?

লুচি ! লুচি ! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশে নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়।....

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ি আসিল।

এই তো মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছিল না।

দুর্গার খেলা কয়দিন ভালো রকম জমে নাই। অপুর বিদেশযাত্রার দিনকতক আগে দেশি-কুমড়ার শুকনা খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ

হইয়া গিয়াছিল ; এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছিমিছি এ নিয়ে ঝগড়া করে তার কান মলে দিলাম ? আসুক সে ফিরে, আর কখখনো তার সঙ্গে ঝগড়া করব না, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক ! .... বাড়ি আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী সর্বত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস সে দেখিয়াছে এই কয়দিনে ! ....

রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকার রেলগাড়ি যায়। মাটির আতা, পেঁপে, শশা—অবিকল যেন সত্যিকার ফল। সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনি বাজাইতে শুরু করে ! তারপর অমলা-দি । কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুল ভরা বিল—কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জন পথ বাহিয়া। সেই যে কোন গাঁয়ে পথের ধারে কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ-চিঁড়ে-বাতাসা খাইতে দিয়াছিল ! কোনটা ফেলিয়া সে কোনটার গল্প করে ? রেল-রাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার-বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় নোয়াগুনো দেখলি অপু ? তার টাঙানো বুঝি ? খুব লম্বা ? রেলগাড়ি দেখতে পেলি ? গেল ? না—রেলগাড়ি অপু দেখে নাই। ঐটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা চার-পাঁচ রেল-রাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ি দেখা যাইত, কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কী যেন একটা সরু দড়ির মতো বুকে আটকাইল ও সঙ্গে-সঙ্গে কি একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল ও দুইদিক হইতে দুটো কাঠির মতো উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল—কিছু ভাল করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পক্ষণ পরেই অপু বাড়ি আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—এ কী ! বা রে ? আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে ?

পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয় ! কখখনো আর কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ি ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বসিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাঁঠালবিচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রাদলের অভিমন্যুর ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশির সপ্তমের মতো রিনরিনে তীব্র মিষ্টসুরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট করে ছোটাগুলো বুঝি বনবাগান ঘেঁটে নিয়ে আসিনি ?

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেচিস ? কি হয়েছে ?

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না ? কাঁটায় আমার হাত-পা ছড়ে যায়নি বুঝি ?

—কী বলে পাগলের মতো ? হয়েচে কী ?

—কী হয়েচে ? আমি এত কষ্ট করে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম, আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না ?

—তুমি যত উদ্‌ভুটটি কাণ্ড ছাড়া তো এক দণ্ড থাক না বাপু ! দেখিচি কি পথের মাঝখানে কী টাঙানো রয়েছে—টেলিগিরাপ কি ফেলিগিরাপ ? আসচি তাড়াতাড়ি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কী করব বলো ?

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ, কি ভীষণ হৃদয়হীনতা। আগে-আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালবাসে, অবশ্য যদিও তাহার ভ্রান্ত ধারণা অনেক দিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর, পাষাণীরূপে কখন স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই! কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহুকষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চলতা কত কষ্টে যোগাড় করিয়া সে আনিল—এখুনি রেল-রেল খেলা হইবে—সব ঠিকঠাক, আর কি না ....ওঃ ...

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণবিধানো কথা বলিতে চাহিল; এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধহয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়ে তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাব না, যাও—কক্‌খনো খাব না।

তাহার মা বলিল—না-খাবি না-খাবি যা, ভাত খেয়ে একেবারে রাজা করে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না। না খাবি যা, দেখব খিদে পেলে কে খেতে দ্যায়?

বাস্! চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি, তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁঠালবিচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মতো উবিয়া গেল! কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ি ঢুকিতেই দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিতসুরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস অমন করে, কী হয়েচে? ও অপু, শোন—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি, যতসব অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড়-মাস কালি হয়ে গেল! কী এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেছে, আসছি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কী হবে? আমি কি ইচ্ছে করে ছিঁড়িচি? তাই ছেলের রাগ—আমি ভাত খাব না। না খাস যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়। সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাস-নয়নে ও-পাড়ার পথে রায়দের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া ছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ি আসিয়া তাহাকে দেখিত, তবে সে কখনই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু—যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত আবার তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকি নাই, ঠিক যেন একবারে সত্যিকার রেলরাস্তার তার!

সে সতুদের বাড়ি গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়ির উঠোনে, চল রেল-রেল খেলা করি—আসবে?

—তার কে টাঙিয়ে দিল রে?

—আমি নিজে টাঙালাম! দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল।

সতু বলিল—তুই খেলগে যা, আমি এখন যেতে পারব না। অপু মনে-মনে বুঝিল বড় ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া খেলার যোগাড় করা তাহার কর্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সে সতুর কাছে গেল। নিরাশমুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল—চল না সতুদা, যাবে তুমি, আমি আর দিদি খেলবো এখন। পরে সে

প্রলোভনজনক ভাবে বলিল—আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো বাতাবি নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল।—যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখচোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিয়াছিল—এত করিয়া বলিয়াও সতুদার মন ভিজিল না! ...

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইঁট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের যোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশি রাখে। দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে আলুর ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচার পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব-লবণ—আরও কত কী সংগ্রহ করিয়া আনিল; আনিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল—চিনি কিসের করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভাল বালি আছে, মা চাল-ভাজা ভাজবার জন্যে আনে; সেই বালি চল আনিগে—সাদা চকচক কচ্ছে—ঠিক একেবারে চিনি।

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে-খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন-চটকা গাছের আগডালে একটা বড় লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড়-বড় সুগোল কী ফল দুলিতেছে! অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় গোটাকয়েক ফল নিচের দিকের লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপভাবে রক্ষিত হইল যে, খরিদ্দার আসিলে প্রথমেই যেন তাহার নজরে পড়ে।...

পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া দোকানের পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িয়া গেল—ও সতুদা, দেখ-না, কী রকম দোকান হয়েছে। কেমন ফল এই দেখ; আমি আর দিদি পেড়ে আনলাম। কি ফল বল দিকি? জান?

সতু বলিল—ও তো মাকাল-ফল, আমাদের বাগানে কত ছিল! সতু আসতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল; সতুদা তাহাদের বাড়িতে তো বড় একটা আসে না। তা ছাড়া সতুদা বড় ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলায় ছেলেমানুষিটুকু যেন কতকটা ঘুচিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল—ভাই, আমাকে দুমণ চাল দাও, খুব সরু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে।

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন, না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল—না বৈ কি? তোমরা তো হলে কনেযাত্রী—সকালে এসে নকুতো করে নিয়ে যাব। সতুদা, রাণুকে বলবে আজ রাত্তিরে যেন চন্দন বেটে রাখে, কাল সকালে নিয়ে আসব—

দুর্গার কথা ভাল করিয়া শেষ হয় নাই, এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত পণ্যের মধ্য হইতে কী যেন তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল; সঙ্গে-সঙ্গে অপুও—ওরে দিদিরে, নিয়ে গেলরে—বলিয়া, তাহার রিন্‌রিনে গলায় চিৎকার করিতে-করিতে সতুর পিছনে-পিছনে ছুটিল।

বিস্মিত দুর্গা ভাল করিয়া ব্যাপারটা কী বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার

বাহির হইয়া চলিয়া গেল ! সঙ্গে-সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল-ফল তিনটির একটিও নাই !

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল—সতু গাবতলার পথে আগে-আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু-পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে তিন-চার বৎসরের বেশি ; তাহা ছাড়া সে অপুর মতো ওরকম ছিপছিপে মেয়েলি গড়নের ছেলে নয়—বেশ জোরালো হাত-পা-ওয়ালা শক্ত। তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে, তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে !

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে, সতু গতিবেগ কমাইয়া একবারটি নিচু হইয়া যেন পিছন ফিরিয়া চাহিল, সঙ্গে-সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। পরক্ষণে সতু ছুটিয়া চাল্‌তেতলার পথে পড়িয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌঁছিয়াছে। অপু একটু সামনের দিকে নিচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে। দুর্গা বলিল—কী হয়েচে রে অপু ?

অপু ভাল করিয়া না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দুহাত দিয়া চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে বলিল—সতুদা চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেচে দিদি ; চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল—সর-সর দেখি, ওরকম করে চোখ রগড়াস্‌নে ; একটু তাকা দেখি ! অপু তখনি দুহাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল—উঁহু দিদি, চোখের মধ্যে কেমন কচ্ছে—চাইতে পাচ্ছিনে; আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েচে দিদি।

—দেখি-দেখি, ওরকম করে চোখ রগড়াস্‌নে—সর। পরে সে কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল। দুর্গা তাহার দুই চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল—এখন বেশ দেখতে পাচ্ছিস তো ? আচ্ছা, তুই এখন বাড়ি যা, আমি ওদের বাড়ি গিয়ে ওর মাকে আর ঠাক্‌মাকে সব বলে দিয়ে আসচি—রাণুকেও বলব। আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো। যা, আমি আসচি এক্‌খুনি।

রাণুদের খিড়কির দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু আর যাইতে সাহস করিল না। সেজ-ঠাক্‌রুনকে সে ভয় করে, খানিকক্ষণ খিড়কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিয়া সে বাড়ি ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল—অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি সামনে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচ-কাদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখন কাঁদে না—রাগ করে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে ; অত সাধের ফলগুলি গেল, তাহা ছাড়া আবার চোখে ধুলা দিয়া এরূপ জব্দ করিল ! অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না —তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল, সান্ত্বনার সুরে বলিল—কাঁদিসনে অপু। আয়, তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্ছি—আয়। চোখে কি আরো ব্যথা বাড়চে ? দেখি, কাপড়খানা বুঝি ছিড়ে ফেলেচিস ?...

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠাবাড়ির পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রঙের সেকালের বেতের পেঁটরা, কড়ির আলনা, জলচৌকিতে ঘর ভরা। এমন সব বাক্স আছে

যাহা অপু কখনও খুলিতে দেখে নাই, তাকে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ি-কলসি আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সবসুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরনো জিনিসের কেমন একটা পুরনো-পুরনো গন্ধ বাহির হয়। সেটা ঠিক কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু তাহা যেন বহু অতীতকালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সেই অতীত দিনে সে ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ঐ ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ কাঠের বড় সিন্দুকটা ছিল ! ওই যেখানে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জঙ্গলে ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে !

যখন সে একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়, তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া, দিনের আলোয় পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোশে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল, সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের ; তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নিচে নামাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে। এক-একদিন বনের ধারের জানলাটায় বসিয়া সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে। সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মতো আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মতো পড়িয়া যায়—অনেকটা বুঝিতেও পারে।

পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। তাহার বাবা মাঝে-মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলি-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে লইয়া যায়। রামায়ণ কি পাঁচালি পড়িতে দিয়া বলে—পড় তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো !

বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন। দীনু চাটুয্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়েস হবে, দু-তিন-খানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে, বিশ্বাস করবে না, এখন, ভাল করে অক্ষর, চিনলে না ! বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে। ঐ যে-ক'দিন আমি আছি রে বাপু, তারপর চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠি ধরতে হবে।

পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে ভাবে—ওকি তোমাদের হবে ? করলে তো চিরকাল সুদের কারবার ! হলামই-বা গরিব, হাজার হোক পণ্ডিতবংশ তো বটে। বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেননি পুঁথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায় ?...

তাহাদের ঘরের জানলার কয়েক হাত দূরেই বাড়ির পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কী বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে ! জানলায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে-ওগাছে দোদুল্যমান কতরকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি বনচালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নিচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখির নাচ। বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কটুওলের সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের বাড়ির ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ-বন অফুরন্ত ঠেকে। সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ-বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই ! শুধু এইরকম তিন্তিরাজ

গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা-মোটা গুলঞ্চলতা দুলানো, থোলো-থোলো বন-চালতার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এ গাছের তলা দিয়া বনকলমি, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে-চলিতে কোথায় কোনদিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে ; শুধুই বন ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আসে।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা পুরনো পুকুর আছে, তারই পারে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেইরকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা। একসময় কী বিষয়ে সফলমনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন ; তাহাতে রুষ্ট হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে, তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—আর কখনও ফিরিবেন না। সে অনেক কালের কথা। বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে। এরূপ মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিনগাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন, সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুরমতো বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টসুরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনের মধ্যে ওলাউঠার মড়ক আরম্ভ হবে। বলে দিও চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দতলায় একশো আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজো করে। ... কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারে শীতসন্ধ্যার কুয়াশায় ধীরে-ধীরে মিলাইয়া গেল। ... এই ঘটনার দিনকয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এসব গল্প কতবার অপু শুনিয়াছে! জানলার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে উঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? সে বনের পথে হয়তো গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—হঠাৎ সেই সময় যেন—

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা-পাড় শাড়ি পরনে, হাতে-গলায় মা-দুর্গার মতো ঝকমক করিতেছে হার আর বালা।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে, কী বর চাও?

দুপুরবেলা কোনো-কোনো দিন সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক-একবার ঝিরঝির হাওয়ায় কত কী লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে। কোনো বটগাছের মাথার উপর হইতে ঘাঙ-চিল টানিয়া-টানিয়া ডাকে—

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না ; ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই।

জানলার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা! নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর ; গুলঞ্চলতার তার টাঙানো—খেজুর ডালের ঝোপ। বনের দিক হইতে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়, রাঙা রোদটুকু জেঠামশায়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবিলেবু গাছের মাথায় চিকচিক করে, চকচকে বাদামি রঙের ডানাওয়ালা তেড়োপাখি বনকলমি-ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে। তাজা মাটির গন্ধ—ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া উঠে। কাহাকে সে কী করিয়া বুঝাইবে কী সে আনন্দ? ...

নয়॥ শকুনির ডিম

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়াছিল। কয়েকস্থানে বিফলমনোরথ হইয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ুইয়ের বাড়ির নিকটবর্তী তেঁতুলতলার কাছে আসিয়াই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়িখেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলেপাড়ার ছেলে, কেবল ব্রাহ্মণপাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই, কারণ পটুর যে পাড়ায় বাড়ি, অপুদের বাড়ি হইতে তাহা অনেক দূর। অপুর চেয়ে বয়সে পটু কিছু ছোট । অপুর মনে আছে, প্রথম যেদিন সে প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভর্তি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল। অপু তাহার কাছে গিয়া বলিল—ক'টা কড়ি? পটু কড়ির গেঁজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা সুতার বুনানি ছোট্ট গেঁজেটি—তাহার অত্যন্ত শখের জিনিস। বলিল—সতেরোটা এনেচি—সাতটা সোনা-গেঁটে ; হেরে গেলে আরও আনব। পরে সে গেঁজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল—কেমন দেখছিস? গেঁজেটায় একপণ কড়ি ধরে। খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে শুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে, কড়িখেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে ; সেইজন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু উপর হইতে টুক করিয়া বড় কড়ি দিয়া তাক ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া-পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বারবার গেঁজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটা ভর্তি হইতে আর কত বাকি!

কয়েকজন জেলের ছেলে কী পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল—আর এক হাত তফাত থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতের টিপ বেশি।

পটু বলিল—বা রে, তা কেন, টিপ বেশি থাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেতো-না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

পরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল—এত বেশি কড়ি আমি কোনদিন জিতিনি ; আজ আর খেলচিনে—খেললে কি এই কড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে পারব? আবার এক হাত বাধ বেশি! সব হেরে যাব! ... হঠাৎ সে ছোট্ট থলিটি হাতে লইয়া বলিল—আমি এক হাত বেশি নিয়ে খেলব না, আমি বাড়ি যাচ্ছি ... পরে জেলের ছেলেদের ভাবভঙ্গি ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল। একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি?....সঙ্গে-সঙ্গে সে হঠাৎ পটুর থলিসুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পারিল না ; বিষণ্ণমুখে বলিল—বা রে, ছেড়ে

দাও–না আমার হাত !...পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল। সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ির থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা। পড়িয়া গিয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল ; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিতে পারিবে ! হাত হইতে কড়ির থলিটা অনেকক্ষণ কোন ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল—কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর দুর্দশায় একটু যে খুশি না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সে–ও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায়ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল—ছেলেমানুষ ওকে তোমরা মারচ কেন? বা রে, ছেড়ে দাও—ছাড়ো ! পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার ঘুষি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না ; তারপর ঠেলাঠেলিতে সে–ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

অপু কাউকে একথা এখনও বলে নাই—দিদিকেও না।

সেদিন সে দুপুরবেলা বাবার অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপিচুপি বইয়ের বাক্সটা খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ–বই ও–বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা বইয়ের মধ্যে ভাল গল্প লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়ের মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব–দর্শন–সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কী বা বইখানা কোন বিষয়ের—তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ–কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল–কাগজের নিচ হইতে বাহির হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে নিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরনো–পুরনো গন্ধ ! মেটে রঙের পুরু–পুরু পাতাগুলার এই গন্ধটা তাহার বড় ভাল লাগে; গন্ধটায় কেবলই তাহার বাবার কথা মনে করাইয়া দেয় !

অত্যন্ত পুরনো মার্বেল–কাগজের বাঁধাই মলাট—নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এইরকম পুরনো বইয়ের উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেইজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে–পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে, কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ–কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে–করিতে লেখক লিখিয়াছে—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া, মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে যদৃচ্ছা বিচরণ করতে পারে !

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, আবার পড়িল—আবার পড়িল। পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে–ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি? তাহার দিদি বলিতে পারে না।

সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীপু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে—সে এখানে নয় ; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায় !... তাহার মা বকে—এই ঠিক

দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস !..... অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে ও বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে। আশ্চর্য ! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ি নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে ; হয়তো এই জায়গাটা আর কেউ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরনো–পুরনো গন্ধটা ! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো অবিশ্বাস থাকে না। পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে সে জানে। আয়নার পিছনে পারা মাখানো থাকে ; একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, উহা সে যোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় কী করিয়া পায়?

সন্ধ্যান অবশেষে মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁঠালতলায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়িতে তেল–তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে–মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস, আমি দুটো পয়সা দেব।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ির সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রঙের ছোট–ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই দেখ ঠাকুর, এনেচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল—দেখি ! পরে আহ্লাদের সহিত নাড়িয়া–চাড়িয়া বলিল—শকুনির ডিম !—ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভূরিভূরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগ্‌ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে ; কিন্তু দুইটি দুই আনার কমে দিবে না। পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল—দুটো পয়সা দেব, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেব, একটা টিনের কৌটোভর্তি কড়ি সব। এই এত বড়–বড় সোনা–গেঁটে—দেখবি, দেখাব?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল ! সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া–চিন্তিয়া আর দুইটা পয়সা যোগাড় করিয়া দাম চুকাইয়া দিয়া ডিম দুইটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলো অপুর প্রাণ, অর্ধের রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনও হাতছাড়া করিত না অন্য সময় ; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুনবিচি খেলা !

ডিমটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে–সঙ্গে তাহার প্রাণটা যেন ফুঁ দেওয়া রবারের বেলুনের মতো হাল্কা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তারপর যেন একটু সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল। সন্ধ্যার আগে একা–একা নেড়াদের আমগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল—সত্যি–সত্যি উড়া যাইবে তো ! আচ্ছা, সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখপাখি ময়নাপাখির মতো ও–ই আকাশের গায়ে তারা যেখানে উঠিয়াছে ওখানে?....

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতা পাকাইবার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকের হাঁড়ি–কলসির পাশে গোঁজা ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে–হাতড়াইতে কী যেন ঠক্ করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না—দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা, কিসের দুটো বড়–বড় ডিম এখানে ! এঃ, পড়ে একেবারে

গুড়ো হয়ে গিয়েচে ! দেখেচ, কী পাখি ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা !

তাহার পর কী ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভাল। অপু সমস্ত দিন খাইল না। রুদ্রমূর্তি, কান্নাকাটি—হৈ-হৈ কাণ্ড।....

তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কী কাণ্ড ! ওমা, এমন কোথাও তো কখনও শুনিনি ! শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে? ওই ওদের বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটা—তাকে বুঝি বলেছে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কিসের ডিম এনে বলেচে—এই নাও শকুনীর ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কী বোকা, সে আর কী বলব ! কী করি যে এ-ছেলে নিয়ে আমি !

কিন্তু বেচারী সর্বজয়া কী করিয়া জানিবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত !

দশ ।। মুচুকুন্দচাঁপা

অনেকদিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। এই গৌরবর্ণ, সদানন্দ বৃদ্ধটি সামান্য একখানি খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন ; অপুর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে-মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত ; সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে-মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়—দাদু আছ? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা পাতিয়া দিয়া বলেন—এস দাদাভাই এস, বসো-বসো।

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কিন্তু এই সরল বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে। বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ—খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মতো। নরোত্তম দাসের কেহ নাই ; বৃদ্ধ একাই থাকেন ; এক স্বজাতীয়া বৈষ্ণবের মেয়ে দুইবেলা কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া-বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, কিন্তু সতীর্থ। এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায় ! গল্প করিতে-করিতে অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমিই আমার বালক গোরা ! তোমায় দেখলে আমার মনে হয়, দাদু, আমার গৌরচন্দ্র তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতোই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ, সরল ছিলেন ; ওইরকম দিব্য ভাব-মাখানো চোখ-দুটি ছিল তাঁরও !

অন্যস্থানে এ-কথায় অপুর হয়তো লজ্জা হইত ; এখানে সে হাসিয়া বলে—দাদু, তা হলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে-পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোটে দুখানি ; দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন—আমি মরবার সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাব দাদু। জানি তোমার হাতে এ বইয়ের অপমান হবে না।...

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতিপথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে।

তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, বিচিত্র পাখি ও গাছপালার সাহচর্যের মতো অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে। দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাই তাহার এত প্রবল !

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। বিছানায় সেগুলি সে রাখিয়া দেয়। তাহার পর সন্ধ্যার আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে তাহাকে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্টাখানেকের বেশি কোনদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যেন হইয়া গেল। পরে ছুটি পাইয়া সে খাইতে যায়। খাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে—আর অমনি সে আজিকার দিনে সকল খেলাধুলা, সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া উঠে ; বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়। ....

এগারো ।। চড়ুইভাতি

একদিন চুপিচুপি দুর্গা বলিল—চড়ুইভাতি করবি অপু?

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে কুলুই-চণ্ডীর ব্রতের বনভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়। তাহার মা-ও যায়, কিন্তু আজকাল তাহাকে আর লইয়া যায় না। সেখানে সব নিজের-নিজের জিনিসপত্র। অত উপকরণ তাহাদের নাই। বনভোজনে গিয়া আর সকলে বাহির করে কত কী জিনিস—ভাল চাল, ডাল, আলু, ঘি, দুধ। তাহার মা বাহির করে শুধু মোটা চাল, মটরের ডালবাটা, আর দুই-একটা বেগুন। পাশে বসিয়া ভুবন মুখুয্যেদের সেজ-ঠাকরুনের ছেলেমেয়েরা নতুন আখের গুড়ের পাটালি দিয়া দুধ ও কলা মাখিয়া ভাত খায় ; নিজের ছেলেমেয়ের জন্য তাহার মায়ের মন কেমন করে। তাহার অপু ঐরকম দুধ-কলা দিয়া পাটালি মাখিয়া ভাত খাইতে বড় ভালবাসে।

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওপারে খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে দ্যাখ, তেঁতুলতলায় মা আসচে কি না, আমি চাল-ডাল বের করে নিয়ে আসি শিগগির করে।

একটা ভাল নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপিচুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে তুলিয়া লইল। মালমশলা বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া দিয়া বলিল—শিগগির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু ! সেইখেনে রেখে আয়, দেখিস যেন গরু-টরুতে খেয়ে না ফেলে।

চারিদিক বনে ঘেরা ; বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মতো ছোট্ট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই দ্যাখ অপু, কত বড়-বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা থেকে। পুঁটুদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেব।

অপু মহা-উৎসাহে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বনভোজন। অপুর এখন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারি রান্না হইবে, না, খেলাঘরের বনভোজন—যা কতবার হইয়াছে—সেইরকম—ধুলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁটাল-পাতার লুচি।

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি। বড় সুন্দর স্থান বনভোজনের। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে-ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে ; বাতাবি লেবু গাছটায় কয় দিনের কুয়াশায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা-থোপা সাদা-সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

চড়ুইভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ির উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন, নিয়ে আয় তো ডেকে, অপু। একটু পরে অপুর পিছনে-পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল ; একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কী হচ্চে দুগ্‌গা দিদি?

দুর্গা বলিল—আয়না বিনি, চড়ুইভাতি কচ্চি—বোস।

বিনি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে। পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে সরু-সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা। যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে বাস করে। অবস্থাও ভাল নয়।

বিনি সানন্দে দুর্গার ফরমাইস খাটিতে লাগিল। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুকনো কাঠ দ্যাখ তো—আগুনটা জ্বলচে না ভাল।

বিনি তখনি কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি, না আর আনব?

দুর্গা যখন বলিল—বিনি এসেচ, ও-ও তো এখানে খাবে, আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু। বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কী-কী তরকারি দুগ্‌গা দিদি? দুর্গা ভাত নামাইয়া, তেলটুকু দিয়া তাহাতে বেগুন ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন-ভাজার মতো রঙ হচ্চে দেখিচিস অপু? ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুনভাজা, না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়! তাহারও এখনও যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, তাহাদের বনভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুনভাজা সম্ভবপর হইবে। তাহার পর তিনজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন ভাজা,আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়াছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে—কেমন হয়েছে রে বেগুনভাজা?

অপু বলে—বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন!

লবণকে ইহারা ভুলক্রমে একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাতৃপ্তিতে তিনজনে কোষো আলুর ফল-ভাতে ও পানসে আধপোড়া বেগুনভাজা দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বসিল! দুর্গার এই প্রথম রান্না—প্রথম এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনা লতাপাতার রাশের মধ্যে খেজুরতলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুরপাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারে ভাত-তরকারি খাওয়া!

খাইতে-খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি-হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন!

বিনি খাইতে-খাইতে ভয়ে-ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি? মেটে আলুর ফল-ভাতে মেখে নিতাম। দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল।

অপু বলিল—মাকে কী বলবি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

—দূর, মাকে কখনও বলি! সন্দের পর দেখিস খিদে পাবে এখন।

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়, তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপুর গেলাসটা

দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দাও তো অপু! জলতেষ্টা পেয়েছে।

অপু বলিল—নাও না বিনিদি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাওনা!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না।

দুর্গা বলিল—নে-না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা-না!

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার একদিন বনভোজন করব, কেমন তো? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দিই?

অপু বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি।

একটা ভাঙা পাঁচিলের গুলগুলির মধ্যে হাঁড়িটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

বারো॥ সোনার কৌটো

দিনকয়েক পরে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ি রাণু দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে ; কিন্তু এখনও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলেমেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তার নাম টুনি। সন্ধ্যার একটু আগে সেজ-ঠাকরুন এঘরে কী কাজ করিতেছেন, টুনির মায়ের গলা তাঁহার কানে গেল। সেজ-ঠাকরুন দালানে আসিয়া বলিলেন—কী রে হাসি, কী? টুনির মা উত্তেজিতভাবে ও ব্যস্তভাবে বিছানাপত্র, বালিশের তলা হাতড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোশক উল্টাইয়া ফেলিয়াছে ; বলিল—এই একটু আগে আমার সেই সোনার সিঁদুর-কৌটোটা এই বিছানার পাশে এইখানটায় রেখেছি, খোকা দোলায় চেঁচিয়ে উঠল—আর তুলতে মনে নেই ; কোথায় গেল আর তো পাচ্ছিনে!

সেজ-ঠাকরুন বলিলেন—ওমা, সে কী? হাতে করে ও-ঘরে নিয়ে যাসনি তো?

—না সেজদি, এইখানে রেখে গেলুম! বেশ মনে আছে ; ঠিক এইখানে।

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করিল—কৌটার সন্ধান নাই। সেজ-ঠাকরুন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ-বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছিল, তারপর খাবার খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ-ঠাকরুনের ছোট মেয়ে টেঁপি চুপিচুপি বলিল—আমরা যেই খাবার খেতে গেলাম, তখন দেখি যে দুগ্‌গাদি খিড়কি-দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মাত্তর আবার এসেচে।

সেজ-ঠাকরুন চুপিচুপি কী পরামর্শ করিলেন ; পরে রুক্ষস্বরে দুর্গাকে বলিলেন—কৌটো দিয়ে দে দুগ্‌গা, কোথায় রেখেছিস বল—বার কর এখুনি বলচি ; নইলে—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজ-ঠাকরুনের ভাবভঙ্গিতে তাহার জিভ যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। সে অস্পষ্টভাবে কী বলিল ভাল বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই ; একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরাতে সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল। বিশেষত দুর্গাকে সে কয়দিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ—কথাবার্তা ভাল বলিয়া দুর্গাকে পছন্দ করে ; সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব? টুনির মা বলিল—ও নেয়নি বোধহয় সেজদি, ও কেন—

সেজ-ঠাকরুন বলিলেন—তুমি চুপ করে থাকো-না! তুমি ওর কী জান, নিয়েচে কি না-নিয়েচে? আমি জানি ভাল করে।

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস বের করে দে না, নয়তো কোথায় আছে বল—আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি—কেন মিথ্যে—

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল ; তাহার পা ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, সে দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি জানিনে কাকীমা—সত্যি বলচি !

সেজ–ঠাকরুন বলিলেন—বললেই আমি শুনব? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ভাল কথা বলচি কোথায় রেখেছিস দিয়ে দে। জিনিস দিয়ে দাও তো কিছু বলব না—আমার জিনিস পেলেই হল। পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—ভদ্দর–লোকের মেয়ে চুরি করে—কোথাও শুনিনি তো কখনও। এ পাড়াতেই বাড়ি নাকি?

সেজ–ঠাকরুন বলিলেন—তুমি ভাল কথার কেউ নও, না? দেখবে তুমি মজাটা একবার? তুমি আমার বাড়ির জিনিস নিয়ে হজম কত্তে গিয়েচ—এ কি যা তা পেয়েচ বুঝি? তোমায় আমি আজ—

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের ঠিক মাঝখানে আনিয়া বলিলেন—দুর্গা, বল এখন কোথায় রেখেচিস ? ...বলবি নে? ...না, তুমি জান না, তুমি কচি খুকি—তুমি কিচ্ছু জান না ! শিগগির বল, নৈলে নোড়া দিয়ে দাঁতের পাটি সব ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলব এখুনি ! বল শিগগির—বল এখনও বলচি।

টুনির মা ছাড়াইয়া দিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন বলিলেন—রোসো–না, দেখচ না ও–ই নিয়েচে ! চোরের মারই ওষুধ—দিয়ে দাও, এখুনি মিটে গেল ! আর কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল ! সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতিকষ্টে শুকনো জিভে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানি না কাকীমা, ওরা সব চলে গেলে আমিও তো.....ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া সেজ–ঠাকরুনের দিকে চোখ রাখিয়া দেওয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া যাইতে থাকিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল।

তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল—পাকা চোর !

টেঁপি বলিল—বাগানের আমগুলো ওর জ্বালায় তলায় পড়বার যো নেই কাকীমা !

শেষোক্ত কথাতেই বোধহয় সেজ–ঠাকরুনের কোনো লুকানো ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাঁই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবেরে পাজি, নচ্ছার, চোরের ধাড়ি, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দাও কি না দাও। ... কথা শেষ করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন।...বল, কোথায় রেখেচিস—বল এখুনি—বল শিগগির বল।

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজ–ঠাকরুনকে হাত ধরিয়া বলিল—করেন কী, করেন কী সেজদি ! থাকগে আমার কৌটো, ওরকম করে মারেন কেন? ছেড়ে দিন, থাক হয়েচে, ছাড়ুন, ছি ! টুনি মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল ! পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—এঃ, রক্ত পড়চে যে !

দুর্গার নাক দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে আগে কেহ লক্ষ করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন—শিগগির একটু জল নিয়ে আয় টেঁপি, রোয়াকের বালতিতে আছে দ্যাখ।

চেঁচামেচি ও হৈ–চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ির কামারদের ঝি–বৌরা ব্যাপার কী দেখিতে আসিল। রাণুর মা এতক্ষণ ছিলেন না—দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর কামারবাড়ি বসিয়া গল্প

করিতেছিলেন, তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতেছিল, সে দিশেহারাভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া কী দেখিল। জল আসিলে রাণুর মা তাহার চোখেমুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল, সে মোহগ্রস্তের মতো বসিয়া পড়িল। রাণুর মা বলিলেন—অমন করে কি মারে সেজদি? আহা, রোগা মেয়েটা—ছি !

—তোমরা ওকে চেননি এখন ! চোরের মার ছাড়া ওষুধ নেই—এই বলে দিলুম। মারের এখন হয়েচে কী, জিনিস না পাওয়া গেলে, অমনি ছাড়ব নাকি? হরি রায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর।

রাণুর মা বলিলেন—খুব হয়েচে, এখন একটু সামলাতে দাও সেজদি। যে কাণ্ড করেচ !

টুনির মা বলিল—ওমা, এত কাণ্ড হবে জানলে কে কৌটোর কথা বলত? বাবা, চাইনে আমার কৌটো, ওকে ছেড়ে দাও সেজদি।

সেজ–ঠাকরুন এত সহজে ছাড়িতেন কি না বলা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দিতে লাগিল। কাজেই তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রাণুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কির উঠানে বাহির করিয়া দিলেন; বলিলেন—ভাল ক্ষণে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক ! যা, আস্তে–আস্তে যা ; টেঁপি খিড়কিটা ভাল করে খুলে দে।

তেরো।। হলুদ বনে বনে

গ্রামের বারোয়ারি চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ি–বাড়ি চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন।

হরিহর বলিল—না খুড়ো, এবার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অন্যেয় হয়েছে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা?

বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল। এরকম দলটি এ–অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি।

চড়কের আর বেশি দেরি নাই। বাড়ি–বাড়ি গাজনের সন্ন্যাসীরা নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার–নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে–পিছনে পাড়ায়–পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্যান্য গৃহস্থের বাড়ি হইতে পুরনো কাপড়, সিধা, পয়সা দেয়—কেউ–বা ঘড়া দেয় ; তাহারা কিছুই দিতে পারে না দুটো চাল ছাড়া। এজন্য তাহাদের বাড়িতে এ–দল কোনো বারই আসে না ! দশ–বারো দিন সন্ন্যাসী–নাচনের পর চড়কের পূর্বরাত্রে নীলপূজা আসিল। নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে। দুর্গা আসিয়া খবর দিল—প্রতি বৎসরের যে গাছটাতে কাঁটা ভাঙা হয়, এবার সেটাতে হইবে না, নদীরে ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা–ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে ; চড়কতলার মাঠের শেওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রাণু, পুঁটি, টুনু। এদের বাড়িতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মতো টো–টো করিয়া যেখানে–সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতিকষ্টে বলিয়া–কহিয়া ইহারা নীলুর সঙ্গে চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনু বলিল—আজ রাত্তিরে সন্ন্যাসীরা শ্মশান জাগাতে যাবে।

রাণু বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে! তারপর মড়ার মুণ্ডু নিয়ে আসবে, ছড়া বলতে-বলতে আসবে; ওর সব মন্তর আছে।

দুর্গা বলিল—আমি জানি ওদের ছড়া, শুনবি বলব?

স্বগ্‌গো থেকে এলো রথ, নামল খেতু-তলে।
চব্বিশ-কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে।।
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি।
শিব শিব বলরে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি।।

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্টবিহারের পুতুল হয়েচে নীলুদা! দাসু কুমোরের বাড়ি দেখে এলুম। দেখিসনি রাণু?

পুঁটি বলিল—সত্যিকার মড়ার মুণ্ডু রাণুদি?

—নয়তো কী? অনেক রাত্তিরে আসিস তো দেখতে পাবি।

—চল ভাই আমরা বাড়ি যাই—আজ রাতটা ভাল নয়। আয়রে অপু, দুগ্‌গাদি আয়।

অপু বলিল—কেন ভাল নয় রাণুদি? কী হবে আজ রাতে?

রাণু বলিল—সেসব কথা বলতে নেই, তুই আয় বাড়ি।

অপু গেল না, কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল। তারপর হঠাৎ মেঘ করিল; সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ি ফিরিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই। সন্ধ্যা হইতে শ্মশান ও মড়ার মুণ্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতেছে। মোড়ে বাঁশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটু গন্ধ বহিয়া যাইতেছে! সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল; আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুরমা নীলপূজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল—কিসের গন্ধ বেরিয়েছে ঠাকুমা?

বুড়ি বলিল—আজ ওঁরা সব বেরিয়েচেন কিনা? তারই গন্ধ আর কি!

অপু বলিল—কারা ঠাকুমা?

—কারা আবার—শিবের দলবল, সন্দেবেলা ওঁদের নাম করতে নেই। রাম-রাম—রাম-রাম!

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অপ্রিয় অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল—আমি কী করে বাড়ি যাব ঠাক্‌মা?

বুড়ি বকিয়া উঠিল—তা এত রাত্তির করাইবা কেন বাপু আজকের দিনে? এস আমার সঙ্গে! নীলপুজোর থালাখানা দিয়ে আসি, তারপর এগিয়ে দেবো'খন। ধন্যি যা হোক! ...

বারোয়ারিতলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রাদল এই-আসে এই-আসে করিয়া এখনও পৌঁছে নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে লোকে বলে—কাল সকালের গাড়িতে আসিবে; সকাল চলিয়া গেলে সকলে বৈকালের আশায় থাকে! অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বিছানায় ছটফট করে—এপাশ-ওপাশ করে।...যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

দুর্গা চুপিচুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া আসরসজ্জা ও বাঁশের গায়ে ঝুলানো লাল-নীল

কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে। অপুর মনে হয়, যে-পঞ্চাননতলায় সে দুবেলা কড়িখেলা করে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজরার দলের যাত্রার মতো একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটিবে, এও কি সম্ভব? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না। হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বৈকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চল্‌কাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে!

কুমোরপাড়ার মোড়ে দুপুর হইতেই ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, সন্ধ্যার একটু আগে দূরে একখানা গরুর গাড়ি তাহার চোখে পড়িল। সাজের বাক্স-বোঝাই গাড়ি—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচখানা! পটু একে-একে আঙুল দিয়া গনিয়া খুশির সুরে বলে—অপু-দা, আমরা এদের পেছনে-পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি?

সাজের গাড়িগুলোর পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে; সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে। পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধহয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ-বাতাসের রঙ একেবারে বদলাইয়া গেল। অপু মহাউৎসাহে বাড়ি ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কী লিখিতেছে ও গুনগুন করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে—যাত্রাদলের আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্ফূর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ি বাবা! উঃ, এরকম দল আর—

হরিহর শিষ্যবাড়ি বিলি করার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কিসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এতবড় ঘটনা বাবার জানা নাই। বাবাকে সে নিতান্তই কৃপার পাত্র বিবেচনা করে। সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারিতলায় যাব বাবা, সক্কলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি বসে-বসে পড়ব? এক্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়, পড়, এখন বসে পড়। যাত্রা আরম্ভ হলে ঢোল বাজাবার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে! তখন নাহয় যেও এখন! নিজে প্রায় সময়ে হরিহর আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ি আসিয়া ছেলেকে চোখের আড়াল করিতে মন চায় না। অভিমানে ক্ষোভে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্নাভরা গলায় আবার টানিয়া টানিয়া শুভঙ্করী শুরু করে—মাস মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত?

সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে—ওবেলা বসিবে। দুপুরবেলা অপু মায়ের কাছে গিয়া কাঁদো-কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে—দাও-না গা ছেলেটাকে ছেড়ে! বচ্ছরকারের দিনটা—তোমার তো ন'মাস বাড়িতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তক্কলঙ্কার ঠাকুর হয়ে উঠবে কিনা?

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারিতলায় কাটে। বৈকালে যাত্রা বসিবার পূর্বে ছুটিয়া বাড়িতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এ-সময় তাহাকে বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল না আমিও দেখতে যাব।

অপু বলে—মা, দিদি কেন আসুক-না আমার সঙ্গে? মেয়েদের জায়গা চিক দিয়ে ঘিরে দিয়েচে, সেইখানে বসবে!

মা বলে—এখন থাক, ওই ওদের বাড়ির মেয়েরা যাবে, আমি তাদের সঙ্গে যাব—ও আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারিতলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন অপু! সে

কাছে আসিতে হাসি-হাসি মুখে বলিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দুপয়সার মুড়কি কিনে খাস, নয়তো যদি লিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস।

ইহার দিন সাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপিচুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল—কী হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—লিচু খাব। কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে—বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে দিদি, অনেক লিচু পেড়েচে, দুঝুড়ি-ই।—এক পয়সায় ছটা, এই এত বড়-বড়, একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা! সতু কিনলে, সাধন কিনলে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আছে দিদি? দুর্গার বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরস মুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল; তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে দুটা পয়সা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মতো ভাইটা, মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারি মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে—দুগ্‌গা, একটা কাজ কর তো! রাণুদের বাগান থেকে দুটো গন্ধ-ভেদালির পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো—অপুর শরীরটা অসুখ করেচে, এটু ঝোল করে দোব।

মায়ের কথায় সে একছুটে রাণুদের বাগানে মানুষ-সমান-উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধ-ভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখ হইতে ছেলেবেলায় শেখা একটা ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—
নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে
—সুখ নেইকো মনে।

চোদ্দ ॥ রাজপুত্র অজয়

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে।

পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। কী সব সাজ! কী সব চেহারা!

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখতে পাচ্ছ তো?.... তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা, দিদি এসেছে? চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীর গুপ্ত-ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে-সুরে বেহালার সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ-রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া এক-এক পা করিয়া থামেন, আর এক-এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন—সত্যকার জগতে কোনো বনবাস-গমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজসেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে, মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা।

অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়। এমন তো সে কখন দেখে নাই!

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রানী! ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা—ভাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ নাই যে তাহাদের মুখের দিকে চায়, কেহ নাই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়; তারপর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—'কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথীরে'—

শুনিয়া অপু এতক্ষণ অপলক চোখে চাহিয়াছিল, আর থাকিতে পারে না—ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।...

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার-খেলা কী ভীষণ!...যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুঁড়া হয়, নয়তো কোনো হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বুঝি বিঁধিয়া যায়! রব ওঠে—ঝাড় সামলে—ঝাড় সামলে! কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশল, সব বাঁচাইয়া চলে। ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালার কসরতের সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুম পাচ্ছে, বাড়ি যাবে খোকা?... ঘুম! সর্বনাশ!... না, সে বাড়ি যাইবে না! বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে—এই দুটো পয়সা রাখ বাবা, কিছু কিনে খেও, আমি বাড়ি গেলাম। অপুর ইচ্ছা হয় সে এক পয়সার পান কিনিয়া খায়। পানের দোকানের কাছে কিসের অত্যন্ত ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখে, অবাক কাণ্ড! সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্ধ অবস্থায় সিগারেট কিনিয়া শোঁ-শোঁ টানিতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়! আবার আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুইয়ে হাত দিয়া বলিল—এক পয়সার পান খাওয়াও-না কিশোরীদা! রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার কোনো নিদর্শন দেখা গেল না, হাত ঝাড়া দিয়া বলিল—যাঃ, অত পয়সা নেই, ওবেলা সাবানখানা যে দুজনে মাখলে—আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল—খাওয়াও-না কিশোরীদা! আমি বুঝি কখনও কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপুরই সমবয়সী হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড় সুন্দর। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—বড় ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে। হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়; একটু লজ্জার সঙ্গে বলে—পান খাবে? অজয় একটু অবাক হয়, বলে—তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এস-না! দুজনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ অভিভূত হইয়া যায়! ইহাকেই সে এতদিন মনে-মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজয়কে! তাহার মায়ের শত-রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়া, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে—এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর। ঠিক সে যাহা চায় তাহাই! অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ি কোথায় ভাই? আমাকে একজনদের বাড়ি খেতে দিয়েছে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়ি খায় কে ভাই?

খুশিতে অপুর সারা গা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে; সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়িতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্ছে। তুমি কাল থেকে যেও, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব। ঢোলকওয়ালা নাহয় তুমি যে বাড়িতে আগে খেতে, সেখানে খাবে।

খানিকক্ষণ দুজনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ

সিনে আমার গান আছে।

শেষরাত্রের দিকে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ি ফেরে। পথে আসিতে-আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রা 'একটো' হইতেছে। দিদি জিজ্ঞাসা করে—ও অপু, কেমন যাত্রা শুনলি? অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কী বলিয়া উঠিল। কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! মহাখুশির সহিত সে বলে—অজয় যে সেজেছিল, মা, কাল থেকে সে আমাদের বাড়ি খেতে আসবে!

তাহার মা বলে—দুজন খাবে নাকি? দুজনকে কোত্থেকে—

অপু বলে—তা নাহয় একজন চলে যাবে, শুধু অজয় খাবে।

দুর্গা বলে—বল-না কেমন যাত্রা রে অপু?

—এমন কক্‌খোনো দেখিনি। কেমন গান কল্লে যখন সেই রাজকন্যে মরে গেল। অপু তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালার সঙ্গীত শোনে। একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে; শেষরাত্রে ঘুমাইয়াছে, তা-ও তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমায় নাই। সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে যেন সুঁচ বিঁধে; চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-ঢোল-মন্দিরার ঐকতান যেন তখন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে।

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে-বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল—কেহ বীরাবতী, কেহ কলিঙ্গ দেশের মহারানী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে—রাজকন্যা ইন্দুলেখা যে মাখানো। কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মন্দ মানায় নাই বটে, কিন্তু তাহার মনে-মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে-প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া; ঐ রকম রঙ, অমনি বড়-বড় চোখ, অমন সুন্দর চুল। দুপুর-বেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে এক জায়গায় খাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই; এক মাসি তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছরখানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশি কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপিচুপি বলিল—মা, ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বলো-না—সেই 'কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথীরে'।

অজয় গলা ছাড়িয়া গানটি গাহিল—অপু মুগ্ধ হইয়া গেল, সর্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা, এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল! সর্বজয়া বলিল—বিকেলে মুড়ি ভাজব, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেও—লজ্জা কোরো না যেন। যখন খুশি আসবে, আপনার বাড়ির মতো, বুঝলে?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল—ভাই, তোমার গলা বড় মিষ্টি, একটা গান গাও-না? অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরি লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে—এ একজন যাত্রাদলের ছেলে—এর কাছে তার গান গাওয়া! নদীর ধারে বড় শিমুলগাছটার তলায় চলা-চলতির পথ হইতে কিছু দূরে বাঁশঝোপের আড়ালে দুজনে বসে। অপু অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান ধরে—'শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত'—দাশু রায়ের পাঁচালির গান, বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক হইয়া যায়, বলে—তোমার এমন গলা ভাই। তা

তুমি গান শেখ না কেন? আর একটা গান গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—"খেয়ার আশে বসেরে মন ডুবল বেলা খেয়ার ধারে'। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড় ভাল লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়া লইয়াছিল; বাড়িতে কেহ না থাকিলে মাঝে-মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গানটা শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল—এমন গলা থাকলে যে-কোনো দলে ঢুকলে পনেরো টাকা করে মাইনে সেধে দেবে বলচি তোমায়—এর ওপর যদি শেখ।

বাড়িতে কেহ না থাকিলে দিদির সামনে গাহিয়া অপু কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে? গান হবে? দিদি তাহাকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে-আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হোক, আজ একজন খাস যাত্রাদলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ-প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কী উত্তর করিবে ঠাহর করিতে পারিল না। বলিল—তোমার ঐ গানটা আমায় শেখাও-না ভাই! তাহার পর দুজনে গলা মিলাইয়া সেই গানটা গাহিল।

অজয় অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছে। আর একটু বড় হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দিবে। অধিকারী বড় মারে। সে-আশুতোষ পালের দলে যাইবে—সেখানে বড় সুখ, রোজ রাত্রে লুচি! না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকি দেয়। এ-দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ি আসিবে ও সে সময় কিছুদিন থাকিবে।

বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল—চল ভাই, আজ আবার এখুনি আসর হবে, সকাল-সকাল ফিরি। যদি 'পরশুরামের দর্প-সংহার' হয়, তবে আমি নিয়তি সাজব; দেখো, কেমন একটা সুন্দর গান আছে!...

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে-ঘাটে-মাঠে, গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে-বাহিতে, রাখাল গরু চরাইতে-চরাইতে যাত্রার পালার নতুন-শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ি ডাকাইয়া, যাহার যে-গান ভালো লাগিয়াছে তাহার মুখে সে-গান ফরমাইশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

অপু আরও তিন-চারটি নতুন গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন যে যাত্রাদলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল—একটা গান গাহিতে হইবে।

সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভাল গান গাহিতে পারে। অপু বহু সাধ্যসাধনার পর নিজের বিদ্যা ভাল করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গান গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রঙের ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল, এস না খোকা, দলে আসবে? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত হইল। আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে—এস, চল, তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রাদলের কাজ করা যে মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য, সে-কথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কে বলিল—আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কী সাজতে দেবে? অজয় বলিল—এখন সখী-টখী, কি বালকের পার্ট এইরকম, তারপর ভাল করে শিখলে—

অপু সাজিতে চায় না ; জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য।

দিন পাঁচেক পরে যাত্রাদলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে, তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ির ছেলের মতো যখন-তখন আসিত-যাইত, এই কয়দিন সে অপুরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুরই বয়সী ছোট ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপুর মতো যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিসিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশি খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কোথায় শোয়, কী খায়, কে কোথায় দ্যাখে, তাহা বলিবার কেহ নাই! যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে

বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভাল কাপড়—

সর্বজয়া বলিল—না বাবা না, তুমি মুখে বললে এই খুব হল, টাকা দিতে হবে না ; তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে। তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

সকলে বাড়ির দরজার সামনে খানিকটা পথ তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বারবার বলিয়া গেল, দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়। গাবতলার ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্তি ভাঁটশেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলেমানুষ। আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে করতে। অপুর আমার যদি—উঃ মাগো।

পনেরো ॥ খয়ের-ভেজা কালি

প্রথম-প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল, তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, এ-অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভাল চাকুরি দিবে। (কাহারা চাকুরি দেয় সে-সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্র-বক্ষের মতো অস্পষ্ট। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল! ঘরের পোকা-কাটা কপাট দিন-দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল। আগে যাও-বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবুও সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারই একটা-একটা আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিকঠাক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া!....কিন্তু হয় কৈ? হরিহর বাড়ি হইতে গিয়াছে প্রাই দুই-তিন মাস। টাকাকড়ি খরচপত্রও অনেকদিন পাঠায় নাই। দুর্গা অসুখে ভুগিতেছে একটু বেশি ; খায়-দায়—অসুখ হয়, দুদিন একটু ভাল থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

দুর্গা একটা ছোট্ট মানকচু কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধরনা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে—তোর হল কী দুগ্‌গা? আজ কী বলে ভাত খাবি? কাল সন্ধেবেলাও তো জ্বর এসেছে! দুর্গা বলে—তা হোক মা, সে জ্বর বুঝি? একটু তো মোটে শীত করল। তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত—

তাহার মা বলে—অসুখ হয়ে তোর খাই-খাই বড্ড বেড়েছে। আজ আর কাল ভাল যদি থাকিস তো পরশু বরং দেব।

অনেক কাকুতি-মিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে—আজ খুব ভাল আছি, আজ আর জ্বর আসবে না আমার ; ওবেলা দুখানা রুটি আর আলুভাজা খাব।...একটু পরেই হাই ওঠে, সে জানে ইহা জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ। তবুও সে মনকে বুঝায়, হাই উঠুক, এমনি তো কত হাই ওঠে, জ্বর আর আসিবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়।

সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হুহু করে। ভাবে—জ্বর-জ্বর ভেবে এরকম হচ্ছে, সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি।

রাঙা রোদ শেওলাধরা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে—বোস দিকি একটু আমার কাছে, গল্প করি।

গল্প ভাল করিয়া শেষ হইতে-না-হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়। আজকাল বাবা বাড়ি নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বই-দপ্তরে ঘুণ ধরিবার যোগাড় হইয়াছে। সকালে সেই যে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে—ছেলের না নিকুচি করেচে, তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিকেয় উঠল? এবার বাড়ি এলে সব কথা বলে দেব, দেখো তখন তুমি।

অপু ভয়ে-ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলো খুলিয়া চারিদিকে ছড়ায়। মাকে বলে—একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেব।

পরে সে বসিয়া-বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের-ভিজানো কালি চকচক করে—অপু মহা খুশির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে ; ভাবে—আর একটু খয়ের দেব কাল থেকে—ওঃ কী চকচক করছে দেখ একবার! পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুকাইতে দিয়া কতটা আজ জ্বলজ্বল করে দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয়—আচ্ছা যদি আর একটু দিই?

একদিন মা'র কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে—ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল ড্যালা-ড্যালা খয়ের রোজ দরকার। রেখে দে খয়ের!

ধরা পড়িয়া অপু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে—খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি? আমি বুঝি এমনি এমনি—

—না, খয়ের নৈলে কালি হবে কেন? এইসব রাজ্যির ছেলে আর লেখাপড়া কচ্চে না? তাদের সের-সের খয়ের রোজ যোগান রয়েচে যে দোকানে!

অপু বসিয়া-বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া সে খাতা প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে—মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুহাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র সৃষ্ট হইবার অল্প পরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না-থাকা সত্ত্বে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনর্জীবন প্রাপ্তি ও বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনার বর্ণনা।

দপ্তরে একখানা বই আছে—বইখানার নাম 'চরিতমালা', লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরনো বই। তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে ; কোথা হইতে এখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে-মাঝে খানিকটা খুলিয়া পড়িয়া থাকে। বইখানাতে যাঁহাদের গল্প আছে, সে ঐরকম হইতে চায়।

ষোলো।। বাঁশবাগানের মাছ

বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবার এমনি জোরে আসে যে, বৃষ্টির ছাঁটে চারিধার ধোঁয়া-ধোঁয়া।

হরিহর মোটে পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছিল ; তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেও অনেক দিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খবর আসিবে। ছেলেকে বলে—তুই খেলে-খেলে বেড়াস বলে দেখতে পাসনে ; ডাক-বাক্সটার কাছে বসে থাকবি, পিওন যেমন আসবে আর অমনি জিগগেস করবি। অপু বলে—বা, আমি বুঝি বসে থাকিনে? কালও তো এল পুঁটুদের চিঠি, জিগগেস করে এস পুঁটুকে? আমি থাকিনে বৈকি!

বর্ষা রীতিমতো নামিয়াছে, অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। আকাশের ডাককে সে বড় ভয় করে। বিদ্যুৎ চমকাইলে মনে-মনে ভাবে—দেবতা কী রকম নলপাচ্ছে দেখেচ, এইবার ঠিক ডাকবে—পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে। বাড়িতে ফিরিয়া দেখে মা ও দিদি সারা বিকাল ভিজিতে-ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড়ো করিয়াছে।

অপু বলে—কোত্থেকে আনলে মা? উঃ কত!

দুর্গা হাসিয়া বলে—কত! হুঁ-উঃ! তোমার তো বসে-বসে বড়ো সুবিধে! ওই ওদের ডোবার জামতলা থেকে, এই এতটা—এক হাঁটু জল, যাও দিকি!....

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত-বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাঁসার একখানা রেকাবি বাহির করিয়া বলে—এই দেখ জিনিসখানা খুব ভাল—ভরণ না, কিছু না, ফুস-কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি, যাই নিয়ে—এ যে-সে জিনিস নয়, এ আমার বিয়ের দানের—এখন এ-জিনিস আর মেলে না।

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বৌ নগদ একটি আধুলি দিয়া রেকাবিখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে, সর্বজয়া এ-অনুরোধ বারবার করে।

দুই-একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হুহু পুবে-হাওয়া—খানাডোবা সব থৈ-থৈ করিতেছে—পথে-ঘাটে একহাঁটু জল ; দিনরাত শোঁ-শোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাঁধে—বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়ে ; চার-পাঁচ দিন সমানভাবে কাটিল—কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ। অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে-মুছিতে বলিল—আমাদের বাঁশতলায় জল এসেছে দিদি, দেখবি? দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল, না উঠিয়াই বলিল—কতখানি জল এসেচে রে? অপু বলে—তোর জ্বর সারলে কাল দেখে আসিস, তেঁতুলতলার পথে হাঁটু-জল। পরে জিজ্ঞাস করে—মা কোথায় রে? ঘরে একটা দানা নাই—দুটিখানি বাসী চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে—তা হবে না মা, আমার খিদে পায় না বুঝি? আমি দুটো ভাত খাব—হুঁ-উ।

তার মা বলিল—লক্ষ্মী আমার, ওরকম কি করে! অনেক করে চালভাজা মেখে দেব এখন—রাঁধবো কেমন করে, উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে। পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কী বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে—এই দ্যাখ একটা কইমাছ,

বাঁশতলায় দেখি কানে হেঁটে বেড়াচ্ছে ; বন্যের জল পেয়ে সব উঠে আসছে গাঙ থেকে—বরোজপোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে কিনা, তাই সব উঠে আসচে।

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া দেখে—অবাক হইয়া যায়। বলে—দেখি মা মাছটা? হ্যাঁ মা, কইমাছ বুঝি কানে হেঁটে বেড়ায়? আর আছে?

অপু এখনি বৃষ্টিমাথায় ছুটিয়া যায় আর কি—অনেক কষ্টে তাহার মা তাহাকে থামায়।

দুর্গা বলে—একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল অপু তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসব এখন। পরে সে অবাক হইয়া ভাবে—বাঁশবাগানে মাছ! কী করে এল? বাঃ, বেশ তো! মা কি আর ভাল করে খুঁজেচ? খুঁজলে আরও সেখানে পাওয়া যেত। দেখতে পেলাম না কী রকমে কইমাছ কানে হাঁটে ; কাল সকালে দেখবো—সকালে জ্বর সেরে যাবে। চারিদিকে বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘ ও ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার।

দুর্গা যে-বিছানায় শুইয়া আছে, তাহারই একপাশে তাহার মা ও অপু বসে।

ভাইবোনে তুমুল তর্ক বাঁধিয়া যায়। অপু সরিয়া মায়ের কাছ-ঘেঁষিয়া বসে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। অপু হাসিয়া বলে—মা, কী সেই ছড়াটা? শামলঙ্কা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ?

দুর্গা বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ!

অপু বলে—দূর! হ্যাঁ মা তাই?—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ?—বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে।

সর্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মতো বেঁধে। মনে-মনে ভাবে—সাতটা নয়, পাঁচটা নয়—এই তো একটা ছেলে! কী অদেষ্ট যে করে এসেছিলাম—তার মুখের আবদার রাখতে পারিনে। ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না—কিনা শুধু দুটো ভাত—নিনক্যি!...আবার ভাবে—এই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার—অপু মানুষ হলে আর এ-দুঃখ থাকবে না। ভগবান তাকে মানুষ করে তোলেন যেন।

অনেক রাত্রে সর্বজয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায় ; অপু ডাকিতেছে—মা, ওমা, ওঠো—আমার গায়ে জল পড়চে।

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে। বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে—ফুটা ছাদ, ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া-সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিয়া দেখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপসপ করিতেছে। ডাকিয়া বলে—দুর্গা, ও দুর্গা, শুনছিস? একটু ওঠ দিকি, বিছানাটা সরিয়ে নি। ও দুর্গা, শিগগির, একেবারে ভিজে গেল যে সব!

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না! অন্ধকার রাত, এই ঘন বর্ষা। তাহার মন ছমছম করে, ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে—কিছু ঘটিবে। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে—সে-মানুষেরই-বা কী হল? কেন পত্তরও আসে না—টাকা মরুক গে যাক! এরকম তো কোনোবার হয় না!..তাঁর শরীরটা ভাল আছে তো?...মা সিদ্ধেশ্বরী, সপাঁচ-আনার ভোগ দেব, ভাল খবর এনে দাও মা!

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সর্বজয়া বাড়ির বাহির হইয়া দেখিল, বাঁশবনের মধ্যকার ছোট ডোবাটা জলে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে-ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল—ও নিবারণের মা,

শোন। পরে সলজ্জভাবে বলিল—সেই তুই একবার বলিছিলি-না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে—তা নিবি?

নিবারণের মা বলিল—আছে? দেয়া একটু ধরুক, মোর ছেলেরে সঙ্গে করে আসব এখনি। নতুন আছে তো মা-ঠাকরোন, না পুরনো?

সর্বজয়া বলিল—তুই আয়-না, এখুনি দেখবি! একটু পুরনো কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয়নি, ধোয়া তোলা আছে।—পরে একটু থামিয়া বলিল—তোর আজকাল চাল ভান্‌চিস নে?

নিবারণের মা বলিল—এই বাদলায় ধান শুকোয় মা-ঠাকরোন? খাবার বলে দুটোখানি রেখে দিইচি অমনি।

সর্বজয়া বলিল—এক কাজ কর-না, তাই গিয়ে আমায় আধ কাঠাখানেক দিয়ে যাবি? একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—বৃষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনবার লোক পাচ্ছিনে। টাকা নিয়ে-নিয়ে বেড়াচ্ছি, তা কেউ যদি রাজি হয়! বড় মুশকিলে পড়িচি মা! নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল, বলিল—আসব এখন নিয়ে, কিন্তু সে ভেটেল ধানের চালির ভাত কি আপনারা খাতি পারবেন মা-ঠাকরোন? বড্ড মোটা! নিমছাল-সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে—এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা নিমকি-নোন্‌তা, মুখে বেশ লাগে।...সাবু তা-ই জোটে না, তার বিস্কুট। বৈকালবেলা হইতে আবার বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশি করিয়া আসে। অশ্রান্ত বর্ষণ ছম-ছম ঝম-ঝম, চারিদিকে জলে থৈ-থৈ, হু-হু শাঁ-শাঁ করিয়া বহে পুবে-হাওয়া, মেঘে-অন্ধকারে একাকার ভাদ্রসন্ধ্যা। আবার সেইরকম কালো-কালো পেঁজাতুলার মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে।

বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না। দরজা-জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট হুহু করিয়া ঢোকে—ছেঁড়া থলে, ছেঁড়া কাগজ-গোঁজা ভাঙা কপাটের সাধ্য কী যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়!

বেশি রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশি বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। শরীর দুর্ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করে।

জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে। হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে। সে কী করে? আর কত রাত আছে? সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে—ও অপু! একটু ওঠ দিকি! দুর্গাকে বলে—পাশ ফিরে শো তো দুগ্‌গা, বড্ড জল পড়চে—একটু সরে পাশ ফের দিকি! অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিক চায়—পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কী শব্দ হয়, সর্বজয়া তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল—বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা-ফাঁকা দেখাইতেছে—রান্নাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে। তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে—এইবার যদি পুরনো কোঠাটা—? কে আছে, কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে-মনে বলে—হে ঠাকুর, আজকের রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও।....

তখন ভাল করিয়া ভোর হয় নাই; ঝড় থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প-অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী গোয়ালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়কি-দোরে বারবার ধাক্কা শুনিয়া আসিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—নতুন বৌ, এ সময়?

সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ন'দি, একবার বট্‌ঠাকুরকে ডাকো দিকি? একবার শিগগির আমাদের বাড়িতে আসতে বলো—দুগ্‌গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্‌গা? কেন ,কী হয়েছে দুগ্‌গার?

সর্বজয়া বলিল—কদিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্ছে আবার যাচ্ছে—ম্যালেরিয়া জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশি। তার ওপর কাল রাত্রে কী-রকম কাণ্ড তো জানই। একবার শিগগির বট্‌ঠাকুরকে—

তাহার চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কী বৌ? দাঁড়াও, আমি এখুনি ডেকে দিচ্চি। চল আমিও যাচ্চি। কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালখানা পড়ে গেল। বাবাঃ, কাল রাত্তিরের মতো কাণ্ড আমি তো কখনও দেখিনি। শেষরাত্রে সব উঠে গরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কিনা! দাঁড়াও, আমি ডাকি।

একটু পরে নীলমণি মুখুয্যে, তাঁহার বড় ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়ি আসিলেন।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কী হয়েচে বাবা অপু? অপুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল—দিদি কী সব বকছিল জ্যাঠামশায়। নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাতখানা? ....জ্বরটা একটু বেশি। আচ্ছা, কোনো ভয় নেই। ফণি, তুমি একবার চট্‌ করে নবাবগঞ্জ চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে, একেবারে ডেকে নিয়ে আসবে। পরে তিনি ডাকিলেন—দুর্গা, ও দুর্গা!...দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়াশব্দ নাই। একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন। দেখিয়া-শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন; বলিয়া গেলেন যে, বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই, জ্বর বেশি হইয়াছে। মাথায় জলপটি নিয়মিতভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন।

হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখুয্যে দুবেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড়বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতে দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল—ও দিদি শুনছিস, কেমন আছিস, কথা ক'না, ও দিদি! দুর্গার সেই আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে—কী যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর-ঘোর। অপু কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁচিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভাল করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কী বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে?

অপু বলিল—বেলা এখনও অনেক আছে। আজ রদ্দুর উঠেচে দেখেচিস দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রদ্দুর রয়েচে।

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক দিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন অপু, একটা কথা শোন।

—কী রে দিদি?... সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

—সেরে উঠলে আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?

—দেখাব এখন ; তুই সেরে উঠলে বাবাকে বলে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাব রেলগাড়ি করে।...

সারা দিনরাত কাটিয়া গেল।

ঝড়বৃষ্টি কোনো কালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে শরতের জমকালো রৌদ্র!

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুয্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, এই সময় তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত সুর কানে গেল—ওগো, এস তো একবার এদিকে শিগগির, অপুদের বাড়ির দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যাপার কী দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্বজয়া মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সকরুণ আবেগে বলিতেছে—ও দুগ্গা, চা দিকি—ওমা, ভাল করে চা একবার—ও দুগ্গা, একবার মা বলে ডাক!

নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কী হয়েছে? সরো সরো দিকি সব। আহা, কেন সব বাতাসটা বন্ধ করে দাঁড়াও? সর্বজয়া ভাসুর-সম্পর্কীয় প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, আমার কী হল, মেয়ে কথা কয় না—চোখ চায় না কেন?

দুর্গা আর পৃথিবীর আলোয় চোখ চাহিল না।

আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল ; তিনি আসিয়া ও রোগী দেখিয়া বলিলেন—খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েছে, আর অমনি হার্টফেল করেছে। ঠিক এইরকম একটা কেস্ হয়ে গেল সেদিন দশঘরায় মুখুয্যেদের বাড়ি!....

আধ ঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

সতেরো।। আগমনীর সুর

হরিহর বাড়ির চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় তাহার পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা, একটা-না-একটা কিছু উপায় হইবে—এই কুহকে পড়িয়াই সে সেখানে গিয়াছিল। কিছুদিন থাকিবার পর সন্ধান পাইল যে, শহরের উকিল জমিদারের বাড়িতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসাবে চণ্ডীপাঠ করার কার্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায়-আশায় দিন-পনেরো কাটাইয়া বাড়ি হইতে পথখরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়াছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হয় না।

সে পড়িল মহাবিপদে। অপরিচিত স্থান, একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন কেহ নাই। খোড়োবাজারের যে হোটেলটিতে ছিল, পয়সা ফুরাইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় নবাগত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পথিককে

বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একটা কুঠুরির একপাশে সে স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা। অনেকগুলি নিষ্কর্মা গাঁজাখোর লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা জমায়, প্রায় সমস্ত রাত্রি হৈ-হৈ করিয়া কাটায়।

অতিকষ্টে দিন কাটাইয়া সে শহরের বড়-বড় উকিল ও ধনী গৃহস্থের বাড়িতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারই বিছানাটি টানিয়া লইয়া কে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। প্রায়ই এরূপ হওয়াতে, ইহা লইয়া গাঁজাখোর সম্প্রদায়ের সহিত একদিন তাহার একটু বচসা হইল। পরদিন প্রাতে তাহারা হরিসভার সেক্রেটারির কাছে গিয়া কী লাগাইল তাহারাই জানে। সেক্রেটারি-বাবু নিজ বাড়িতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাঁহাদের হরিসভায় তিন দিনের বেশি থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পর জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইল।

খোড়ে নদীর ধারে আসিয়া হরিহর অল্প একটু নির্জন স্থানে পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাতমুখ ধুইল।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই। সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া শ্যামাবিষয়ক গান করিয়াছিল। গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয়। সেই টাকাটি ভাঙাইয়া কিছু পয়সা দিয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়া যেন নামে না। মাত্র দিন দশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছে। অদ্য প্রায় দুই মাসের উপর হইয়া গেল—এ পর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই ; এতদিন কী করিয়া তাহাদের চলিতেছে! অপু বাড়ি হইতে আসিবার সময় বারবার বলিয়া দিয়াছে—তাহার জন্য একখানা 'পদ্মপুরাণ' কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড় ভালবাসে। মাঝে-মাঝে সে যে বাপের বাক্সদপ্তর খুলিয়া লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে।

বাড়ি হইতে আসিবার পূর্বে হরিহর যুগীপাড়া হইতে একখানা বটতলার পদ্যে 'পদ্মপুরাণ' পড়িবার জন্য লইয়া আসে। অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল ; রোজ-রোজ পড়ে—কুচুনিপাড়ায় শিবঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িয়া তাহার ভারি আমোদ হয়। হরিহর বলে—বইখানা দাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্ছে যে! অবশেষে একখানা 'পদ্মপুরাণ' তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে—এই শর্তে বাবাকে রাজি করাইয়া তবে সে বই ফেরত দেয়। আসিবার সময় বারবার বলিয়াছে—সেই বই একখানা এনো কিন্তু বাবা এবার অবিশ্যি অবিশ্যি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভাল দেখিয়া আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সেসব তো দূরের কথা, কী করিয়া বাড়িতে সংসার চলিতেছে সেটাই এখন সমস্যা!

সন্ধ্যার পর পূর্বপরিচিত কাঠের গোলাটায় গিয়া সে-রাত্রের মতো আশ্রয় লইল। ভাল ঘুম হইল না—বাড়িতে কী করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া সে আবার লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে লাগিল। একটু শুভযোগ বোধহয় ঘটিয়াছিল। রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের গোলাতেই একটা কাজের সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরের কাছে এক গ্রামে একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন গৃহদেবতার পূজা পাঠ করিবার জন্য এমন একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে যে বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগাযোগে অবিলম্বে সে

সেখানে গেল ; বাড়ির কর্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর-আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ি যাইবার সময় বাড়ির কর্তা দশটাকা প্রণামী ও যাতায়াতের গাড়িভাড়া দিলেন। গোয়াড়ীতে রক্ষিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতেও পাঁচটি টাকা প্রণামী মিলিল। রাণাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালোবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া একখানা ভাল কাপড় ও ভাল দেখিয়া আলতা কয়েক পাতা কিনিল। অপুর 'পদ্মপুরাণ' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থালীর টুকটাক দু-একটা জিনিস সর্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল—একটা কাঠের চাকি-বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে-হাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না ; দেখা হইলেও সে উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ না করিয়া হন-হন করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে-ঢুকিতে আপন মনে বলিল—উঃ, দেখ কাণ্ডখানা! বাঁশঝাড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে পাঁচিলের ওপর! ভুবন কাকা কাটাবেনও না, মুশকিল হয়েছে আজ্ঞা—পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমতো আগ্রহের সুরে ডাকিল—ও মা দুগ্‌গা, ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিল। হরিহর মৃদু হাসিয়া বলিল—বাড়ির সব ভাল তো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি? সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারি পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল—এস, ঘরে এস।

স্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ করিলেও তাহার মনে কোনো খট্‌কা লাগিল না ; তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে—এখনই বুঝি ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিবে!

দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে—কী এনেচ বাবা আমার জন্যে? অমনি তাড়াতাড়ি হরিহর পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়িটা দেখাইয়া তাহাদের তাক লাগাইয়া দিবে। সে ঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে বলিল—বেশ কাঁঠালের চাকি-বেলুন এনিচি এবার।....পরে সতৃষ্ণ-নয়নে চারিদিকে চাহিয়া নিরাশামিশ্রিত স্বরে বলিল—কৈ, হ্যাঁগা, অপু দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে?

সর্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো? মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে গো। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

গাঙ্গুলি বাড়ির পূজা অনেক কালের।

আঁসমালীর দীনু সানাইদার অন্য-অন্য বৎসরের মতো এবারও রসুনচৌকি বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দ-সুর বাজিয়া ওঠে।

নতুন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। পথে পা দিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে—এগিয়ে চল, অনেক বেলা হয়ে গিয়েচে বাবা।

আঠারো ।। এই নিশ্চিন্দিপুর

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়া ছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া মায়ের সঙ্গে বাবার রাত্রে যেসব কথাবর্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এ-দেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এ-দেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্পবয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে-দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সেসব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই—দুঃখ এ-দেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবে বলিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিল। যে-জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া, নানা খুচরা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড় তক্তপোশ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল—খবর পাইয়া এপাড়া-ওপাড়া হইতে খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বিরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরে দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা এবং কত অল্প-খরচে এখানে সংসার চলে, সে-বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে-মুখে তাঁহারা দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, স্ত্রীর সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন—বাপু, আছেই-বা কী দেশে যে থাকতে বলব? তা ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পেতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি, এবার তো ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আসব, যদি ভগবান দিন দেন!

রাণু কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ি আসিল। বলিল—হ্যাঁরে অপু, তোরা কি এ-গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি, জিগগেস করো মাকে।

তবুও রাণু বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণু অবাক হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল—কবে যাবি রে?

—সামনের বুধবারের পরের বুধবার।

—আসবিনে কখন?

রাণুর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল! সে বলিল—তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে-গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কী করে?

অপু বলিল—আমি কি করব, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা! বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে!

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে কত কথা হইল পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল—তোর জন্যে নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শেওলা সারিয়ে ফুট্ কাটলাম, একদিনও মাছ ধরবিনে তাতে?.....

এবার রামনবমী, দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিনের পরে-পরে পড়িল। প্রতিবৎসর এই সময় অপূর্ব, অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি

এ সময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিত।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ি মারা গেল। নতুন যে-মাঠটাতে আজকাল চড়কমেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা। অনেক লোক জড়ো হইয়াছে দেখিয়া সে-ও সেখানে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনির ভয়ে মাঠ-বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল, তখন সে ছোট ছিল; এখন তাহার সে-কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরী বুড়ি ডাইনি নয়, রাক্ষুসী নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—কুশ্রী, গরিব, অসহায়—ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না; থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছে, সৎকারের লোক হয় না?....পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাহিরে আনিয়া ঢালিল—এক হাঁড়ি শুকনা আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ি আমসি-আমচুর তৈয়ারি করিয়া রাখিয়া দিত ও তাহা হাটে-হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আমসি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। গত বছরের চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পয়সা দেব অপু, একটা সীতাহরণের পট দেখিস যদি মেলায় পাস? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পানসে-পুতু পট, তাই তোর কিনতে হবে! আমি পারব না যা। কেন, রাম-রাবণের যুদ্ধ একখানা কেন-না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধু আর যুদ্ধু—ছেলের যা কাণ্ড! কেন, ঠাকুর-দেবতার পট বুঝি ভাল হল না?...দিদির শিল্পানুভূতিশক্তির উপর অপুর কোনো কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।....

তাহাদের বেড়ার গায়ে রাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে, তাহার মুখ মনে পড়ে; পাখির ডাকে, সদ্যফোটা ওড়কলমি ফুলের দুলুনিতে—দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয়, যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে কত খুশি হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর! আর কখনও, কখনও কি সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না?..চড়ক দেখিয়া, নানা গায়ের চাষার ছেলেমেয়েরা রঙিন কাপড়-জামা, কেউ-বা নতুন কোরা শাড়ি পরনে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে-বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারে মেলা দেখিতে চার-পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখি, কাঠের পুতুল, রঙিন কাগজের পাখা, রঙ-করা হাঁড়ি ছোবা—সকলেরই হাতে কোনো-না-কোনো জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলায় বেগুনি-ফুলুরির দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু দুপয়সায় তেলেভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ির দিকে চলিল। ফিরিতে-ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না। মনে ভাবিল—সেখানে যদি চড়ক না হয়, তবে বাবাকে বলব—আমি মেলা দেখব বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চলে যাই—নাহয় দুদিন এসে খুড়িমাদের বাড়ি থেকে যাব! চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল।

কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জ্যাঠার ভিটায় নারিকেলগাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন

দেশে যাইবার জন্য তাহার যে-উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্ন বিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়িঘর, ওই বাঁশবন, সলতে-খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতি করার ওই জায়গাটা—এসব সে কত ভালবাসে! ওই অমন নারিকেল-গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কী সুন্দর দেখায়! ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া চুমকি-ঝরা নারিকেলশাখার দিকে চাহিয়া কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশপঁচিশ খেলিয়াছে। কতবার মনে হইয়াছে কী সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর! যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে অমন নারিকেলগাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে? নৌকা বাহিতে পারিবে, রেল-রেল খেলিতে পারিবে? কদমতলায় সায়রের ঘাটের মতো ঘাট কি সে-দেশে আছে? রাণুদি আছে? সোনাডাঙার মাঠ আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা—কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?

উনিশ।। মনে পড়ে

দুপুরে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীব্রতের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে, অপু ঘরের মধ্যেই তাকের উপরিস্থিত জিনিসপত্র কী লইয়া যাইতে পারে না-পারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে; উঁচু তাকের একটা ছোট মাটির কলসি সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা কী জিনিস গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেঝে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। নোনা ও মাকড়সার ঝুল মাখা হইলেও জিনিসটা যে কী তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা—আর বছর যেটা সেজ-ঠাকরুনদের বাড়ি হইতে চুরি গিয়াছিল!

দুপুরে কেহ বাড়ি নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অপু অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, চৈত্র-দুপুরের তপ্ত-রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শনশন শব্দ অনেক দূরের বার্তার মতো কানে আসে। আপনমনে বলিল—দিদি হতভাগী চুরি করে এনে ওই কলসিটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে-ধীরে খিড়কি-দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খচিলটা কোন গাছের মাথায় টানিয়া-টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন-হ্রদে লুক্কায়িত প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যাহ্নটা! একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মনে-মনে বলিল—রইল ওইখানে, কেউ জানতে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, এমনকি মাকেও না।...

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে, হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ি রওনা হইল।

সকালের দিকে আকাশে একটু-একটু মেঘ ছিল বটে, কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া বৈশাখী মধ্যাহ্নের পরিপূর্ণ প্রখর রৌদ্র গাছপালায় পথে-মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে।

পটু গাড়ির পিছনে-পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপুদা, এবার

বারোয়ারিতে ভাল যাত্রাদলের বায়না হয়েচে, তুই শুনতে পেলিনে এবার।

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশি করে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি, জানলি?....

আবার সেই চড়কতলার মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্নস্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে; কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইয়াছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে।

হরিহর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার যেন কেমন-কেমন ঠেকিতেছিল।.... কাজটা কি ভাল হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সেসব ধুমধাম তো একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই, যা-ও-বা মাটির প্রদীপ টিমটিম্ করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে তাহা চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কী মনে করিবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ি আতুরী বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুরবাগানের পাশ দিয়া গাড়ি গিয়া একেবারে আষাড়ু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল।

গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল—যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু দীনতা হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নবীন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা!

রাত্রি প্রায় দশটার সময় স্টেশনে গাড়ি পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ি স্টেশনে পৌঁছিবে অপু সেই আশায় বসিয়া ছিল; গাড়ি থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়া হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারা রাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই। ঐ হীরু গাড়োয়ানের গরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনি সে ট্রেন দেখিতে পাইত।

প্ল্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাঁট সাজানো; দুজন রেলের লোক একটা লোহার বাক্সের মতো দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কী করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটিগুলি চিকচিক করিতেছে। ওদিকে রেললাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেইরকম দুটা লাল আলো। স্টেশনের ঘরে টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। একরাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মতো জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খটখট শব্দ করিতেছে।

ইস্টিশান! ইস্টিশান!...বেশি দেরি নয়—কাল সকালেই সে রেলের গাড়ি শুধু যে দেখিবে তাহা নয়—চড়িবেও।

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মতো জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল—স্টেশনের পুকুরধারে রাঁধিয়া খাইবার যোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ি পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-নিশ বৎসরের একটি বৌ ও একটি যুবক। অপু শুনিল—বৌটি হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ির, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বৌটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। মা খিচুড়ির চাল-ডাল ধুইতেছে, বৌটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়েসাতটায় ট্রেন আসিল।

অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ি দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বাবা বলিল—খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এস এদিকে। একজন খালাসিও চেঁচাইয়া লোকজনদের হঠাইয়া দিতেছিল। ইস, কতবড় ট্রেনখানা। কী ভয়ানক শব্দ! সামনের প্রকাণ্ড কালোমতো ধোঁয়া-ওড়ানো গাড়িটাকেই তাহা হইলে ইঞ্জিন বলে? উঃ। কী কাণ্ড!

হবিবপুরের বৌটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল।

গাড়িতে হৈ-হৈ করিয়া মোট-ঘাট উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ির মেজেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানালাদরজা সব হুবহু।

এই ভারী গাড়িখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে-বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কি জানি হয়তো না-ও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে—ওগো, তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ি আজ আর চলিবে না।

তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, অপুর মনে হইল লোকটি কী কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ি চড়িল না, সে বাঁচিয়া থাকিবে কোন সুখে?...হীরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

গাড়ি চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব ঝাঁকুনি আর দুলুনি। দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ-করিয়া-দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ি বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলা সটসট করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ!! এরই নাম রেলগাড়ি।

উঃ, মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে! ঝোপঝাপ, গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি, ছটোখাটো চাষাদের ঘর—সব একাকার করিয়া দিতেছে। গাড়ির তলায় জাঁতা-পেষার মতো একটানা একটা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কী শব্দটা!

সে আর দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে-খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল। সেদিন—আর আজ?

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাড়ু-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে!.....তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে। তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালবাসিত না, মা নয়, বাবা নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়। দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথেঘাটে, বাঁশবনে, আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে-কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্পেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহকোণে—আজ কিন্তু সত্যসত্যই দিদির সহিত তাহার চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, তবু তাহা কী সে জানে না। কত কী মনে আসিল অল্প কয়েক মুহূর্তের মধ্যে.... আতুরী ডাইনি.... নদীর ঘাট.... তাহাদের কোঠাবাড়িটা.... চালতেতলার পথ... রাণুদি... কত বৈকাল, কত দুপুর... কতদিনের কত হাসিখেলা.... পটু.... দিদির মুখ.... দিদির কত না-মেটা সাধ !....

দিদি যেন এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। ....

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যকার অস্ফুরিত ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বারবার বলিতে চাহিল—আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে।

সত্যই সে ভোলে নাই।

বড় হইয়া নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার বড় ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতিমুহূর্তে নীল আকাশের নব-নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোনো নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীয়মান চক্রবালসীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, অদূরে অস্পষ্ট-দেখিতে-পাওয়া বনভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মতো মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে, এক পুরনো কোঠায়, অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরিবঘরের মেয়ের কথা—তাহার হারানো স্মৃতি।

অপু, সেরে উঠলে, আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি ? ...

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালখানা দেখিতে-দেখিতে অস্পষ্ট হইতে-হইতে শেষে একেবারে মিলাইয়া গেল।

হীরামানিক জ্বলে

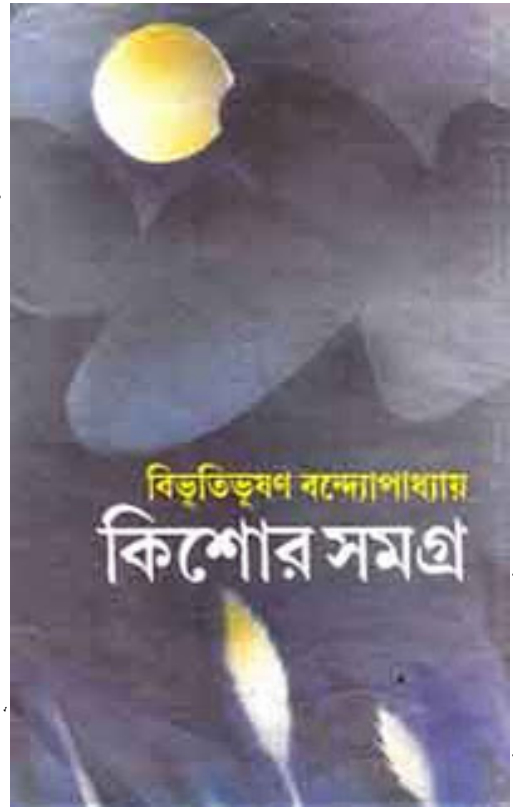

ছোট্ট গ্রাম সুন্দরপুর।

একটি নদীও আছে গ্রামের উত্তর প্রান্তে। মহকুমা থেকে বারো-তেরো মাইল, রেল-স্টেশন থেকেও সাত-আট মাইল।

গ্রামের মুস্তফি বংশ এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন, এখন তাঁদের অবস্থা আগের মতো না থাকলেও আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে তাঁরাই এখনও পর্যন্ত বড়লোক বলে গণ্য, যদিও ভাঙা পুজোর দালানে আগের মতো জাঁকজমকে এখন আর পুজো হয় না—প্রকাণ্ড বাড়ির যে-মহলগুলোর ছাদ খসে পড়েছে গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে, সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না, বাড়ির মেয়েদের বিবাহ দিতে হয় কেরানি পাত্রদের সঙ্গে—অর্থের এতই অভাব।

সুশীল এই বংশের ছেলে। ম্যাট্রিক পাস করে বাড়ি বসে আছে—বড় বংশের ছেলে, তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনও চাকুরি করেননি, সুতরাং বাড়ি বসেই বাপের অন্নধ্বংস করুক এই ছিল বাড়ির সকলেরই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়।

সুশীল তা-ই করে আসছে অবিশ্যি।

সুন্দরপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস খুব বেশি নেই—আগে অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাস ছিল, তাদের সবাই এখন বিদেশে চাকুরি করে—বড় বড় বাড়ি জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

মুস্তফিদের প্রকাণ্ড ভদ্রাসনের দক্ষিণে ও পূর্বে তাঁদের দৌহিত্র রায়বংশ বাস করে। পূর্বে যখন মুস্তফিদের সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল তখন বিদেশ থেকে কুলগৌরবসম্পন্ন রায়দের আনিয়ে কন্যাদান করে জমি দিয়ে এখানেই বাস করিয়েছিলেন এঁরা।

কালের বিপর্যয়ে সেই রায়বংশের ছেলেরা এখন সুশিক্ষিত ও প্রায় সকলেই বিদেশে ভাল চাকুরি করে। নগদ টাকার মুখ দেখতে পায়—বাড়ি কেউ বড় একটা আসে না—যখন আসে তখন খুব বড়মানুষি চাল দেখিয়ে যায়। পদে পদে মাতুল বংশের ওপর টেক্কা দিয়ে চলাই যেন তাদের দু-একমাস-স্থায়ী পল্লিবাসের সর্বপ্রধান লক্ষ্য।

আশ্বিন মাস। পুজোর বেশি দিন দেরি নেই।

অঘোর রায়ের বড় ছেলে অবনী সস্ত্রীক বাড়ি এসেছে। শোনা যাচ্ছে, দুর্গোৎসব না করলেও অবনী এবার মধুধামে নাকি কালীপুজো করবে। অবনী সরকারি দপ্তরে ভাল চাকুরি করে। অবনীর বাবা অঘোর রায় চৈলের কাছেই বিদেশে থাকেন। তিনি এ-সময় বাড়ি আসেননি, তাঁর মেজ ছেলে অখিলের সঙ্গে পুরী গিয়েছেন। অখিল যেন কোথাকার সাবডেপুটি—পনেরো দিন ছুটি নিয়ে স্ত্রীপুত্র ও বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছে।

সুশীল অবনীদের বৈঠকখানায় বসে এদের চালবাজির কথা শুনছিল অনেকক্ষণ থেকে।

অবনী বললে—মামা, তোমাদের বড় শতরঞ্জি আছে?

—একখানা দালানজোড়া শতরঞ্জি ছিল জানি—কিন্তু সেটা ছিঁড়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়।

—ছেঁড়া শতরঞ্জি আমার চলবে না। তা হলে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ভাল একখানি বড় শতরঞ্জি কিনে আনি, বন্ধুবান্ধব পাঁচজনে আসবে ; তাদের সামনে বার করার উপযুক্ত হওয়া চাই তো!—বড় আলো আছে?

—বাতির ঝাড় ছিল, এক-এক থাকে কাঁচ খুলে গিয়েছে—তাতে চলে তো নিও।

—তোমাদের তাতেই কাজ চলে?

—কেন চলবে না? দেখায় খুব ভাল। তা ছাড়া দুর্গোৎসবের কাজ দিনমানেই বেশি—রাত্রে আরতি হয়ে গেলেই আলোর কাজ তো মিটে গেল।

—আমার ডে-লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। কালীপুজোর রাতে আলোর ব্যবস্থা একটু ভালরকম থাকা দরকার। ইলেকট্রিক আলোয় বারো মাস বাস করা অভ্যেস, সত্যি, পাড়াগাঁয়ে এসে এমন অসুবিধে হয়।

বৃদ্ধ সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী তাঁর ছোট ছেলের একটা চাকুরির জন্যে অবনীর কাছে ক-দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটু—অবিশ্যি খুব সামান্যই একটু—ভরসা পেয়েছিলেন, তিনি অমনি বলে উঠলেন—তা অসুবিধে হবে না? বলি তোমরা বাবাজি কী রকম জায়গায় থাক, কী ধরনে থাক—তা আমার জানা আছে তো! গঙ্গাচানের যোগে কলকাতা গেলেই তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠি, আর সে কী যত্ন! ওঃ, ইলেকট্রিক আলো না হলে কি বাবাজি তোমাদের চলে?

সুশীল কলকাতায় দু-একবার মাত্র গিয়েছে,—আধুনিক সভ্যতার যুগের বহু নতুন জিনিসই তার অপরিচিত—শিক্ষিত ও শহুরে বাবু অবনীর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে তাকে কথা বলতে হয়।

তবুও সে বললে—ডে-লাইটের চেয়ে কিন্তু ঝাড়-লণ্ঠন দেখায় ভাল—

অবনী হেসে গড়িয়ে পড়ে আর-কি!

—ওহে, যে-যুগে জমিদারপুত্রেরা নিষ্কর্মা বসে থাকত আর হাতিতে চড়ে জরদ্গবের মতো ঘুরে বেড়াত—ওসব চাল ছিল সেকালের। মডার্ন যুগে ওসব অচল, বুঝলে মামা? এ হল প্রগতির যুগ—হাতির বদলে ইলেকট্রিক লাইট—সেকালকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে?

বনেদি পুরনো আমলের চালচলনে আবাল্য অভ্যস্ত সুশীল। বয়সে যুবক হলেও প্রাচীনের ভক্ত।

সে বললে—কেন, হাতি চড়াটা কী খারাপ দেখলে?

—রামোঃ! জবড়জং ব্যাপার! হাতির মতো মোটা জানোয়ারের ওপর বসে-থাকা পেট-মোটা নাদুসনুদুস—

সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী বললেন—গোবর-গণেশ—

—জমিদারের ছেলেরই শোভা পায়, কিন্তু কাজে যারা ব্যস্ত, সময় যাদের হাতে কম, দিনে যাদের ত্রিশ মাইল চক্কর দিয়ে বেড়াতে হয় নিজের কাজে বা আপিসের কাজে—তাদের পক্ষে দরকার মোটরবাইক বা মোটরকার। স্মার্ট যারা—তাদের উপযুক্ত যানই হচ্ছে—

সুশীল প্রতিবাদ করে বললে—স্মার্ট কারা জানিনে; মোগল বাদশাদের সময় আকবর আওরঙ্গজেবের মতো বীর হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত—তারা স্মার্ট হল না—হল তোমাদের কলকাতার আপ্পির-পাঞ্জাবি-পরা চশমা-চোখে ছোকরা বাবুর দল, যারা বাপের পয়সায় গড়ের মাঠে হাওয়া খায়—কিংবা শখে পড়ে দু-দশ কদম মোটর ড্রাইভ করে, তারা? অত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, তারা হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত, পুরুরাজ হাতির পিঠে চড়ে আলেকজান্ডারের গ্রীক বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল—তারা স্মার্ট ছিল না, স্মার্ট হল সিনেমার ছোকরা-অ্যাক্টরের দল?

সুশীল সেখান থেকে উঠে চলে এল। অবনীর ধরন-ধারণ তার ভাল লাগেনি—দূর

সম্পর্কের মামাভাগ্নে, কোনকালের দৌহিত্রবংশের লোক, এই পর্যন্ত। এখন তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কী যোগ আছে?—কিছুই না। জমিদারের ছেলেদের ওপর অবনীর এ-কটাক্ষ, সুশীলের মনে হল তাকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে।

তা করতে পারে—এরা এখন সব হঠাৎ-বড়লোকের দল, পুরনো বংশের ওপর ওদের রাগ থাকা অসম্ভব নয়।

সুশীল জমিদারপুত্রও বটে, নিষ্কর্মাও বটে। বসে খেতে খেতে দিনকতক পরে পেটমোটা হয়েও উঠবে—এ-বিষয়েও নিঃসন্দেহ। অবনী তাকে লক্ষ্য করেই বলেছে নিশ্চয়ই।

বাড়ি এসে সুশীল জ্যাঠামশায়কে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা জ্যাঠামণি, আমাদের বংশে কখনও কেউ চাকরি করেছে?

জ্যাঠামশায় তারাকান্ত মুস্তফির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তিনি পুজোর দালানের সঙ্গে ছোট কুঠরিতে সারাদিন বৈষয়িক কাগজপত্র দেখেন এবং মাঝে মাঝে গীতাপাঠ করেন। ঘরটার কুলুঙ্গিতে ও দেওয়ালের গায়ের তাকে গত পঞ্চাশ বছরের পুরনো পাঁজি সাজানো। তারাকান্ত বললেন—কেন বাবা সুশীল? এ-বংশে কারো কোনো ভাবনা ছিল যে চাকুরি করবে?

—ছেলেরা কী করত জ্যাঠামণি?

—পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেয়ে আমাদের পুরুষানুক্রমে চলে আসছে—তবে আজকাল বড় খারাপ সময় পড়েছে, জমিজমাও অনেক বেরিয়ে গেল—তাই যা-হয় একটু কষ্ট যাচ্ছে। কী আবার করবে কে? ওতে আমাদের মান যায়।

সুশীল কথাটা ভেবে দেখলে অবসর সময়ে। অবনীর কথাগুলো হিংসেতে ভরা ছিল এখন দেখা যাচ্ছে। অবনীদের বাইরে বেরিয়ে চাকুরি না করলে চলে না—আর তাদের চিরকাল চলে আসছে বাড়ি বসে—এতে অবনীর হিংসের কথা বৈকি!

মামার বাড়ি খেয়ে চিরকাল ওরা মানুষ। আজ হঠাৎ বড়লোক হয়ে চাল-দেওয়া কথা-বার্তায় সেই মাতুল বংশকেই ছোট করতে চায়।

সুশীল এর প্রমাণ অন্য একদিক থেকে খুব শিগগিরই পেলে। মুস্তফিদের সাবেক পুজোর মণ্ডপে দুর্গোৎসব টিম্‌টিম্‌ করে সমাধা হল—লোকের পাতে ছেঁচড়া, কলাইয়ের ডাল, ক্ষেতের রাঙা নাগরা চালের ভাত, পুকুরের মাছ, জোলো দুধোলো দই ও চিনির ডেলা ঘোঙা মোণ্ডা খাইয়ে—কিন্তু অবনীদের বাড়ি যে-কালীপুজো হল—সে একটা দেখবার জিনিস!

কালীপুজোর রাত্রে গাঁ-সুদ্ধ পোলাও মাংস, কলকাতা থেকে আনা দই রাবড়ি সন্দেশ খেলে। টিন-টিন দামি সিগারেট নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিলি হল, পরদিন দুপুরে যাত্রা ও ভাসানের রাত্রে প্রীতি সম্মেলনে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। অবনীর এক বন্ধু আবার ম্যাজিক-লণ্ঠনের স্লাইড দেখিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতাও করলে। গ্রামের লোক সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল। এ-গাঁয়ে এমনটি আর কখনও হয়নি—কেউ দেখেনি! সকলের মুখে অবনীর সুখ্যাতি।

কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না, যদি তারা সেইসঙ্গে অমনি মুস্তফি জমিদারের ছোট করে না দিত।

—নাঃ, মুস্তফিরা কখনও এদের সঙ্গে দাঁড়ায়? বলে—কিসে আর কিসে!

—যা বলেছ ভায়া! নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না—

—শুধু লম্বা লম্বা কথা আছে—আর কিছু নেই রে ভাই।

এ-ধরনের একটা কথা একদিন সুশীলের নিজের কানেই গেল। নিজেদের পুকুরের ঘাটে বসে সুশীল ছিপে মাছ ধরছে, গাঁয়ের ওর পরিচিত দুটি ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে পথ দিয়ে যাচ্ছেন। একজন বললেন—মুস্তফিদের ওপর এবার খুব একহাত নিয়েছে অবনী! অপর জন বললে—তার মানে মুস্তফিদের আর কিছু নেই। সব ছেলেগুলো বাড়ি বসে বসে খাবে, আজকালকার দিনে কি আর সেকেলে বনেদি চাল চলে? লেখাপড়া তো একটা ছেলেও ভাল করে শিখলে না।

—লেখাপড়া শিখে তো ঐ সুশীলটা বাপের হোটেলে দিব্যি বসে খাচ্ছে—ওদের কখনও কিছু হবে না বলে দিলাম। যত সব আল্‌সে আর কুঁড়ে।

কথাটা সুশীলের মনে লাগল। এদিক থেকে সে কোনোদিন নিজেকে বিচার করে দেখেনি। চিরকাল তো এইরকম হয়ে আসছে তাদের বংশে, এতদিন কেউ কিছু বলেনি, আজকাল বলে কেন তবে?

পাশের গ্রামে সুশীলের এক বন্ধু থাকত, সুশীল তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। ছেলেটির নাম প্রমথ, তার বাবা এক সময়ে মুস্তফিদের স্টেটের নায়েব ছিলেন, কিন্তু তারপর চাকুরি ছেড়ে মাল-চালানি ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন।

প্রমথ বেশ বুদ্ধিমান ও বলিষ্ঠ যুবক। সে নিজের চেষ্টায় গ্রামে একটা নৈশ স্কুল করেছে, একটা দরিদ্র-ভাণ্ডার খুলেছে—তার পেছনে গ্রামের তরুণদের যে দলটি গড়ে উঠেছে—গ্রামের মঙ্গলের জন্যে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই। সম্প্রতি প্রমথ বাবার আড়তে বেরুতে আরম্ভ করেছে।

সুশীল বললে—প্রমথ, আমাকে তোমাদের আড়তে কাজ শেখাবে?

প্রমথ আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে চেয়ে বললে—কেন বল তো? হঠাৎ এ-কথা কেন তোমার মুখে?

—বসে বসে চিরকাল বাপের ভাত খাব?

—তোমাদের বংশে কেউ কখনও অন্য কাজ করেনি, তাই বলছি। হঠাৎ এ মতিবুদ্ধি ঘটল কেন তোমার?

—সে বলব পরে। আপাতত একটা হিল্লে করে দাও তো।

—ওর মধ্যে কঠিন আর কী। যেদিন ইচ্ছে এস, বাবার কাছে নিয়ে যাব।

মাসখানেক ধরে সুশীল ওদের আড়তে বেরুতে লাগল, কিন্তু ক্রমশ সে দেখলে, ভুষি-মাল চালানির কাজের সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ নেই। তার বাবা ছেলেকে আড়তে যোগ দিতে বাধা দেননি, বরং বলেছিলেন ব্যবসার কাজে যদি কিছু টাকা দরকার হয়, তাও তিনি দেবেন।

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আড়তের কাজ কী রকম হচ্ছে?

সুশীল বললে—ও ভাল লাগে না, তার চেয়ে বরং ডাক্তারি পড়ি।

—তোমার ইচ্ছে। তা হলে কলকাতায় গিয়ে দেখেশুনে এস।

কলকাতায় এসে সুশীল দেখলে, ডাক্তারি স্কুলে ভর্তি হবার সময় এখন নয়। ওদের বছর আরম্ভ হয় জুলাই মাসে—তার এখনও তিন-চার মাস দেরি। সুশীলের এক মামা খিদিরপুরে বাসা করে থাকতেন, তাঁর বাসাতেই সুশীল এসে উঠেছিল—তাঁরই পরামর্শে সে দু-একটা আপিসে কাজের চেষ্টা করতে লাগল।

দিন-পনেরো অনেক আপিসে ঘোরাফেরা করেও সে কোথাও কোনো কাজের সুবিধে করতে পারলে না—এদিকে টাকা এল ফুরিয়ে। মামার বাসায় খাবার খরচ লাগত না

অবিশ্যি, কিন্তু হাত-খরচের জন্যে রোজ একটি টাকা দরকার। বাবার কাছে সে চাইবে না—নগদ টাকার সেখানে বড় টানাটানি, সে জানে। একটা কিছু না করে এবার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে নেই তার। অথচ করাই-বা যায় কী? সন্ধ্যার দিকে গড়ের মাঠে বসে রোজ ভাবে।

সুশীল সেদিন গড়ের মাঠের একটা নির্জন জায়গায় বসে ছিল চুপ করে। বড্ড গরম পড়ে গিয়েছে—খিদিরপুরে তার মামার বাসাটিও ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের চিৎকার ও উপদ্রবে সদা সরগরম—সেখানে গিয়ে একটা ঘরে তিন-চারটি আঁট-দশ বছরের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে হবে। সুশীলের ভাল লাগে না আদৌ। তাদের অবস্থা এখন খারাপ হতে পারে, কিন্তু দেশের বাড়িতে জায়গার কোনো অভাব নেই।

ওপরে নিচে বড় বড় ঘর আছে—লম্বা লম্বা দালান, বারান্দা—পুকুরের ধারের দিকে বাইরের মহলে এত বড় একটা রোয়াক আছে যে, সেখানে অনায়াসে একটা যাত্রার আসর হতে পারে।

এমন সব জ্যোৎস্নারাতে কতদিন যে পুকুরের ধারে ওই রোয়াকটায় একা বসে কাটিয়েছে! পুকুরের ওপারে নারিকেল গাছের সারি, তার পেছনে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের চূড়োটা, সামনের দিকে ওর ঠাকুরদাদার আমলের পুরনো বৈঠকখানা। এ বৈঠকখানায় এখন আর কেউ বসে না—কাঠ ও বিচুলি, শুকনো তেঁতুল, ভূষি, ঘুঁটে ইত্যাদি রাখা হয় বর্ষাকালে।

মাঝে-মাঝে সাপ বেরোয় এখানে।

সেবার ভাদ্রমাসে তালনবমীর ব্রতের ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছে পুজোর দালানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শোনা গেল পুকুরপাড়ের পুরনো বৈঠকখানার দিক থেকে।

সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, হরি চাকর বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকেছিল বিচালি পাড়বার জন্যে—সে-সময় তাকে কী সাপে কামড়েছে।

হৈ-হৈ হল। লোকজন এসে সারা বৈঠকখানার মালামাল বার করে সাপের খোঁজ করতে লাগল। কিছু গেল না দেখা। হরি চাকর বললে সে সাপ দেখেনি, বিচুলির মধ্যে থেকে তাকে কামড়েছে।

ওঝার জন্যে রানীনগরে খবর গেল। রানীনগরের সাপের ওঝা তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত—তারা এসে ঝাড়ফুঁক করে হরিকে সে-যাত্রা বাঁচালে। লোকজন খুঁজে সাপও বের করলে—প্রকাণ্ড খয়ে-গোখ্‌রো। হরি যে বেঁচে গেল, তার পুনর্জন্ম বলতে হবে।

—বাবু, ম্যাচিস আছে—ম্যাচিস?

সুশীল চমকে মাথা তুলে দেখলে, একটি কলোমতো লোক। অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত অবাঙালি লোক বলেই সুশীলের ধারণা হল—কারণ তারাই সাধারণত দেশলাইকে 'ম্যাচিস' বলে থাকে।

সুশীল ধূমপান করে না, সুতরাং সে দেশলাইও রাখে না। সে-কথা লোকটাকে বলতে সে চলেই যাচ্ছিল—কিন্তু খানিকটা গিয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে যেন কী ভেবে ফিরে এল।

সুশীলের একটু ভয় হল। লোকটিকে এবার সে ভাল করে দেখে নিয়েছে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। বেশ সবল, শক্ত-হাত-পা-ওয়ালা চেহারা—গুণ্ডা হওয়া বিচিত্র নয়। সুশীলের পকেটে বিশেষ কিছু নেই—টাকা-তিনেক মাত্র। সুশীল একটু সতর্ক হয়ে সরে বসল। লোকটা ওর কাছে এসে বিনীত সুরে বললে—বাবুজি, দু-আনা পয়সা হবে?

সুশীল বিনা বাক্যব্যয়ে একটা দুয়ানি পকেট থেকে বের করে লোকটার হাতে দিলে।

তাই নিয়ে যদি খুশি হয়, হোক না! এখন ও চলে গেলে যে হয়!

চলে যাওয়ার কোনো লক্ষণ কিন্তু লোকটার মধ্যে দেখা গেল না। সে সুশীলের কাছেই এসে সকৃতজ্ঞ সুরে বললে—বহুৎ মেহেরবানি আপনার বাবু! আজ আমার খাওয়ার কিছু ছিল না —এই পয়সা লিয়ে হুটেলে গিয়ে রোটি খাব। বাবুজির ঘর কুথায়?

ভাল বিপদ দেখা যাচ্ছে! পয়সা পেয়ে তবুও নড়ে না যে! নিশ্চয় আরও কিছু পাবার মতলব আছে ওর মনে মনে। সুশীল চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল, কাছাকাছি কেউ নেই। পকেটে টাকা তিনটে ছাড়া সোনার বোতামও আছে জামায়, হঠাৎ এখন মনে পড়ল।

ও উত্তর দিলে—কালকাতাতেই বাড়ি, বালিগঞ্জে। আমার কাকা পুলিশে কাজ করেন কিনা, এদিকে রোজ বেড়াতে আসনে মটর নিয়ে। এতক্ষণে এলেন বলে, রেড রোডে মোটর রেখে এখানেই আসবেন। আমি এখানে থাকি রোজ, উনি জানেন।

—বেশ বাবু, আপনাকে দেখেই বড় ঘরানা বলে মনে হয়।

সুশীলের মনে কৌতূহল হওয়াতে সে বললে—তুমি কোথায় থাক?

—মেটেবুরুজে বাবুজি।

—কিছু কর নাকি?

—জাহাজে কাজ করতাম, এখন কাজ নেই। ঘুরি ফিরি কাজের খোঁজে। রোটির যোগাড় করতে হবে তো?

লোকটার সম্বন্ধে সুশীলের কৌতূহল আর বেড়ে উঠল। তা ছাড়া লোকটার কথাবার্তার ধরনে মনে হয় লোকটা খারাপ ধরনের নয় হয়তো। সুশীল বললে, জাহাজে কতদিন খালাসিগিরি করছ?

—দশ বছরের কুছু ওপর হবে।

—কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছ?

—সব দেশে। যে-দেশে বলবেন সে-দেশে। জাপান লাইন, বিলেত লাইন, জাভা-সুমাত্রার লাইন—এস. এস. পেনগুইন, এস. এস. গোলকুণ্ডা—এস. এস. নলডেরা, পিয়েনোর বড় জহাজ নলডেরা, নাম শুনেছেন?

'পিয়েনো' কী জিনিস, পল্লিগ্রামের সুশীল তা বুঝতে পারলে না। না, ওসব নাম সে শোনেনি।

—তা বাবুজি, আপনার কাছে ছিপাব না। সরাব পিয়ে পিয়ে কাজটা খারাবি হয়ে পড়ল, জাহাজ থেকে ডিসচার্জ করে দিল। এখন এই কোষ্টো যাচ্ছে, মুখ ফুটে কাউকে বলতে ভি পারিনি। কী করব, নসিব বাবুজি!

—জাহাজে কাজ আবার পাবে না?

—পাব বাবুজি, ডিস্‌চার্জ সার্টিক্-ফিটিক্ ভাল আছে। সরাব-টরাবের কথা ওতে কুছু নেই। কাপ্তানটা ভাল লোক, তাকে কেঁদে গোড়-পাকরে বললাম—সাহেব আমার রোটি মেরো না। ও-কথা লিখো না।

লোকটি আর একটু কাছে এসে ঘেঁষে বসল। বললে—আমার নসিব খারাপ বাবু—নয়তো আমায় আজ চাকরি করে খেতে হবে কেন? আজ তো আমি রাজা!

সুশীল মৃদু কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞাসা করলে—কী রকম?

লোকটি এদিক-ওদিক চেয়ে সুর নামিয়ে বললে—আজ আর বলব না। এইখানে কাল আপনি আসতে পারবেন?

—কেন পারব না?

—তাই আসবেন কাল। আচ্ছা বাবু, আপনি পুরানো লিখা পড়তে পারেন?

সুশীল একটু আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কী লেখা?

—সে কাল বাৎলাব। আপনি কাল এখানে আসবেন, তবে, বেলা থাকতে আসবেন—সুরয ডুবার আগে।

মামার বাসায় এসে কৌতূহলে সুশীলের রাতে চোখে ঘুমই এল না। এক-একবার তার মনে হল, জাহাজি মাল্লা কত দূর কত দেশ ঘুরেছে, কোনো এক আশ্চর্য ব্যাপারের কথা কি তাকে বলবে? কোনো নতুন দেশের কথা? পুরনো লেখা কিসের? ...

ওর ছোট মামাতো ভাই সনৎ ওর পাশেই শোয়। গরমে তারও চোখে ঘুম নেই। খানিকটা উশখুশ করার পরে সে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। বললে—দাদা চা খাবে? চা করব?

—এত রাত্তিরে চা কী রে?

—কী করি বল। ঘুম আসছে না চোখে—খাও একটু চা।

সনৎ ছেলেটিকে সুশীল খুব পছন্দ করে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, লেখাপড়াতেও ভাল, ফুটবল খেলায় এরই মধ্যে বেশ নাম করেছে, কলেজ টীমের বড় বড় ম্যাচে খেলবার সময় ওকে ভিন্ন চলে না।

সনৎ-এর আর একটা গুণ, ভয় বলে কোনো জিনিস নেই তার শরীরে। মনে হয় দুনিয়ার কোনো কিছুকে সে গ্রাহ্য করে না। দুবার এই স্বভাবের দোষে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল, একবার খেলার মাঠে এক সার্জেন্টের সঙ্গে মারমারি করে, নিজে তাতে মার খেয়েছিলও খুব—মার দিয়েছিলও। সেবার ওর বাবা টাকাকড়ি খরচ করে ওকে জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে আনেন। আর একবার মাহেশের রথতলায় একটি মেয়েকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডার ছুরিতে প্রায় প্রাণ দিয়েছিল আর-কি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক যুবকদল ওকে গুণ্ডাদের মাঝখান থেকে টেনে উদ্ধার করে আনে।

সুশীল বললে—সনৎ, কতদূর লেখাপড়া করবি ভাবছিস?

—দেখি দাদা। বি. এম-পি. পর্যন্ত পড়ে একটা কারখানায় ঢুকে কাজ শিখব। কলকব্জার দিকে আমার ঝোঁক, সে তো তুমি জানই—

—আমি যদি কোনো ব্যবসায় নামি, আমার সঙ্গে থাকবি তুই?

—নিশ্চয়ই থাকব। তুমি যেখানে থাকবে, যা করবে—আমি তাতে থাকি এ আমার বড় ইচ্ছে কিন্তু। কী ব্যবসা করবে ভাবছ দাদা?

—আচ্ছা, কাউকে এখন এসব কিছু বলিসনে। তোকে আমি জানাব ঠিক সময়ে। তোকে নইলে আমার চলবে না। চল আজ শুয়ে পড়ি—রাত দুটো বাজে—

পরদিন সুশীল গড়ের মাঠে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে একা বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল—তবুও লোকটির দেখা নেই।

অন্ধকার নামল। আসবে না সে লোক? হয়তো নয়। কী একটা বলবে ভেবেছিল কাল, রাতারাতি তার মন ঘুরে গেছে।

রাত আটটার সময় সুশীল উঠতে যাবে, এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সে চেয়ে দেখলে।

পরক্ষণেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লোকটা ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে।

—সেলাম, বাবুজি! মাপ করবেন, বড় দেরি হয়ে গেল। এই দেখুন—

লোকটার পায়ের ওপর দিয়ে ভারী একটা জিনিস চলে গিয়েছে যেন। সাদা কাপড়ের

ব্যান্ডেজ বাঁধা—কিন্তু ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে।

সুশীল বললে—এঃ, কী হয়েছে পায়ে?

—এইজন্যে দেরি হয়ে গেল বাবুজি। বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর একটা ভারী হাতে-ঠেলা গাড়ি পায়ের ওপর এসে পড়ল। দুজন লোক ঠেলছিল, তাদের সঙ্গে মারামারি হয়ে গেল আমার সঙ্গের লোকদের।

—বসো বসো। তোমার পায়ে দেখছি সাঙ্ঘাতিক লেগেছে! না এলেই পারতে!

—না এলে আপনি তো হারিয়ে যেতেন। আপনাকে আর পেতাম কোথায়? রিক্শা করে এসেছি বাবুজি, দাঁড়াতে পারছিনে!

লোকটা ঘাসের ওপর বসে পড়ল। বললে—আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাবুজি, আজ কোনো কাজ হবে না।

লোকটা কথা বলবে, সুশীল শুনবে। এতে দিনের আলোর কী দরকার, সুশীল বুঝতে পারলে না। বললে—কী কথা বলবে বলেছিলে—বলে যাও-না!

লোকটা ধীরে ধীরে চাপা গলায় অনেক কথা বললে—মোটামুটি তার বক্তব্য এই ঃ—

তার বাড়ি আগে ছিল পশ্চিমে। কিন্তু অকেদিন থেকে সে বাঙলাদেশে আছে এবং বাঙালি খালাসিদের সঙ্গে কাজ করে বাঙলা শিখেছে। লোকটা মুসলমান, ওর নাম জামাতুল্লা। একবার কয়েকজন তেলেগু লস্করের সঙ্গে সে একটা জাহাজে কাজ করে—ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপে নারকোল-কুচি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেত মাদ্রাজ থেকে। সেই সময় একবার তাদের জাহাজ ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অচল হয়ে পড়ে। সৌরাবায়া থেকে তাদের কোম্পানির অন্য জাহাজ এসে তাদের জাহাজের মাল তুলে নিয়ে যাবার আগে সাতদিন ওরা সেইখানে পড়ে ছিল। একদিন সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে জাহাজসুদ্ধ লোকের কলেরা হল।

এইখানে সুশীল জিজ্ঞেস করলে—সবারই কলেরা হল?

—কেউ বাদ ছিল না বাবু। খাবার পাওয়া যেত না, পাহাড়ের একটা গর্তে কাঁকড়া পেয়ে সেদিন ওরা তাই ধরে ছিল। ছোট ছোট—লাল কাঁকড়া।

—তারপর?

—দুজন বাদে বাকি সব সেই রাত্রে মারা গেল। বাবুজি, সে-রাতের কথা ভাবলে এখনও ভয় হয়। সতেরো জন দিশি লস্কর আর দুজন ওলন্দাজ সাহেব—একজন মেট আর একজন ইঞ্জিনীয়ার—সেই রাত্রে সাবাড়। রইলাম বাকি কাপ্তান আর আমি।

তারপর জাহাজের কাপ্তান ওকে বললে—মড়াগুলো টান দিয়ে ফেলে দাও জলে—

ও বললে—আমি মুর্দাফরাশ নই সাহেব, ও আমি ছোঁব না—

সাহেব ওকে গুলি করে মারতে এল। ও গিয়ে লুকোল ডেকের ঢাকনি খুলে হোল্ডের মধ্যে। সেই রাত্রে কাপ্তান সাহেব খুব মদ খেয়ে চিৎকার করে গান গাইছে—ও সেই সময় জাহাজের বোট খুলে নিয়ে নামতে গেল।

ডেভিট থেকে বোট নামাবার শব্দে সাহেবের মদের নেশা ভাঙল না তাই নিস্তার—ডেকের ওপরে তখন দুটো মড়া পড়ে রয়েছে—মরণের বীজ জাহাজের সর্বত্র ছড়ানো, ভয়ে ও কিছু খায়নি সকাল থেকে, পাছে কলেরা হয়। সুতরাং অনাহারে ও ভয়ে খানিকটা দুর্বলও হয়ে পড়েছে।

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছিল, দুপুরের দিকে ও লক্ষ্য করেছিল। সারারাত নৌকো বাইবার পরে ভোরে এসে বোট ডাঙায় লাগল। ও নেমে দেখে ডাঙায় ভীষণ জঙ্গল—ওদেশের সব

দ্বীপেই এ-ধরনের জঙ্গল ও জানত। লোকজনের কোনো চিহ্ন নেই কোনোদিকে।

বোট ডাঙায় বেঁধে ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুদিন হাঁটলে, শুধু গাছের কচি পাতা আর এক ধরনের অম্ল-মধুর ফল খেয়ে। মানুষের বসতির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় এসে হঠাৎ একেবারে ও অবাক হয়ে গেল।

ওর সামনে প্রকাণ্ড বড় সিংহদরজা—কিন্তু বড় বড় লতাপাতা উঠে একেবারে ঢেকে ফেলে দিয়েছে। সিংহদরজার পর একটা বড় পাঁচিলের খানিকটা—আরও খানিক গিয়ে একটা বড় মন্দির, তার চূড়ো ভেঙে পড়েছে—মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বলে তার মনে হল। সে ভারতের লোক, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সে চেনে। এ-ক্ষেত্রে হয়তো সে ঠিক চিনতে পারেনি—তবে তার ওইরকম বলেই মনে হয়েছিল।

অবাক হয়ে সে আরও ঘুরে ঘুরে দেখলে। জায়গাটা একটা বহুকালের পুরনো শহরের ভগ্নস্তূপ মনে হল। কত মন্দির, কত ঘর, কত পাথরের সিংদরজা, গভীর বনের মধ্যে বড় বড় কাছির মতো তার নাগপাশ-বন্ধনে জড়িয়ে কত যুগ ধরে পড়ে আছে। ভীষণ বিষধর সাপের আড্ডা সর্ববত্র। একটা বড় ভাঙা মন্দিরে সে পাথরের প্রকাণ্ড বড় মূর্তি দেখেছিল—প্রায় আট-দশ হাত উঁচু।

সন্ধ্যা আসবার আর বেশি দেরি নেই দেখে তার বড় ভয় হয়ে গেল। এসব প্রাচীন-কালের নগর শহর—জিন—পরীর আড্ডা, তেলেগু লস্করেরা যাকে ওদের ভাষায় বলে 'বিহ্মমুনি'।

বিহ্মমুনি বড় ভয়ানক জিন, হিন্দুদের পুরোহিত মারা যাওয়ার পর বিহ্মমুনি হয়। এই গহন অরণ্যের মধ্যে লোকহীন পরিত্যক্ত বহু প্রাচীন নগরীর অলিতে গলিতে ঝোপেঝাপে ধূম্রবর্ণ, বিকটাকার, কত যুগের বুভুক্ষু বিহ্মমুনির দল সন্ধ্যার অন্ধকার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সন্ধানে জাগ্রত হয়ে উঠে হাঁক পাড়ে—ম্যয় ভুখা হুঁ! তাদের হাতের নাগালে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? অতএব এখান থেকে পালানোই একমাত্র বাঁচবার পথ।

সুশীল একমনে শুনছিল,—পালিয়ে গেলে কোথায়?

—সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার দুদিন তিন দিন ধরে হেঁটে সমুদ্রের ধারে পৌঁছুলাম। জাহাজে উঠব এসে এই তখন খেয়াল।

—আবার সেই মড়া-ভর্তি জাহাজে কেন?

—বুঝলেন না বাবুজি? যদি জাহাজে উঠি, তবে তো দেশে পৌঁছুবার ঠিকানা মেলে। নয়তো সেই জংলি মুলুকে যাব কোথায়? চারিধারে সমুদ্র, যদি জাহাজ না পাই তবে সেই জংলি মুলুকে না খেয়ে মরতে হবে—নয়তো জংলি লোকেরা খুন করে ফেলবে। বাবুজি, তখন এমন ডর, যে রাতে ঘুমুতে পারি নে। একদিন প্রকাণ্ড এক বনমানুষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম—নসিবের জোর খুব। অমন ধরনের জানোয়ার যে দুনিয়ায় আছে তা জানতাম না। গাছের ওপর একদল বনমানুষ ছিল—ধাড়িটা আমায় দেখতে পেলে না বাবুজি, দেখলে আর বাঁচতাম না।

সুশীল মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখলে। লোকটা মিথ্যা কথা বলচে না সত্যি বলচে, ওর এই বনমানুষের কথা তার একটা মস্ত বড় পরীক্ষা। সুশীল জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশুনো করেছিল, বাড়িতে আগে নানারকম পাখি, বেঁজি, খরগোশ, শজারু ও বাঁদর পুষত। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলত, 'মুস্তফিদের চিড়িয়াখানা'। এ-সম্বন্ধে ইংরেজি বইও নিজের পয়সায় কিনেছিল।

ও বললে—কত বড় বনমানুষ?

—খুব বড় বাবুজি। ইন্দোরের পালোয়ান রামনকীব সিং-এর চেয়েও একটা বাচ্চার গায়ে জোর বেশি। নিজের আঁখ্‌সে দেখলাম।

—কী করে দেখলে?

—ডাল ফাঁড়লে হাত আর পা দিয়ে ধরে! আমার মাথার ওপর গাছপালার ডালগুলো তো বনমানুষে বিলকুল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

—তবে তো তুমি সুমাত্রা দ্বীপে কিংবা বোর্নিওতে গিয়েছিলে কিংবা ওর কাছাকাছি কোনো ছোট দ্বীপে। তুমি যে বনমানুষ বলছ—ও হচ্ছে ওরাং ওটাং—ও ছাড়া আর কোনো বনমানুষ ও দেশে থাকবে না—

লোকটা হঠাৎ অত্যন্ত বিস্ময়ে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—দাঁড়ান—দাঁড়ান, বাবুজি, কী জায়গার নাম করলেন আপনি?

—সুমাত্রা আর বোর্নিও—

—ওঃ, বাবুজি, আপনি বহুৎ পড়ালিখা আদমি। এই নাম কতকাল শুনিনি জানেন? আজ দশ-বারো বছর। শেষের নামটা—কী বললেন বাবুজি? বোর্নিও? ঠিক। সুলু সী'র নাম জাহাজি চার্টে দেখবেন। সুলু সী'র কাছাকাছি, এপার ওপার। কেন জানেন বাবুজি? এই নাম শুনলে আমার বহুত কথা মনে পড়ে যায়! তাজ্জব কথা! আজ দেখচেন আমায় এই গড়ের মাঠে বসে দু-একটা পয়সা ভিক্ষে করছি—কিন্তু আমি আজ—আচ্ছা, সে-কথা এখন থাক।

—তারপর কী করলে বল-না! জঙ্গল থেকে এসে উঠলে আবার জাহাজে?

—হ্যাঁ, উঠলাম। সেই কাপ্তান তখন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে নিজের কেবিনে চাবি দিয়ে ঘুমুচ্ছে—আমি আগে তো ভাবলাম মরে গিয়েছে। মড়াগুলো কতক কাপ্তান ফেলে দিয়েছে—কতক তখনও রয়েচে। ভীষণ বদ গন্ধ—আর সেই গরম! আমি জাহাজের কিছু খেতে পারিনে কলেরার ভয়ে। ডাঙায় গিয়ে মাছ ধরতাম—আর কচ্ছপ।

—কাপ্তেন বেঁচে ছিল?

—বেঁচে ছিল, কিন্তু বেচারির মগজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তখনকার দিনে বেতার ছিল না, আমাদের জাহাজে যে অমন হয়ে গেল, সে-খবর কোথাও দেওয়া যায়নি। ওসব দিকের সমুদ্রে জাহাজ বেশি চলাচল করে না—জাহাজের লাইন নয়। এগারো দিন পরে সৌরাবায়া থেকে জাহাজ যাচ্ছিল পাসারাপং,—তারা আমাদের আগুন দেখে এসে জাহাজে তুলে নিয়ে বাঁচায়।

—কিসের আগুন?

—ডুবো-পাহাড়ের খানিকটা ভাঁটার সময় বেরিয়ে থাকত। পাটের থলে জ্বালিয়ে সেখানে রোজ আগুন করতাম—অন্য জাহাজের যদি চোখে পড়ে। তাতেই তো বেঁচে গেলাম।

এ-পর্যন্ত শুনে সুশীল বুঝতে পারলে না লোকটার ভাগ্য কিসে ফিরেছিল। তবে লোকটা যে মিথ্যা কথা বলছে না, ওর কথার ধরন থেকে সুশীলের তা মনে হল। কিন্তু এইবার লোকটা যে-কাহিনী বললে, তা শেষ পর্যন্ত শুনে সুশীল বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল—অল্পক্ষণের জন্য সারা গড়ের মাঠ, এমনকি বিরাট কলকাতা শহরটাই যেন তার সমস্ত আলোর মালা নিয়ে তার চোখের সামনে থেকে গেল বেমালুম মুছে—বহু দূরের কোনো বিপদসঙ্কুল নীল সমুদ্রে সে একা পাড়ি জমিয়েছে বহুকালের লুকোনো হীরে-মানিক-মুক্তোর সন্ধানে—পৃথিবীর কত পর্বতে, কন্দরে, মরুতে, অরণ্যে অজানা স্বর্ণরাশি মানুষের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—বেরিয়ে পড়তে হবে সেই লুকোনো রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে—পুরুষ যদি হও! নয়তো আপিসের দোরে দোরে

মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মতো ঘুরে ঘুরে সেলাম বাজিয়ে চাকুরির সন্ধান করে বেড়ানোই যার একমাত্র লক্ষ্য তার ভাগ্যে—নৈব চ, নৈব চ।

এই খালাসিটা হয়ত লেখাপড়া শেখেনি, হয়তো মার্জিত নয়—কিন্তু এ সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে এসেছে, দুনিয়ার বড় বড় নগর বন্দর, বড় বড় দ্বীপ দেখতে কিছু বাকি রাখেনি—এ একটা পুরুষমানুষ বটে—কত বিপদে পড়েছে, কত বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে।

বিপদের নামে ত্রিশ হাত পেছিয়ে থাকে যারা, গা বাঁচিয়ে চলবার ঝোঁক যাদের সারা জীবন ধরে, তাদের দ্বারা না ঘুচবে অপরের দুঃখ, না ঘুচবে তাদের নিজেদের দুঃখ। লক্ষ্মী যান না কাপুরুষের কাছে, অলসের কাছে—তাদের তিনি কৃপা করেন যারা বিপদকে, বিলাসকে, আরাম প্রিয়তাকে তুচ্ছবোধ করে।

জাহাজ সৌরাবায়া এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সত্যিই ক্লান্তিতে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়, অখাদ্য ভক্ষণে ওদের শরীর ভেঙে পড়েছিল। দিন পনেরো হাসপাতালে শুয়ে থাকবার পরে ক্রমশ ওর শরীর ভাল হয়ে গেল—কাপ্তেনের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণও ক্রমে দূর হল।

ওদের জন্যে কিছু টাকা চাঁদা উঠেছিল, ও হাসপাতাল থেকে যেদিন বাইরে পা দিলে, সেদিন এক দয়াবতী মেমসাহেব ওকে টাকাটা দিয়ে গেলেন। দুঃস্থ নাগরিকদের থাকবার জন্যে গভর্নমেন্টের একটা বাড়ি আছে—সেখানে ওকে বিনি খরচায় থাকবার অনুমতি দেওয়া হল।

এই বাড়িতে সে প্রায় দু-মাস ছিল, তারপর অন্য জাহাজে চাকরি নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে। তারপর পাঁচ-সাত বছর কেটে গেল। ও যেমন জাহাজে কাজ করে তেমনি করে যাচ্ছে। প্রাচ্য-দেশের বড় বড় বন্দরের মদের দোকান ও জুয়ার আড্ডার সঙ্গে তখন সে সুপরিচিত।

একবার তাদের জাহাজ ম্যানিলাতে থেমেছে। ও অন্যান্য লস্করদের সঙ্গে গিয়ে এক পরিচিত জুয়ার আড্ডায় উঠেছে—এমন সময়ে আড্ডাধারী এসে ওকে বললে—একবার এস তো! তোমাদের দেশের একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ও অবাক হয়ে বললে—আমাদের দেশের?

আড্ডাধারী চীনাম্যান হেসে বললে—হ্যাঁ, ইন্ডিয়ার। এতকাল দোকান করছি বন্দরে, ইন্ডিয়ার মানুষ চিনিনে?

ও আড্ডাধারীর পিছু পিছু গিয়ে দেখলে জুয়ার আড্ডার পেছনে একটা পায়রার খোপের মতো ছোট্ট ভীষণ নোংরা ঘরে একজন লোক শুয়ে। লোকটার বয়স কত ঠিক বোঝবার জো নেই—চল্লিশও হতে পারে, আবার ষাটও হতে পারে। বিছানার সঙ্গে যেন সে মিশে গিয়েছে বহুদিন ধরে অসুখে ভুগে।

ওকে দেখে লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে তেলেগু ভাষায় বললে—দেশের লোককে দেখতে পাইনে। যখন হংকং হাসপাতালে ছিলাম, অনেক দেশের লোক দেখতাম সেখানে। বসো এখানে। আহা, ভারতের লোক তুমি? মুসলমান? তা কী? এতদূর বিদেশে তুমি শুধু ভারতের লোক, যে-দেশের মাটিতে আমার জন্ম, সেই একই দেশের মাটিতে তোমারও জন্ম। এখানে তুমি আমার ভাই।

ও রোগীর বিছানার পাশে বসল। সেই অপরিচিত মুমূর্ষু স্বদেশবাসীকে দেখে ওর মনে একটা গভীর অনুকম্পা ও মমতা জেগে উঠল—যেন সত্যিই কতকালের আপনার জন।

রোগী বললে—আমার নাম নটরাজন, ত্রিবেন্দ্রাম শহর থেকে এগারো মাইল দূরে

কোটিউপ্পা বলে ছোট্ট একটি গ্রামে আমার বাড়ি। কোচিন থেকে যে স্টিমলঞ্চ ছাড়ে ত্রিবেন্দ্রাম যাবার জন্যে, সে-স্টিমার আমার গ্রামের ঘাট ছুঁয়ে যায়। বেউয়া কাপ্পিয়াম নদীর ধারে, চারিধারে ঘন বন আর ছোট ছোট পাহাড়—কেটিউপ্পা গ্রাম তুমি দেখনি, বুঝতে পারবে না সে কী চমৎকার জায়গা। আমি অনেক দেশ বেড়িয়েছি পৃথিবীর, ভবঘুরে হয়ে চিরদিন কাটিয়ে দিলাম জীবনটা—কিন্তু আমি তোমায় বলছি শোনো, ভারতবর্ষের মধ্যে তো বটেই, এমনকি পৃথিবীর মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর একটি অদ্ভুত সুন্দর দেশ। কিন্তু আমার দেশের বর্ণনা শোনাবার জন্যে আজ তোমায় আমি ডাকি নি। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, কাল যে সূর্যদেব উঠবে আকাশে, তা আমি চোখে বোধহয় দেখতে পারব না—তুমি আমার দেশবাসী ভাই, একটা উপকার করবে আমার?

—কী, বলুন। আপনি আমার চাচার বয়সী, কী হুকুম করবেন বলুন। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব।

রোগীর পাণ্ডুর মুখ অল্পক্ষণের জন্যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—নিবুনিবু প্রদীপের শিখার মতো। ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—কথা দিলে? কিন্তু ভীষণ লোভ দমন করতে হবে ভাই!

—আল্লার নামে বলছি, যা করতে বলবেন, তা-ই করব।

—আমার মাথার বালিশের তলায় একটা চামড়ার ব্যাগ আছে, সেটা বার করে নাও। আমার মৃত্যুর পরে ব্যাগটা আমার গ্রামে আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবে।

ও রোগীর মাথাটা সন্তর্পণে একধারে সরিয়ে আস্তে আস্তে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ বার করলে। ব্যাগের মধ্যে কতকগুলো কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হল না ওর।

বৃদ্ধ নটরাজন বললে—তোমার কাছে আমি কোনো কথা লুকোব না। ব্যাগটার মধ্যে একখানা ম্যাপ আছে—জীবনে অনেক সাহসের কাজ করেছি, অনেক বনেজঙ্গলে ঘুরেছি—অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি। এই ম্যাপখানা এবং ব্যাগের মধ্যে যা যা আছে—তা আমি সৎপথে থেকে হস্তগত করিনি। সৎক্ষেপে কথাটা বলে নি, কারণ বেশি বলবার আমার সময় বা শক্তি নেই। আজ বিশ-বাইশ বছর আগে এই ব্যাগ আমার হস্তগত হয়। যে-ম্যাপখানা এই ব্যাগের মধ্যে আছে—তার সাহায্যে যে-কোনো লোক দুনিয়ায় মহাধনী লোক হয়ে যেতে পারে। সুলু সী'র একটা খাড়ির ধারে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন আমলের এক নগরের ভগ্নস্তূপ আছে। সেই নগর প্রাচীন যুগের এক হিন্দু রাজ্যের রাজধানী ছিল। তার এক জায়গায় প্রচুর ধনরত্ন লুকোনো আছে। যার কাছ থেকে এ ম্যাপ আমি পাই, সে আমারই বন্ধু, দুজনে মিলে সুলু সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি করেছি দশ বছর ধরে। সে জাতিতে মালয়, ম্যাপ তার তৈরি—সে নিজে ওই শহরের সন্ধান খুঁজে বার করেছিল। সেখানে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে, সামান্য কিছু পাথর ছাড়া সে বেশি কোনো জিনিস আনতে পারেনি সেখান থেকে। তার নিজের লেখা জাহাজের লগবুকের (Log Book) কয়েকখানা পাতা আমি মালয় ভাষা থেকে নিজের সুবিধার জন্যে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নিই সৌরাবায়াতে এক গরিব মালয় স্কুল-মাস্টারকে ধরে। সেই অনুবাদের কাগজখানাও এই ব্যাগের মধ্যে আছে। তারপর ম্যাপখানা হস্তগত করে আমি নিজে অনেক খোঁজাখুঁজি করি—কিন্তু সুলু সমুদ্রেরও ওদিকে বহুশত বসতিহীন ও বসতিযুক্ত ছোট ও বড় দ্বীপ—তাদের প্রত্যেকটিতে ভীষণ জঙ্গল। ম্যাপও যা আছে, তা খুব নিখুঁত নয়—মোটের ওপর সে-দ্বীপ আমি বার করতে পারিনি। দেশের গ্রামে আমার ছেলে আছে, তাকে নিয়ে গিয়ে ম্যাপটা আর ব্যাগ দিও। এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে—আমার বোম্বেটে বন্ধু

সেই প্রাচীন শহরে একটা জিনিস পায়। জিনিসটা একটা সীলমোহর বলেই মনে হয়। একখানা গোটা পদ্মরাগ মণির ওপর সীলমোহরটা খোদাই করা। সেটাও এর মধ্যে আছে। সেই মোহরের ওপরে যে-অদ্ভুত চিহ্নটি আঁকা আছে—আমার বিশ্বাস ছিল, সেটা একটা বড় হদিশ ওই প্রাচীন নগরীর রত্নভাণ্ডারের। তাই ওখানা আমি কবচের মতো গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েছি এতদিন। কিন্তু আজ বুঝেছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। উনিশ বছর আগে গ্রাম থেকে যখন চলে আসি, তখন আমার ছেলে ছিল দু-বছরের—আর আমার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিনি এই উনিশ বছরের মধ্যে। বেঁচে থাকলে আজ সে একুশ-বাইশ বছরের যুবক। তার হাতে এগুলো সব দিয়ে বলে দিও, বাপের ছেলে যদি হয়, সে যেন খুঁজে বার করে সেই নগরী, তার বাপ যা পারেনি। আর আমার কিছু বলবার নেই। ব্যাগটা নাও হাতে তুলে।

রোগী এই পর্যন্ত বলে ক্লান্তিতে চোখ বুজল। চীনা আড্ডাধারীর ইঙ্গিতে ও রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সুশীল বললে—তারপর?

—বাবুজি, যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, নটরাজন বাঁচল কি মারা গেল সেদিকে কোনো খেয়াল করিনি। আমার মাথা তখন ঘুরছে। ব্যাগ খুলে দেখলাম কতকগুলো পুরনো কাগজপত্র ও ম্যাপখানা ছাড়া আর কিছুই নেই! পদ্মরাগ মণিটা নেড়েচেড়ে দেখে কিছু বুঝলাম না—ওসব জিনিসের আমরা কী বুঝি বলুন! কিন্তু তখন আমার আর একটা বড় কথা মনে হয়েছে। নটরাজন যখন ওর গল্প করছিল, আমার মনে পড়ল সাত বছর আগের সেই ঘটনা। জাহাজে সেই কলেরা হওয়া, আমার জাহাজ থেকে পালানো এবং বন-জঙ্গলের মধ্যে সেই বিক্ষমুনির দেশের মধ্যে গিয়ে পড়া, বুঝলেন না বাবুজি?

—খুব বুঝেচি, বলে যাও।

—আমার মনে হল, আমি সেখানেই গিয়ে পড়েছিলাম ঘুরতে ঘুরতে। সে-পুরনো শহর আমি দেখেছি, নটরাজন যা বের করতে পারেনি। আমি সেখানে একটা গোটা দিন কাটিয়েচি। এই জায়গা সুলু সী'র ধারে, তাও আমি জানি। যদিও ঠিক বলতে পারব না হয়তো—কিন্তু দূর থেকে দেখলে বোধ হয় চিনব।

—ত্রিবাঙ্কুরের সেই গাঁয়ে গেলে না?

লোকটা বললে, প্রথমে ওর লোভ হয়েছিল খুব। পদ্মরাগ মণিটার দাম যাচাই করে দেখা গেল প্রায় দেড় হাজার টাকা দাম সেটার। তা ছাড়া আরও লোভ হল, নটরাজনের ছেলেকে ম্যাপ দেবার কী দরকার? এই ম্যাপের সাহায্যে সে-ই তো জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারে। বিশেষ করে একবার যখন সেখানে সে গিয়েছিল। কিন্তু তিন-চার দিন ভাবার পরে ওর মনে হল মরবার আগে বিশ্বাস করে নটরাজন ওর হাতে জিনিসগুলো সঁপে দিয়েছে তার ছেলেকে দেবার জন্যে। এখন যদি না দেয়, তবে নটরাজনের ভূত ওর পেছনে লেগে থাকবে, হয়তো বা মেরেও ফেলতে পারে। অতএব খানিকটা ইচ্ছা এবং খানিকটা অনিচ্ছাতে সেখানে যেতে সে বাধ্যই হল। বড় মজার ব্যাপার ঘটল কিন্তু সেখানে।

সুশীল বললে—কী রকম?

—বাবুজি, অনেক কষ্ট করে বেউয়া কাপ্পিয়াম নদীর ধারে সেই কেটিউপ্পা গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম নটরাজন মিথ্যে বলেনি, নদীটা একেবারে ওদের গ্রামের নিচে দিয়েই গিয়েছে বটে। নিজের পকেট থেকে যাওয়ার খরচ করলাম। গাঁয়ে গিয়ে যাকেই জিজ্ঞেস করি, কেউ নটরাজনের ছেলের খোঁজ দিতে পারে না। নটরাজনের কথাই অনেকের মনে নেই। দু-একজন বুড়ো লোক বললে, নটরাজনকে তারা চিনত বটে—তবে অনেকদিন আগে সে

নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তার স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে তারা জানে না।

—তারপর?

—মানে খানিকটা আনন্দ যে না হল তা নয়। ছেলেকে যদি সন্ধান না করতে পারি তবে আমার দোষ কী! তবুও একে ওকে জিগ্যেস করি। শেষকালে গাঁয়ের কাছারিতে কী ভেবে গিয়ে খোঁজ করলাম। তারা শুনে বললে, অনেকদিন আগে নটরাজনের জায়গাজমি নীলাম করতে হয়েছিল খাজনা না দেওয়ার জন্যে। নীলামের নোটিস তারা পাঠিয়েছিল ত্রিবেন্দ্রাম শহরে।

—পেলে খুঁজে?

—ঠিকানা তো খুঁজে বার করলাম। ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি, নারকেল গাছের বাগান সামনে। শহরের মধ্যে বাড়িটা নয়, শহর থেকে মাইলখানেক দূরে। অনেক ডাকাডাকির পরে এক বুড়ি এসে দোর খুলে দিলে। মাথার চুল সব সাদা হয়েছে, অথচ মুখ দেখে খুব বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না। বললে—কাকে চাও? আমি বললাম—নটরাজনের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বুড়ি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—ও-নাম কোথায় শুনলে? ও নাম তো কেউ জানে না! আমি তখন সব কথা বুড়িকে বললাম। শুনে বুড়ি কেঁদে ফেললে। বললে—আমার ছেলেও আজ নিরুদ্দেশ, তার বাপের মতো সেও বেরিয়েছে—আজ তিন বছর হয়ে গেল! কোনো খবর পাইনি।

—তুমি কী করলে?

—এই কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হল, বাবুজি। আমি সেখানে বুড়ির বাড়ি সাত-আটদিন রইলাম। তাকে মা বলে ডাকি। বুড়িও আমায় বড় যত্ন করতে লাগল। বুড়ি বড় গরিব—ভাড়াটে ঘরে থাকে। তার ছেলে স্কুলে পড়ত। সে রাঁধুনিগিরি করে ছেলের পড়ার খরচ ও নিজেদের খরচ চালাতো। এখনও সে নারকেল তেলের গুদামের শেঠজিদের বাড়ি রাঁধে। কোনোরকমেই একটা পেট চলে যায়। বুড়িকে পদ্মরাগ মণিটা আমি দেখাইনি—

—এত কষ্ট করে গিয়ে ওটার বেলা ফাঁকি দিলে?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল, পদ্মরাগ মণির গায়ে একটা আঁকজোঁক আছে—যা হদিশ দেবে হীরেজহরতের—ওই হল ওখানা না দেওয়ার গোড়ার কথা। ভাবলাম কী জানেন? ভাবলাম এই, নটরাজনের ছেলে না-পাত্তা—বুড়ির কাজ নয় ম্যাপ দেখে সুলু সী যাওয়া আর সেই দ্বীপের মধ্যে লুকোনো শহর খুঁজে বার করা। যদি ওকে দিই ওগুলো, এখানে পড়ে নষ্ট হবে। তার চেয়ে যদি আমি নিই, হয়ত চেষ্টা করলে একদিন-না-একদিন আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেও পারি। যদি হীরে জহরত পাই, বুড়িকে আমি ভালভাবে খোরপোশ দিয়ে রাখব। কিন্তু যদি পদ্মরাগ মণিখানা দিয়ে দিই—তবে হদিশটা হাতছাড়া হয়ে গেল। বুড়ি এখুনি অপরকে মণি বিক্রি করবে। যে কিনবে, সে মণির গায়ে আঁকা সীলমোহরের কোনো মানেই বুঝবে না। লোহার সিন্দুকে আটকা থাকবে জিনিসটা। তাতে কারো কোনো উপকার নেই। কী বলেন আপনি?

—তোমার যুক্তি মন্দ না। যদিও আমার মনে হয় জিনিসটা দেওয়াই তোমার উচিত ছিল। যাদের জিনিস, তারা সেটা নিয়ে যা খুশি করুক না কেন। তোমার ওপর শুধু দেওয়ার ভার। সেটা তুমি রাখলে নিজের কাছে?

—হাঁ বাবুজি। এই দেখুন আমার কাছেই আছে। আসুন ওই আলোর কাছে।

সুশীল আলোর নিচে গিয়ে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর প্রসারিত করতলের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ল। মস্ত একখানা পাথর, একটু চেপ্টা গড়নের, উজ্জ্বল লাল রঙের—তার

ওপর খোদাই-কাজ-করা।

সুশীল ওর হাত থেকে সীমলমোহরটা নিয়ে দেখলে উল্টেপাল্টে। খোদাই-কাজ-করা এত বড় পাথর সে কখনও দেখেনি। বড় সাইজের একটা কলার লেবেঞ্চুসের মতো। সীলমোহরের মধ্যে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল—বড় একটা ওঁকারের 'ওঁ'র লেজ জড়িয়ে জড়িয়ে পাকিয়েছে একটা বটগাছ কিংবা অন্য কোনো গাছকে। তারপর সে আরও ভাল করে চেয়ে দেখলে—আসলে ওটা ওঁকার নয়, যদিও সেইরকম দেখাচ্ছে বটে। কোন নাগ-দেবতার মূর্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। ত্রিভুজাকৃতি কী একটা আঁকা রয়েছে ছবির বাঁদিকে। কোনো নাম বা সন-তারিখ নেই।

লোকটা বললে—কিছু বুঝলেন বাবু?

—নাঃ, তবে হিন্দুর সঙ্গে এ-জিনিসের সম্পর্ক আছে বলে মনে হল। দেড় হাজার টাকার জিনিসটা তুমি যে বড় বিক্রি করে ফেল নি এতদিন?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল এই খোদাই-করা আঁকজোঁকের মধ্যে আসল মালের হদিশ পাওয়া যাবে—সেই লোভেই একে হাতছাড়া করে ফেলি নি।

—নটরাজনের স্ত্রী কোথা?

—তাকে কেটিউপ্পা গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। মাসে মাসে টাকা পাঠাই। শহরে খরচ বেশি, গাঁয়ে খরচ কম। ঘরভাড়া লাগে না। সেই সেদিনও পাঁচ টাকা ডাকে পাঠিয়েছি। এখন চাকরি নেই—নিজের পেটই চলে না।

—কাগজপত্র আর ম্যাপগুলো?

—ওই নটরাজনের স্ত্রী—তাকে আমি মা বলি—সেখানে তার কাছেই আছে। সঙ্গে নিয়ে বেড়াইনে, বড্ড দামি ও দরকারি জিনিস—আমার কাছে থাকলে হারিয়ে যেতে পারে। সে-বুড়ি তার বেতের পেটরায় তুলে রেখে দিয়েছে, যখন দরকার হবে, নিয়ে আসব গিয়ে।

—এসব আজ কত বছরের কথা হল?

—বেশি দিনের নয়। আজ দু-বছর আগে আমি নটরাজনের গাঁয়ে গিয়ে বুড়ির সঙ্গে প্রথম দেখা করি।

—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো। এই মানিকখানা বিক্রি করে ফেলে টাকাটা নটরাজনের স্ত্রীকে দাওগে। তার জীবনটা একটু ভালভাবে কাটবে। দেড় হাজার টাকা হাতে পেলে সে খুব খুশি হবে। তাদেরই জিনিস ধর্মত দেখতে গেলে, তোমার নিজের কাছে রাখা মানে চুরি করা।

—কিন্তু বাবু, তাহলে হদিশ চলে গেল যে!

—যাবে না। প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচে ওটা তুলে নিলেই চলে। ওই ছবিটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। মানিকখানা যার জিনিস, তাকে দাও ফিরিয়ে। তুমি যখন মা বলে ডাক, তখন তার আশীর্বাদ তোমার বড় দরকার। মানিকখানা যদি বুড়ি বিক্রি করে, যে কিনবে সে ওর খোদাই ছবির কোনো মানে করতে পারবে না, তার কোনো কাজেই লাগবে না।

—বেশ বাবুজি, আপনিই কাজটা করিয়ে দিন-না!

—কাল এটা সঙ্গে করে নিয়ে আমার সঙ্গে এখানে দেখা কোরো। আমার একটা জানাশুনো লোক আছে, সে এইসব কাজ করে—তাকে দিয়ে করিয়ে দেব।

রাত হয়ে গিয়েছিল। সুশীল মাঠ থেকে ফিরতে ফিরতে কত কথাই ভাবলে। তার মাথার মধ্যে যেন কেমন করছে। এ যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মত অদ্ভুত! এমনভাবে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে একজন মুসলমান লস্করের সঙ্গে দেখা হবে—সে তাকে এমন

একটি আজগুবি গল্প বলে যাবে—এ কখনও সে ভেবেছিল? গল্পটা আগাগোড়া গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেও পারত সে, যদি ওই চুনিয় সীলমোহরখানা সে না দেখত নিজের চোখে।

লোকটার গল্প যে সত্যি, তা ঐ পাথরখানা থেকে বোঝা যাচ্ছে। সন-তারিখ ও জায়গা মিলিয়ে এমনভাবে সে গল্প বলে গেল—যা অবিশ্বাস করা শক্ত। সুশীল ওকে শেষের দিকে যে প্রশ্নটা করেছিল, অর্থাৎ কতদিন আগে বুড়ির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, সেটা শুধু সময় সম্বন্ধে তাকে জেরা করা মাত্র।

সুশীল বাড়ি গিয়ে সনৎকে বললে—এই কলকাতা শহরেই অনেক মজা ঘটে যায় দেখছি!

সনৎ বললে—কী দাদা?

—সে একটা অদ্ভুত গল্প। যদি বলবার দরকার বুঝি তবে বলব—

পরদিন গড়ের মাঠে আবার সে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে রইল। একটু পরে জামাতুল্লা খালাসি এসে ওর পাশে নিঃশব্দে বসে পড়ল। বললে—আমার কথা ভাবলেন বাবুজি?

—চল আমার সঙ্গে। একটা ছাঁচ তোমাকে করিয়ে দিই। এনেছ ওটা?

—হাঁ বাবুজি। দেখুন, আমি ভিক্ষে করে খাচ্ছি আজ দু-মাস, তবুও এত বড় দামি পাথরটা বিক্রি করিনি শুধু বড় একটা লাভের আশায়। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, তত আমার মনে হচ্ছে নসিব আমার খারাপ, নইলে সেই জায়গায় গিয়েও তো কিছু করতে—

—জামাতুল্লা, তুমি লেখাপড়া-জানা লোক না হলেও খুব বুদ্ধি আছে। একা তুমি কিছু করতে পারবে না তা বেশ বোঝ। এ-কাজে টাকা চাই, লোক চাই, জাহাজ চাই। অনেক টাকার খেলা সেসব। তোমার অত টাকা নেই। মিছে কেন নটরাজনের স্ত্রীর পাওনা জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করবে?

দু-একদিনের মধ্যে প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচটা হয়ে গেল। সুশীল প্রাচীন ধনীবংশের সন্তান, ও যে ছাঁচ গড়িয়ে দিলে, সে ভাবলে ওদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি এটা। ফেরত দেওয়ার সময় সে বললে—এটা আমার এক বন্ধুকে একবার দেখতে দেবে?

—কেন বল তো?

—আমার সে-বন্ধু মিউজিয়ামে কাজ করে। পণ্ডিত লোক। যদি গভর্মেন্টের তরফ থেকে এটা কিনে নেওয়া হয় তাই বলছি।

—তাকে তোমার স্টুডিওতে কাল নিয়ে এস।

পরদিন জামাতুল্লাকে নিয়ে সুশীল বন্ধুর স্টুডিওতে গিয়ে দেখলে একটি সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন।

বন্ধুটি বলে উঠল—এই যে এস সুশীল, ইনি এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন—আলাপ করিয়ে দিই—ডঃ রজনীকান্ত বসু এম. এ. পি.এইচ. ডি.—মিউজিয়মে সম্প্রতি চাকুরিতে ঢুকেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডঃ বসু পদ্মরাগের সীলমোহরের ওপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠে বললেন—এ-জিনিসটা আপনি পেলেন কোথায়?

সুশীলের আর্টিস্ট-বন্ধু বললে—ওটা ওদের বংশের জিনিস। ওরা পল্লিগ্রামের প্রাচীন ধনী বংশ।

ডঃ বসু সন্দিগ্ধ মুখে বললেন—কিন্তু এ তো তা নয়! এ যে বহু পুরনো জিনিস! এ আপনারা পেয়েছিলেন কোথায় তার ইতিহাস কিন্তু জানেন? যদি বলতে বাধা না থাকে—

সুশীল বললে—না ডঃ বসু, আমি এ-সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। আপনি কী আন্দাজ করছেন?

ডাঃ বসু বললেন—দেখুন, সীলমোহরের ওপর এ-চিহ্ন আমি নিজে কখনও দেখিনি—তবে এই ধরনের পাথরের ওপর সীলমোহর ওঁকারভাটে পাওয়া গিয়েছে। ফরাসী ইন্দোচীনের জঙ্গলের মধ্যে বহু পুরনো নগরের ধ্বংসস্তূপে। এই সময় নির্দিষ্ট হয়েছে মোটমুটি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। আমাদের মিউজিয়ামেও আছে—কাল যাবেন, দেখাব। কিন্তু আপনার এটা আরও পুরনো, আমি একে নির্ভয়ে নবম শতাব্দীতে ফেলে দিতে পারি—কিংবা আরও আগে।

সুশীল বললে—আপনার তা-ই মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। নইলে বলতাম না। আর সেইজন্যেই আপনাকে জিগ্যেস করছি আপনাদের পূর্বপুরুষে এটা পেলেন কী করে? এ হল সমুদ্রপারের জিনিস। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে আমগাছের ছায়ায় শান্ত ও নিরীহ জিনিস নিয়ে কারবার—কিন্তু এ-সীলমোহরের পেছনে রয়েছে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার দুর্দান্ত সাহস, দুর্জয় বিক্রম, যুদ্ধ, রক্তপাত—ভারতবাসী যেদিন সমুদ্রের ওপারে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেইসব দিনের ইতিহাস এ-সীলমোহরের সঙ্গে জড়ানো। তাই বলছি, এটা আপনারা পেলেন কী করে?

ওখান থেকে বার হয়ে আসবার সময়ে সুশীলের মনে টাকার স্বপ্ন ছিল না।

ছিল যে সুদূরের, দুঃসাহসিক অভিযানের স্বপ্ন—জামাতুল্লা খালাসির অত বড় পদ্মরাগ মণিখানার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সে এমন একদিনের স্বপ্ন—যা প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে, তরুণদের প্রাণে নতুন আশা, উৎসাহ ও আনন্দের সংবাদ আনে বয়ে—

তবু তা সুশীলের মনে ছবি যে জাগালে তা আদৌ স্পষ্ট নয়—সবই আবছায়া, সবই ধোঁয়া-ধোঁয়া। সুশীল ইতিহাসের ছাত্র নয়। ডঃ বসুর শেষ কথা-কটির সঙ্গে যেন এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক শক্তি মেশানো ছিল—তার চোখের সামনে প্রাচীনকালের সুদীর্ঘ অলিন্দ বেয়ে তলোয়ার হাতে বর্মে চর্মে সুসজ্জিত বীরের দল সারি সারি চলেছে, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না—অজানা সুমদ্রপথে তাদের বিজয় অভিযান নব উপনিবেশের ইতিহাস সৃষ্টি করে ভাবীকালের অসহায় ও অকর্মণ্য সন্তানদের শিরায় শিরায় নতুন রক্তের আলোড়ন এনে দেয়।

কোথায় সে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে, পুরনো জমিদার-ঘরের বিলাসপুষ্ট আয়েসি ছেলেটি সেজে, তাদেরই পূর্বপুরুষ একদিন যে অসিহাতে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল—তাদেরই স্বজাতি, স্বদেশবাসী—আর সে থাকবে দিব্যি আরামে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে; তেলে জলে, দাদখানি চালের ভাত আর মাছের ঝোলে, কোনোরকমে পৈতৃক বাঙালি প্রাণটুকু বজায় রেখে চলবে টায় টায়!

চিরকাল হয়তো এমনি কেটে যাবে তার।

প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করে, পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টেনে আর পালপার্বণে গ্রাম্য লোকজনের পাতে দই মোণ্ডা দিয়ে হাততালি অর্জন করবার প্রাণপণ চেষ্টায় মশগুল হয়ে।

তারপর আছে মামলা মোকর্দমার তদারক করতে কোর্টে ছুটোছুটি—ডিক্রি, নালিশ,

কিস্তিবন্দি, সইমোহরের নকল, সমন জারি—উঃ! ভাবলে তার গা কেমন করে। প্রাচীন ধনীবংশের লাল খেরো-বাঁধানো রোকড ও খতিয়ানের চাপে সে নিজের যৌবন ও জীবনকে একদম পিষে মেরে ফেলে শেষের দিকে যখন মহকুমার হাসপতালে একটি মাত্র রোগী থাকবার স্থানের টাকা জেলাবোর্ডের হাতে দেবে স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষা কল্পে—তখন হয়তো সে পাবে রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর খেতাব।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, এই তো জীবনের পরম সার্থকতা সে পেয়ে গেছে।

না দেখবে দুনিয়া—না দেখবে জীবন, ঠুলিপরা বলদের মতো ঘানিগাছের চারিধারে ঘুরেই জীবন কাটাবে!

রাত্রে সে সনৎকে ডেকে বললে—সনৎ, তোর সাহস আছে?

—কেন দাদা?

—আমি যদি বিদেশে বেরুই, আমার সঙ্গে যাবি?

—এখুনি—যদি নিয়ে যাও!

—অনেক দূর হলেও?

—যেখানে বল।

—বাড়ির জন্যে মন কেমন করবে না?

—আমি পুরুষমানুষ না দাদা? ও-কথাই ওঠে না!

—আমি এমনি জিগ্যেস করছি—

পরদিন সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়ল পুরনো দিনের বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। যেসব কথা সে জানত না, কোনোদিন শোনেনি—ডঃ বসুর কথায় তার ইচ্ছে গেল সেগুলো জানবার ও পড়বার।

বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের কাহিনী, চম্পা রাজ্যের কথা—সুদূর সমুদ্রপারের ভারতীয় উপনিবেশ চম্পা। ভারতবাসী অসির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ দিয়ে যে, দেশের মাটি-পাথরের গায়ে নাগরাজ বাসুকী, শিব-পার্বতী ও বিষ্ণুমূর্তি অমর করে রেখেছে।

জামাতুল্লা খালাসিকে সে একেশোবার ধন্যবাদ জানাল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়তে পড়তে।

সে তো এক পাড়াগাঁয়ে অলস জীবন যাপন করছিল—

কোনদিন এসব কথা সে জানতেও পারত না—এত বড় ছবি তার মনে কোনোদিন জাগতও না—যদি দৈবক্রমে জামাতুল্লা খালাসি সেদিন তার পাশে এসে বসে দেশলাই না চাইত।

তুচ্ছ এক পয়সার দেশলাই।

পড়ার টেবিলে বসে বসেই সুশীলের হাসি পেল কথাটা ভেবে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে বার হয়েই জামাতুল্লা খালাসির সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মাঠের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে আছে। সুশীলকে দেখে সে বললে—আসুন বাবু, কাল রাতে এক কাণ্ড হয়ে গেছে!—আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে—

সুশীল বাধা দিয়ে বললে—কী—কী?

জামাতুল্লা বললে—সে এক আজগুবি কাণ্ড বাবু—

—কী রকম ব্যাপার?

—আপনার সেই বন্ধুর বাড়ি থেকে পাথরখানা নিয়ে কাল ফিরছি বাবু, মেটেবুরুজের কাছে ছোটমোল্লাখালি বলে যে বস্তি—ওই বস্তির কাছে আমার এক দোস্ত থাকে। ভাবলাম

চা খেয়ে যাই। সেখানে একেবারে মানুষ নেই—ফাঁকা মাঠ, সিকিমাইল দূরে ছোটমোল্লাখালি বস্তি। হঠাৎ বাবু আমার মনে হল আমার দম বন্ধ হয়ে আসচে, কে যেন আমার গলা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে—আমি তো চেঁচিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম—কিন্তু পড়ে গেলাম চিতপাত হয়ে মাঠের মধ্যে—পেছনে সে-সময় পায়ের শব্দ শুনলাম যেন—

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বললে—পাথরখানা আছে তো?

—শুনুন বাবু, তারপর। আমি এমন কাণ্ড কখনও দেখিনি। চিতপাত হয়ে পড়ে আর জ্ঞান নেই। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমার চারিপাশে দু-তিন জন লোক দাঁড়িয়ে, তারা .. পানি এনে আমার চোখেমুখে দিচ্ছে, কেউ গামছা নেড়ে বাতাস করছে। আমার দোস্তর নাম বলতে তারা আমায় ছোটমোল্লাখানি নিয়ে গেল তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে যখন আমার হুঁশ বেশ ভাল ফিরে এল, আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি পাথরখানা নেই।

—বল কী? নেই। গেল সেখানা!

—শুনুন বাবু আজগুবি কাণ্ড! পাথর নেই দেখে তো আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দোস্তর বাড়ি তো শোরগোল পড়ে গেল। কত লোক দেখতে এল—আমার দোস্ত কতবার মুখেচোখে পানি দিয়ে ডাক্তার ডেকে আমায় চাঙ্গা করলে। আমি সেই রাত্রেই বাড়ি চলে গেলাম—

—তারপর?

—বাবু, আপনি বলুন একটা কথা। আমি কাল আপনার দোস্তর কাছে দেখাতে গিয়েছিলাম কী নিয়ে? যে-ছাঁচ তৈরি হয়েছিল তা-ই নিয়ে—না আসল পাথরখানা নিয়ে? আপনার ওই যে দোস্ত খুব এলেমদার লোক, তার কাছে?

—ও, ডঃ বসুর কাছে তুমি তো আসল পাথরখানা নিয়ে গেছলে।

—ছাঁচখানা নিয়ে যাইনি, ঠিক তো? কিন্তু বাবু, বাড়ি ফিরে দেখি আসল পাথরখানা পকেটে রয়েছে, ছাঁচখানা নেই।

সুশীল হো-হো করে হেসে বললে—এ কোনো আজগুলি কাণ্ড হল না জামাতুল্লা। তুমি দুখানাই নিয়ে গেছলে। যে তোমার গলা টিপেছিল সে ছাঁচখানাকে ভুল করে নিয়ে গেছে—আসলখানা তোমার পকেটেই রয়ে গিয়েছিল। কোন পকেট কোনটা রেখেছিলে মনে আছে?

—বাবু, আমি ছাঁচটা নিয়েই যাইনি—

—আমি বলছি শোনো। তুমি ভুলে দুটোই নিয়ে গেছলে। কিন্তু এ থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে। কেউ আমাদের পাথরের খবর পেয়েছে—কলকাতা গুণ্ডা-বদমাইশের জায়গা—আমরা ক-দিন ধরে এখানে পাথরের কথা বলেছি, তত সাবধান হইনি। এখানেও শুনতে পারে, সেদিন ডঃ বসুর ওখানে দুটো আরদালি দাঁড়িয়ে ছিল—আমার সন্দেহ হয় তাদের মধ্যে কেউ শুনতে পারে। যাক ভালই হয়েছে যে আসলখানা চুরি যায়নি! আজ তোমার সঙ্গে নেই তো সেখানা?

—না বাবু। আমি কি আর তেমনি উজবুক!

—লোক লেগেছে আমাদের পেছনে। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে।

জামাতুল্লা হেসে বললে—বাবু, লোক লেগে আমায় হঠাৎ কিছু করতে পারবে না। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি—কত বদমাইশ লোকের সঙ্গে কতবার কারবার করেছি। এই হাতদুটো যে দেখছেন—এ-দুটো ঠিক থাকলে এর সামনে কেউ এগুতে পারবে না জানবেন খোদার দোওয়ায়।

সুশীল একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে—কোনোদিকে কোনো লোক নেই। সঙ্গীকে চুপিচুপি বললে—এসব কথা এখন নয়। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

—কোথায় বাবুজি?

—আমার বাসায়। সেখানে ঘরের মধ্যে বসে সব কথা হবে এখন।

জামাতুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সুশীল তাদের বাসায় এল। আসার পথে কোনো কিছু অঘটন ঘটে নি দেখে সুশীলের মন থেকে ভয় ও বিপদাশঙ্কা অনেকখানিই চলে গেল। জামাতুল্লাকে কিছু খেতে দিয়ে ও তার জন্যে বাইরের ঘরের কোণে বিছানা করে দিলে।

জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, বিছানা কেন?

—রাত্রে এখানে তোমায় রাখব। যেতে দেব না মেটেবুরুজে। সাবধানের মার নেই। খিদিরপুরের মাঠ থেকে মেটেবুরুজ পর্যন্ত জায়গা বড্ড নির্জন—গুণ্ডা-বদমাইশের আড্ডা। রাত্রে সে-পথে গেলে বিপদ আছে। তোমার যত সাহসই থাকুক—রাত্রে যাওয়া হবে না।

সুশীলের এই সতর্কতার জন্যে জামাতুল্লাকে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকতে হয়েছিল।

রাত্রে আহারাদির পরে সুশীল জামাতুল্লাকে বললে—আমার মতলব তোমাকে বলব বলেই তোমায় ডেকেছি। আমার মনে হয়েছে আমরা—যে-করেই হোক—চল সেই বনের মধ্যে প্রাচীন নগরের সন্ধানে বেরুই। টাকাকড়ির সন্ধান আমি করছি নে—পাই ভাল, তা আমি একা নেব না—নটরাজনের স্ত্রীর শেষ দিনগুলো যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটে তার ব্যবস্থা করব তা দিয়ে। তাররে তুমি আছ, আমি আছি। ভগবানের আশীর্বাদে আমার ঘরে খাবার ভাবনা নেই।

জামাতুল্লা খালাসি ঘাড় নেড়ে বললে—সে আমি আগেই জানি বাবু—আপনি রইস আদমি—মানুষ দেখেই চিনতে পারি। নইলে আপনাকে এত বিশ্বাস করতাম না। বড় ঘরানা আপনারা, আপনাদের নজর হবে বড়।

—তা ছাড়া কী জান জামাতুল্লা? এই বয়স হচ্ছে বিদেশ বেড়ানোর সময়। চিরকাল বাড়ি বসে থাকব যদি, তবে দুনিয়া দেখব কবে? ... তোমার সাহস আছে আমায় সেখানে নিয়ে যাবার তো?

—এ বাবুজি সাহসের কথা নয়। জাহাজ চালানো বিদ্যের কথা—কৌশলের কথা। সিঙ্গাপুরে আমার এক দোস্ত আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে, সে সুলু সীতে জাহাজ চালিয়েছে অনেক দিন—আপনার কাছে ছিপাব না, বোম্বেটের কাজ করতে সে। এখন বড্ড কড়া শাসন, ওলন্দাজ সরকার আর আমাদের ইংরেজ সরকারের। মানোয়ারি জাহাজ সর্বদা ঘুরছে। বোম্বেটে জাহাজ ধরতে পারলেই ধরে নিয়ে আসবে—আর গুলি করবে। সেজন্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকান করে বসে আছে সিঙ্গাপুরে। তাকে সঙ্গে নিতে হবে।

—তা হলে কী রকম ব্যবস্থা করবে যাবার?

—আপনি টাকা কত নিতে পারবেন বলুন।

—শ-পাঁচকে। তার বেশি এক পয়সা নয়।

তাও নেবেন না। আপনি আমার দোস্ত—দুশো নিয়ে চলুন। আমি পাথর বিক্রি করে ফেলি—সেই টাকায় চালাব।

—সে-টাকা তোমায় আমি নিতে দেব না জামাতুল্লা। নটরাজনের স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সে-পাথর নিয়ে আমাদের ফল ভাল হবে না। নটরাজন স্বর্গ থেকে দেখবে আর অভিশাপ দেবে।

—এইজন্যেই তো বলি, রইস আদমির বুদ্ধি আর আমাদের বুদ্ধি! আপনি যা বলবেন

বাবুজি।

অনেক রাত হয়েছিল। জামাতুল্লার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দিয়ে সুশীল নিজে শোবার জন্যে চলে গেল বটে—কিন্তু তার সারা রাত ঘুম এল না চোখে। এবার কী ক্ষণে সে বাড়ি থেকে বার হয়েছিল! সাগরপারের যাত্রী হয়ে যদি সেই অজানা দ্বীপে অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন যুগের হিন্দু-কীর্তি শুধু চোখের দেখা দেখে আসতে পারে—তবেই সে জীবন সার্থক বিবেচনা করবে। চম্পারাজ্যের মতো সেখানেও আর এক হিন্দু উপনিবেশ ছিল নিশ্চয়ই—মহাকালের চক্রনেমির আবর্তনে অরণ্য গ্রাস করেছে সে-নগরী—তবুও ভারতের সন্তান সে, প্রাচীন যুগের সেই পুণ্যভূমির পবিত্র ধূলি স্পর্শ করে সে ধন্য হতে চায়।

অর্থের জন্যে সে যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে উঠে সুশীল জামাতুল্লাকে চা ও খাবার খেতে দিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে বসেছে—এমন সময় কাগজওয়ালা খবরের কাগজ দিয়ে গেল, সুশীল কাগজ খুলে সংবাদগুলোর ওপর সাধারণভাবে চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত সুরে বলে উঠল—জামাতুল্লা, আরে, তোমাদের মেটেবুরুজে খুন! ...

জামাতুল্লা চা খেতে খেতে চমকে উঠে বললে—কোথায় বাবু, কোথায়?

—দু নম্বর মফিজুল সর্দারের লেন, একটা কুঠুরিতে নূর মহম্মদ নামে একটা লোককে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—

সুশীল কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখলে জামাতুল্লা তালপাতার মতো কাঁপছে—অতি কষ্টে সে সুশীলকে জিজ্ঞেস করলে—কী নাম লোকটির বাবুজি?

—নূর মহম্মদ—

জামাতুল্লা চা ফেলে উঠে এসে সুশীলের হাত ধরে বললে—আপনি আমার সবচেয়ে বড় দোস্ত—কাল এখানে রেখে আপনি আমার জান বাঁচিয়েছেন! নূর মহম্মদ আমার ঘরেই থাকে। এক বিছানাতে দুজনে শুই—কাল আমি থাকলে আমাকেই মারত, আমি ভেবে ভুল করে ও-বেচারিকে খুন করে গিয়েছে—

সুশীল বলে—তুমি এখুনি বাড়ি যাও—সেই জিনিসটা—

—না বাবু, সে আমি অন্য জায়গায় রেখেছি—সেখান থেকে কেউ সেটা বের করতে পারবে না।

সুশীল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—তবুও একবার যাও—

—সেটা নিয়ে বাবুজি আপনাদের বাড়িতে রেখে দিন আপনি—মেহেরবানি করে যদি রেখে দেন!

—নিশ্চয়ই রাখব। তুমি একা যেও না—চল আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আমার ভাই সনৎকে সঙ্গে নেব।

পাথরখানা এনেই সুশীল কয়েকদিনের মধ্যে তার আর-একখানা ছাঁচ করিয়ে নিয়ে সেখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এল। ওসব জিনিস সঙ্গে রাখলেই যত গোলমাল।

কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখবার কয়েকদিন পরেও ঘটে গেল এক বিপদ।

সুশীল তখন হাজার দুই টাকার ব্যবস্থা একরকম করে ফেলেছে। তার কাকাই টাকাটা তাকে দেবেন—তবে সে বলেছে ব্যবসার জন্যেই ওটা দরকার—বিদেশে যাওয়ার কথা শুনলে কেউ উৎসাহ দিত না। ওর সঙ্গে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাজি, সনৎ এ-কথা জানিয়েছে।

সুশীল বৌবাজার দিয়ে গিয়ে জামাতুল্লাকে ট্রামে দিয়ে এল। ট্রাম পরবর্তী থামবার

জায়গায় যাবার পূর্বেই ট্রামে এক শোরগোল উঠল।

জামাতুল্লা ট্রামের বেঞ্চিতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের একজন লোক নেমে গেল—নেমে যাবার সময় একবার যেন তার হাতখানা জামাতুল্লার পিঠের দিকে ঠেকাল—অন্তত জামাতুল্লার তা-ই মনে হল। পরক্ষণেই জামাতুল্লা রক্তাক্ত দেহে চিতপাত ট্রামের মেঝেতে।

লোকজন হৈ-হৈ—পুলিশ! পুলিশ! সবাই মিলে ওকে ধরাধরি করে নামিয়ে ফেললে।

শেষে দেখা গেল ওর বিশেষ কিছু লাগেনি এবারও। একখানা ধারালো ছুরি দিয়ে বোধ-হয় আততায়ী কোমরের থলে কাটতে চেষ্টা করেছিল। ছুরিখানা দৈবাৎ তলপেটের পাশের দিকে লেগে খানিকটা অগভীর রেখা সৃষ্টি করে লম্বালম্বিভাবে কেটে গিয়েছে।

এই ঘটনার ঠিক সাতদিন পরে সুশীল, সনৎ ও জামাতুল্লা তিনজনে একখানা রেঙ্গুনগামী জাহাজে চড়ে বসল—আপাতত সিঙ্গাপুর এবং সেখান থেকে ব্যাটেভিয়া যাবে এই হল উদ্দেশ্য ওদের।

মাস দুই পরের কথা।

সুশীল সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একটি ছোট শিখ-হোটেলের একটা ঘরে বসে সনৎকে বলছিল—আমরা এখানে এসে ভাল করলাম কি মন্দ করলাম এখনও বুঝিনি সনৎ। জামাতুল্লার বোম্বেটে বন্ধু তো দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির লোক—ও হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। ওকে কি খুব বিশ্বাস করা উচিত হল?

—বিশ্বাস না করেই-বা উপায় কী দাদা? ও ছাড়া সুলু সমুদ্রে জাহাজ চালাবে কে? তবে আমার মনে হয় যখন আমাদের কাছে এমন কোনো মূল্যবান জিনিস নেই—তখন সে অনর্থক মানুষ খুনের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে যাবে কেন?

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা তার বোম্বেটে বন্ধু মিঃ ইয়ার হোসেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ইয়ার হোসেন ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটা চুল-ছাঁটা দোকান করে ভাড়াটে চীনে নাপিত দিয়ে চুল ছাঁটায়—রোজগায় মন্দ হয় না। বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর বয়স হবে, রোগা চেহারা—চোখের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বালমানুষ ও নিরীহ ধরনের বলে মনে হয়—পরনে সাহেবি পোশাক। লোকটা ভারতীয় নয়, মালয়ও নয়—কোন দেশের লোক তা কখনও বলেনি। তবে তার কথাবার্তা থেকে মনে হয় ভারতের ওপর টানটা তার বেশি। কথাবার্তা বলে ইংরেজিতে, নয়তো মালয় ভাষায়। তার ভাঙা ইংরেজি জামাতুল্লা বেশ বোঝে।

এ-ধরনের লোকের সঙ্গে কখনও সুশীল বা সনৎ-এর পরিচয় ঘটেনি ইতিপূর্বে। বাইরে মোটামুটি ভদ্রলোক, এমনকি বেশ নিরীহ প্রকৃতির প্রৌঢ় ভদ্রলোক—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইয়ার হোসেন দুর্দান্ত দস্যু। মুহূর্তে মনোমালিন্যের ফলে যারা বন্ধুর বুকে অতর্কিতে তীক্ষ্ণধার কিরিচ বসিয়ে দিতে একটুকু দ্বিধা করে না—এ সেইজাতীয় লোক।

ইয়ার হোসেন ঘরে ঢুকে বললে—বসে আছেন? আমায় আর দুশো টাকা দিতে হবে—দরকার রয়েছে।

সুশীল জামাতুল্লার মুখের দিকে চাইলে অতি অল্পক্ষণের জন্য। জামাতুল্লা চোখের ইঙ্গিতে তাকে বলে দিলে ইয়ার হোসেনকে যেন সে প্রত্যাখ্যান না করে।

—কত টাকা বললেন মিঃ হোসেন?

—দুশো কি আড়াইশো—

—বেশ, নেবেন। সেদিন নিয়েছেন একশো—

ইয়ার হোসেন যেন খানিকটা উদ্ধত সুরে বললে—নিয়েছি তো কী হবে? তোড়.. করতেই সব টাকা যাচ্ছে—

—জাহাজের কী হল? চার্টার করবেন?

—জাহাজ চার্টার করবার টাকা কোথায়? কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা বলি। আপনারা সে-বিন্ধমুনির দেশে যেতে চাইছেন কেন? টাকাকড়ি হীরেজহরত সেখানে সত্যি আছে?

—কী করে বলি সাহেব! তোমার কাছে লুকুব না। খুব বড় রত্নভাণ্ডার সেখানে লুকোনো আছে এই আমাদের বিশ্বাস। ওই মণির ওপর আঁকজোক আছে—ওটাই তার হদিশ—অন্তত নটরাজন তা-ই বলেছিল।

—আমি চেষ্টা করে দেখব—কিন্তু আমার ভাগ ঠিক তিন ভাগের এক ভাগ চাই। ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলেই বিপদ ঘটবে। এই হাতে অনেক মানুষ খুন করেছি, সে-কথা কে না জানে? মানুষ মারা যা, আমার কাছে পাখি মারাও তা।

সুশীলের গা যেন শিউরে উঠল। কাজের খাতিরে এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আজ তাকে মিশতে হচ্ছে—ভাগ্য কী জানি কোন পথ তাকে নির্দেশ করছে! মুখে বললে—না সাহেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—ফাঁকে তুমি পড়বে না।

ইয়ার হোসেন বললে—একটা গল্প বলি শোনো তবে। একবার আমার জাহাজে ছ-সাতজন মাল্লা মদ খেয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। তাদের দলে একজন সর্দার ছিল, সে এসে আমায় জানালে, এই-এই শর্তে আমি রাজি না হলে তারা আমার হাত-পা বাঁধবে—মেরে ফেলতেও পারে। আমি ওদের সান্ত্বনা দিয়ে শর্তে সই করে দিলাম। তারপর ইঞ্জিন-রুমের বড় কর্মচারীকে ডেকে বললাম—জাহাজে কয়লা দিয়েই স্টীম বন্ধ করে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখবে।

ইঞ্জিনিয়ার বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কেন কাপ্তেন সাহেব—এ তো বড় বিপজ্জনক ব্যাপার—সেই ভীষণ উত্তাপে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখব?

সে-বেচারি আমার মতলব কিছু বুঝলে না। আমি সেই বিদ্রোহী সর্দারকে আর তার চারজন অনুচরকে বললাম ফার্নেসে কয়লা দিতে। এদিকে ইঞ্জিন-রুমে টেলিগ্রাফে ইঞ্জিনিয়ারকে পুরোদমে স্টিম দিতে বলেই ওরা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে পুলি ঘুরিয়ে জাহাজ প্রায় পঁচিশ ডিগ্রি কোণ করে স্টারবোর্ডের দিকে কাত করে ফেললাম। টাল সামলাতে না পেরে ওরা হঠাৎ গিয়ে পড়ল খোলা ফার্নেসের মুখে। লোক ঠিক করা ছিল, তক্ষুনি তারা ওদের ফার্নেসের আগুনে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে ফার্নেসের দরজা ঘটাং করে বন্ধ করে দিলে।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে বললে—তারপর?

—তার পর? তারপর দুদিন পরে কতকগুলো আধপোড়া হাড়পোড়া কয়লার ছাইয়ের সঙ্গে ফার্নেস-সাফ-করা কুলি সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। মিউটিনির শেষ হয়ে গেল।

—কেউ টের পেলে না?

—সবগুলো বদমাইশ যখন ও-পথে গেল—তখন বাকিগুলো আপনা-আপনিই চুপ করে গেল। ভালমানুষির দিন চলে গিয়েছে জানবেন। নিষ্ঠুর হতে হবে, নির্মম হতে হবে—তবে মানুষের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পারবেন।

সুশীল বুঝল না এমন নিরীহ ভালমানুষটির আড়ালে কী করে এমন দৃঢ় ও নির্মম চরিত্র

লুকানো থাকতে পারে।

—আর একটা কথা—অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে আপনাদের?

—কিছু না, একটি করে অটোম্যাটিক আছে দুজনের—তার কার্টিজ নেই।

—রাইফেল নেই?

—ভারত থেকে রাইফেল কেনা? মিঃ হোসেন, এবার আপনি হাসালেন।

ইয়ার হোসেন দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা বড় রিভলভার নিয়ে এসে সুশীলের হাতে দিয়ে বললে—পছন্দ হয়?

—ওঃ, এ তো চমৎকার জিনিস!

—এ-ই কিনব তিনটি তিনজনের, আর একটা পুরনো মেশিনগান—

—মেশিনগান কী হবে!

—অনেক দরকার আছে।

সুশীল ও সনৎ দুজনেই দেখলে সে অনেক রকম জানেশোনে। জাহাজ চালানোর যন্ত্রাদি কিনবার সময়—তার যে কিছু কিছু বিজ্ঞানের জ্ঞানও আছে—এ-পরিচয়ও পাওয়া গেল। চালচলনে, ধরনধারণে—সে সর্বদাই মনে করিয়ে দেয় যে সে সাধারণ নয়।

সুশীল জামাতুল্লাকে বললে—তুমি বলেছিলে দুশো টাকা হলেই হবে—তো এখন দেখছি পাঁচশো টাকাই মিঃ হোসেন নিয়ে নিলে নানা ছুতো করে; হাতে কিন্তু এক পয়সাও রইল না—

—কোনো ভয় নেই বাবুজি, আমি যখন আছি। ও তেমন লোক নয়।

—লোক নয় কী রকম? ভয়ানক লোক, আমরা বুঝেছি। ও দরকার মনে করলে তোমার মতো পুরনো বন্ধুর গলা কাটতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

—বাবুজি দেখছি ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

—তা একটু পেতে হয়েছে। টাকাটা ও মেরে দেবে না তো? তুমি হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে ওর পেছনে।

—বাবুজি, আমি হাজার পেছনে থেকেও কিছু করতে পারব না—ও যদি ইচ্ছে করে তবে সিঙ্গাপুর থেকে আজই পালিয়ে যেতে পারে—কেউ পাত্তাই পাবে না। ইয়ার হোসেন ছাঁচটার কথা জিগ্যেস করছিল—

—তুমি কী বললে?

—বললাম, বাবুর কাছে আছে।

—মতলব কী?

—না বাবু, খারাপ কিছু নয়—ও একবার দেখতে চায়।

—ওঃ, ভাগ্যিস আসল পদ্মরাগখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়! নইলে, সেই পাথর নিয়ে কলকাতাতেই খুন হয়ে গেল মেটেবুরুজে, এখানে আনলে সে-পাথর আমরা হাতে রাখতে পারতাম না!

জামাতুল্লা গলার স্বর নিচু করে বললে—বাবুজি, এখানেও লোক পেছন নিয়েছে।

সুশীল ও সনৎ একযোগে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কী রকম!

—এখন বলব না, আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন। সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে দিনদুপুরে মানুষের বুকে ছুরি বসায়—পারে শুনবেন।

সিঙ্গাপুরে যেদিকে বড় ডক তৈরি হয়েছে, ওর কাছে অনেক দূর পর্যন্ত সামরিক ঘাঁটি। সাধারণ লোককে সেসব রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। জামাতুল্লাকে পথপ্রদর্শকরূপে

নিয়ে দুজনে সেই দিকে বেড়াতে বেরুল। সমুদ্রের নীল দিগন্তপ্রসারী রূপ এখান থেকে যেমন দেখায়, এমন আর কোথাও থেকে নয়। দুপুরের কাছাকাছি সময়টা প্রখর রৌদ্র-কিরণে সমুদ্রজল ইস্পাতের ছুরির মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। দুখানা মানোয়ারি জাহাজ বন্দর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

একজন চীনেম্যান এসে ওদের পিজিন ইংলিশে বললে—টী, স্যর, টী?

—নো টী।

—নো টী স্যর? মাই হাউস হিয়ার স্যর, ভেরি গুড হোম-মেড টি স্যর!

সনৎ বললে—চল দাদা, চল জামাতুল্লা, একটু চা খেয়ে আসি।

সবাই মিলে রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা চীনা বাঁশঝাড়ের আড়ালে একটা অ্যাসবেস্টস-এর ঢেউ-খেলানো পাত দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট বাড়িতে এল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাঁশের টেবিল পাতা আছে বারান্দায়। তিনজনে সেখানে বসে দূরে সমুদ্রের দৃশ্য দেখছে—এমন সময় চীনেম্যানটি চা নিয়ে এল। ওরা চা খাচ্ছে, সে-লোকটা আবার কিছু কেক নিয়ে এসে ওদের সামনে রাখলে। ওদের বললে—তোমরা কোথায় যাবে?

সুশীল বললে—বেড়াতে এসেছি।

—কোথা থেকে?

—কলকাতা থেকে।

—ভেরি গুড। চমৎকার জায়গা সিঙ্গাপুর।—এখান থেকে আর কোথাও যাবে নাকি?

—না, আর কোথাও যাব না।

—ভাল কিউরিও কিনবে?

—কী জিনিস?

—এস না ঘরের মধ্যে।

ওরা তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বুদ্ধের মূর্তি, মালা, ড্রাগনের মূর্তি, পোর্সিলেনের পেটমোটা চীনে ম্যান্ডারিনের মূর্তি—ইত্যাদি সাধারণ শৌখিন জিনিস আলমারিতে সাজানো—ওরা হাতে করে দেখছে, এমন সময় সনৎ একটা জিনিস হাতে নিয়ে অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল:

—দাদা দেখ!

সুশীল ও জামাতুল্লা দুজনেই চেয়ে দেখলে, একখানা জেড পাথরে তৈরি ছুরির গায়ে কী আঁকজোঁক কাটা। ভাল করে দুজনেই দেখলে অবিকল সেই আঁকজোঁক, নটরাজনের পদ্মরাগ মণির গায়ে যে আঁকজোঁক ছিল।

ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল।

সুশীল বললে—এ-ছুরিখানার দাম কত?

—দু ডলার, মিস্টার।

—এ ছুরি তুমি কোথায় পেলে?

—দেখি ছুরিখানা! ও, এ আমি একজন মালয়ের কাছে কিনেছিলাম।

—এখানেই?

—হ্যাঁ, একজন মাল্লা ছিল সে।

—কোথা থেকে সে ছুরিখানা পেয়েছিল তা কিছু বলেনি?

—না মিস্টার। তবে ছুরিখানা সে ভয়ে পড়ে বিক্রি করে। সে বলেছিল, দু-দুবার সে প্রাণে মরতে মরতে বেঁচে যায় এ-ছুরিখানার জন্যে। তার পেছনে লোক লেগেছিল। লুকিয়ে

পাবলিক ... হাটি-১৮৯৭ ... খুলনা

আমার কাছে বিক্রি করে। কেউ জানে না যে এখানা আমার কাছে আছে।

—আমরা এখানা নেব।

—ওখানা বিক্রি হবে না।

—আমরা তিন ডলার দেব।

—নিয়ে বিপদে পড়বে তোমরা। ও নিও না।

—তোমার দোকানের জিনিস বিক্রি করতে আপত্তি কী?

—আমি আমার খরিদ্দারকে বিপদে ফেলতে চাইনে। শোনো মিস্টার, আমি জানি ও-ছুরি তুমি কেন নিতে চাইছ। ওই আঁকজোঁকগুলোর জন্যে—ঠিক কি না? প্রাচীনকাল থেকে এ-দেশে অনেকে জানে ওই আঁকগুলো কোথাকার এক গুপ্ত নগর আর তার ধনভাণ্ডারের হদিশ। সকলে জানে না বটে, তবে পুরনো লোক কেউ কেউ জানে। অনেক পুরনো জেড পাথরের আংটিতে ওই আঁকজোঁক আমি দেখেছি। ও নিয়ে একটা গুপ্ত সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়ের বাইরে আর কারো কাছে এই আঁক-জোঁকওয়ালা আংটি কি ছুরি কি কিরিচ দেখলে তারা তার পেছনে লেগে গুপ্তহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে—তবে তাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে, জিনিসটাকে হস্তগত করা।

—কেন?

—পাছে অন্য কেউ ওই আঁকজোঁকের হদিশ পেয়ে সেই প্রাচীন নগর আর তার গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করে ফেলে। ওরা নিজেরা যখন বের করতে পারলে না—তখন আর কাউকে ওরা খোঁজ করতেও দেবে না। ও-চিহ্নের জিনিস কাছে রাখা মানে প্রাণ হাতে করে বেড়ানো। কিন্তু আমার মনে হয় কী জান, মিস্টার? ওরকম নগর কোথাও নেই। ও একটা মিথ্যা প্রবাদের মতো এ-অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কেউ দেখেছে এ পর্যন্ত বলতে পার? কেউ বলতে পারে সে দেখেছে? কেউ সন্ধান দিতে পারে? ও একটা ভুয়ো গল্প।

চা খেয়ে বাইরে এসে তিনজনে সমুদ্রের দিকে চলল।

চীনেম্যানটি পিছন থেকে ডেকে বললে—ওদিকে যেও না মিস্টার, সামরিক সীমানা—যাওয়া নিষেধ। সমুদ্রের ধারে এদিকে বসবার জায়গা নেই।

একটু নির্জন স্থানে গিয়ে সুশীল বললে—জামাতুল্লা, শুনলে সব কথা? এখনও কি তোমার মনে হয় সে-নগর আছে কোথাও? আমরা আলেয়ার পেছনে ছুটছিনে? নটরাজনের গল্প ভুয়ো নয়?

জামাতুল্লা বললে—তবে পদ্মরাগ মণি এল কোথা থেকে?

—আমি তোমায় বলছি নটরাজনের কাহিনী আগাগোড়া বানানো গল্প। পদ্মরাগ মণি-খানা সে কোনোপ্রকার অসৎ উপায়ে হস্তগত করে—যার উপরে প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী ঐ চিহ্নটি আঁকা ছিল। এ ছাড়া ওর কোনো মানে নেই।

জামাতুল্লার মুখচোখের ভাব হঠাৎ যেন বদলে গেল—কত বৎসর পূর্বের এক স্বপ্নভরা দিন, এক আতঙ্কভরা কৃষ্ণা-রজনীর স্মৃতি তার মুখের রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে। সে বললে—কিন্তু বাবুজি, নটরাজন হয়তো দেখেনি, আমি তা দেখেছি। ভীষণ বনের মধ্যে অন্ধকার রাত কাটিয়েছি। আমি কারো কথা শুনিনে।

—খুব সাবধান জামাতুল্লা, আমাদের প্রাণের দাম এক কানাকড়িও না—যদি এ কথা কোনোরকমে প্রকাশ হয় যে আমরা ওই আঁকজোঁক-পড়া পাথরের ছাঁচে যার নিশানা সেই নগর খুঁজতে বেরিয়েছি।

—ঠিক বাবুজি। সে-কথা আমারও মনে হয়েছে। এই সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে

পথে-পথে রাত্রের অন্ধকারে খুন হয়। ভারি সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। ইয়ার হোসেনকে সাবধান করে দিতে হবে। মুশকিল হয়েছে লোকটা মাতাল, মদ খেয়ে কোনো কথা প্রকাশ করে না ফেলে। চল, যাওয়া যাক।

তিনজনে সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বাসার দিকে রওনা হল।

পরদিন ইয়ার হোসেন এসে ওদের বাসায় খুব সকালে উপস্থিত হল। সনৎ তখন উঠেছিল। চায়ের জন্যে স্টোভ ধরিয়েছে—ইয়ার হোসেনকে দেখে বললে—আসুন মিঃ হোসেন, ঠিক সময়েই এসেছেন—চা তৈরি।

ইয়ার হোসেন রুক্ষ প্রকৃতির লোক। বলে উঠল—চা খাবার জন্যে ঠিক আসি নি। আরও দুশো টাকা চাই।

হঠাৎ সনৎ-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আরও দুশো! তা হলে তো আমাদের হাতে রইল না কিছু!

—তা আমি কী জানি? এ-কাজে এসেছেন যখন তখন পয়সার জন্যে হঠলে চলবে না। নয়তো বলুন ছেড়ে দিই।

—না না, দাঁড়ান। আমি দাদা ও জামাতুল্লাকে ডাকি।

সুশীল শুনে বললে—তাই তো, ব্যাপার কী? চল, দেখি ব্যাপার কী।

ইয়ার হোসেন বাইরে বসে আছে। সুশীল গিয়ে বললে—গুড মর্নিং মিঃ হোসেন। কী মনে করে এত সকালে?

—সব ঠিক। আজ রাত্রে রওনা হতে হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে।

সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে বলে উঠল—কী রকম?

ইয়ার হোসেন গম্ভীর মুখে বললে—সব ঠিক। তার আগে সেই ছাঁচখানা একবার দেখি—এখুনি। আর দুশো টাকা—এখুনি।

সুশীলের ইঙ্গিতে সনৎ বাক্স খুলে প্যারিস-প্লাস্টারের ছাঁচ ওর হাতে দিলে। ইয়ার হোসেন ছাঁচখানা উল্টেপাল্টে দেখেশুনে বললে—নাও। এসব বুজরুকি—অন্য কিছুই না। কিছুই হবে না হয়তো।—টাকা?

সুশীল বললে—টাকা রয়েছে জামাতুল্লার কাছে। সে আসুক।

—কোথা সে?

—তা তো জানিনে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছে।

—আচ্ছা, আমি বসি।

—এখন কী ঠিক করলেন বলুন মিঃ হোসেন।

—এখান থেকে ডাচ্ স্টীমার 'বেন্দা' ছাড়ছে আজ রাত দশটায়। আমাদের নামতে হবে সাঙ্গাপান বন্দরে—সুলু সমুদ্রের ধারে। সাঙ্গাপান মশলার বড় আড়ত—সেখান থেকে চীনে জাঙ্ক ভাড়া করে যাব।

—এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাচ্ স্টীমারে উঠতে দেবে? মেশিনগান কিনেছেন নাকি?

—সব ঠিক আছে। আপনি শুধু দেখুন ইয়ার হোসেন কী করতে পারে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। জামাতুল্লা আর ফেরে না। সুশীল ও সনৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কাল বিকেলের সেই চীনাম্যানের কথা বারবার মনে পড়ছিল ওদের। কথাটা ইয়ার হোসেনকে বলা ঠিক হবে না হয়তো—ভেবেই ওরা বললে না। কিন্তু জামাতুল্লা সব জেনে-শুনে একা বেরুল কোথায়?

বেলা প্রায় দশটা। এমন সময় জামাতুল্লা ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে হাজির হল। ওর মুখের

চেহারা দেখে তিনজনেই একসঙ্গে বললে—কী হল তোমার?

জামাতুল্লা ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—কিছুই না।

—কিন্তু তোমার চেহারা দেখে—

—এই রোদে—

সুশীল বললে—জামাতুল্লা, মিঃ হোসেন আরও দুশো টাকা চান।

—ও! তা দিন বাবু। এই নিন চাবি।

—উনি বলছেন আজ রাত্রে আমাদের রওনা হতে হবে।

জামাতুল্লা সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে—টাকাটা দিয়ে দিন ওঁকে আগে।

টাকা নিয়ে ইয়ার হোসেন বিদায় নেবার পরমুহূর্তেই জামাতুল্লা নিম্নস্বরে বললে—বড় বেঁচে গিয়েছি। ডকের পাশে যে-গলি আছে ওখানে দু-জন মালয় গুণ্ডা আমাকে আক্রমণ করেছিল। দুজন দুদিক থেকে কিরিচ হাতে। ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিত আর-একটু হলে। আমি প্রাণপণে ছুটে বেঁচেছি। তোমার অত ছুটতে পারতে না, মারা পড়তে ওদের হাতে। কালকের সেই চীনেম্যানের কথাই ঠিক। আমরা খুব বিপন্ন এখানে। বাড়ি থেকে কোথাও বেরিও না। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে ওর কথা শুনছিল। কথা শেষ হলে সনৎ তাকে চা ও টোস্ট খেতে দিয়ে বললে—কিছু বলিনি আমরা। ও আজই যেতে বলছে—শুনেছ তো?

—যাতে হয়, আজই আমাদের পালাতে হবে। এখন প্রাণ নিয়ে জাহাজে উঠতে পারলে বাঁচি।

—বল কী জামাতুল্লা? এত ভয় নেই। চীনেম্যানটার বাজে গল্পটা দেখছি তোমার মনে বড় দাগ কেটে দিয়েছে।

—বাবুজি, মেটেবুরুজের মাঠে খুনের কথাটা ভেবে দেখুন। সে-পাথরখানার জন্যে নয়—আঁকজোঁকের জন্যে। এখন আমার তা-ই মনে হচ্ছে। অসবাধান হবেন না আজ দিনমানটা। জাহাজে উঠলে কতকটা বিপদ কাটে বটে।

সেদিন বিকেলে ইয়ার হোসেনের লোক আবার এল। একটা সীলমোহর-করা চিঠি সুশীলের হাতে দিয়ে বললে—এর উত্তর এখুনি চাই। সুশীল চিঠিখানা পড়ে দেখলে, আজ কীভাবে কোথা থেকে রওনা হতে হবে, সেই ব্যবস্থা চিঠিতে লেখা। ইয়ার হোসেন অন্য পথ দিয়ে যাবে। ওদের যেন চেনে না, এভাবে। জাহাজে না উঠে এদের তিনজনের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলবে না।

সুশীল চিঠির উত্তর দিয়ে দিলে। জামাতুল্লা বললে—আমাদের জিনিসপত্র যদি কিনতে হয়, এই সময় কিনে নিয়ে আসি—চলুন।

ওরা বেরিয়ে এল বাসা থেকে। ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের বড়বাজারে জিনিসপত্র কিনবে এই ওদের ইচ্ছা। জামাতুল্লা বললে—বাবু, কিছু ভাল জিনিস খেয়ে নেওয়া যাক। জানেন, কোনো অজানা রাস্তায় অনেক দূর যেতে হলে, ভাল খেয়ে নিতে হয়। অনকদিন হয়তো ভাল খাবার অদৃষ্টে জুটবে না।

একটা শিখ-রেস্টুরেন্টে ওরা গিয়ে বসল। মাংস, কাটলেট, চা, টোস্ট ইত্যাদি আনিয়ে খাওয়া শুরু করেছে, এমন সময় একজন ইউরোপীয়-পোশাক-পরা মালয় এসে ওদের টেবিলে বসে বিনীতভাবে বললে—সে কি তাদের সঙ্গে বসে খেতে পারে?

সুশীল বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

সে আর কোনো কথা না বলে খাবার আনিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে খেতে লাগল।

তারপর আবার ওদের দিকে চেয়ে বললে—আপনারা ভারতীয়?

সুশীল ভদ্রভাবে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—এখানে এসেছেন বেড়াতে, না?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগছে সিঙ্গাপুর?

—বেশ জায়গা।

—এখান থেকে দেশে ফিরছেন বোধ হয়?

—তা-ই ইচ্ছে আছে।

—আপনারা তিনজনে বুঝি এসেছেন?

—না, আমরা এখানে এক হোটেলে থাকি—আলাপ হয়ে গিয়েছে।

—বেশ, বেশ।

তারপর আবার বললে, আপনারা কোন হোটেলে উঠেছেন জানতে পারি কি? আমাদের একজন ভারতীয় বন্ধুর একটা ভাল হোটেল আছে, সেখানে খাবারপত্র সস্তা। ঘরদোরও ভাল। যদি আপনাদের দরকার হয়—

সনৎ হঠাৎ বলে উঠল—না, ধন্যবাদ। আমরা আজই চলে যাচ্ছি।

সুশীল টেবিলের তলা দিয়ে সনৎকে এক রামচিমটি কাটলে। মালয় লোকটার চোখে-মুখে একটা কৌতূহলের ভাব জাগল। সেটা গোপন করে সে বললে—ও! আজই যাবেন? কিন্তু ভারতের জাহাজ তো আজ ছাড়বে না?

সুশীল বললে—না, আমরা রেলে উঠে যাচ্ছি কুয়ালালামপুর।

—ও, কুয়ালালামপুর? দেখে আসুন, বেশ শহর।

আরও কিছুক্ষণ পরে লোকটা বিল চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সুশীল রাগের সঙ্গে সনৎ-এর দিকে চেয়ে বললে—ছি, ছি, এত নির্বোধ তুমি? ও-কথা কেন বলতে গেলে?

সনৎ অপ্রতিভ মুখে বললে—আমি ভাবলাম ওতেই আপদ বিদেয় হয়ে যাবে। অত জিজ্ঞেস করার ওর দরকার কী? আমরা যদি না যাই, তোর তাতে কি রে বাপু?

—তা নয়। কে কী মতলব নিয়ে কথা বলে, দরকার কী ওদের সঙ্গে কথা বলার?

জামাতুল্লা বললে—ঠিক কথা বলেছেন বাবুজি।

সন্ধ্যার কিছু আগে ওরা রেস্টুরেন্ট থেকে বার হয়ে রাস্তায় নেমে দু-একটা জিনিস কেনবার জন্যে বাজারের দিকে চলেছে—এমন সময় জামাতুল্লা নিচু গলায় চুপিচুপি বললে—ওই দেখুন সেই লোকটা!

সুশীল ও সনৎ চেয়ে দেখলে, সেই মালয় লোকটা একটা দোকানে কী একটা জিনিস কিনছে। ওদের দিকে পিছন ফিরে।

সুশীল বললে—চল আমরা এখান থেকে চলে যাই—মোড়ের দোকানে জিনিস কিনি গে।

জিনিস কিনতে একটু রাত হয়ে গেল। ওরা বড় রাস্তা বেয়ে অনেকটা এসে ওদের হোটেল ও গলিটার মধ্যে সে-কী গলিটাতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় কী একটা ভারী জিনিস সুশীলের ঠিক বাঁ হাতের দেয়ালে জোরে এসে লেগে ঠিকরে পড়ল সামনে রাস্তার ওপরে।

ওরা চমকে উঠল। জামাতুল্লা পথের ওপর থেকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে—সর্বনাশ!

ওরা দুজনে নিচু হয়ে জিনিসটা দেখতে গেল—কিন্তু জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, ছুটে

আসুন, এখানে আর দাঁড়াবেন না বলছি!

দুজনে জামাতুল্লার পিছনে পিছনে দ্রুতপদে চলতে চলতে বললে—কী, কী হয়েছে? কী জিনিস ওটা?

মিনিট পাঁচ-ছয় ছুটবার পর নির্জন গলিটার শেষ প্রান্তে ওদের হোটেলটা দেখা গেল। জামাতুল্লা হাই ছেড়ে বললে—যাক, খুব বেঁচে যাওয়া গিয়েছে! এখানা মালয় দেশের ছুঁড়ে মারা ছুরি! ওরা দশ-বিশ গজ তফাত থেকে এই ছুরি ছুঁড়ে লোকের গলা দুখানা করে কেটে দিতে পারে। আমাদের তাগ করেই ছুরিখানা ছুঁড়েছিল—কিন্তু অন্ধকারে ঠিক লাগেনি। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে, যে ছুঁড়েছে তার আর-একখানা ছুড়ি ছুঁড়তেই-বা কতক্ষণ?

সনৎ সেই ভারী ছোরাখানা হাতে করে বললে—ওঃ, এ গলায় লাগলে পাঁঠা কাটার মতো মুণ্ডু কেটে ছট্‌কে পড়ত! কানের পাশ দিয়ে তীর গিয়েছে!

সুশীল বললে—এ সেই গুপ্ত সম্প্রদায়ের লোকের কাজ। আমাদের পেছনে লোক লেগেছে।

জামাতুল্লা বললে—লোক লেগেছে, তবে আমাদের বাসাটা এখনও বার করতে পারেনি। আমি বলিনি যে এখানে আমরা বিপন্ন। আমার না বলবার কারণ আছে।

রাতে ডাচ স্টিমার 'বেন্দা' ছাড়ল। ইয়ার হোসেন বড় বড় কেরসিন কাঠের প্যাকবাক্স ওঠালে গোটাকতক জাহাজে—তাদের বাইরে বিলিতি বিয়ার মদের বিজ্ঞাপন মারা। ওঠাবার সময় অবিশ্যি কোনো হাঙ্গামা হল না—কিন্তু সুশীল ও সনৎ-এর ভয় তাতে একেবারে দূর হয়নি। সিঙ্গাপুরের বন্দর ও প্রকাণ্ড নৌ-ঘাঁটি ধীরে ধীরে দিকচক্রবালে মিলিয়ে গেল—অকূল জলরাশি আলোকোৎক্ষেপী ঢেউয়ে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

চারদিনের দিন সকালে জাহাজ এসে সাঙ্গাপান পৌঁছল। এখানে এসে ওরা নেমে একটা চীনা হোটেলে আশ্রয় নিলে।

সাঙ্গাপান মশলার খুব বড় আড়ত, কতকগুলো নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, নদীর সেই মোহানাতেই বন্দর অবস্থিত—যেমন আমাদের দেশের চট্টগ্রাম।

ইয়ার হোসেন বাংলা জানে না, উর্দু বা হিন্দুস্থানিও ভুলে গিয়েছে—ও জামাতুল্লার সঙ্গে কথা বলে পিজিন ইংলিশে ও মালয় ভাষায়। বললে—জামাতুল্লা, এবার তুমি তোমার সেই দ্বীপে নিয়ে যেতে পারবে তো?

—পারব বলে মনে হচ্ছে। তবে এখনও ঠিক জানি নে—

সুশীল বললে—শুনুন মিঃ হোসেন। যখন আমার সঙ্গে জামাতুল্লার দেখা হয় গ্রামে, ও বলেছিল ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের একটা দ্বীপে ওর জাহাজ নারকেলের ছোবড়া ও কুচি বোঝাই করতে গিয়ে ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায়। কেমন, তাই তো জামাতুল্লা? রাস্তার কথাটা একবার ভাল করে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

—ঠিক বাবুজি—

—তারপর বলে যাও—

—তারপর আমরা সাতদিন সেইখানে থাকি।

ইয়ার হোসেন বললেন—সেখানে থাকি মানে কী বুঝিয়ে বল। দ্বীপে, না সমুদ্রে?

—না সাহেব, দ্বীপে তো নয়—আমরা যাচ্ছিলাম এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে। মাঝদরিয়ায় এ কাণ্ড ঘটে। তারপর সৌরাবায়া থেকে জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে।

—কতদিন পরে উদ্ধার করে?

—আট দশ দিন কি ওই রকম।

সুশীল বললে—আগে বলেছিলে সাতদিন।

—বাবু, ঠিক মনে নেই। অনেক দিনের কথা। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে। সেই সময় সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে সব কলেরা হয়ে মারা গেল—বাকি ছিলাম কাপ্তান আর আমি। দ্বীপ ছিল নিকটেই—যেখানে ডুবোপাহাড়ে আমাদের জাহাজে ধাক্কা খেয়েছিল, সেখান থেকে ডাঙা নজরে পড়ে। জাহাজের রশির দু রশি কি তিন রশি তফাতে। দ্বীপ দেখলে আমি চিনতে পারব—তার ধারে একটা পাহাড়, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝর্না পড়েছে সমুদ্রে। বড় বড় পাথর পড়ে আছে; পাথরগুলো সাদা রঙের।

সুশীল হেসে বললে—তোমার সেই বিশ্বামুনির দ্বীপ?

জামাতুল্লা গম্ভীর মুখে বললে—হাসবেন না বাবুজি। এসব কাজে নেমে এদেশের সব দেবতাকে মানতে হবে। না মানলে বিপদ হতে কতক্ষণ? আমি খুব ভাল করেই তা জানি।

ইয়ার হোসেন বললে—বুঝলাম, ওসব এখন রাখ। সাঙ্গাপান থেকে কোন দিকে যেতে হবে, কত দূরে? একটা আন্দাজ দাও—একটা নটিক্যাল চার্ট করে নেওয়া যাক।

—আমরা সাঙ্গাপান তেকেই রওয়ানা হয়ে যাই পূর্ব-দক্ষিণ কোণে—আন্দোজ দুশো মাইল—সেখান থেকে পূর্বে উত্তর-পূর্ব কোণে যাই আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল। এইখানে সেই ডুবোপাহাড়ের জায়গাটা—যতদূর আমার মনে হচ্ছে—

ইয়ার হোসেন অসহিষ্ণুভাবে বললে—যতদূর মনে হলে তো হবে না! আমাদের সেদিকে যেতে হবে যে! সুলু সমুদ্রের সর্বত্র তো ঘুরে বেড়াতে পারা যাবে না। আচ্ছা, তুমি সে-দ্বীপ কতদূর থেকে চিনতে পারবে? নেমে, না জাহাজে বসে?

—জাহাজে বসে চিনতে পারব ওই সাদা পাথরের পাহাড় আর ঝর্না দেখে।

—কত সাদা পাথরের পাহাড় থাকে—

—না সাহেব, তা নয়। সে পাথরের পাহাড়ের গড়ন অন্য রকম। দেখলেই চিনব।

ইয়ার হোসেন আর সুশীল দুজনে মিলে মোটামুটি ম্যাপ এঁকে নিয়ে সেদিন রাত্রে আর একবার মিলিয়ে নিলে জামাতুল্লার বর্ণনার সঙ্গে। চীনা জাঙ্ক ভাড়া করা হল। দু-মাসের মতো চাল, আটা, চা, চিনি বোঝাই করে নেওয়া হল জাঙ্কে—আর রইল বিয়ারের কাঠের বাক্সভর্তি অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনগান।

ইয়ার হোসেন প্রস্তাব করলে—এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ রাত্রেই যাওয়া যাক—শত্রু লাগতে পারে—

জামাতুল্লা বললে—সে-কথা ঠিক। কিন্তু রাত্রে হারবার-মাস্টার জাহাজ কি নৌকো ছাড়তে দেবে না, পোর্ট-পুলিশে ধরবে। এসব জায়গায় এই নিয়ম। বোম্বেটে ডাকাতের আড্ডা কিনা সুলু সী! কড়া নিয়ম সব।

—তবে?

—কাল সকালে চলুন সাহেব—

ইয়ার হোসেন দ্বিধার সঙ্গে এ-প্রস্তাবে মত দিলে। সুশীলকে ডেকে বললে—রাতের অন্ধকারে যাওয়া ভাল ছিল। দিনের আলোয় সকলের মনে কৌতূহল জাগিয়ে যাওয়া ভাল না। যাই হোক, উপায় কী?

সকাল আটটার পরে সাঙ্গাপান থেকে ওদের নৌকো ছাড়ল। মাত্র দেড় টনের চীনা জাঙ্ক—সমুদ্রে মোচার খোলার মতো। কিন্তু জামাতুল্লা বললে—জাঙ্ক হঠাৎ ডোবে না, এসব তুফানসঙ্কুল সমুদ্রে পাড়ি দিতে চীনা জাঙ্ক-এর মতো জিনিস নেই।

জাহাজ ছেড়ে অনেক দূর এল, ক্রমে চারিধারে শুধু সমুদ্রের নীল জলরাশি।

জামাতুল্লা নাবিক ও কর্ণধার—কিন্তু যে বৃদ্ধ চীনাম্যান জাঙ্কের সারেং সেও দেখা গেল বেশ জাহাজ চালাতে জানে। দুদিন জাহাজ চলবার পরে জামাতুল্লার সঙ্গে চীনা সারেং এর ঝগড়া বেধে গেল।

ইয়ার হোসেন বললে—চেঁচামেচি কেন? কী হয়েছে?

চীনা সারেং বললে—জামাতুল্লা সাহেব জাহাজ চালাতে জানে না—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—

জামাতুল্লা বললে—বিশ্বাস করবেন না ওর কথা! ও-লোকটা একেবারে বাজে।

ইয়ার হোসেন ও সুশীল পরামর্শ করে জামাতুল্লার ওপরই কিন্তু জাহাজ চালানোর ভার দিলে। একদিন সন্ধ্যার সময় দূরে ডাঙা ও আলোর সারি দেখা গেল।

চীনা সারেং ছুটে গিয়ে বললে—ওহে, বড় যে জাহাজ চালাচ্ছ—ও-ডাঙা আর আলো কোথাকার? এদিক এত বড় ডাঙা কিসের?

জামাতুল্লাও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। চার্ট অনুসারে ওখানে আলো আর ডাঙা দেখবার কথা নয়। চীনা সারেং ইয়ার হোসেনকে আর সুশীলকে ডেকে বললে—ওকে বলতে বলুন স্যর, ও-আলো আর ডাঙা কিসের?

জামাতুল্লাকে মাথা চুলকাতে দেখে চীনা সারেং বিজয়গর্বে বললে—আমি বলে দিচ্ছি স্যর—সান্ডা প্রণালীর মুখে পিয়েরপং বন্দরের আলো—তার মানে বুঝেছেন? আমরা আমাদের যাবার রাস্তা থেকে একশো মাইল পূর্ব-দক্ষিণে হঠে এসেছি—এই রকম করে জাহাজ চালালে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে আমাদের আর বেশি দেরি থাকবে না স্যর!

চীনা সারেং সেদিন থেকে হল কাপ্তেন।

সুশীল বললে—রাগ কোরো না জামাতুল্লা। তুমি অনেকদিন এ কাজ করনি, ভুলে গিয়েছ হে।

জামাতুল্লা বললে—তা নয় বাবুজি। আমি ভুলিনি জাহাজ চালানো। আমার চার্ট ঠিক ছিল, আমার মনে হয় কী গোলমাল হয়েছে বা চার্টে ভুল করে রেখেছে।

আরও তিনদিন পরে বিকেলের দিকে চীনা কাপ্তেন বললে—পারা নামছে স্যর, দড়িদড়া সামলে আর জিনিস সামলে আপনারা খোলের মধ্যে নেমে যান—ঝড় উঠবে।

তিন ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ ঝড় এল পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে। দড়িদড়া ছিঁড়ে পাল উড়িয়ে নিয়ে যায়—জামাতুল্লা চিৎকার করে বললে—সব খোলের মধ্যে যান—ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠেছে—

জাঙ্কের ডেকের ওপর বড় বড় ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়ে—ক্ষুদ্র দেড় টনের জাঙ্কখানা যে, কোনো মুহূর্তে ভেঙেচুরে সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দেবে মনে হল সবারই—কিন্তু দু-তিন বার জাঙ্কখানা ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল—নাকানি-চুবুনি খেয়েও আবার সমুদ্রের ওপর ঠেলে ওঠে। শাবাশ মোচার খোলা!

হঠাৎ চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে উঠল—সামনে পাহাড়—সামলাও—

জামাতুল্লা হালে ছিল, ডাইনে সজোরে হাল মারতেই কান ঘেঁষে কতগুলো বজ্‌বজে সমুদ্রের ফেনা ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেল, ফেনাগুলোর মাঝে কালো রঙের কী একটা টানা রেখা যেন ফেনারাশিকে দুভাগে চিরে দিয়েছে। ডুবো-পাহাড়!

ঝড়ের শব্দে কে কী বলে শোনা যায় না—তবুও সুশীল শুনলে, চীনা কাপ্তেন চিৎকার করছে—খুব বাঁচা গিয়েছে! আর একটু হলেই সব শেষ হত আমাদের!

ইয়ার হোসেন ও সুশীল বাইরে একচমক দেখতে পেলে—জলের মধ্যে মরণের ফাঁদ

পাতাই বটে! সাক্ষাৎ মরণের ফাঁদ!

জামাতুল্লা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হাল ধরে আছে। একটু আলগা হলেই এই ভীষণ জায়গায় জাঙ্ক বানচাল হয়ে ধাক্কা মারবে গিয়ে বাঁদিকের ডুবো-পাহাড়ে। খানিকটা পরে জামাতুল্লার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ভয়ে—একী! দু-দিকেই যে ডুবো-পাহাড়!—ডাইনে আর বাঁয়ে!

চীনা কাপ্তেনকে হেঁকে বললে—কোথা দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছ গাধার বাচ্চা! পাহাড়ের চূড়ো দিয়ে যে! মারবে এবার—

ঝড়ের তুফানের মধ্যে চীনা কাপ্তেনের কথাগুলো অট্টহাস্যের মতো শোনা গেল। কী যে সে বললে, জামাতুল্লা বুঝতে পারল না।—কিন্তু যাই ভুল হোক, জাহাজ বাঁচাতে হবে।

সে সামনে পিছনে চেয়ে দেখলে—পাহাড়ের কালো রেখা অতিকায় শুশুকের শিরদাঁড়ার মতো জলের ওপর স্পষ্ট জেগে, মাস্তুলের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা সারেং সব পাল গুটিয়ে ফেলেছে—কেবল মাঝের বড় মাস্তুলে ষোল ফুট চওড়া বড় পালখানা ঝড়ের মুখে ছিঁড়ে ফালি-ফালি হয়ে অসংখ্য সাদা নিশানের মতো উড়ছে। সে দেখলে, নিশানগুলোর জন্যে জাহাজখানা এদিকে-ওদিকে হেলছে ঘুরছে। চক্ষের নিমেষে সে কোমর থেকে ছুরি বার করে পালের মোটা শনের কাছি কাটতে লাগল। একবার করে খানিকটা কাটে, আবার ছুটে গিয়ে হাল টিপে ধরে।

অমানুষিক সাহস ও দৃঢ়তা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাঁচ-ছ মিনিটের মধ্যে সে অত বড় মোটা রশিটা কেটে ফেললে। ফেলতেই দড়িদড়া ঢিলে পড়ে পাল সড়াৎ করে অনেকখানি নেমে এল।

চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে বললে—কে রশি কাটলে?

—আমি।

—খুব ভাল কাজ করেছ! এবার সামলাও ঠ্যালা। যদি জান না কোনো কিছু, তবে সবতাতেই সর্দারি করতে আস কেন?

চীনা কাপ্তেন মিথ্যে বলেনি। জামাতুল্লা সভয়ে দেখলে পালে ঢিল পড়াতে জাঙ্ক এবার জগদ্দল পাথরের মতো ভারী হয়ে পড়েছে যেন। পিছন থেকে বাতাস ঠেলা মেরেও তাকে নড়াতে পারছে না—সুতরাং দু-দিকের মরণফাঁদকে অতিক্রম করে বাহির সমুদ্রে পড়তে এর অনেক সময় লেগে যাবে—ইতিমধ্যে বাতাস দিক পরিবর্তন করলেই—বিষম বিপদ।

ইয়ার হোসেন পাকা লোক। সে বুঝেছিল কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। মাথা বার করে বললে—কী হল আবার? জাঙ্ক নড়ে না যে!

চীনা সারেং বললে—নড়বে কী স্যর—নড়বার পথ কি আর রেখেছে জামাতুল্লা? এবার বাঁচাতে পারলাম না বোধ হয়!

কিন্তু সুখের বিষয় আধঘণ্টার মধ্যে ভয় কেটে গেল। বাতাস পিছন হতেই বয়ে চলল একটানা—এবং আধঘণ্টার মধ্যে জাঙ্ককে ডুবো-পাহাড়ের ফাঁদ পার করে বাহির সমুদ্রে তাড়িয়ে দিলে।

জামাতুল্লা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

চীনা কাপ্তেন টিটকিরি দিয়ে বললে—বাঁচলে সবাই আজ নিতান্ত বরাতের জোরে! তোমার হাতের গুণে নয়, মনে রেখো।

সুমদ্র শান্ত, জ্যোৎস্না উঠেছে—সুশীলদের দল খোলের ঢাকনি খুলে ডেকের ওপরে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ জ্যোৎস্নার মধ্যে দূরে কী একটা বিরাট কালো জিনিস দেখা গেল—জল থেকে উঁচু

হয়ে আছে মাথা তুলে।

ইয়ার হোসেন বললে—কী ওটা?

সুশীল জিনিসটা প্রথমে দেখতে পেলে না—তারপর দেখে বিস্মিত হল—অস্পষ্ট কুয়াশা-মাখা জ্যোৎস্নালোকে কিছু ভাল দেখা যায় না—তবুও একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় দৈত্যের মতো আকাশের গায়ে কী ওটা জল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে?

সনৎও সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

একমাত্র জামাতুল্লা দু-চোখ বিস্ফারিত করে জিনিসটার দিকে চেয়ে ছিল।

ইয়ার হোসেন কথার উত্তর না পেয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, জামাতুল্লা তাকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ডেকের সম্মুখভাগে এগিয়ে এসে কালো জিনিসটা ভাল করে দেখতে লাগল।

চীনা সারেং টিটকিরি দেওয়ার সুরে বললে—দেখছ কী, ওটা ডুবো-পাহাড়—বুড়ো বয়সে চোখে ভাল দেখতে পাইনে—তবুও বলছি—

সুশীল বললে—জলের উপর জেগে রয়েছে যে! ডুবো-পাহাড় কী করে হল?

চীনা সারেং বললে—ও পাহাড়ের চূড়োটা মাত্র জেগে আছে জলের ওপর, স্যর। প্রকাণ্ড ডুবো-পাহাড় ওটা—

জামাতুল্লা এইবার সুশীলকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে—সারেং ঠিক বলেছে। এতক্ষণ পরে আমি চিনেছি, এই সেই পাহাড় বাবুজি—এই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েই—

সুশীল অবিশ্বাসের সুরে বললে—চিনলে কী করে?

—আমি এতক্ষণ তা-ই চেয়ে দেখছিলাম—এবার আমার কোনো সন্দেহ নেই—ওই ডুবো-পাহাড়ের এক জায়গায় দক্ষিণ কোণে একটা শুয়োরের মুখের মতো ছুঁচলো গড়ন দেখছেন কি? আসুন আমি দেখাচ্ছি—এতকাল আমার মনে ছিল না, কিন্তু এবার দেখেই মনে পড়েছে।

—ইয়ার হোসেনকে বলি?

—কিন্তু ওই হলদেমুখো চীনাটাকে কিছু বলবেন না, বাবুজি। ওটাকে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না—আপনি বলুন হোসেন সাহেবকে—

—যদি ও-ই সেই ডুবো-পাহাড়টা হয়, তবে তো ওখান থেকে জমি দেখা যাবে, আর সেই সাদা পাথরের পাহাড়টা—

—সে হল তিন রশি চার রশি তফাতে বাবুজি—চাঁদনি রাতে সাদা পাথরের পাহাড় অত দূর থেকে ভাল দেখা যাবে না। সকাল হোক—

চীনা সারেং চিৎকার করে উঠল—হাল সামলাবে না গল্প করে সময় কাটাবে—ডুবো-পাহাড় সামনে, সে-খেয়াল আছে?

জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে—আঃ, হলদেমুখো ভূতটা বড্ড জ্বালালে দেখছি—দাঁড়ান বাবুজি—আপনি হোসেন সাহেবকে বলুন, আমি দেখি ওদিকে কি বলে—

সুশীল হাসতে হাসতে বললে—তুমি যা-ই বল, ও কিন্তু খুব পাকা জাহাজি—এসব অঞ্চল দেখছি ওর নখদর্পণে—ওস্তাদ জাহাজি—এ বিষয়ে ভুল নেই—

কিছু পরে চীনা সারেং তার নাবিকগিরির সুদক্ষতার এমন একটি প্রমাণ দিলে যাতে জামাতুল্লাকে পর্যন্ত তারিফ করতে হল। জামাতুল্লার হাল পরিচালনায় জাহাজ যখন ডুবো-পাহাড়ের একদিক দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে তখন চীনা সারেং হুকুম দিলে—সামনে

এগোও—পাশ কাটাবার চেষ্টা করছ কেন?

—সামনে এগিয়ে ধাক্কা খাবে নাকি?

—এই বিদ্যে নিয়ে মাঝিগিরি করতে এসেছ সুলু সীতে? নিজের দেশে নদী খালে ডোঙা চালাও গে যাও গিয়ে! ওই পাহাড়ের দু-পাশের ভীষণ চাপা স্রোতের মুখে পড়ে জাহাজ পাহাড়ের গায়ে সজোরে ধাক্কা মারবে—সে-খেয়াল আছে? তোমার হালের সাধ্যি হবে না সে-স্রোতের বেগ সামলানো—দেখছ না জল কী রকম ঘুরছে?

জামাতুল্লা তখনও ইতস্তত করছে দেখে চীনা সারেং হেঁকে বললে—জামাতুল্লা এবার সবাইকে মারবে স্যার—ওকে বুঝিয়ে বলুন, একবার ওর হাত থেকে ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন—এবার বোধহয় আর রক্ষে হয় না—

সুশীল আর ইয়ার হোসেন জামাতুল্লাকে বললে—ও যা বলছে তা-ই করো না জামাতুল্লা—

—ও কী বলছে তা আপনারা খেয়াল করছেন না? ও বলছে ওই ডুবো-পাহাড়ের দিকে সোজাসুজি হাল চালাতে—মরব তো তা-হলে—

চীনা সারেং জামাতুল্লার কথা শুনতে পেয়ে বললে—চালিয়ে দেখই না কী করি। মরণের অত ভয় করলে মাল্লাগিরি করা চলে না সাহেব—

জামাতুল্লা চোখ পাকিয়ে বললে—হুঁশিয়ার! আমি আর যা-ই হই—মরণের ভয় করি তা তুমি বলতে পারবে না, হলদেমুখো বাঁদর—

সুশীল ধমক দিয়ে বললে—ও কী হচ্ছে জামাতুল্লা? এ-সময়ে ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কী? সারেং যা বলছে তা-ই করো—

জামাতুল্লা হাতের চাকা ঘোরাতেই জাহাজ পাহাড়ের একেবারে বিশ গজের মধ্যে এসে পড়ল—ঠিক একেবারে সামনা-সামনি—সবাই দুরুদুরু বক্ষে চেয়ে আছে, সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর ঘাঁটি, এ থেকে কী করে চীনা জাহাজ বাঁচবে কেউ বুঝছে না—দেখতে দেখতে বিশ গজের ব্যবধান ঘুচে গেল—দশ গজ—

আর বুঝি জাহাজ রক্ষা হয় না—মতলব কী চীনাটার?—সবাই বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে আছে। বুকের ভিতর ঢেকির পাড় পড়ছে সবারই—হঠাৎ সারেং ক্ষিপ্রহস্তে প্রকাণ্ড একটা জাহাজি কাছি সুকৌশলে সামনের দিকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—ডাইনে হাল মায়—

সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল যা ইয়ার হোসেন ও জামাতুল্লা তাদের জাহাজি মাল্লা-জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনও দেখেনি। জাহাজ ডানদিকে ঘুরে পাহাড়ের গুঁড়িটা পেরিয়ে যেতেই সারেং-এর কাছি গিয়ে পাহাড়ের সরু অংশটা জড়িয়ে ধরল এবং পেছন দিক দিয়ে ঘড়ঘড় করে নোঙর পড়ার শব্দে সবাই বুঝল বড় সী-অ্যাঙ্কর অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে ফেলার বড় নোঙর তার সুদৃঢ় আঁকশির মুখ দিয়ে সমুদ্রের তলায় পাথর ও মাটি আঁকড়ে ধরলেই জাহাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

বোঁ করে অত বড় জাহাজখানা ডিঙি-নৌকোর মতো ঘুরে গেল আর পরক্ষণেই স্থির, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল পাহাড় থেকে তিন-চার গজের মধ্যে। জাহাজ আর পাহাড়ের মধ্যে কেবল একফালি সরু সাগর-জল, একটা বড় হাঙর তার মধ্যে কষ্টে সাঁতার দিতে পারে।

ইয়ার হোসেন বলে উঠল—শাবাশ সারেং!

সুশীল ও সনৎ নিশ্বাস ফেলে বললে—খুব বাঁচিয়েছ বটে—

জামাতুল্লা চুপ করে রইল।

চীনা সারেং হলদে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে—বিদেশি লোক এখানে জাহাজ চালাতে পারে না, স্যার! জামাতুল্লা মাল্লাগিরি যা জানে, তা খাটে চাটগাঁয়ের বন্দরে—এসব সে-জায়গা নয়—এখানে জাহাজ চালাতে হলে পেটে বিদ্যে চাই অনেকখানি—

ইয়ার হোসেন বললে—এখন কী করা যাবে বল। জাহাজ তো আটকে গেল।

সারেং ওদের অভয় দিয়ে বললে—জাঙ্ক আটকায়নি। জোয়ার এলেই সকালে জাঙ্ক ছাড়া নিরাপদ।

সকলে দুরুদুরু বক্ষে সকালের প্রতীক্ষায় রইল। সুশীল আর জামতুল্লা ভাল করে ঘুমুতেই পারলে না। খুব ভোরে উঠে জামাতুল্লাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে সুশীল বললে—এস, চেয়ে দেখ—চল বাইরে—

জামাতুল্লা বাইরে এসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে—ওই সেই সাদা পাহাড় আর সেই দ্বীপ! আমি কাল রাত্রেই বুঝেছিলাম বাবুজি, কাউকে বলিনি—

—কেন?

—কী জানি বাবুজি, চীনা সারেংটাকে আর এই হোসেন সাহেবকে আমার তেমন যেন বিশ্বাস হয় না, খোদার দিব্যি বলছি—ওদের সামনে মুখ খোলে না আমার। হোসেন সাহেব আস্ত গুণ্ডালোক, বাধ্য হয়ে ওর সাহায্য নিতে হয়েছে, কিন্তু সিঙ্গাপুরে ওর নাম শুনে সবাই ভয় পায়।

—সে-কথা আর এখন ভেবে লাভ কী বল! ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে যখন। ইয়ার হোসেনকে বলি কথাটা।

ইয়ার হোসেন সব শুনে জামাতুল্লাকে ডেকে বললে—কোনো সন্দেহ নেই তোমার? এই দ্বীপ ঠিক?

—ঠিক।

—আমরা নেমে কিন্তু জাঙ্ক ছেড়ে দেব—ঠিক করে দেখ এখনও।

সুশীল ও জামাতুল্লা আশ্চর্য হয়ে বললে—জাঙ্ক ছেড়ে দেবেন কেন?

—আমি ওদের অন্য এক গল্প বলেছি। আমি বলেছি জঙ্গলে মাঠের ইজারা নিয়েছি ডাচ গবর্মেন্টের কাছে—এখানে আমরা এখন থাকব কিছুদিন। ওদের বলতে চাই নে—চীনেরা লোক বড় ভাল নয়—

দুপুরের পর জালি-বোটে জিনিসপত্র ও দুটি ছোট ছোট তাঁবুসমেত ওদের সকলকে অদূরবর্তী দ্বীপের শিলাবৃত তীরভূমিতে নামিয়ে জাঙ্কের সারেং তার ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে চলে গেল।

সুশীল ইয়ার হোসেনকে বললে—ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের দ্বীপ তো এটা? ডাচ্ গবর্মেন্টের কোনো অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু—

—সেসব বড় হাঙ্গামা। ডাচ গবর্মেন্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে তা হলে; কেন যাচ্ছি আমরা—ও দ্বীপে কতদিন আমরা থাকব! হয়তো আমাদের সঙ্গে পুলিশ পাহারা থাকত—সব মাটি হত।

জামাতুল্লা দ্বীপের মাটিতে নেমে কেমন যেন স্বপ্নমুগ্ধের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। এতকাল পরে সে যে এখানে আসবে তা মেটেবুরুজের মাল্লাপাড়ার হোটেলে সানকিতে ভাত খেতে বসে কখনও কি ভেবেছিল? সে ভেবেছিল তার দুঃসাহসের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে! সেই বিন্ধ্যমুনির দ্বীপ আবার!

সুশীল ভাবছিল, কী অদ্ভুত যোগাযোগ! বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে জমিদারের ছেলে সে

চিরকাল বসেই খাবে পায়ের ওপর পা দিয়ে, নির্বিঘ্নে জমিজমার খাজনা শোধ, দুপুরে লম্বা ঘুম দেবে, বিকেলে-দুপুরে মাছ ধরবে, সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় পৈতৃক তাকিয়া হেলান দিয়ে তাস-দাবা খেলবে, রাত্রে পিঠে-পায়েস খেয়ে আবার ঘুম দেবে—এই সনাতন জীবনযাত্রা-প্রণালীর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি তার পিতৃপিতামহের বেলায়।—তার বেলাতেও সে-ধারা অক্ষুণ্ণই থাকত যদি দৈবক্রমে সেদিন গড়ের মাঠে জামাতুল্লা খালাসি তার কাছে 'ম্যাচিস' চাইতে না আসত। কত সামান্য ঘটনা থেকে যে জীবনের কত বৃহৎ ও গুরুতর পরিবর্তন শুরু হয়!

সুশীল ও সনৎ দ্বীপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ-ধরনের ঘন বনানী এ পর্যন্ত তারা কোথাও দেখেনি—রীতিমত ট্রপিক্যাল অরণ্য যাকে বলে, তা এতদিন সুশীল ছবিতেই দেখে এসেছে এবং ইংরেজি ভ্রমণের বইয়ে তার বর্ণনাই পড়ে এসেছে—এতকাল পরে তা সে দেখল। জলের ধার থেকেই অপরিচিত গাছপালার নিবিড় বন আরম্ভ হয়েছে—বনস্পতি-মাতার বড় বড় গাছের গায়ে অর্কিডের ফুলগুলি সুগন্ধে প্রভাতের বাতাস মাতিয়েছে—মোটা মোটা লতা দুলছে এ-গাছ থেকে ও-গাছে! কত রঙের প্রজাপতি উড়ছে—সামনে সুনীল সমুদ্র প্রস্তরাকীর্ণ তীরভূমিতে এসে সজোরে ধাক্কা মারছে, একেবারে খোলা জলরাশি থৈ-থৈ করছে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত, একটা ব্রেকওয়াটার পর্যন্ত নেই কোথাও—যদি কেউ জলে পড়ে, তবে হাঙরের আহার্য হবে এ জানা কথা—এসব সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি সুশীল আগেই শুনেছে। বনের মধ্যে অনেক জায়গায় এখনও অন্ধকার কাটেনি—কারণ প্রভাতের রৌদ্র তার মধ্যে এখনও অনেক জায়গাতেই ঢোকেনি—দেখে বোধ হয়, দুপুরেও ঢোকে কি না সন্দেহ।

ইয়ার হোসেন দেখেশুনে বললে—এ যে ভীষণ জঙ্গল দেখছি—! জামাতুল্লা বললে—আগে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়েও যেন জঙ্গল বেশি হয়েছে।

সুশীল জানতে চাইলে এ-দ্বীপে লোক আছে কি না। ইয়ার হোসেন বললে—ম্যাপে তো কিছু দেয় না এ—দ্বীপের কিছুই দেখিনে ম্যাপে—কী জামাতুল্লা, তুমি কী দেখেছিলে?

—কোথাও কিছু নেই।

—বেশ ভাল জান?

—আমার যাওয়ার পথে অন্তত তো কিছু দেখিনি—

—এখান থেকে তোমার সে-নগর কতদূর হবে আন্দাজ?

—তিন-চার দিনের পথ।

—এত কেন হবে? এ-দ্বীপের প্রস্থ তো খুব বেশি হবার কথা নয়।

সুশীল বললে—কত বে আন্দাজ করছেন, মিঃ হোসেন?

—ত্রিশ মাইলের মধ্যে। তবে একটা কথা, এই জঙ্গল ঠেলে যাওয়ায় পথ এগোবে না বেশি। অনেক জায়গায় পথ কেটে নিয়ে তবে এগুতে হবে। তিন দিন লাগা বিচিত্র নয়।

সেদিন তাঁবু খাটিয়ে দুপুরে বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে দ্বীপের মধ্যে ঢোকবার জন্যে ইয়ার হোসেন সবাইকে তৈরি হতে বললে। মালয় কুলি ওরা এনেছিল সাতজন, জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—এরা সবাই ইয়ার হোসেনের হাতের লোক এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বী। ওদের গতিক বড় সুবিধের বলে মনে হয়নি সুশীলের ও সনৎ-এর গোড়া থেকেই। দেখে মনে হয় সিঙ্গাপুরে এরা চুরি-ডাকাতি ও রাহাজানি করে চালিয়ে এসেছে এতদিন। যেমন দুশমনের মতো চেহারা, তেমনি ধূর্ত দৃষ্টি এদের চেখে। ইয়ার হোসেনের কথায় এরা ওঠেবসে। জামাতুল্লা এদের বিশ্বাস করত না। কিন্তু উপায় কী, ইয়ার হোসেনকে

যখন দলে নিতে হয়েছে, তখন এদেরও রাখতে হবে।

দুদিন সমুদ্রের ধারে তাঁবু ফেলে থাকবার পরে সকলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সুশীল ও সনৎ এমন জঙ্গল কখনও দেখেনি। গাছপালা যে এত সবুজ, এত নিবিড়, এত অফুরন্ত হতে পারে—বাংলাদেশের ছেলে হয়েও এরা এ-জিনিসটা প্রথম দেখলে। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একটা ছোট নদী বা খাড়ি—তার পাশে যেন গাছপালা ও বনঝোপের সবুজ পর্বত—কত ধরনের অর্কিড, কত ধরনের লতা, কত অদ্ভুত ও বিচিত্র ফুল!

একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বন কাটতে কাটতে ওরা মোটে মাইল-তিনেক এগিয়ে যেতে সক্ষম হল।

সন্ধ্যার দিকে ইয়ার হোসেন বললে—এখানে আজ তাঁবু ফেলা যাক।

কিন্তু তাঁবু ফেলবে কোথায়? সুশীল চারদিকে চেয়ে দেখলে ভয়ানক ঘন জঙ্গলের মধ্যে বড়-বড় দোলানো লতার তলায় ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর রাত্রে বাস করতে হবে। আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতায় এরা দেখেছে এখানকার জঙ্গলে তিনরকম জীব যেখানে-সেখানে বাস করে—যে-তিনটিই মানুষের শত্রু। প্রথম, বড়-বড় রক্ত-শোষক জোঁক; দ্বিতীয়, বিষধর সর্প; তৃতীয়, মৌমাছি। এই তিনটি শত্রুর কোনোটাই কম নয়—যে-কোনটার আক্রমণ মানুষের জীবন বিপন্ন হবার পক্ষে যথেষ্ট।

কোনো রকমে তাঁবু খাটানো হল।

ঘুমের মধ্যে কখন ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল—ট্রপিক্যাল অরণ্যের এ-অঞ্চলে বৃষ্টি লেগেই আছে, এমন দিন নেই যে বৃষ্টি হয় না। ঘুমের মধ্যে সুশীল দেখলে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে কখন বৃষ্টির জলের ধারা গড়িয়ে এসে ওদের বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে কোথায় এক গুরুগম্ভীর নিনাদ শোনা গেল—সমস্ত অরণ্য যেন কেঁপে উঠল।

সনৎ চমকে উঠে বললে—কে ডাকে দাদা?

অন্য তাঁবু থেকে ইয়ার হোসেন বলে উঠল—ও কিসের ডাক?

কেউ কিছু জানে না। না জামাতুল্লা, না ইয়ার হোসেন—কেবল ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর বললে—ওটা বুনো হাতির ডাক স্যার।

আর একজন অনুচর প্রতিবাদ করে বললে—ওটা গণ্ডারের ডাক।

কিছুমাত্র মীমাংসা হল না এবং আবার সেই ডাক, সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক জানোয়ারের ভীষণ গর্জন। সেটা শুনে অবশ্য সকলেই বুঝতে পরলে—বাঘের গর্জন।

এরই ফাঁকে আবার বন-মোরগও ডেকে উঠল। ঐ সময়ে একপাল বন্য কুকুরের ডাকও।

সনৎ বললে—ও দাদা, এ যে ঘুমুতে দেয় না দেখছি—

সুশীল উত্তর দিলে—কানে আঙুল দিয়ে থাক—

ইয়ার হোসেন বললে—রইফেল নিয়ে বসে থাকতে হবে—কেউ ঘুমিও না—

এটা নিতান্ত প্রথম দিন বলে এদের ভয় ছিল বেশি, দু-একদিনের মধ্যে জন্তু জানোয়ারের আওয়াজ গা-সওয়া হয়ে গেল। নিবিড় ট্রপিক্যাল জঙ্গলের মধ্যে প্রতি রাত্রেই নানা বন্য জানোয়ারের বিচিত্র আওয়াজ—আওয়াজ যা করে, তাঁবুর আশেপাশেই করে—কিন্তু তাঁবুর লোককে আক্রমণ করে না।

সুশীল দুদিন ঘুমাতে পারেনি—কিন্তু তিন রাত্রি পরে সে বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পারলে।

জঙ্গলের কূল-কিনারা নেই—ওরা পাঁচদিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেও কোনো কিছুই দেখতে পেলে না সেখানে—ওই বন আর বন।

সূর্যের আলো না দেখে সুশীল তো হাঁপিয়ে উঠল। এ-জঙ্গলে সূর্যের আলো আদৌ পড়ে না।

আগে দেশে থাকতে সে দু-একখানা ভ্রমণের বইতে পড়েছিল যে মেক্সিকোতে, মালয়ে, আফ্রিকায় এমন ধরনের বন আছে, যেখানে কখনও সূর্যালোক প্রবেশ করে না। কথাটা আলঙ্কারিকের অত্যুক্তি হিসেবেই সে ধরে নিয়েছিল, আজ সে সত্যই প্রত্যক্ষ করলে এমন বন, যা চির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পড়ন্ত বেলায় কেবল সুউচ্চ বনস্পতিরাজির শীর্ষদেশ অস্তমান সূর্যের রাঙা আলোয় রঞ্জিত হয় মাত্র। কৃচিৎ নিবিড় লতাঝোপের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চাঁদের আলো সামান্যমাত্র পড়ে, নতুবা সকল সময়েই গোধূলি দিনমানে। চিরগোধূলির জগৎ এটা যেন।

একদিন সনৎ পড়ে গেল বিপদে।

তাঁবু থেকে বন্দুক-হাতে শিকার করতে বার হয়ে সে একটা গাছের ডালে এক ভীষণ অজগর সাপ দেখে সেটাকে গুলি করলে। সাপটা দুলতে দুলতে গাছের ডাল থেকে পাক ছাড়িয়ে ঝুপ্ করে একবোঝা মোটা দড়াদড়ির মতো নিচে পড়ে গেল।

সনৎ সেটার কাছে গিয়ে দেখলে অজগরের মাথাটা গুলির ঘায়ে একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার ল্যাজটা হঠাৎ এসে সনৎ-এর পা দুখানা জড়িয়ে ধরে শক্ত কাঠ হয়ে গেল। সরীসৃপের হিমশীতল স্পর্শ সনতের স্নায়ুগুলোকে যেন অবশ করে দিলে, নিজের পা দুখানাকে সে আর মোটেই নাড়তে পারলে না—হাতদুটোকে যখন কষ্টে নাড়ালে তখন লোহার শেকলের মতো নাগপাশের শক্ত বাঁধনে তার পদদ্বয় গতিশক্তিহীন।

অজগর তো মরে কাঠ হয়ে গেল, কিন্তু সনৎ চেষ্টা করেও কিছুতেই নাগপাশ থেকে পা ছাড়াতে পারলে না। পা যেন ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে, এমনকি সনৎ-এর মনে হল আর কিছুক্ষণ এ-অবস্থায় থাকলে সে চিরদিনের মতো চলৎশক্তি হারাবে। এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, বেলা ক্রমশ পড়ে আসছে—এরই মধ্যে গোধূলি গিয়ে যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে বনে। কিছুক্ষণ পরে দিক ঠিক করে তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরও কিছুক্ষণ কাটল, শেয়ালের দল বনের মধ্যে ডেকে উঠল—একটু পরেই বন্যহস্তীর বৃংহিত অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তুলবে, হায়েনার অট্টহাসিতে বুকের রক্ত শুকিয়ে দেবে।

সনৎ সবই বুঝছে—কিন্তু কোনো উপায় নেই। বন্দুকটার আওয়াজ করলে তাঁবুর লোকদের তার সন্ধান দেওয়া চলত বটে—কিন্তু বন্দুকে গুলি নেই। শেষ দুটো টোটা অজগরের দিকে সে ছুঁড়েছে।

তিমিরময়ী রাত্রি নামল।

অসহায় অবস্থায় চুপ করে কাত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। প্রথমটা তার মনে খুব ভয় হল—কিন্তু মরিয়ার সাহসে সাহসী হয়ে শেষ পর্যন্ত সে চুপ করে শুয়েই রইল। মৃত অজগরটাকে অন্ধকারে আর দেখা যায় না—কিন্তু তার হিম, শীতল আলিঙ্গন প্রতিমুহূর্তে সনৎকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল যে প্রাণের বদলে সে প্রাণই নিতে চায়।

সারারাত্রি এভাবে কাটলে বোধহয় সনৎ সে যাত্রা ফিরত না—কিন্তু অনেক রাত্রে হঠাৎ সনৎ-এর তন্দ্রা গেল ছুটে। অনেক লোক আলো নিয়ে এসে ডাকাডাকি করছে। ইয়ার হোসেনের গলা শোনা গেল—হালু-উ-উ—মিঃ রায়—

সনৎ-এর সর্বশরীর ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গিয়েছিল—সে গলা দিয়ে স্বর উচ্চারণ করতে

পারলে না। কিন্তু ইয়ার হোসেনের টর্চের আলো এসে পড়ল ওর ওপরে। সবাই এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। পাশের মৃত অজগর দেখে ওরা আগে ভেবেছিল সর্পের বেষ্টনে সনৎও প্রাণ হারিয়েছে—তারপর ওকে হাত নাড়তে দেখে বুঝলে ও মরেনি।

তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করতে সনৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ইয়ার হোসেন সেদিন ওদের ডেকে পরামর্শ করতে বসল।

জামাতুল্লাকে বললে—কই, তোমার সেই মন্দিরের বা শহরের ধ্বসাবশেষ তো দেখিনে কোনোদিকে।

জামাতুল্লা বললে—আমি তো আর মেপে রাখিনি মশাই ক-পা গেলে শহর পাওয়া যাবে—সবাই মিলে খুঁজে দেখতে হবে।

সুশীল একটা নকশা দেখিয়ে বললে—এ কদিনে যতটা এসেছি, জঙ্গলের একটা খসড়া ম্যাপ তৈরি করে রেখেছি। এই দেখে আমরা যে-যে পথে এসেছি দেখতে হবে, সে পথে আর যাব না।

আবার ওদের দল বেরিয়ে পড়ল—দুদিন পরে সমুদ্র-কল্লোল শুনে বনঝোপের আড়াল থেকে বার হয়ে ওরা দেখলে—সামনেই বিরাট সমুদ্র।

সনৎ চিৎকার করে উঠল—আলাট্টা! আলাট্টা!

সুশীল বললে—তোমার এ চিৎকার সাজে না সনৎ। তুমি জেনোফনের বর্ণিত গ্রীক সৈন্য নও, সমুদ্রের ধারে তোমার বাড়ি নয়—

ইয়ার হোসেন বললে—ব্যাপার কী? আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারছিনে—

সনৎ বললে—জেনোফন বলে একজন প্রাচীন যুগের গ্রীক লেখক—নিজেও তিনি একজন সৈনিক—পারস্য দেশের অভিযান শেষ করে ফিরবার সময়ত দুঃখ-কষ্টটা 'দশ সহস্রের প্রত্যাবর্তন' বলে একখানা বইয়ে লিখে রেখে গিয়েছেন—তা-ই ও বলছে—

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—ও!

জামাতুল্লা বললে—আমার একটা পরামর্শ শোনো। কম্পাসে দিক ঠিক করে চল এবার উত্তর মুখে যাই—ওদিকটা দেখে আসা যাক।

সকলেই এ-কথায় সায় দিলে। সূর্যের মুখ না দেখে সকলেরই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ওরা প্রথম দিনেই সমুদ্রের বালির ওপরে অনেকগুলো বড়-বড় কচ্ছপ দেখতে পেলে। ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর ছুটে গিয়ে একটাকে উল্টে চিত করে দিলে, বাকিগুলো তাড়াতাড়ি গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মালয় দেশীয় দায়ের (মালয়েরা বলে 'বোলো') সাহায্যে কচ্ছপটাকে কাটা হল, মাংসটা ভাগ করে রান্না করে সকলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলে। ভাগ করার অর্থ এই যে, ইয়ার হোসেনের দল ও জামাতুল্লার রান্না হত আলাদা, সুশীল ও সনৎ-এর আলাদা রান্না সনৎ নিজেই করত।

একদিন সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে কী একটা জানোয়ার দেখে সনৎ ছুটে এসে সবাইকে খবর দিলে।

সকলে গিয়ে দেখলে প্রকাণ্ড বড় শুয়োরের মতো বড় একটা জানোয়ার বালির ওপর চুপ করে শুয়ে। তার থ্যাবড়া নাকের নিচে বড় বড় গোঁপ—মুখের দুদিকে দুটো বড় বড় দাঁত।

ইয়ার হোসেন বললে—এ এক ধরনের সীল—সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বটে।

সীলের মূল্যবান চামড়ার লোভে সনৎ ওকে গুলি করতে উদ্যত হল।

ইয়ার হোসেন নিষেধ করে বললে—ওটা মেরো না—ও সীলকে বলে সী লায়ন, ও

মারলে অলক্ষণ হয়।

পরদিন তাঁবু তুলে সকলে উত্তর দিকের জঙ্গল ভেদ করে রওনা হল।

উত্তর দিকের জঙ্গলে সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেকটা গেল ওরা। এক গাছ থেকে আর এক গাছে বড় বড় পুষ্পিত লতা সারা বন সুগন্ধে আমোদ করে ঝুলে পড়েছে—সুবৃহৎ লতা যেন অজগর সাপের নাগপাশে মহীরুহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে—রাশি রাশি বিচিত্র অর্কিড। বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের পাখির দল ডালে ডালে—অদ্ভুত সৌন্দর্য বনের। সুশীল বললে—মিঃ হোসেন, ও কী লতা জানেন? যেমন সুন্দর ফুল—আর লতা দেখা যাচ্ছে না ফুলের ভারে—গন্ধও অদ্ভুত। ইয়ার হোসেন লতার নাম জানে না—তবে বললে, সিঙ্গাপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ওরকম লতা সে দেখেছে।

সারা দ্বীপে গভীর বন। বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া কঠিন ও অনবরত গাছপালা কেটে যেতে হয় পথ করবার জন্যে—কাজেই ওরা সমুদ্রের ধার বেয়ে চলছিল। এক জায়গায় একটা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে বনের মধ্যে দিয়ে, নদী পার হয়ে যাওয়া কষ্টকর বলে ওরা বাধ্য হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নদী সরু হবার নাম নেই—অনেক দূরে বনের মধ্যে ঢুকে এখনও নদী বেশ গভীর।

সুশীল বললে—ওহে, নদীটা আমাদের দেশের বড় একটা খালের মতো দেখছি। এ-দ্বীপে এত বড় নদী আসছে কোথা থেকে? তেমন বড় পাহাড় কোথায়?

—নিশ্চয়ই বড় পাহাড় আছে বনের মধ্যে, সেইদিকেই তো যাচ্ছি—দেখা যাক—

আরও আধঘণ্টা সকলে মিলে গভীর জনহীন বনের মধ্যে দিয়ে চলল। বনের রাজ্য বটে এটা—সত্যিকার বন কাকে বলে এতদিন পরে প্রত্যক্ষ করল সুশীল সনৎ।

হঠাৎ এক জায়গায় একটা নাগকেশর গাছ দেখে সুশীল বলে উঠল—এই দেখ একটা আশ্চর্য জিনিস! এই গাছ কোথাও এদিকে দেখা যায় না। নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে আমদানি এ-গাছটা।

খুঁজতে খুঁজতে আশেপাশে আরও কয়েকটা নাগকেশর গাছ পাওয়া গেল। এই গভীর বনের মধ্যে নাগকেশর গাছ থাকার মানেই হচ্ছে এখানে কোনো ভারতীয় উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল পুরাকালে।

সনৎ বললে—কিন্তু এ-গাছ তো খুব পুরনো না, দেখেই মনে হচ্ছে। আট-ন-শো বছরের নাগকেশর গাছ কি বাঁচে?

—তা নয়। ঔপনিবেশিক ভারতীয়দের নিজেদের হাতে পোঁতা গাছের চারা এগুলো। বড় গাছগুলোর থেকে বীজ পড়ে পড়ে এগুলো জন্মেছে। এ গাছ অধস্তন চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষ আসল গাছের।

সেদিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সনৎ বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা কৃষ্ণপ্রস্তর-মূর্তি দেখে চিৎকার করে সবাইকে এসে খবর দিলে। ওরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখলে গভীর জঙ্গলের লতাপাতার মধ্যে একটা পাষাণ-মূর্তি—মূর্তির মুণ্ড নেই, তবে হাত-পা দেখে মনে হয় শিবমূর্তি ছিল সেটা। দু হাত উঁচু প্রস্তর-বেদির ওপর মূর্তিটা বাসানো, এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে ডমরু, গলায় অক্ষমালা—এত দূর দেশে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির এই চিহ্ন দেখে সুশীল ও সনৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল—সেখান থেকে যেন সরে যেতে পারে না। এই দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুধর্মের বাণী বহন করে এনেছিলেন একদিন এদেশে। সুলু সমুদ্রের ওই ডুবো-পাহাড় অতিক্রম করতে চীনা জাঙ্কওয়ালা যে-কৌশল দেখালে, এই কম্পাস ও ব্যারোমিটারের যুগের বহু বহু পূর্বে

তাঁদের পূর্বপুরুষেরা সে কৌশল একদিন না যদি দেখতে পারতেন—তবে নিশ্চয়ই এ-দ্বীপে পদার্পণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না। মন মনে সুশীল তাঁদের প্রণতি জানালে। নমো নমো দিগ্বিজয়ী পূর্বপুরুষগণ, আশীর্বাদ করো—যে-বল ও তেজ তোমাদের বাহুতে, যে-দুর্ধর্ষ অনমনীয়তা ছিল তোমাদের মনে, আজ তোমাদের অধঃপতিত দুর্বল উত্তরপুরুষেরা যেন সেই বল ও তেজের আদর্শে আবার নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, সার্থক করতে পারে ভারতের নাম বিশ্বের দরবারে!

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেনও চমৎকৃত হল। এ-বনেও একদিন মানুষ ছিল তা হলে! এই যে গভীর বন আজ শুধু অজগর আর ওরাং-ওটাংয়ের বিচরণক্ষেত্র, এখানে একদিন সভ্য মানুষের পদশব্দ ধ্বনিত হয়েছে, মন্দির গড়েছে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে—এ-ই সকলের চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হল ওদের কাছে।

জামাতুল্লাকে সুশীল বললে—কেমন, এসব দেখেছিলে বলে মনে হয়?

—এসব দেখিনি। তবে এতে বোঝা যাচ্ছে মানুষের বাসের নিকটে এসে পড়েছি।

—সে-জায়গাটা কেমন?

—সে একটা শহর বাবুজি। তার বাইরে পাঁচিল ছিল একসময়ে। এখন পড়ে গিয়েছে।

—কম্পাস দেখে দিক ঠিক করেছিলে? ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড ঠিক করেছিলে?

—না বাবুজি, ওসব কিছু করিনি। কম্পাস ছিল না।

সকলের মনে আশার সঞ্চার হল যে এবার নিশ্চয়ই সে-প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি আসা গিয়েছে। কিন্তু তার পর তিনদিন কেটে গেল, চারদিন গেল, পাঁচদিন গেল—আবার সামনে সমুদ্রের পূর্ব তীর, আবার সুনীল সুলু সী। কোথায় নগর, কোথায়ই-বা কী! একখানা ইঁট বা পাথরও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কারো চোখে পড়ল না আর। আবার হতাশ হয়ে পড়ল সকলে। জামাতুল্লাকে ইয়ার হোসেন বললে—জামাতুল্লা সাহেব, স্বপ্ন দেখনি তো হিন্দু-মন্দিরের আর শহরের? জামাতুল্লা গেল রেগে। ইয়ার হোসেনের অনুচরেরা নিজেদের মধ্যে কি বিড়বিড় করতে লাগল।

সুশীল সনৎ ও জামাতুল্লাকে গোপনে ডেকে বললে—ইয়ার হোসেনের ওই লোকগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে যদি কিছু চিহ্ন না পাওয়া যায়—দেখছি ওগুলো ভারি বদমাইশ!

জামাতুল্লা বললে—ভাববেন না বাবুজি, আমি ছুরি চালাব, আপনাদের জন্যে প্রাণ দেব! ওরা কী করবে? কাঠের ভেলা তৈরি করে সুলু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিয়ে যাব—ওই হলদেমুখো চীনে জাঙ্কওয়ালা বড় বাহাদুরি করে গেল আপনাদের কাছে—দেখব ও কত বাহাদুর!

একদিন সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে সুশীল বনের মধ্যে পাখি শিকার করতে বেরুল বন্দুক নিয়ে। কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে অস্পষ্ট গোধূলির আলোয় দূর থেকে একটা লম্বা পাহাড়মতো দেখতে পেলে। আরও কাছে গিয়ে সে দেখলে পাহাড় ও তার মধ্যে একটা খাল, তাতে জল আছে—গভীর খাল। জলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। ভাল করে চেয়ে দেখে সে বুঝলে ওপারে ওটা পাহাড় নয়, একটা উঁচু পাঁচিল হতে পারে ওটা। খাল নয়, মানুষের হাতে-কাটা পরিখা হয়তো। পঁচিলের ওপর বড় বড় গাছ গজিয়েছে, মোটা মোটা শেখড় পাঁচিলের গা বেয়ে এসে মাটিতে নেমেছে—তাদের ডালপালার ফাঁক দিয়ে জায়গায় জায়গায় পাঁচিলের গায়ের বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো দেখা যাচ্ছে।

সুশীল আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল।

এই তবে সেই প্রাচীন নগরীর প্রাচীর ও পরিখা! এ-বিষয়ে ভুল থাকতে পারে না—তবে, হয়তো সে উল্টোদিক থেকে এটাকে দেখছে। নগরীর সিংহদ্বার অন্যদিকে আছে কোথাও।

সে যখন সকলকে গিয়ে খবর দিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমগ্র বনভূমিকে আচ্ছন্ন করেছে। ইতিমধ্যেই ওরাং-ওটাং ও শৃগালের ডাক শোনা যাচ্ছে। দু-একটা নিশাচর পাখি ছাড়া অন্য পাখির কূজন থেমে গিয়েছে। ডালপালার ফাঁকে ঊর্ধ্বে কৃষ্ণ আকাশে নক্ষত্রাদি দেখা দিয়েছে।

ইয়ার হোসেন বারণ করলে—এখন না, এ-রাত্রিকালে তাঁবু ছেড়ে কোথাও যেও না, কাল সকালে দেখা যাবে।

সুশীলের আনা পাখি দিয়ে তাঁবুতে ভোজ হল রাত্রে।

জামাতুল্লা বললে—পাঁচিল যখন বেরিয়েছে—তখন আমায় মিথ্যাবাদী বলে বদনাম আর কেউ দিতে পারবে না।

পরদিন সকলে গিয়ে দেখলে, সত্যই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার অস্তিত্ব ওদের সেখানে কোনো প্রাচীন নগরীর অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজমান।

পরিখার জলে পদ্মফুল দেখে সুশীল ও সনৎ ভাবলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক যেন ঐ ফুল। আট শো বছর আগে যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ প্রথম পদ্মলতা এনে দুর্গ-পরিখার জলে পুঁতে দেয়, তারা আজ কোথায়? কিন্তু জলে একবার শেকড় গেড়ে যে-পদ্মলতা বেঁচে উঠেছিল, সে বংশানুক্রমে আজও অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে এই গভীর অরণ্যের মধ্যে। ইয়ার হোসেনের আদেশে তার দুজন অনুচর জল মেপে দেখলে, এখানে পার হওয়া অসম্ভব। পরিখার জল বেশ গভীর। পরিখার এক বাহু ধরে এক দল ও অন্যদিকে অন্য বাহুর সন্ধানে অন্য দল বার হল।

শেষের দলে গেল সুশীল।

উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা প্রাচীর-পরিখার উত্তর দিকে আধ মাইল-টাক গিয়ে ওদের দল সবিস্ময়ে দেখলে প্রাচীরের এক স্থান ভগ্ন। মাঝখান বেয়ে বেশ একটা রাস্তা যেন ছিল সুপ্রাচীন কালে, এখন অবিশ্যি ঘন বন। দেখে মনে হয় শত্রুদ্বারা দুর্গ বা নগর-প্রাচীর হয়তো এখানে ভগ্ন হয়ে থাকবে, নতুবা এর অন্য কোনো কারণ নির্দেশ করা যায় না।

দেখা গেল, পরিখার সেইখানে প্রাচীন কালে বোধহয় কাঠের সেতু ছিল, এখন সেটা পড়েছে ভেঙে জলে। জলের গভীরতা সেখানে কম। কাঠের সেতু প্রথমে দেখা যায়নি। ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর প্রথমে জলের ধারে একটা শেকল দেখতে পায়। শেকলটা টেনে জলের মধ্য থেকে একখণ্ড লোহার পাত বেরুল। আন্দাজ করা কঠিন নয় যে এই লোহার পাত কাঠের চওড়া তক্তার গায়ে লাগানো ছিল। অনুমানটুকু ছাড়া কাঠের সেতুর অস্তিত্বের অন্য কোনো নিদর্শন এতকাল পরে কীভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে!

ইয়ার হোসেন বললে—এখান দিয়ে পার হওয়া যাক—জল গভীর হবে না।

সুশীল সামান্য একটু আপত্তি করলে—অথচ কেন যে করলে তা সে নিজেই জানে না।

প্রথমে নামল ইয়ার হোসেন নিজে—তার পেছনে নামল সুশীল। হাত তিন-চার মাত্র জলে যখন ওরা গিয়েছে তখন ওরা দেখলে সামনে জলের যা গভীরতা, তাতে আর অগ্রসর হওয়া চলবে না। ঠিক সেই সময় ওদের নিকট থেকে হাত পাঁচ-ছয় দূরে ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর—যে শিকল টেনে তুলেছিল জল থেকে—সে নামল, উদ্দেশ্য, ওদের পাশাপাশি সেও পরিখা পার হবে। কিন্তু পরক্ষণেই এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল।

সুশীল চোখের কোণ দিয়ে অল্পক্ষণের জন্যে দেখতে পেলে, লোকটার ছ-সাত হাত দূরে ছোট্ট কাঠের মতো কালো কী একটা জিনিস যেন ভাসছে। দু-সেকেণ্ড মাত্র, পরেই হঠাৎ যেন ভূমিকম্পে বিরাট জলোচ্ছ্বাস উঠল, একটা আর্তচিৎকার-ধ্বনি অল্পক্ষণের মধ্যে শোনা গেল

... কিসের একটা প্রবল ঝাপটা এসে ওদের জলের ওপর কাত করে ফেললে ... ওদের দুজনকে।

পরক্ষণেই ইয়ার হোসেনের সেই অনুচর অদৃশ্য।

কী হল ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারলে না—অবিশ্যি এক মিনিটও হয়নি—এর মধ্যে সব ঘটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায় যারা ছিল তারা চেঁচিয়ে উঠল—শয়তান! শয়তান!

ইয়ার হোসেন আকুলভাবে চিৎকার করে বললে—ডাঙায় ওঠো—ডাঙায় ওঠো!

হতভম্ব সুশীল কাদা হাঁচড়ে মরি-বাঁচি ডাঙার উঠল—পাশাপাশি ইয়ার হোসেন উঠল, জলে চেয়ে দেখলে জল কাদা-ঘোলা হয়েছে, ইয়ার হোসেনের অনুচর নিশ্চিহ্ন।

সুশীল ও ইয়ার হোসেন তখনও হাঁপাচ্ছে; সুশীলের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে!

সে ভীত কণ্ঠে বললে—কী হল?

ইয়ার হোসেন বললে—আমাদের সাবধানে জলে নামা উচিত ছিল। এইসব প্রাচীন কালের জলাশয়ে কুমির থাকা সম্ভব, এ-কথা ভুলে গিয়েছিলাম। খোঁজো সবাই—

কুমির! সবাই অবাক হয়ে গেল। কে জানত নগরীর পরিখায় কুমির থাকতে পারে? দুর্গাপরিখার প্রহরী এরা—হয়তো প্রাচীন দিনেই শত্রুরোধকল্পে জলের মধ্যে কুমির ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সুবিস্তৃত প্রহরীর ন্যায় এখনও তারা বাইরের লোকের অনধিকার প্রবেশে বাধাদান করছে।

খুঁজে কিছু হল না—জল কিছুক্ষণ পরে হতভাগ্য অনুচরের রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। ইয়ার হোসেন বললে—আজ থামলে আমাদের চলবে না—এগোও। নগরের ফটক খোঁজো—

সুশীল বললে—জলের মধ্যে অজানা বিপদ। জল পার হওয়া দরকার নেই—হেঁটে বা সাঁতরে। কোথাও সেতু আছে কি না দেখা যাক।

আবার উত্তরমুখে সকলে চলল। মাইল দুই সোজা চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—কারণ ভীষণ জঙ্গল কেটে কেটে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আগুন জ্বেলে তাঁবু ফেলে সেদিন সকলে সেখানে রাত্রি কাটাবার আয়োজন করলে। এমন সময় বহু দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল—তার উত্তরে ওরাও একটা আওয়াজ করলে। দুটি দলের মধ্যে যোগসূত্র রাখবার একমাত্র উপায় এই বন্দুকের আওয়াজ—অনেক দূর থেকে দক্ষিণগামী দলের এ হল সঙ্কেতধ্বনি। পরদিন সকালে আরও এক মাইল গিয়ে প্রাচীরের উত্তর দিক থেকে পূর্ব দিকে মুখ ফেরালে। অর্থাৎ এদিকে আর শহর নেই। প্রাচীর ধরে সবাই বাঁকতে গিয়ে দেখলে পরিখার এপারে অনেকগুলো স্তূপ, স্তূপের ওপর বিরাট জঙ্গল। বড় বড় পাথর গড়িয়ে এসে পড়েছে স্তূপ থেকে নিচে—সেগুলো বেশ চৌকশ করে কাটা। সম্ভবত স্তূপের ওপর কোনো দুর্গ ছিল যা ঠিক নগর-প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম কোণ পাহাড়া দিত।

পশ্চিমমুখে কতটা যেতে হবে কেউ জানে না, কারণ তারা দৈর্ঘ ধরে যাচ্ছে, না প্রস্থ ধরে যাচ্ছে তা জানবার সময় এখনও আসেনি। সেদিনও কেটে গেল বনের মধ্যে; সন্ধ্যা নামল। সন্ধ্যায় যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, আওয়াজ খুব ক্ষীণ ও অস্পষ্ট।

সুশীল বললে—আমরা দৈর্ঘ অতিক্রম করেছি—প্রস্থ ধরে চলেছি। বুঝেছেন মিঃ হোসেন?

—এবার বুঝলাম। ওদিকে যে দল গিয়েছে তারা ওদিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বন্দুক ছুঁড়ছে। অন্তত সাত মাইল দূর এখান থেকে।

পরদিন বেলা দশটার মধ্যে নগরীর সিংহদ্বার পাওয়া গেল। সেখানটাতে পরিখার ওপর পাথরের সেতু। এপারে সেতুরক্ষার জন্যে দুর্গ ছিল, বর্তমানে প্রকাণ্ড ভরা ঢিবি।

সকলে ব্যস্ত হয়ে সেতু পার হয়ে সিংহদ্বার লক্ষ্য করে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থেমে গেল।

সিংহদ্বারের খিলান ভেঙে পড়ত—যদি বটজাতীয় কয়েকটি বৃক্ষের শিকড় আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে না জড়িয়ে ধরে রাখত। সিংহদ্বারের দুপাশে অদ্ভুত দুই প্রস্তরমূর্তি—নাগরাজ বাসুকি ফণা তুলে আছে সামনে, পেছনে তিনমুখবিশিষ্ট কোনো দেবতার মূর্তি। সূর্যের আলো ওপরের বটবৃক্ষের নিবিড় ডালপালা ভেদ করে মূর্তি দুটি গায়ে বাঁকাভাবে এসে পড়েছে।

গম্ভীর শোভা। সুশীল স্তব্ধ-ময়, দলের সকলেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল এই কারুকার্যময় সিংহদ্বার ও প্রাচীন যুগের শিল্পীর হাতে এই ভাস্কর্যের পানে।

সুশীল হাত জোড় করে প্রণাম করলে মূর্তি দুটির উদ্দেশ্যে। সে পুরাতত্ত্ব বা দেবমূর্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হলেও আন্দাজ করলে এ দুটি তিন মুখ বিশিষ্ট শিবমূর্তি।

সুলু সমুদ্রের এই জনহীন অরণ্যাবৃত দ্বীপে প্রাচীন ভারতের শক্তি ও তেজ একদিন এই দেবমূর্তিকে স্থাপিত করেছিল। আজ ভারত অধঃপতিত,—দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। হে দেব, তোমার যে, ভক্তগণ তোমাকে এখানে বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা আজ নেই—তাদের অযোগ্য বংশধরকে তুমি সেই শৌর্য ও সাহস ভিক্ষা দাও, তাদের বীরপুরুষদের বংশধর করে দাও হে রুদ্রভৈরব!

ইয়ার হোসেন পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এই বিরাট ভাস্কর্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বললে—যদি আমার দিন আসে, এই মূর্তি সিঙ্গাপুরের মিউজিয়মে দান করবার ইচ্ছে রইল—

সুশীল বললে—তা কখনও করবেন না মিঃ হোসেন, যেখানকার দেবতা সেইখানেই তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিন। অমঙ্গলকে ডেকে আনবেন না।

সিংহদ্বার অতিক্রম করে ওরা নগরীর মধ্যে ঢুকল। কিন্তু অল্প কিছুদূর গিয়েই দেখলে, এত দুর্ভেদ্য জঙ্গল যে দশ হাত এগিয়ে যাবার উপায় নেই বন না কাটলে। সিংহদ্বারের সামনেই নিশ্চয় প্রাচীন নগরের রাজপথ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে-রাজপথের ওপরেই তিন-চারশো বছরের পুরনো বটজাতীয় বৃক্ষ, বন্য রবার, বন্য ডুমুর গাছে। এইসব বড় গাছের নিচে আগাছা ও কাঁটলতার জঙ্গল। ওরাং-ওটাংও এই জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হতে পারে না—মানুষ কোনো ছার।

ইয়ার হোসেনের হুকুমে মালয় অনুচরেরা 'বোলো' দিয়ে জঙ্গল কেটে কোনোরকমে একটু সুঁড়িপথ বার করতে করতে সোজা চলল।

সুশীল বললে—এ-জঙ্গল তো দেখছি নগরের বাইরে যেমন ছিল এখানেও তেমনি। কেবল এটা পাঁচিলের মধ্যে এই যা তফাত। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—দেখুন! দেখুন!

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল, সামনে প্রকাণ্ড একটা মন্দিরের চূড়া লতাঝোপের আবরণ থেকে অনেক উঁচুতে মাথা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের কাছে যাবার কোনো উপায় নেই—অনেক দূর থেকে বড় বড় দেওয়ালভাঙা পাথর ছড়িয়ে জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে অন্তত দেড়শো হাত পর্যন্ত।

ওরা ডিঙিয়ে লাফিয়ে কোনোরকমে মন্দিরের সামনে বড় চত্বরের কাছে এল—কিন্তু সামনেই গোপুরমের মতো উঁচু পাইলন টাওয়ার। তার সুবিশাল পাথরের খিলান ফেটে চৌচির হয়ে সিংহদ্বারের মতই আষ্টেপৃষ্ঠে বড় বড় শেকড় আর লতার বাঁধনে আজ কত যুগ যুগ ধরে ঝুলছে—তার ঠিকানা কারো কাছে নেই। গোপুরম ছাড়িয়ে মন্দিরের দেওয়াল, বিকটাকার দৈত্যের মুখের মতো সারি সারি অনেকগুলো মুখ দেওয়ালের গায়ে বেরিয়ে

আছে—সুশীল আঙুল দিয়ে ওদের দেখিয়ে বললে—দেখ কী চমৎকার কাজ! হয় পাথরের কড়ি, নয়তো পয়োনালি, যাকে ইংরাজিতে বলে গর্গয়েল। অর্থাৎ বিকট জানোয়ারের মুখ-বসানো নালি।

সকলেই অবাক হয়ে সেই কল্পনাসৃষ্ট ভীষণ মুখগুলোর দিকে চেয়ে রইল। সুন্দরকে গড়ে তোলে সেও যেমন কৌশলী শিল্পী, ভীষণকে যে রূপ দেয়, সে-শিল্পীও ঠিক তত বড়। সুশীলের মনে পড়ল আনাতোল ফ্রাঁসের সেই গল্প, শয়তানকে এমন বিকট করে এঁকেলে শিল্পী, যে, রাতের অন্ধকারে শয়তান এসে শিল্পীকে জাগিয়ে জিগ্যেস করলে—তুমি আমাকে এর আগে কোথায় দেখেছিলে যে অমন করে এঁকেছ? শিল্পী বললে—আপনি কে?

শয়তান বললে—আমি লুসিফার। যাকে তোমরা বল শয়তান। ও-নামটায় আমার ভয়ানক আপত্তি তা জানো? তুমি কী বিশ্রী করে এঁকেছ আমায়! আমি কি অত খারাপ দেখতে? দেখ-না আমার দিকে চেয়ে!

শিল্পী দেখলে শয়তানের মূর্তি দেখতে বেশ সুন্দর, তবে মুখশ্রী ঈষৎ বিষণ্ণ। ভয়ে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললে—আমায় মাপ করুন, আমি এর আগে দেখিনি আপনাকে। আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে। আমি ভুল শুধরে নেব—

শয়তান হাসতে হাসতে বললে—তাই শুধরে নাও গে যাও—নইলে তোমার কান মলে দেব—

যাক। ওরা সবাই খিলানের তলা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মন্দিরের মধ্যেকার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। শুধু ভীষণ কাঁটাগাছ আর বেত, যা থেকে মলাক্কা বেতের ছড়ি হয়।

সনৎ ছেলেমানুষ, ভাল বেত দেখে বলে উঠল—দাদা, একটা বেত কাটব?

ইয়ার হোসেন তাকে ধমক দিয়ে কী বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একটি সুন্দর পাখি এসে সামনের বন্য রবারের গাছের ডাল থেকে মন্দিরের ভাঙা পাথরের কার্নিসে বসল। সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল পাখিটার দিকে। কী সুন্দর! দীর্ঘ পুচ্ছ ঝুলে পড়েছে কার্নিস থেকে প্রায় এক হাত—ময়ূরের পুচ্ছের মত। হলদে ও সাদা আঁখি পালকের গায়ে—পিঠের পালকগুলো ঈষৎ বেগুনি।

ইয়ার হোসেন বললে—টিকাটুরা যাকে সাহেব লোক বলে বার্ড অব্ প্যারাডাইজ—খুব সুলক্ষণ।

সনৎ বললে—বাঃ, কী চমৎকার! এই সেই বিখ্যাত বার্ড অব্ প্যারাডাইজ! কত পড়েছি ছেলেবেলায় এদের কথা—

সুশীল বললে—সুলক্ষণ কুলক্ষণ দুরকমই দেখছি। কুমির নিলে একজনকে, আবার বার্ড অব্ প্যারাডাইজ দেখা গেল এটা সুলক্ষণ—

মন্দিরের বিভিন্ন কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরির দেওয়ালে সারবন্দি খোদাই-কাজ। সুশীল একখানা পাথরের ইঁট মনোযোগের সঙ্গে দেখলে। একজন ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর পাশে বোধহয় গৃহবিপ্র পাঁজি পড়ছেন। সামনে একসার লোক মাথা নিচু করে যেন রাজাকে অভিবাদন করছে। রাজার এক হাতে একটা কী পাখি—হয় পোষা শুক, নয়তো শিক্রে বাজ।

ভারত! ভারত! কত মিষ্টি নাম, কী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার! তার নিজের দেশের মানুষ একদিন কম্পাস-ব্যারোমিটারহীন যুগে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এখানে এসে হিন্দুধর্মের নিদর্শন রেখে গিয়েছিল, তাদের হাতে-গড়া এই কীর্তির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে

গর্বে ও আনন্দে সুশীলের বুক দুলে উঠল। বীর তারা, দুর্বল হাতে অসি ও বর্শা ধরেনি, ধনুকে জ্যা রোপণ করেনি—সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে—এই অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল মহাসাগর—হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিগ্বিজয় করে নটরাজ শিবের পাষাণ-দেউল তুলেছে সপ্তসমুদ্র-পারে।

পরবর্তী যুগের যারা স্মৃতিশাস্ত্রের বুলি আউড়ে টোলের ভিটেয় বাঁশবনের অন্ধকারে বসে বলে গিয়েছিল—সমুদ্রে যেও না, গেলে জাতটি একেবারে যাবে, হিন্দুত্ব একেবারে লোক পাবে,—তারা ছিল গৌরবময় যুগের বীর পূর্বপুরুষদের অযোগ্য বংশধর, তাদের স্নায়ু দুর্বল, মন দুর্বল, দৃষ্টি ক্ষীণ, কল্পনা স্থবির।

তারা হিন্দু নয়—হিন্দুর কঙ্কাল।

দুদিন ধরে ওরা বনের মধ্যে কত প্রাচীন দেওয়াল, ধ্বংসস্তূপ, দরজা, খিলান ইত্যাদি দেখে বেড়াল। জ্যোৎস্নারাত্রি, গভীর রাত্রে যখন ওরাং-ওটাংয়ের ডাকে চারিপাশের ঘন জঙ্গল মুখরিত হয়ে ওঠে, অজ্ঞাত নিশাচর পক্ষীর কূস্বর শোনা যায়, বন্য রবারের ডালপালায় বাদুড় ঝটাপটি করে, তখন এই প্রাচীন হিন্দু নগরীর ধ্বংসস্তূপে বসে সুশীল যেন মুহূর্তে কোনো মায়ালোকে নীত হয়—অতীত শতাব্দীর হিন্দু-সভ্যতার মায়ালোক—দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত কবি ও বীন-বাজিয়ে যে মহাযুগের প্রতীক, হুনবিজেতা মহারথ স্কন্দগুপ্তের কোদণ্ড-টঙ্কারে যে-যুগের আকাশ সশস্ত্র।

সুশীল স্বপ্ন দেখে। সনৎকে বলে—বুঝলি সনৎ, জামাতুল্লাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ যে ও আমাদের এনেছে এখানে। এসব না দেখলে ভারতবর্ষের গৌরব কিছু বুঝতাম না!

সনৎ এ-কথায় সায় দেয়। টাকার চেয়ে এর দাম বেশি।

ইয়ার হোসেন কিন্তু এসব বোঝে না। সে দিন-দিন উগ্র হয়ে উঠছে। এই নগরীর ধ্বংসস্তূপে প্রায় দশদিন কাটল। অথচ ধনভাণ্ডারের নামগন্ধও নেই, সন্ধানই মেলে না। জামাতুল্লাকে একদিন স্পষ্ট শাসালে—যদি টাকাকড়ির সন্ধান না মেলে তো তাকে এই জঙ্গলে টেনে আনবার মজা সে টের পাইয়ে দেবে।

জামাতুল্লা সুশীলকে গোপনে বললে—বাবুজি, ইয়ার হোসেন বদমাইশ গুণ্ডা—ও না কী গোলমাল বাধায়!

সুশীল ও সনৎ সর্বদা সজাগ হয়ে থাকে রাত্রে, কখন কী হয় বলা যায় না। ইয়ার হোসেনর সশস্ত্র অনুচরের দল দিন-দিন অসংযত হয়ে উঠছে।

একদিন জামাতুল্লা বনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় একটি বড় পাথরের থাম আবিষ্কার করলে। থামের মাথায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে পদ্ম তৈরি করা হয়েছে। সুশীলকে ডেকে নিয়ে গেল জামাতুল্লা, সুশীল এসব দেখে খুশি হল। সুশীল ও সনৎ দুজনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে থামটা দেখতে গেল।

সেখানে গিয়েই সুশীল দেখলে থামটার সামনে আড়ভাবে পড়ে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙ—যেন একখানা চৌরশ করা শানের মাঝে। সুশীল ক্যামেরা এনেছে থামটার ফটো নেবে বলে, পাথরটা সরিয়ে না দিলে পদ্মটির ছবি নেওয়া সম্ভব নয়।

জামাতুল্লা বললে—পাথরখানা ধরাধরি করে এস সরাই।

সরাতে গিয়ে পাথরখানা যেই কাত অবস্থা থেকে সোজা হয়ে পড়ল, অমনি সনৎ চিৎকার করে বললে—দেখ, দেখ—

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, যেখানে পাথরটা ছিল, সেখানে একটা সুড়ঙ্গ যেন মাটির নিচে নেমে গিয়েছে। জামাতুল্লা ও সুশীল সুড়ঙ্গের ধারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সুড়ঙ্গটা হঠাৎ

বেঁকে গিয়েছে, প্রথমটা সেজন্য মনে হয় গর্তটা নিতান্তই অগভীর।

সুশীল বললে—আমি নামব—

জামাতুল্লা বললে—তা কখনও করতে যাবেন না, বিপদে পড়বেন। কী আছে গর্তের মধ্যে কে জানে!

সুশীল বললে—নেমে দেখতেই হবে। আমি এখানে থাকি, তোমরা গিয়ে তাঁবু থেকে মোটা দড়ি হাত-চল্লিশ, টর্চ আর রিভলবার নিয়ে এস। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সব আনা হল। সুশীল জামাতুল্লা দুজনে সুড়ঙ্গের মধ্যে নামল। খানিক দূর নামলে ওরা। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, পনেরো-ষোল ধাপ নেমেই কিন্তু দুজনে হতাশ হল দেখে, সামনে আর রাস্তা নেই। সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে একটা গাঁথা দেওয়ালের সামনে।

সুশীল বললে—এর মানে কী জামাতুল্লা সাহেব?

—বুঝলাম না বাবুজি। যদি যেতেই দেবে না, তবে সিঁড়ি গেঁথেছে কেন?

রাত হয়ে আসছে। ওরা দুজনে টর্চ ফেলে চারিদিক ভাল করে দেখতে লাগল। হঠাৎ সুশীল চেঁচিয়ে উঠে বললে—দেখ, দেখ! দুজনেই অবাক হয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে ওদের পরিচিত সেই চিহ্ন খোদা—পদ্মরাগ মণির ওপর যে-চিহ্ন খোদা ছিল। ভারতীয় স্বস্তিক চিহ্ন, প্রত্যেক বাহুর কোণে এক-এক জানোয়ারের মূর্তি—সর্প, বাজপাখি, বাঘ ও কুমির।

—এই সেই আঁকজোঁক বাবুজি! কিন্তু এর মানে কী, সিঁড়ি বন্ধ করলে কেন, বুঝলেন কিছু?

দুজনে হতভম্ব হয়ে গেল। সুশীল সামনে পাথরখানাতে হাত দিলে, বেশ মসৃণ; মাপ নিয়ে চৌকশ করে কেটে কে তৈরি করে রেখেছে।

কিছুই বোঝা গেল না—অবশেষে হতাশ হয়ে ওরা গর্ত থেকে উঠে পড়ে তাঁবুতে ফিরে এল সনৎকে নিয়ে। সেখানে কাউকে কিছু বললে না। পরদিন দুপুরবেলা সুশীল একা জায়গাটায় গেল। আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে নামল। ওর মনে এ-কথা বিশেষভাবে জেগেছিল, লোকে এইটুকু গর্তে ঢোকবার জন্য এরকম সিঁড়ি গাঁথে না। এ-সুড়ঙ্গ নিশ্চয় আরও অনেক বড়। কিন্তু তবে দশ ধাপ নেমেই পাথর দিয়ে এমন শক্ত করে বোজানো কেন?

এ-গোলমেলে ব্যাপারের কোনো মীমাংসা করা যাবে না দেখা যাচ্ছে। সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে সেই অদ্ভুত চিহ্নটি সুস্পষ্ট খোদাই করা আছে। এ-চিহ্নই-বা এখানে কেন? ভাল করে চেয়ে চিহ্নটি দেখতে দেখতে ওর চোখে পড়ল, যে-পাথরের গায়ে চিহ্নটি খোদাই করা, তার এক কোণের দিকে আর একটা কী খোদাই করা আছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার খুব না হলেও আলোও তেমন নয়। সুশীল টর্চ ফেলে ভাল করে দেখলে—চিহ্নটি আর কিছুই নয়, ঠিক যেন একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখবার সামান্য খোল। খোলের চারিপাশে দুটি লতার আকারের বলয় কিংবা অন্য কোনো অলঙ্কার পরস্পর যুক্ত। সুশীল কী মনে ভেবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের খোলে নিজের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে দেখতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের পাথর যেন কলের দোরের মতো সরে একটা মানুষ যাবার মতো ফাঁক হয়ে গেল। সুশীল অবাক। এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত আলিবাবার গুহা!

সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে, সিঁড়ির পর সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে। সুশীল সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে উঁকি মেরে চাইলে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে। বহু যুগ আবদ্ধ দূষিত বাতাসের বিষাক্ত নিশ্বাস যেন ওর চোখেমুখে এসে লাগল। তখন কিন্তু সুশীলের মন আনন্দে কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বসে ভাববার সময় নেই। ও তাড়াতাড়ি কয়েক ধাপ নেমে গেল।

আবার সিঁড়ি বেঁকে গিয়েছে কিছুদূর গিয়ে। এবার আর সামনে পাথর নেই, সিঁড়ি এঁকে বেঁকে নেমে চলেছে। সুশীল একবার ভাবলে তার আর যাওয়া উচিত নয়। কতদূর সিঁড়ি নেমেছে এই ভীষণ অন্ধকূপের মধ্যে কে জানে? কিন্তু কৌতূহল সংবরণ করা ওর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। ও আরও অনেকখানি নিচে নেমে গিয়ে দেখলে এক জায়গায় সিঁড়ি হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে নিচের দিকে ঘুরিয়ে দেখলে, কোনো দিকে কিছুই নেই—পাথর-বাঁধানো চাতাল বা মেঝের মতো তলাটা সব শেষ, আর কিছু নেই। ইরাজিতে যাকে বলে dead end, ও সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। সুশীল হতভম্ব হয়ে গেল।

যারা এ-সিঁড়ি গেঁথেছিল তারা কী জন্যে এত সতর্কতার সঙ্গে এত কষ্ট করে সিঁড়ি গেঁথেছিল যদি সে সিঁড়ি কোথাও না পৌঁছে দেয়?

চাতালের দৈর্ঘ হাত-তিনেক, প্রস্থ হাত আড়াই। খুব একখানা বড় পাথরের দ্বারা যেন সমস্ত মেঝে বা চাতালটা বাঁধানো। তন্নতন্ন করে খুঁজে চাতালের কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। সুশীল বাধ্য হয়ে বোকা বনে উঠে চলে এসে জামাতুল্লা ও সনৎকে বললে। ওরা পরদিন লুকিয়ে তিনজনে সেখানে গেল, সিঁড়ি দিয়ে নামলে। সামনে সেই চাতাল। সিঁড়ির শেষ।

জামাতুল্লা বললে—এ কী তামাশা আছে বাবুজি—আমি তো বেকুব বনে গেলাম!

তিনজনে মিলে নানাভাবে পাথরটা দেখলে, এখানে টিপলে ওখানে চাপ দিলে—হিমালয় পর্বতের মতোই অনড়। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই পাথরের গায়ে। মিনিট কুড়ি কেটে গেল। মিনিট কুড়ি সেই অন্ধকার ভূগর্ভে কাটানো বিপজ্জনকও বটে, অস্তস্তিকরও বটে।

সুশীল বললে—ওঠো সবাই, আর না এখানে।

হঠাৎ জামাতুল্লা বলে উঠল—বাবুজি, একটা কথা আমার মনে এসেছে।

দুজনেই বলে উঠল—কী? কী?

—গাঁতি দিয়ে এই পাথরখানা খুঁড়ে তুলে দেখলে হয়। কী বলেন?

তখন ওরাও ভাবলে এই সামান্য কথাটা। যে-কথা, সেই কাজ। জামাতুল্লা লুকিয়ে তাঁবু থেকে গাঁতি নিয়ে এল। পাথড় খুঁড়ে শাবলের চাড় দিয়ে তুলে ফেলে যা দেখলে তাতে ওরা যেমন আশ্চর্য হল তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবার সিঁড়ির ধাপ! কিন্তু দশ ধাপ নেমে গিয়ে সিঁড়ি বেঁকে গেল—আবার সামনে চৌরশ পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গ বোজানো। মাথার ওপরকার পাথরে পূর্ববৎ চিহ্ন পাওয়া গেল। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে আবার সে-পাথর ফাঁক হল। আবার সিঁড়ি। কিন্তু কিছুদূর নেমে আবার পাথর-বাঁধানো চাতাল—আবার সেই dead end--নির্দেশহীন শূন্য।

অমানুষিক পরিশ্রম। আবার পাথর তুলে ফেলা হল—আবার সিঁড়ি। সুশীল বললে—যারা এ গোলকধাঁধা করেছিল, তারা খানিকদূর গিয়ে একবার একখানা পাথর সোজা করে পথ বুজিয়েছে, তার পরেরটা সিঁড়ির মতো পেতে বুজিয়েছে—এই এদের কৌশল, বেশ বোঝা যাচ্ছে। জামাতুল্লা ওদের সতর্ক করে দিলে। বললে—বাবুজি, অনেকটা নিচে নেমে এসেছি। খারাপ গ্যাস থাকতে পারে, দম-বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারি সবাই। তাঁবুতেও সন্দেহ করবে। চলুন আজ ফিরি।

তাঁবুতে ফিরবার পথে জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, ইয়ার হোসেনকে এর খবর দেবেন না।

—কেন?

—কী জানি কী আছে ওর মনে! যদি রত্নভাণ্ডারের সন্ধানই পাওয়া যায়, তবে ইয়ার হোসেন কী করবে বলা যায় না। ওর সঙ্গে লোক বেশি। প্রত্যেকে গুণ্ডা ও বদমাইশ। মানুষ

খুন করতে ওরা এতটুকু ভাববে না। ওদের কাছে মশা টিপে মারাও যা, মানুষ মারাও তা-ই।

ইয়ার হোসেনের মন যথেষ্ট সন্দিগ্ধ। তাঁবুতে ফিরতে সে বললে—কোথায় ছিলে তোমরা?

সুশীল বললে—ফটো নিচ্ছিলাম।

ইয়ার হোসেন হেসে বললে—ফটো নিয়ে কী হবে, যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা—তার সন্ধান করো।

ইয়ার হোসেনের জনৈক মালয় অনুচর সেদিন দুপুরে একটা পাথরের বৃষমূর্তি কুড়িয়ে পেলে গভীর বনের মধ্যে। খুব ছোট, কিন্তু অতটুকু মূর্তির মধ্যেও শিল্পীর শিল্পকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় বর্তমান।

রাত্রে জ্যোৎস্না উঠল।

সুশীল তাঁবু থেকে একটু দূরে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসল। ভাবতে ভাল লাগে এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপময় রাজ্যের অতীত গৌরবের দিনের কাহিনী। রাত্রের ঘামঘোষী দুন্দুভি যেন বেজে উঠল—ধারাযন্ত্রে স্নান সমাপ্ত করে, কুঙ্কুমচন্দনলিপ্ত দেহে দিগ্বিজয়ী নৃপতি চলেছেন অন্তঃপুরের অভিমুখে। বারবিলাসিনীরা তাঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছে এইমাত্র—তারাও ফিরছে তাঁর পিছনে পিছনে, কারো হাতে রজত কলস, কারো হাতে স্ফটিক কলস...

আধো-অন্ধকারে কালো মতো কে একটা মানুষ বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে সুশীলের দিকে ছুটে এল আততায়ের মতো—সুশীল চমকে উঠে একখানা পাথর ছুঁড়ে মারল। মানুষটা পড়েই জানোয়ারের মতো বিকট চিৎকার করে উঠল—তারপর আবার উঠে আবার ছুটল ওর দিকে। সুশীল ছুট দিলে তাঁবুর দিকে।

ওর চিৎকার শুনে তাঁবু থেকে সনৎ বেরিয়ে এল। ধাবমান জিনিসটাকে সে গুলি করলে। সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দেখা গেল একটা ওরাং-ওটাং।

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেন দুজনে তিরস্কার করলে সুশীলকে।

এই বনে যেখানে-সেখানে একা যাওয়া উচিত নয়, তারা কতবার বলবে এ-কথা? কত জানা-অজানা বিপদ এখানে পদে পদে!

পরদিন ছুতো করে সুশীল ও জামাতুল্লা আবার বেরিয়ে গেল। বনের মধ্যে সেই গুহায়। সনৎকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। কেননা সকলে গেলে সন্দেহ করবে এরা।

আবার সেই পরিশ্রম। আরও দুধাপ সিঁড়ি ও দুটো চাতাল ওঁরা ডিঙিয়ে গেল। দিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন আর কাজ হয় না। আবার তার পরের দিন কাজ হল শুরু। এইরকম আরও তিন চার দিন কটে গেল।

একদিন সনৎ বললে—দাদা, তোমরা আর সেখানে দিনকতক যেও না।

সুশীল বললে—কেন?

—ইয়ার হোসেন সন্দেহ করছে। সে রোজ বলে, এরা বনের মধ্যে কী করে। এত ফটো নেয় কিসের?

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আর একদিনের কাজ বাকি। ওর শেষ না দেখে আমি আসতে পারছিনে।

—একা যাও—দুজনে যেও না। জোট বেঁধে গেলেই সন্দেহ করবে। হাতিয়ার নিয়ে যেও।

—তুই তাঁবুতে থেকে নজর রাখিস ওদের ওপর। কাল খুব সকালে আমি বেরিয়ে যাব।

সুশীল তাই করলে। প্রায় ষাট ফুট নিচে তখন শেষ চাতাল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেদিন দুপুর পর্যন্ত পরিশ্রম করে সে চাতালটা ভেঙে ফেললে।

তারপর যা দেখলে তাতে সুশীল একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ল।

সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে ক্ষুদ্র একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে।

কক্ষের মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য।

টর্চের আলোয় দেখা গেল কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি পাষাণবেদিকার ওপর এক পাষাণ নারীমূর্তি—বিলাসবতী কোনো নর্তকী যেন নাচতে নাচতে হঠাৎ বিটঙ্কবেদিকার ওপর পুত্তলিকার মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে কী দেখে।

এ কী!

এর জন্য এত পরিশ্রম করে এরা এসব কাণ্ড করেছে!

সুশীল আরও অগ্রসর হয়ে দেখতে গেল।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। পাথরের বেদির ওপর সেই চিহ্ন আবার খোদাই করা। ঘরের মধ্যে টর্চ ঘুরিয়ে দেখলে। তাকে ঘর বলা যেতে পারে, একটা বড় চৌবাচ্চাও বলা যেতে পারে। স্যাঁতসেঁতে ছাদ, স্যাঁতসেঁতে মেঝে—পাতালপুরীর এই নিভৃত অন্ধকার গহ্বরে এ প্রস্তরময়ী নারীমূর্তির রহস্য কে ভেদ করবে?

কিন্তু কী অদ্ভুত মূর্তি! কটিতে চন্দ্রহার, গলদেশে মুক্তমালা, প্রকোষ্ঠে মণিবলয়। চোখের চাহনি সজীব বলে ভ্রম হয়।

সেদিনও ফিরে গেল। জামাতুল্লাকে পরদিন সঙ্গে করে নিয়ে এল—তন্নতন্ন করে চারিদিক খুঁজে দেখলে ঘরের, কোথাও কিছু নেই।

জামাতুল্লা বললে—কী মনে হয় বাবুজি?

—তোমার কী মনে হয়?

—এই সিঁড়ি আর চাতাল, চাতাল আর সিঁড়ি—ষাট ফুট গেঁথে মাটির নিচে শেষে নাচনওয়ালী পুতুল! ছোঃ বাবুজি—এর মধ্যে আর কিছু আছে।

—বেশঃ, কী আছে, বার করো। মাথাটা খাটাও।

—তা তো খাটাব—এদিকে ইয়ার হোসেনের দল যে খেপে উঠেছে। কাল ওরা কী বলেছে জানেন?

—কী রকম?

—আর দুদিন ওরা দেখবে—তারপর নাকি এ-দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে। তা ছাড়া আর এক ব্যাপার। আপনাকেও ওরা সন্দেহ করে। বনের মধ্যে রোজ আপনি কী করেন! আমায় প্রায়ই জিগ্যেস করে।

—তুমি কী বল?

—আমি বলি বাবুজি ফটো তোলে, ছবি আঁকে। তাতে ওরা আপনাকে ঠাট্টা করে। ওসব মেয়েলি কাজ।

—যারা এই নগর গড়েছিল, পুতুল তৈরি করেছিল, পাথরে ছবি এঁকেছিল—তারা পুরুষ-মানুষ ছিল জামাতুল্লা। ইয়ার হোসেনের চেয়ে অনেক বড় পুরুষ ছিল—বলে দিও তাকে।

সুশীলকে রেখে জামাতুল্লা ফিরে যেতে চাইলে। নতুবা ইয়ার হোসেনের দল সন্দেহ করবে। যাবার সময় সুশীল বললে—কোনো উপায়ে এখানে একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পার? টর্চ জ্বালিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? আর কিছু না থাক সাপের ভয়ও তো আছে।

জামাতুল্লা বললে—আমিন এক্ষুনি ফিরে আসছি লণ্ঠন নিয়ে বাবুজি। আপনি ওপরে উঠে বসুন, এ-পাতালের মধ্যে একা থাকবেন না—

সুশীল বললে—না, তুমি যাও—আমি এখানেই থাকব। পকেটে এক টুকরো মোমবাতি এনেছি—তাই জ্বালাব।

এক টুকরো বাতি জ্বালিয়ে সুশীল ঘরটার মধ্যে বসে ভাবতে লাগল। বাইরে এত বড় রাজ্য যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, কোনো জিনিস গোপন করার জন্যেই তারা এই পাতালপুরী তৈরি করেছিল, এত কষ্ট স্বীকার করে নর্তকী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

হঠাৎ নর্তকী-পুতুলটার দিকে ওর দৃষ্টি পড়তে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কী ব্যাপার এটা?

এতক্ষণ মূর্তিটার যতখানি তার দিকে ছিল, সেটা যেন সামান্য একটু পাক খেয়ে খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সুশীল চোখ মুখে আবার চাইলে।

হ্যাঁ, সত্যিই তা-ই। এই বাতিটার সামনে ছিল ওই পাখানা—এখন পায়ের হাঁটুর পেছনের অংশ দেখা যায় কী করে? সে তো এতটুকু নড়েনি নিজে নিজে, যেখানে—সেখানেই বসে আছে।

সুশীলের ভয় হল। শ্মশানপুরীর ভূগর্ভস্থ কক্ষ, কত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দৈত্যদানোর দল জমা হয়ে আছে এসব জায়গায়, কে বলতে পার? কিসে মৃত্যু আর কিসে জীবন, এ-বার্তা পৌঁছে দেবার লোক নেই। সরে পড়াই ভাল।

এমন সময় ওপর থেকে লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল, পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে ঘরের মধ্যে ওপর থেকে উঁকি মেরে বললে—বাবুজি, ঠিক আছেন?

—তা আছি। ঘরের মধ্যে নামো তো জামাতুল্লা—

জামাতুল্লা ঘরের মেঝেতে নেমে ওর পাশে দাঁড়াল। সুশীল ওকে মূর্তির ব্যাপারটা দেখিয়ে বললে—এখন তুমি কী মনে কর?

—কিছু বুঝতে পারছি নে বাবুজি—খুব তাজ্জব কথা!

—তুমি থাকো এখানে—বসো—

কিন্তু জামাতুল্লা দাঁড়াল না। দুজনে এখানে বসে থাকলে ইয়ার হোসেনের দলের সন্দেহ ঘোরালো রকম হয়ে উঠবে, সে থাকতে পারবে না। জামাতুল্লা চলে যাবার পর সুশীল অনেকক্ষণ মূর্তিটার দিকে চেয়ে বসে রইল। মূর্তিটা এবার বেশ ঘুরে গিয়েছে, এ-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে আসার পর থেকে, এখন ভয়ের চেয়ে কৌতূহল বেশি।

খুব একটু একটু করে ঘুরছে, ঘূর্ণমান রঙ্গমঞ্চের মতই, মূর্তির পদতলস্থ বিটঙ্কবেদিকা।

কেন? কী উদ্দেশ্যে? অতীত শতাব্দীগুলো মূক হয়ে রইল, এর জবাব মেলে না। বেলা গড়িয়ে এল, সুশীলের হাতঘড়িতে বাজে পাঁচটা।

হঠাৎ সুশীল চেয়ে দেখলে আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার।

নর্তকী-মূর্তির সরু সরু আঙুলগুলির মধ্যে একটা আঙুল একটি মুদ্রা রচনা করার দরুন অন্য সব আঙুল থেকে পৃথক এবং একদিকে কী যেন নির্দেশ করবার ভঙ্গিতে ছিল। এবার যেন সে-আঙুলের ছায়া পড়েছে দেওয়ালের এক বিশেষ স্থানে।

এমন ভঙ্গিতে পড়েছে যেন মনে হয় মূর্তিটি তর্জনী-অঙ্গুলির দ্বারা ভিত্তিগাত্রের একটি স্থান নির্দেশ করছে।

তখনি একটা কথা মনে হল সুশীলের। লণ্ঠনের আলোর দ্বারা এ-ছায়া তৈরি হয়েছে, না কোনো গুপ্ত ছিদ্রপথে দিবালোক প্রবেশ করেছে ঘরের মধ্যে?

তা-ই বলে মনে হয়, লণ্ঠনের আলোর কৃত্রিম ছায়া এ নয়। ও লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিয়ে দেখলে—তখন অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্যেও তর্জনীর ছায়া ভিত্তিগাত্রে পড়ে একটা স্থান যেন নির্দেশ করছে।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে উঠে ও জায়গাটা দেখতে গেল।

দেওয়ালের সেই জায়গা একেবারে সমতল, চিহ্নহীন—চারিপাশের অংশের সঙ্গে পৃথক করে নেওয়ার মতন কিছুই নেই সেখানে। তবুও সে নিরাশ না হয়ে দেওয়ালের সেই জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে দেখতে গেল।

হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। ঠিক যেখানে আঙুলের অগ্রভাগ শেষ হয়েছে সেই স্থানের খানিকটা যেন বসে গেল—অর্থাৎ ঢুকে গেল ভেতরের দিকে। একটা শব্দ হল পেছনের দিকে—ও পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে বিটঙ্কবেদিকার তলাটা যেন ঈষৎ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও ফিরে এসে ভাল করে লক্ষ করে দেখলে, গোলাকার বেদিকাটি তার নর্তকী-মূর্তিটাসুদ্ধ যেন একটা পাথরের ছিপি। বড় বোতলের মুখে যেমন কাঁচের স্টপার বা ছিপি থাকে, এ যেন পাষাণনির্মিত বিরাট এক স্টপার। কিসের চাড় লেগে স্টপারের মুখ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও নর্তকী-মূর্তির পাদদেশে এবং গ্রীবায় দুই হাত দিয়ে মূর্তিটাকে একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই সেটা সবসুদ্ধ বেশ আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। কয়েকবার ঘুরবার পরে ক্রমেই তার তলার ফাঁক চওড়া হয়ে আসতে লাগল। কী কৌশলে প্রাচীন শিল্পী পাথরের উপরটাকে ঘূর্ণমান করে তৈরি করেছিল?

এই মূর্তিসুদ্ধ বেদিকা টেনে তোলা তার একার সাধ্যে কুলুবে না। জামাতুল্লা ও সনৎ দু'জনকেই আনতে হবে কোনো কৌশলে সঙ্গে করে, ইয়ার হোসেনের দলের অগোচরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার বিলম্ব নেই। বহু দিন-রাত্রির ছায়া অতীতের এ-নিস্তব্ধ কক্ষে জীবনের সুখ ধ্বনিত করেনি, এখানে গভীর নিশীথরাত্রির রহস্য হয়তো মানুষের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক হবে না, মানুষের জগতের বাইরে এরা।

সুশীল লণ্ঠন-হাতে উঠে এল আঁধার পাতালপুরীর কক্ষ তেকে। তাঁবুতে ঢুকবার পথে ইয়ার হোসেন বড় ছুরি দিয়ে পাখির মাংস ছাড়াচ্ছে।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—কোথায় ছিলেন?

—ছবি আঁকতে, মিঃ হোসেন।

—লণ্ঠন কেন?

—পাছে রাত হয়ে যায় ফিরতে। বনের মধ্যে আলো থাকলে অনেক ভাল।

—এত ছবি এঁকে কী হয় বাবু?

—ভাল লাগে।

—অসল ব্যাপারের কী? জামাতুল্লা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। আমি ওকে মজা দেখিয়ে দেব!

—আমরা সকলেই চেষ্টা করছি! ব্যস্ত হবেন না মিঃ হোসেন—

—আমি আর পাঁচদিন দেখব। তারপর এখান থেকে চলে যাব—কিন্তু যাবার আগে জামাতুল্লাকে দেখিয়ে যাব সে কার সঙ্গে জুয়োচুরি করতে এসেছিল!

—জামাতুল্লার কী দোষ? আপনি বরং আমাকে দোষ দিতে পারেন—

—আরে আপনি তো ছবি-আঁকিয়ে পুরুষমানুষ। এসব কাজ আপনার না।

সুশীল রাত্রে চুপিচুপি জামাতুল্লাদের নর্তকী-পুতুলের ঘটনা সব বললে। ওদের দুজনকেই যেতে হবে, নতুবা ছিপি উঠবে না।

জামাতুল্লা বললে—কিন্তু আমাদের দুজনের একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয় বাবুজি।

—কেন?

—জানেন না,—এর মধ্যে নানারকম ষড়যন্ত্র চলছে। ওরা আপনাদের চেয়ে আমাকেই দোষ দেবে বেশি। আপনাকে ওরা নিরীহ, গোবেচারি বলে ভাবে—

—সেটা অন্যায়।

—আপনারা ভালমানুষ, আমার হাতের পুতুল—পুতুল যেমন নাচায়, তেমনি আপনারা আমার হাতে—

শেষের কথাটা শুনে সুশীলের আবার মনে পড়ল নর্তকী-মূর্তির কথা। কাল হয়তো বেরুনো যাবে না, ইয়ার হোসেনের কড়া নজরবন্দির দরুন। আজই রাত্রে অন্য দল ঘুমুলে সেখানে গেলে ক্ষতি কী?

সনৎকে বললে—সনৎ, তৈরি হও। আজ রাত্রে হয় আমাদের জীবন, নয়তো আমাদের মরণ। পাতালপুরীর রহস্য আজ ভেদ করতেই হবে। আজ আঁধার-রাত্রে চুপিচুপি বেরুবে আমার সঙ্গে—দিনের আলোয় সব ফাঁস হয়ে যাবে।

জামাতুল্লা বললে—কেউ টের না পায় বাবুজি, জুতো হাতে করে সব যাবেন কিন্তু!

আহারাদির পর মিটে গেল। দাবানল জ্বলে উঠেছে আজ ওদের মনে, বনের সাময়িক দাবানলকেও ছাপিয়ে তার শিখা সমস্ত মনের আকাশ ব্যেপে বেড়ে উঠল।

দুটো রাইফেল, একটা রিভলবার, একটা শাবল, একটা গাঁতি, খানিকটা দড়ি, চার-পাঁচটা মোমবাতি, কিছু খাবার জল, এক শিশি টিংচার আইডিন, খানকতক মোটা রুটি—তিনজনের মধ্যে এগুলো ভাগ করে নিয়ে রাত একটার পরে ওরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাঁবু থেকে বেরুল।

ইয়ার হোসেনের একজন মালয় অনুচর উল্টোমুখে দাঁড়িয়ে 'বল' (রামদাও) হাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকারে এরা বুক ঘেঁষে চলে এল—সে লোকটা টের পেলে না।

সনৎ বললে—আমি সে-পুতুলটা একবার দেখব—

অদ্ভুত রাত্রি! বনের মাথায় মাথায় অগণিত তারা, বহুকালের সুপ্ত নগরীর রহস্যে নিশীথ-রাত্রির অন্ধকার থমথম-থর্ম করছে, সমস্ত ধ্বংসস্তূপটি যেন মুহূর্তে শহর হয়ে উঠতে পারে—ওর অগণিত নরনারী নিয়েই। লতাপাতা, ঝোপঝাপ, মহীরুহের দল খাড়া হয়ে সেই পরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় যেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

অন্ধকারে একটা সরসর শব্দ হাতে লাগল সামনের মাটিতে।

সকলে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে টর্চ টিপলে—প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ আস্তে আস্তে ওদের পাঁচ হাত তফাত দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলে পাথরের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল, সাপটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ওরা আবার চলল।

গহ্বরের মুখে ওরা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল, তিনজনে মিলে সেগুলো সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

সনৎ বললে—এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি—

কিন্তু পাতালপুরীর কঙ্কের সে-নর্তকী-মূর্তিটা দেখে ওর মুখে কথা সরল না। শিল্পীর অদ্ভুত শিল্পকৌশলের সামনে ও যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

সুশীল বললে—শুধু এই মূর্তিটি কিউরিও হিসেবে বিক্রি করলে দশ হাজার টাকায় যে-কোনো বড় শহরের মিউজিয়ম কিনে নেবে—তবে আমাদের দেশে নয়—ইউরোপে।

জামাতুল্লা বললে—ধরুন বাবুজি নাচনেওয়ালী পুতুলটা সবাই মিলে—পাক খাওয়াতে হবে একে বারকয়েক এখনও।

মিনিট দুই সবাই মিলে পাক দিয়ে মূর্তিটাকে ঘোরাল যেমন স্টপার ঘোরায় বোতলের মুখে। তারপর সবাই সন্তর্পণে মূর্তিটাকে ধরে উঠিয়ে নিলে। স্টপারের মতই সেটা খুলে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বিটঙ্কদেবীর নিচের অংশে বার হয়ে পড়ল গোলাকার একটা পাথরের চৌবাচ্ছা। সুশীল উঁকি মেরে দেখে বললে—টর্চ ধর, খুব গভীর বলে মনে হচ্ছে—

টর্চ ধরে ওরা দেখলে চৌবাচ্চা অন্তত সাত ফুট গভীর। তার তলায় কী আছে ওপর থেকে ভাল দেখা যায় না।

সনৎ বললে—আমি লাফ দিয়ে পড়ব দাদা?

জামাতুল্লা বরণ করলে। এসব পুরনো কূপের মধ্যে **বিষধর সর্প প্রায়ই** বাসা বাঁধে, যাওয়া সমীচীন হবে না।

দু-একটা পাথর ছুঁড়ে মেরে ওরা দেখলে, কোনো সাড়াশব্দ এল না আধ-অন্ধকার কূপের মধ্যে থেকে। তখন জামাতুল্লাই ঝুপ করে ঝাপ দিয়ে পড়ল ওর মধ্যে।

কিছুক্ষণ তার আর কোনো সাড়া নেই।

সুশীল ও সনৎ অধীর কৌতূহলের সঙ্গে বলে উঠল—কী—কী—কী—দেখলে?

তবুও জামাতুল্লার মুখে কথা নেই। সে যেন কীহাতড়ে বেড়াচ্ছে চৌবাচ্চার তলায়। একটু অদ্ভুতভাবে হাতড়াচ্ছে—একবার সামনে যাচ্ছে, আবার পিছু হটে আসছে।

সুশীল বললে—কী হল হে? পেলে কিছু দেখতে?

জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, এর মধ্যে কিছু নেই—

—কিছু নেই?

—না বাবুজি। একেবারে ফাঁকা—

—তবে তুমি ওর মধ্যে কী করছ জামাতুল্লা?

—এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। নেমে এসে দেখুন—

সুশীল ও সনৎ সন্তর্পণে একে একে পাথরের চৌবাচ্চাটির মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। জামাতুল্লা দেখালে—এই দেখুন বাবুজি, এই লাইন ধরে একবার সামনে, একবার পিছনে গিয়ে দেখুন—তা হলেই বুঝতে পারবেন—

—সামনে-পেছনে গিয়ে কী হবে?

সুশীলক লক্ষ্য করে দেখলে চৌবাচ্চার ডানদিকের দেওয়ালে একটা কালো রেখা আছে, সেইটে ধরে যদি সামনে বা পেছনে যাওয়া যায় তবে চৌবাচ্চার তলাটা একবার নামে, একবার ওঠে। ছেলেদের 'see-saw' খেলার তক্তাটার মত।

সনৎ বললে—ব্যাপারটা কী?

সুশীল বললে—অর্থাৎ এটা যদি কোনোরকমে ওঠানো যায়, তবে এর মধ্যে আরও কিছু রহস্য আছে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

জামাতুল্লা বললে—বাবু, গাঁতি দিয়ে তলা ভেঙে ফেলতে পারি তো—অন্য কোনো পথ যদি না পাওয়া যায়। কিন্তু আজ থাকলে হত না বাবুজি? বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ—সকাল হয়-হয়—

হঠাৎ সুশীল চৌবাচ্চার এক জায়গায় টর্চের আলো ফেলে বলে উঠল—এই দেখ সেই

চিহ্ন—

সনৎ ও জামাতুল্লা সবিস্ময়ে দেখলে, চৌবাচ্চার কালো রেখার ওপরে উত্তরদিকের কোণে দুখানা পাথরের সংযোগস্থলে তাদের অতিপরিচিত সেই চিহ্নটি আঁকা।

সুশীল বললে—দিশ পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে—

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ এই চিহ্নের ওপর টিপলেই চৌবাচ্চার তলার পাথর একদিকে খুব বেশি কাত হয়ে, ভেতরে কী আছে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল। আজ থাক, চল।

জামাতুল্লাও তাতে মতো দিলে। সবাই মিলে তাঁবুতে ফিরে এল যখন, তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্য 'বল' হাতে তাঁবুর দ্বারে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। জামাতুল্লার ইঙ্গিতে সুশীল ও সনৎ উপুড় হয়ে পড়ে বুকে হেঁটে নিজেদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

জামাতুল্লা বললে—ঘুমিয়ে পড়ুন বাবুজিরা—কিন্তু বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমুবেন না, আমি উঠিয়ে দেব সকালেই। নইলে ওরা সন্দেহ করবে।

সুশীল বললে—আমাদের অবর্তমানে ওরা ঘরে ঢোকেনি এই রক্ষে—

সনৎ অবাক হয়ে বললে—কী করে জানলে দাদা?

—দেখবে? এই দেখ! তাঁবুর দোরে সাদা বালি ছাড়ানো, যে-কেউ এলে পায়ের দাগ পড়ত। তা পড়েনি।

ওরা যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

সুশীলকে কে বললে—আমার সঙ্গে আয়।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক দীর্ঘকৃতি পুরুষের পিছু পিছু ও গভীর বনের কতদূর চলল। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্যগণ ঘোর তন্দ্রাভিভূত, ঊষার আলোকের ক্ষীণ আভাসও দেখা যায় না পূর্ব দিগন্তে। বৃক্ষলতা স্তব্ধ, স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন। সারি সারি প্রাসাদ একদিকে, অন্যদিকে প্রশস্ত দীর্ঘিকার টলটলে নির্মল জলরাশির বুকে পদ্মফুল ফুটে ও আছে। সেই গভীর বনে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে দেউলে দেউলে ত্রিমূর্তি মহাদেবের পূজা হচ্ছে। সুগন্ধ দীপবর্তিকার আলোকে মন্দিরাভ্যন্তর আলোকিত। প্রাসাদের বাতায়ন বলভিতে শুকসারী তন্দ্রামগ্ন।

সুশীল বললে—আমায় কোথা নিয়ে যাবেন?

—সে কথা বলব না। ভয় পাবি—

—তবুও শুনি বলুন—

—বহুদিনের বহু ধ্বংস, অভিশাপ, মৃত্যুর দীর্ঘশ্বাসে এ-পুরীর বাতাস বিষাক্ত। এখানে প্রবেশ করবার দুঃসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে।

—কী?

—একজনের প্রাণ। সমুদ্রমেখলা এ-দ্বীপের বহু শতাব্দীর গুপ্ত কথা ঘন বন ঢেকে রেখেছিল। ভারত মহাসমুদ্র স্বয়ং এর প্রহরী, দেখতে পাও না?

—আজ্ঞে, দেখছি বটে।

—তবে সে-রহস্য ভেদ করতে এসেছ কেন?

—আপনি তো জানেন সব।

—সম্রাটের ঐশ্বর্য গুপ্ত আছে এর মধ্যে। কিন্তু সে পাবে না। যে-অদৃশ্য আত্মারা তা

পাহারা দিচ্ছে, তারা অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত হিংসুক। কাউকে তারা নিতে দেবে না। তবে তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করব না আমি—রহস্য নিয়ে যাও, অর্থ পাবে না। যা পাবে তা সামান্য। তারই জন্যে প্রাণ দিতে হবে।

—আপনি বিক্ষমুনি?

—মূর্খ! আমি এই নগরীর অধিদেবতা। ধ্বংসস্তূপ পাহারা দিচ্ছি শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনেকদিন পরে তুমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছ—আটশো বছর আগে তোমাদের সাহসী পূর্বপুরুষরা অস্ত্র-হাতে এখানে এসে রাজ্যস্থাপন করেন। দুর্বল হাতে তাঁরা খড়্গ ধরতেন না। তোমরা সে-দেশ থেকেই এসেছ কি? দেখলে চেনা যায় না কেন?

—সেটা আমাদের অদৃষ্টের দোষ, আমাদের ভাগলিপি।

তার পরেই সব অন্ধকার। সুশীল সেই অদৃষ্টপূর্ব পুরুষের সঙ্গে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন চলেছে...চলেছে...মাথার ওপর কৃষ্ণ নিশীথিনীর জ্বলজ্বলে নক্ষত্রভরা আকাশ।

পুরুষটি বললেন—সাহস আছে? তুমি ভারতবর্ষের সন্তান—

—নিশ্চয়ই, দেব।

নগরী বহুদিন মৃতা, কিন্তু বহু যুগের পুরাতন কৃষ্ণগুরুর ধূপগন্ধে আমোদিত অরণ্যতরুর ছায়ায় ছায়ায় অজানা পথযাত্রার যেন শেষ নেই।

বিশাল পুরী, প্রেতপুরীর সমান নিস্তব্ধ। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষে, দামি নীলাংশুকের আস্তরণে ঢাকা স্বর্ণ-পর্যঙ্ক কোনো অপরিচিতের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। সুশীলের বুক গুরুগুরু করে উঠল, গৃহের রত্নপ্রস্তরের ভিত্তিতে যেন অমঙ্গলের লেখা। ভবনদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে এখনি যেন কোনো বিভীষণা অপদেবীর মূর্তি!

পুরুষ বললেন—ঐ শোন—

সুশীল চমকে উঠল। যেন কোনো নারীকণ্ঠের শোকার্ত চিৎকারে নিশীথ-নগরীর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। সে নারীর কণ্ঠস্বরকে সে চেনে। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর। খুব নিকটআত্মীয়ার বিলাপধ্বনি। সুশীলের বুক কেঁপে উঠল। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে কে ডাকলে—বাবুজি—বাবুজি—

তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ঘামে ভেসে গিয়েছে। জামাতুল্লা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। দিনের আলো ফুটছে তাঁবুর বাইরে।

জামাতুল্লা বললে—উঠুন বাবুজি।

সুশীল বিমূঢ়ের মতো বললে—কেন?

—ভোর হয়েছে। ইয়ার হোসেনের লোক এখনও ওঠেনি—আমাদের কেউ কোনো সন্দেহ না করে। সনৎবাবুকে ওঠাই—

একটু বেলা হলে ইয়ার হোসেন উঠে ওদের ডাকলে। বললে—পরশু এখান থেকে তাঁবু ওটঠতে হবে। জাঙ্কওয়ালা চীনেম্যান এসে বসে আছে। ও আমার নিজের লোক। ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর থাকতে চাইছে না। এখানে আপনারা এলেন ফটো তুলতে আর ছবি আঁকতে। এত পয়সা খরচ এর জন্যে করিনি।

সুশীল বললে—যা ভাল বোঝেন মিঃ হোসেন।

সনৎ বললে—তা হলে দাদা, আমাদের সেই কাজটা এই দুদিনের মধ্যে সারতে হবে—ইয়ার হোসেন সন্দেহের সুরে বললে—কী কাজ?

সুশীল বললে—বনের মধ্যের একটা মন্দিরের গায়ে পাথরের ছবি আছে, সেটা আমি

আঁকছি। সনৎ ফটো নিচ্ছে তার।

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললে—ওই করতেই আপনারা এসেছিলেন আর কি! করুন যা হয় এই দুদিন।

সনৎ বললে—তা হলে চল দাদা আমরা সকাল-সকাল খেয়ে রওনা হই।

ইয়ার হোসেনের অনুমতি পেয়ে ওদের সাহস বেড়ে গেল। দিনদুপুরেই ওরা দুজন রওনা হয়ে গেল—শাবল, গাঁতি, টর্চ ওরা কিছুই আনেনি, সিঁড়ির মুখের প্রথম ধাপে রেখে এসেছে। শুধু ক্যামেরা আর রিভলভার হাতে বেরিয়ে গেল।

জামাতুল্লা গোপনে বললে—আমি কোনো ছুতোয় এর পরে যাব। একসঙ্গে সকলে গেলে চালাক ইয়ার হোসেন সন্দেহ করবে। আজ কাজ শেষ করতে হবে মনে থাকে যেন, হয় এস্পার নয় তো ওস্পার। আর সময় পাব না।

সনৎ বললে—মনে থাকে যেন এ-কথা। আজ আর ফিরব না শেষ না দেখে।

সুশীলের বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল সনতের কথায়। সনতের মুখের দিকে ও চাইলে। কেন সনৎ হঠাৎ এ-কথা বললে?

আবার সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে রহস্যময় গহ্বরে সুশীল ও সনৎ এসে দাঁড়াল। আসবার সময় সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকে ওরা গাঁতি ও টর্চ নিয়ে এসেছে। পাথরের নর্তকী মূর্তি দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় কাত করে রাখা হয়েছে। যেন জীবন্ত পরী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। সুশীল সেদিকে চেয়ে বললে—আর কিছু না পাই, এই পুতুলটা নিয়ে যাব। সব খরচ উঠে এসেও অনেক টাকা থাকবে—শুধু ওটা বিক্রি করলে।

তারপর দুজনে নিচের পাথরের চৌবাচ্চাটাতে নামল।

সনৎ বললে—উত্তর কোণের গায়ে চিহ্নটা দেখলে পাচ্ছ দাদা!

—এখন কিছু কোরো না, জামাতুল্লাকে আসতে দাও।

সনৎ ছেলেমানুষ, সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করে একদিন যে জীবনে এমন একটা রহস্যসঙ্কুল পথযাত্রায় বেরিয়ে পড়বে, কবে সে এ কথা ভেবেছিল? সুশীল কিন্তু বসে অন্য কথা ভাবছিল।

গত রাত্রের স্বপ্নের কথা তার স্পষ্ট মনে নেই, আবছাভাবে যতটুকু মনে আছে, সে যেন গত রাত্রে এক অদ্ভুত রহস্যপুরীর পথে পথে কার সঙ্গে অনির্দেশ যাত্রায় বার হয়েছিল, কত কথা যেন সে বলেছিল, সব কথা মনে হয় না। তবুও যেন কী এক অমঙ্গলের বার্তা সে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে, কী সে বার্তা, কার সে অমঙ্গল কিছুই স্পষ্ট মনে নেই—অথচ সুশীলের মন ভার-ভার, আর যেন তার উৎসাহ নেই। এ-কাজে ফিরবার পথও তো নেই।

ওপরের ঘর থেকে জামাতুল্লা উঁকি মেরে বললে—সব ঠিক।

—এসেছ?

—হাঁ বাবুজি। অনেকটা দড়ি এনেছি লুকিয়ে—

—নেমে পড়।

—আপনার ক্যামেরা এনেছেন?

—কেন বল তো?

—ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি দিতে হলে ক্যামেরাতে ফটো তুলে নিয়ে যেতে হবে—

—সব ঠিক আছে।

জামাতুল্লা ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার অল্পক্ষণ পরেই সনৎ হঠাৎ কী ভেবে দেওয়ালের উত্তর কোণের সে-চিহ্নটা চেপে ধরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথরের চৌবাচ্চার তলা

একদিকে কাত হয়ে উঠতেই ফাঁক দিয়ে সনৎ নিচের দিকে অতলস্পর্শ অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ল।

সুশীল ও জামাতুল্লা দুজনেই চমকে চিৎকার করে উঠল। অমন অতর্কিতভাবে সনৎ লাফ মারতে গেল কেন ওরা ভেবে পেল না।

কিন্তু লাফ মারলে কোথায়?

জামাতুল্লা সভয়ে বলে—সর্বনাশ হয়ে গেল বাবুজি!

তারপর ওরা দুজনেই কিছু না ভেবেই পাথরের চৌবাচ্চার তলার ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল।

ওরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে।

সনৎ অন্ধকারের ভেতর থেকেই বলে উঠল—দাদা, টর্চ জ্বালো আগে, জায়গাটা কী রকম দেখতে হবে—

ওরা টর্চ জ্বেলে চারদিক দেখে অবাক হয়ে গেল। ওরা একটা গোলাকার ঘরের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে—ঘরের দু-কোণে দুটো বড় পয়োনালির মতো কের রয়েছে ওরা বুঝতে পারলে না। ছাদের যে-জায়গায় কড়িকাঠের অগ্রভাগ দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার কথা, সেখানে দুটো বড়-বড় পাথরের গাঁথুনি পয়োনালি, একটা এদিকে, আর একটা ওদিকে। সমস্ত ঘরটায় জলের দাগ, মেঝে ভয়ানক ভিজে ও স্যাঁতসেঁতে, যেন কিছুক্ষণ আগে এ-ঘরে অনেকখানি জল ছিল।

জামাতুল্লা বললে—এ ঘরে এত জল আসে কোথা থেকে বাবুজি?

সুশীল কিছু বলতে পারলে না; প্রকাণ্ড ঘর, অন্ধকারের মধ্যে ঘরের কোথায় কী আছে ভাল বোঝা যায় না।

সনৎ বললে—ঘরের কোণগুলো অন্ধকার দেখাচ্ছে, ওদিকে কী আছে দেখা যাক—

টর্চ ধরে তিনজনে ঘরের একদিকের কোণে গিয়ে দেখে অবাক চোখে চেয়ে রইল।

ঘরের কোণে বড়-বড় তামার জালা বা ঘড়ার মতো জিনিস, একটার ওপর আর একটা বসানো, ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু। সেদিকের দেওয়ালের গা দেখা যায় না—সমস্ত দেওয়াল ঘেঁষে সেই ধরনের রাশি-রাশি তামার জালা—ওরা এতক্ষণ ভাল করে দেখেনি, সেই তামার জালার রাশিই অন্ধকারে দেওয়ালের মতো দেখাচ্ছিল।

জামাতুল্লা বললে—এগুলো কী বাবুজি?

সুশীল বললে—আমার মনে হয় এটাই ধনভাণ্ডার।

সনৎ বললে—আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি—

জামাতুল্লা হঠাৎ অন্য দেয়ালের দিকে গিয়ে বললে—এই দেখুন বাবুজি—

সেদিকে দেয়ালের গায়ে বড় বড় কুলুঙ্গির মতো অসংখ্য গর্ত। প্রত্যেকটার মধ্যে ছোটবড় কৌটোর মতো কী সব জিনিস।

সুশীল বললে—যাতে তাতে হাত দিও না; এসব পাতালঘরে সাপ থাকা বিচিত্র নয়। এই ঘোর অন্ধকারে পাতালপুরী বিষাক্ত সাপের রাজ্য হওয়াই বেশি সম্ভব।

কিন্তু চারিদিকে ভাল করে টর্চ ফেলে দেখেও সাপের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনৎ ও জামাতুল্লা কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটো বার করে দেখলে। ভেতরে যা আছে তা দেখে ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল না। এ কি সম্ভব, এত বড় একটা প্রাচীন সাম্রাজের গুপ্ত ধনভাণ্ডারে এত কাণ্ড করে পাতালের মধ্যে ঘর খুঁড়ে তাতে পুরনো হর্তুকি রাখা হবে?

ওদের হতভম্ব মুখের চেহারা দেখে সুশীল বললে—কী ওর মধ্যে?

সনৎ বললে—পুরনো হর্তুকি দাদা—

—দূর পাগল—হর্তুকি কী রে?

—এই দেখ—

সুশীল গোল-গোল ছোট ফলের মতো জিনিস হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বললে—আমি জানিনে এ কী জিনিস, কিন্তু যখন এত যত্ন করে একে রাখা হয়েছে, তখন এর দাম আছে। থলের মধ্যে নাও দু-এক বাক্স—

সব কৌটোগুলোর মধ্যে সেই পুরোনো হর্তুকি।

ওরা দস্তুরমতো হতাশ হয়ে পড়ল। এত কষ্ট করে পুরনো হর্তুকি সংগ্রহ করতে ওরা এতদূর আসেনি।

হঠাৎ সুশীল বলে উঠল—আমার একটা কথা মনে হয়েছে—

সনৎ বললে—কী দাদা?

—এ-জিনিস যা-ই হোক, এ-ই ছিল পুরনো সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রা—কারেন্সি—এই আমার স্থির বিশ্বাস। সঙ্গে নাও কিছু পুরনো হর্তুকি—

জামাতুল্লা অনেক কৌশল করে একটা তামার জালা পাড়লে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তার ঢাকনি খোলা গেল না। জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে—এ কি রিবিট করে এঁটে দেওয়া বাবুজি? এ খুলবার হদিশ পাচ্ছি নে যে—

টানাটানি করতে গিয়ে একটা ঢাকনি খটাং করে খুলে গেল।

সনৎ বললে—দেখো ওর মধ্যে আবার পুরনো আমলকি না বার হয় দাদা—

কিন্তু জালাটা উপুড় করে ঢাললে তার মধ্যে থেকে বেরুলো রাশি রাশি নানা রঙবেরঙের পাথর। দামি জিনিস বলে মনে হয় না। সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলের যে-কোনো নদীর ধারে এমনি নুড়ি অনেক পাওয়া যায়।

জামাতুল্লা বললে—তোবা! তোবা! এসব কী চিজ বাবুজি?

কতকগুলো কৌটোর মধ্যে শনের মতো সাদা জিনিসের গুলির মতো। মনে হয় বহুকাল আগে শনের নুড়িগুলোতে কোনো গন্ধদ্রব্য মাখানো ছিল—এখনও তার খুব মৃদু সুগন্ধ শনের নুড়িগুলোর গায়ে মাখানো।

সনৎ বললে—দাদা, এটা তাদের ওষুধ-বিষুদ রাখার ভাঁড়ার ছিল না তো?

জামাতুল্লা বললে—কী দাওয়াই আছে এর মধ্যে বাবুজি?

—তা তুমি আমি কী জানি? প্রাচীন যুগের লোকের কত অদ্ভুত ধারণা ছিল। হয়তো তাদের বিশ্বাস ছিল এই সবই অমর হওয়ার ওষুধ।

হটাৎ সুশীল একটা জালার মুখ খুলে বলে উঠল—দেখি, বোধহয় টাকা! জালা উপুড় করলে তার মধ্যে থেকে পড়ল একরাশ বড় বড় চাকতি, বড় বড় মেডেলের আকারের প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু।

সুশীল একখানা চাকতি হাতে করে বললে—সোনা বলে মনে হয় না?

জামাতুল্লা বললে—আলবৎ সোনা—তবে টাকা বা মোহর নয়?

সুশীল বললে—কোনরকম ছাপ নেই। মুদ্রা করবার জন্য এগুলো তৈরি করা হয়েছিল—কিন্তু তারপর ছাপ এতে মারা হয়নি। এ অনেক আছে—

সনৎ বললে—এ যদি সোনা হয়—এই এক জালার মধ্যেই লাখ টাকার সোনা—

সুশীল আর একটা জালা পেড়ে ঢাকনি খুলে উপুড় করে ঢাললে। তার মধ্যেও অবিকল অমনি ধাতব চাকতি—একই আকারের, একই মাপের।

জামাতুল্লা বললে—সোভানাল্লা! দুলাখ হল—যদি আমরা দেখি সব জালাতেই এরকম—

এই সময় সুশীল প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল—শিগগির এদিকে এস—

ওরা গিয়ে দেখলে অন্ধকার ঘরের কোণে কতকগুলো মানুষের হাড়গোড়—ভাল করে টর্চ ফেলে দেখা গেল, দুটো নরকঙ্কাল।

সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার পাতালপুরীর মধ্যে নরকঙ্কাল দুটো যেন ওদের সমস্ত আশা ও চেষ্টাকে দাঁত বার করে উপহাস করছে। কাল রাত্রের স্বপ্নের কথা ওর মনে এল, মৃত্যুর চেয়ে মহা রহস্য জগতে কী আছে? মূঢ় লোকে চারিপাশে মৃত্যু অহরহ দেখছে, অথচ ভাবে না কী গভীর রহস্যপুরীর দ্বারপালস্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের পথে মৃত্যু আছে দাঁড়িয়ে।...

নরকঙ্কালটি কী কথা না জানি বলত যদি এরা এদের মরণের ইতিহাস ব্যক্ত করতে পারত! সে হয়তো দুর্নিবার লোভ ও নৃশংস অর্থলিপ্সার ইতিহাস, হয়তো তা রক্তপাতের ইতিহাস, জীবন মরণ নিয়ে খেলার ইতিহাস, ভাই হয়ে ভায়ের বুকে ছুরি বসানোর ইতিহাস...

জামাতুল্লা কঙ্কালগুলো সরিয়ে রাখতে গিয়ে বললে—হাড় ভেঙে যাচ্ছে বাবুজি, বহুৎ পুরনো আমলের হাড়গোড় এসব। কমসে কম একশো দেড়শো বছরের পুরনো—কিন্তু দেখুন বাবুজি, হাড়ের গায়ে এসব কী?

ওরা হাতে করে নিয়ে দেখলে।

প্রায় এক ইঞ্চি করে লবণের স্তর শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে আছে কঙ্কালের ওপরে। সুশীল ভাল করে টর্চের আলো ফেলে বললে—চোখের কোটরগুলো নুনে বুজোনো—দেখ চেয়ে!

এর যে কী কারণ ওরা কিছুই ঠিক করতে পারলে না।

অন্ধকার পাতালপুরীর শহরে ওদের হাড়ে নুন মাখাতে এসেছিল কে?

সে-সময়ে সনৎ বললে—দেখ দাদা, দেখ জামাতুল্লা সাহেব—এটা কিসের দাগ?

ওরা পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে সনৎ টর্চ ফেলে দেওয়ালের গায়ের একটা সাদা রেখার দিকে চেয়ে কথা বলছে। রেখাটা লম্বা অবস্থায় দেওয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টানা।

জমাতুল্লা বললে—এ-দাগ নোনা জলের দাগ—খুব টাটকা দাগ।

সুশীল ও সনৎ হতভম্ব হয়ে বললে—তার মানে? জল আসবে কোথা থেকে?

জমাতুল্লা বললে—বড্ড অন্ধকার জায়গা, ভাল করে কিছুই তো মালুম পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একবার ভাল করে ঘরের চারিধারে দেখা দরকার। অজানা জায়গায় সাবধান থাকাই ভাল। এত স্যাঁতসেঁতে কেন ঘরটা, আমি অনেকক্ষণ থেকে তা-ই ভাবছি।

জামাতুল্লা ও সনৎ হাতড়ে হাতড়ে সোনার চাকতি বের করে থলের মধ্যে একরাশ পুরে ফেললে—পাথরের নুড়িও কিছু নিলে—বলা যায় না যদি এগুলো কোনো দামি পাথর হয়ে পড়ে! বলা যায় কি? সনৎ ছেলেমানুষ, সে এত সোনার চাকতি দেখে কেমন দিশেহারা হয়ে গেল—উন্মত্তের মতো আঁজলা ভরে চাকতি সংগ্রহ করে তার তামার জালার মধ্যে থেকে, আর থলের ভেতর পুরে নেয়। যেন এ আরব্য উপন্যাসের একটা গল্প—কিংবা রূপকথার মায়াপুরী—পাতালপুরীর ধনভাণ্ডার! বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বেলা দশটা থেকে বিকেল ছ-টা এস্তক কলম পিষে সাঁইত্রিশ টাকা ন-আনা রোজগার করতে হয় সারা মাসে। সেই হল রূঢ় বাস্তব পৃথিবী—মুষকে ঘা দিয়ে শক্ত করে দেয়। আর এখানে কী, না—হাতের আঁজলা ভরে যত ইচ্ছে সোনা নিয়ে যাও, হীরে নিয়ে যাও—এ আলাদা জগৎ—পৃথিবীর অর্থনৈতিক আইনকানুনের বাইরে।

বহু প্রাচীনকালের মৃত সভ্যতা এখানে প্রাচীন দিনের সমস্ত বর্বর প্রাচুর্য ও আদিম অর্থনীতি নিয়ে সমাধিগর্ভে বিস্মৃতির ঘুমে অচেতন—এ-দিন বাতিল হয়ে গিয়েছে, এ-সমাজ বাতিল হয়ে গিয়েছে—একে অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে দিনের আলোয় তুলে বিংশ শতাব্দীর জগতে আর অর্থনৈতিক বিভ্রাট ঘটিও না।....

হটাৎ কিসের শব্দে সুশীলের চিন্তার জাল ছিন্ন হল—বিরাট, উন্মত্ত, প্রচণ্ড শব্দ—যেন সমগ্র নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে ছুটে আসছে কোথা থেকে—কিংবা শিবের জটা থেকে যেন গঙ্গা ভীম ভৈরব বেগে ইন্দ্রের ঐরাবতকে ভাসিয়ে মর্তে অবতরণ করছেন।

জামাতুল্লার চিৎকার শোনা গেল সেই প্রলয়ের শব্দের মধ্যে—জল! জল! পালান—ওপরে উঠুন—

জামাতুল্লার কথা শেষ না হতে সুশীলের হাঁটু ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত জল উঠল—কোমর থেকে বুক লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে জামাতুল্লা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখুন বাবু!

সুশীল সবিস্ময়ে ও সভয়ে চেয়ে দেখলে ঘরের ছাদের কাছাকাছি সেই দুটো পয়োনালা দিয়ে ভীষণ তোড়ে জল এসে পড়ছে ঘরের মধ্যে। চক্ষের নিমেষে ওরা ইঁদুরকলে আটকা পড়ে জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে মরবে!—কিন্তু উঠবে কোথায়! উঠবে কিসের সাহায্যে? এ-ঘরে সিঁড়ি নেই আগেই দেখে এসেছে।

সুশীল চিৎকার করে ওললে—সনৎ—সনৎ—ওপরে ওঠ—শিগগির—

সনৎ বললে—দাদা! তুমি আমার হাত ধর—হাত ধর—

তরাপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল—পুরনো রাজাদের পোষ-মানা বেতাল যেন কোথায় হা হা করে বিকট অট্টহাস্য করে উঠল—সম্মুখে মৃত্যু! উদ্ধার নেই! উদ্ধার নেই!

এ-জলে সাঁতার দেওয়া যাবে না সুশীল জানে—এ মরণের ইঁদুরকল। বুক ছাপিয়ে জল তখন উঠে প্রায় নাকে ঠেকে-ঠেকে—

কে যে অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল—দাদা—দাদা—আমার হাত ধর—দাদা—

একজোড়া শক্ত বলিষ্ঠ হাত ওকে ওপরের দিকে তুললে টেনে। ঘন অন্ধকার। টর্চ কোথায় গিয়েছে সেই উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে। সুশীলের প্রায় জ্ঞান নেই। সে ডাকছে—কে? সনৎ?

কোন উত্তর নেই। কেউ কাছে নেই।

সুশীলের ভয় হল। সে চেঁচিয়ে ডাকলে—সনৎ! জামাতুল্লা!

তার পায়ের তলায় উন্মত্ত গর্জনে যেন একটা পাহাড়ের মাথার হ্রদ খসে পড়েছে! উত্তর দেয় না কেউ—না সনৎ, না জামাতুল্লা।

প্রায় দশ মিনিট পরে জামাতুল্লা বললে—বাবু, জলদি আমার হাত পাকড়ান—

—কেন?

—পাকড়ান হাত—উপরে উঠব—সাবধান!

—সনৎ, সনৎ কোথায়? তাকে রেখে এলে উপরে?

—জলদি হাত পাকড়ান—হুঁ—

কত যুগ ধরে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে সে-ওঠা প্রলয়ের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে—তারপর কতক্ষণ পরে পৃথিবীর ওপর এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা পাতালপুরীর গহ্বর থেকে! বনের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ঘনিয়ে এসেছে। সুশীল ব্যগ্রভাবে বললে—সনৎ কই? তাকে কোথায়—

জামাতুল্লা বিষাদ-মাখানো গম্ভীর সুরে বললে—সনৎবাবু নেই—আমাদের ভাগ্য

বাবুজি—

সুশীল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বললে—নেই মানে।

—সনৎবাবু তো পাতালপুরী থেকে ওঠেননি—তাঁকে খুঁজে পাইনি। আপনাকে তুলে ওপরে রেখে তাঁকে খুঁজতে যাব এমন সময় ঘরের মেঝে দুলে উঠে এঁটে গেল। তিনি থেকে গেলেন তলায়—আমরা রয়ে গেলাম ওপরে। তাঁকে খুঁজে পাই কোথায়?

—সে কী! তবে চল গিয়ে খুঁজে আনি!....

জামাতুল্লা বিষাদের হাসি হেসে বললে—বাবুজির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, এখন কিছু বুঝবেন না। একটু ঠাণ্ডা হোন, সব বলছি। সনৎবাবুকে যদি পাওয়া যেত তবে আমি তাঁকে ছেড়ে আসতাম না।

—কেন? সনৎ কোথায়? হ্যাঁরে, আমি তোকে ছেড়ে বাড়ি গিয়ে মার কাছে, খুড়িমার কাছে কী জবাব দেব?—কেন তুমি তাকে পাতালে ফেলে এলে?

জামাতুল্লা নিজের কপালে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—নসিব, বাবুজি—

উদ্‌ভ্রান্ত সুশীলের বিহ্বল মস্তিষ্কে ব্যাপারটা তখনও ঢোকে নি। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে দম বন্ধ হয়ে সনৎ ওপরে উঠবার চেষ্টা করেও উঠতে পারেনি। অন্ধকারের মধ্যে জামাতুল্লাও ওকে খুঁজে পায়নি। ওরই হাত ধরে টেনে তুলবার পরে ঘরের মেঝে এঁটে গিয়ে রত্নভাণ্ডারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ বিছিন্ন করে ফেলে। ওই ঘরে ছাদ পর্যন্ত জল ভর্তি হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ—সেখানে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পরে?....

সুশীল ক্রমে সব বুঝলে ওপরে উঠে এসে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগানোর পরে। একটা গভীর শোক ও হতাশায় সে একেবারে ডুবে যেত হয়তো, কিন্তু ঘটনাবলীর অদ্ভুতত্বে, সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। কোথায় অন্ধকার পাতালপুরীতে পুরাকালের ধনভাণ্ডার, সে-ধনভাণ্ডার অসাধারণ উপায়ে সুরক্ষিত.....এমন কৌশলে, যা একালে হঠাৎ কেউ মাথায় আনতেই পারত না!

জামাতুল্লা বললে—পানি দেখে তখনি আমার সন্দেহ হয়েছে। আমি ভাবছি এত নোনা পানি কেন ঘরের মধ্যে?

সুশীল বললে—আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল জামাতুল্লা! তা হলে সনৎ আজ এভাবে—

—তখন কী করে জানব বাবুজি? ঐ নালিদুটো গাঁথা আছে—ও দিয়ে জোয়ারের সময় সমুদ্দুরের নোনা পানি ঢোকে—দিনে একবার রাতে একবার। আমার কী মনে হয় জানেন বাবুজি, ওই দুটো নালি এমন ফন্দি করে গাঁথা হয়েছিল যে—

সুশীল বললে—আমার আর একটা কথা মনে হয়েছে জান? ওই দুটো নরকঙ্কাল যা দেখলে, জলে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরেছে। মূর্খের মতো ঢুকেছে, জানত না। যেমন আমরা—সনৎ যেমন—

—কী জানত না?

যে স্বয়ং ভারত মহাসমুদ্র প্রাচীন চম্পারাজ্যের রত্নভাণ্ডারের অদৃশ্য প্রহরী। কেউ কোনোদিন সে-ভাণ্ডার থেকে কিছু নিতে পারবে না, মানমন্দিরের রত্নশৈল তার একখানি সামান্য নুড়িও হারাবে না।—সুশীল বললে—কিন্তু জল যায় কোথায় জামাতুল্লা? এত জল? আমার কী মনে হয় জান—

—আমারও তা মনে হয়েছে। ওই ঘরের নিচে আর-একটা ঘর আছে, সেটা আসল ধনভাণ্ডার। বেশি জল বাধলে ঘরের মেঝে একদিকে ঢাল হয়ে পড়ে জলের চাপে—সব জল

ওপরের ঘর থেকে নিচের ঘরে চলে যায়।

সুশীল বললে—স্টিম পাম্প আনলেও তার জল শুকোনো যাবে না, কারণ—তা হলে গোটা ভারত মহাসাগরকেই স্টিম পাম্প দিয়ে তুলে ফেলতে হয়—ওর পেছনে রয়েছে গোটা ভারত সমুদ্র। সে জামাতুল্লার দিকে চেয়ে বিষাদের সুরে বললে—এই হল তোমার আসল বিহ্মমুনি—সমুদ্র, বুঝলে জামাতুল্লা?

ওরা সেই বনের গভীরতম প্রদেশের একটা পুরনো মন্দির দেখলে। মন্দিরের মধ্যে এক বিরাট দেবমূর্তি, সুশীলের মনে হল, সম্ভবত বিষ্ণুমূর্তি।

যুগযুগান্ত কেটে গেছে, মাথার ওপরকার আকাশে শত অরণ্যময়ূরীদের নর্তন শেষ হয়ে আবার শুরু হয়েছে, রক্তাশোকতরুর তলে কত সুখসুষুপ্ত হংসমিথুনের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে—সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে ঘৃতপক্ক অমৃতচরুর চারু গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর কতদিন হয়েছে আমোদিত—কত উত্থান, কত পতনের মধ্যে দেবতা অবিচল দৃষ্টিতে বহুদূর অনন্তের দিকে চেয়ে আছেন, মুখে সুকুমার সব্যঙ্গ মৃদু চাপা হাসি—নিরুপাধি চেতনা যেন পাষাণে লীন, আত্মস্থ।

সুশীল সসম্ভ্রমে প্রণাম করল—দেবতা, সনৎ ছেলেমানুষ—ওকে তোমার পায়ে রেখে গেলুম—ক্ষমা কোরো তুমি ওকে!

* * *

সুশীল কলকাতায় ফিরেছে।

কারণ যা ঘটে গেল, তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ইয়ার হোসেন সন্দেহ করেনি। সনৎ একটা কূপের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছে শুনে ইয়ার হোসেন খুঁজে দেখবার আগ্রহও প্রকাশ করেনি। চীনা মাঝি জাঙ্ক নিয়ে এসেছিল—তারই জাঙ্কে সবাই ফিরল সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ান মেলবোট ধরে কলম্বো।

কলম্বোর এক জহুরির দোকানে জামাতুল্লা সেই হর্তুকির মতো জিনিস দেখাতেই বললে—এ খুব দামি জিনিস, ফসিল অ্যাম্বার—বহুকালের অ্যাম্বার কোনো জায়গায় চাপা পড়ে ছিল।

দুখানা পাথর দেখে বললে—আনকাট এমারেল্ড খুব ভাল ওয়াটারের জিনিস হবে কাটলে। আন্নামালাইয়ের জহুরীরা এমারেল্ড কাটে, সেখানে গিয়ে কাটিয়ে নেবেন। দামে বিকোবে।

সবসুদ্ধ পাওয়া গেল প্রায় সত্তর হাজার টাকা। ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি না দিয়ে ওরা তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দশ হাজার টাকা পাঠালে—সেই মাদ্রাজি বিধবাকে পাঠালে বিশ হাজার—বাকি টাকা তিন ভাগ হল জামাতুল্লা, সনতের মা ও সুশীলের মধ্যে।

টাকার দিক থেকে এমন কিছু নয়, অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেকখানি। কত রাত্রি গ্রামের বাড়িতে নিশ্চিন্ত আরাম-শয়নে শুয়ে ওর মনে জাগে মহাসমুদ্রপারের সেই প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের অরণ্যাবৃত ধ্বংসস্তূপ..সেই প্রশান্ত ও রহস্যময় বিষ্ণুমূর্তি...হতভাগ্য সনতের শোচনীয় পরিণাম....অরণ্যমধ্যবর্তী তাঁবুতে সে-রাত্রির সেই অদ্ভুত স্বপ্ন। জীবনের গভীর রহস্যের কথা ভেবে তখন সে অবাক হয়ে যায়।

জামাতুল্লা নিজের ভাগের টাকা নিয়ে কোথায় চলে গেল, তার সঙ্গে আর সুশীলের দেখা হয়নি।

গ্রন্থকারের কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা

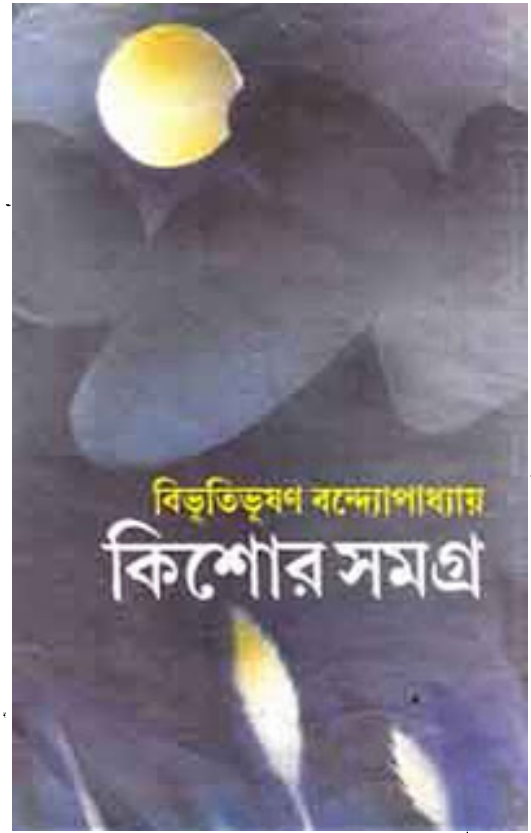

ভূত

কী বাদামই হত শ্রীশ পরামানিকের বাগানে! রাস্তার ধারেই বড় বাগানটা। অনেক দিনের প্রাচীন গাছপালায় ভর্তি। নিবিড় অন্ধকার বাগানের মধ্যে—দিনের বেলাতেই!

একটু দূরে আমাদের উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালা। রাখাল মাস্টারের স্কুল। একটা বড় তুঁত গাছ আছে স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেজন্যে আমরা বলি 'তুঁততলার স্কুল'।

দুজন মাস্টার আমাদের স্কুলে। একজন হলেন হীরালাল চক্রবর্তী। স্কুলের পাশেই এঁর একটা হাঁড়ির দোকান আছে, তাই এঁর নাম 'হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার'।

মাস্টার তো নয়, সাক্ষাৎ যম। বেতের বহর দেখলে, পিলে চমকে যায় আমাদের। টিফিনের সময় মাস্টার মশায়েরা সব ঘুমুতেন। আমরা নিজের ইচ্ছেমতো মাঠে-বাগানে বেরিয়ে ঘন্টাখানেক পরেও এসে হয়তো দেখি তখনও মাষ্টার মশায়দের ঘুম ভাঙে নি। সুতরাং তখন আমাদের টিফিন শেষ হল না—টিফিনের মানে হচ্ছে ছুটি মাস্টার মশায়দের, ঘুমুবার ছুটি।

সেদিনও এমনি হল।

রেললাইন আমাদের স্কুল থেকে অনেক দূরে। আমরা মাৎলার পুল বেড়িয়ে এলাম, রেললাইন বেড়িয়ে এলাম—ঘন্টাখানক পরে এসেও দেখি এখনও হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের নাক ডাকচে!

নারাণ বল্লে—ওরে চুপ চুপ, চেঁচাসনি, চল ততক্ষণ পরামানিকদের বাগানে বাদাম খেয়ে আসি—

আমাদের দলে সবাই মত দিলে।

আমি বল্লাম—বাদাম পাড়া সোজা কথা?

—তলায় কত পড়ে থাকে এ-সময়—

—চল তো দেখি!

এইবার সবাই আমরা মিলে পরামানিকদের বাগানে ঢুকলাম পুলের তলার রাস্তা দিয়ে। দুপুর দুটো, রোদ ঝম্ ঝম্ করচে। শরৎকাল, রোদের তেজও খুব বেশি।

গত বর্ষায় আগাছার জঙ্গল ও কাঁটাঝোপের বেজায় বৃদ্ধি হয়েচে বাগানের মধ্যে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ। এখানে-ওখানে মোটা লতা গাছের ডাল থেকে নেমে নিচেকার ঝোপের মাথায় দুলচে। আমরা এ-বাগানের সব অংশে যাইনি, মস্ত বড় বাগানটা। পাকা রাস্তা থেকে গিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত লম্বা।

পেয়ারাও ছিল কোনো কোনো গাছে। কিন্তু অসময়ের পেয়ারা তেমন বড় হয়নি। ফল আরও যদি কোনো রকম কিছু থাকে, খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারের দিকে চলে গেলাম। বাদাম তো মিললই না। যা-বা পাওয়া গেল, ইঁট দিয়ে ছেঁচে তার শাঁস বের করবার ধৈর্য আমার ছিল না। সুতরাং দলের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। নদীর দিকে বন বেজায় ঘন। এদিকে বড় একটা কেউ আসে না।

খসখস শব্দে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে শেয়াল চলে যাচ্চে। কুল্লো পাখি ডাকচে উঁচু তেঁতুল গাছের মাথায়। আমার যেন কেমন ভয় ভয় করচে।

আমাদের স্কুলের ছেলেরা কানে হাত দিয়ে গায়—

ঠিক দুকখুর বেলা—
ভূতে মারে ঢ্যালা—
ভূতের নাম রসি
হাঁটু গেড়ে বসি—

সঙ্গে সঙ্গে তারা অমনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এসব করলে নাকি ভূতের ভয় চলে যায়।

আমার সঙ্গে কেউ নেই—ঠিক দুপুর বেলাও বটে! মস্তরটা মুখে আউড়ে হাঁটু গেড়ে বসব? কিন্তু ভূতের নাম রসি হল কেন, শ্যামও হতে পারত, কালো হতে পারত, নিবারণ হতেই বা আপত্তি কী ছিল?

একটা বাঁক ঘুরে বড় একটা বাঁশবন আর নিবিড় ঝোপ তার তলায়।

সেখানটায় গিয়ে আমার বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

একটা আমড়া গাছের তলায় ঘন ঝোপের মধ্যে আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে আছে বরো বাগদিনী।

ভাল করে উঁকি মেরে দেখলাম। হ্যাঁ, ঠিক—বরো বাগদিনীই বটে, সর্বনাশ!

সে যে মরে গিয়েছে!

বরো বাগদিনীর বাড়ি আমাদের গাঁয়ের গোঁসাইপাড়ায়। অশত্থতলার মাঠে একখানা দোচালা কুঁড়েঘরে সে থাকত, কেউ ছিল না তার। পাল মশায়ের বাড়ি ঝিগিরি করত অনেক দিন থেকে। তারপর তার জ্বর হয়, এই পর্যন্ত জানি। একদিন তাকে আর দেখা যায় না।

মাস দুই আগের কথা। একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল বাঁওড়ের ধারে বাঁশবনে—শেয়াল কুকুরে তাকে খেয়ে ফেলেছে অনেকটা। সেই রকমই কালো রোগা-মতো দেহটা, বরো বাগদিনীর মতো। সকলে বল্লে, জ্বরের ঘোরে বাঁওড়ে জল তুলতে গিয়ে বরো গিয়েচে।

সেই বরো বাগদিনী আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে দিব্যি বসে!

আমি এক ছুটে বনবাগান ভেঙে দিলাম ছুট পাকা রাস্তার দিকে। যখন বাদামতলায় দলের মধ্যে এসে পৌঁছলাম তখন আমার গা ঠকঠক্ করে কাঁপছে!

ছেলেরা বল্লে—কী হয়েছে রে? অমন কচ্ছিস কেন?

আমি বল্লাম—ভূত।

—কোথায় রে? সে কী! দূর—

—বরো বাগদিনী বসে আছে ঝোপের মধ্যে আমড়াতলায়—সেই নদীর ধারের দিকে। স্পষ্ট বসে আছে দেখলাম।

—সে কী রে? তা কখনও হয়?

—নিজের চোখে দেখলাম। একেবারে স্পষ্ট বরো বাগদিনী—

—দূর—চল তো যাই—দেখি কেমন? তোর মিথ্যে কথা—

সবাই মিলে যেতে উদ্যত হল—কিন্তু সেই সময় দলের চাঁই নিমাই কলু বল্লে,—না ভাই। ওর কথায় বিশ্বাস করে অতদূর গিয়ে স্কুলে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। এতক্ষণ মাস্টারদের ঘুম ভেঙেচে। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের বেতের বহর জান তো! সে ঠ্যালা সামলাবে কে? আমি ভাই যাব না—তোমরা যাও—ওর সব মিথ্যে কথা—

ছেলের দলের কৌতূহল মিটে গেল হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের বেতের বহর স্মরণ করে। একে একে সবাই স্কুলের দিকে চলল। আমিও চল্লাম।

আমরা গিয়ে দেখি মাস্টার মশায়দের ঘুম খানিক আগেই ভেঙেচে—ওঁদের গতিক দেখে মনে হল। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার আমাদের শূন্য ক্লাসরুমের সামনে অধীরভাবে পায়চারি করছিলেন—আমাদের আসতে দেখে বলে উঠলেন—এই যে! খেলা ভাঙল?

আমরাও বলতে পারতাম, আপনার ঘুম ভাঙল?...কিন্তু সে-কথা বলে কে? তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে আমরা তখন সবাই এতটুকু হয়ে গিয়েছি।

ক্লাসে ঢুকেই তিনি হাঁকলেন—রত্না! অর্থাৎ আমি। এগিয়ে গেলুম।

—কোথায় থাকা হয়েছিল?

আমি তখন নবমীর পাঁঠার মতো জড়সড় হয়ে কাঁপচি। এদিকে বরো বাগদিনী ওদিকে হাঁড়ি-বেঁচা-মাস্টার। আমার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে উঠেচে! কিন্তু শেষ অস্ত্র ছিল আমার হাতে, তা ত্যাগ করলাম।

বল্লাম—পণ্ডিত মশাই, দেরি হয়ে গেল কেন ওরা জানে। এই সর্ব পরামানিকের বাগানে বাদাম কুড়ুতে গিয়ে ভূত দেখেছিলাম—তাই—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের মুখে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক যুগপৎ ফুটে উঠল। বল্লেন—ভূত? ভূত কী রে?

—আজ্ঞে, ভূত—সেই যারা—

—বুঝলাম বাঁদর! কোথায় ভূত? কী রকম ভূত?

সবিস্তারে বল্লাম। আমার সঙ্গীরা আমায় সমর্থন করলে। আমায় কী রকম হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে দেখেছিল, বল্লে সে কথা! হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার ডেকে বল্লেন—শুনচেন দাদা?

রাখাল মাস্টার তামাক খাওয়ার যোগাড় করছিলেন, বল্লেন—কী?

—ওই কী বলে শুনুন। রত্না নাকি এখুনি ভূত দেখে এসেচে সর্ব পরামানিকের বাগানে।

—সর্ব পরামানিক কে?

—আরে, ওই শ্রীশ পরামানিকের বাবার নাম। ওদেরই বাগান।

আবার বর্ণনা করি সবিস্তারে।

রাখাল মাস্টার গোঁড়া ব্রাহ্মণ,—হাঁচি, টিকটিকি, জল-পড়া, তেল-পড়া সব বিশ্বাস করতেন। গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলেন—তা হবে না? অপঘাত মৃত্যু—গতি হয়নি—

হাঁড়ি-বেঁচা-মাস্টার একটু নাস্তিক প্রকৃতির লোক। অবিশ্বাসের সুর তখনও তাঁর কথার মধ্যে থেকে দূর হয়নি। তিনি বল্লেন—কিন্তু দাদা, এই দুপুর বেলা, ভূত থাকবে বাগানে বসে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে!

—তাতে কী? তা থাকবে না ভূত এমন কিছু লেখাপড়া করে দিয়েচে নাকি? তোমাদের আবার যত সব ইয়ে—

—আচ্ছা চলুন গিয়ে দেখে আসি।

ছেলেরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে সমর্থন করলে।

রাখাল মাস্টার বলেন,—হ্যাঁ, যত সব ইয়ে—ভূতও তোমাদের জন্যে সেখানে এখনো বসে আছে কি না? ওরা হল কী বলে অশরীরী—মানে ওদের শরীর নেই—ওরা মানে বিশেষ অবস্থায়—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার বল্লেন—চলুন-না দেখে আসি গিয়ে কী রকম কাণ্ডটা, যেতে দোষ কী?

আমরা সকলেই তো এই চাই। এঁরা গেলে এখুনি ইস্কুলের ছুটি হবে এখন। সেদিকেই আমাদের ঝোঁকটা বেশি।

যাওয়া হল সবাই মিলে।

হুড়মুড় করে ছেলের পাল চলল মাস্টারদের সঙ্গে।

আমি আগে আগে, ওরা আমাদের পেছনে।

সেই নিবিড় ঝোপটাতে আমি নিয়ে গেলাম ওদের সকলকে। যে-দৃশ্য চোখে পড়ল, তা কখনও ভুলব না—এত বৎসর পরেও সে-দৃশ্য আবার যেন চোখের সামনে দেখতে পাই এখনও!

সবাই মিলে ঝোপ-ঝাপ ভেঙে সেই আমড়াতলায় গিয়ে পৌঁছলাম।

যা দেখলাম, তা অবিকল এই—

আমড়াগাছের তলায় একটা ছেঁড়া, অতি-মলিন, অতি-দুর্গন্ধ কাঁথা পাতা, পাশে একটা ভাঁড়ে আধ-ভাঁড়টাক জল। একরাশ আমড়ার খোসা ও আঁটি জড় হয়েচে পাশে—কতক টাটকা, কতক কিছু দিন আগে খাওয়া, একরাশ কাঁচা তেঁতুলের ছিবড়ে, পাকা চালতার ছিবড়ে—শুকনো।

ছিন্ন কাঁথার ওপর জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধা বরো বাগদিনী মরে পড়ে আছে। খানিকটা আগে মারা গিয়েচে।

এ-সমস্যার কোনো মীমাংসা হয়নি।

আমরা হৈ-হৈ করে বাইরে গিয়ে খবর দিলাম। গ্রাম্য চৌকিদার ও দফাদার দেখতে এল। কেন যে বরো বাগদিনী এই জঙ্গলে এসে লুকিয়ে ছিল নিজের ঘর ছেড়ে—এ-প্রশ্নের উত্তর কে দেবে! কেউ বল্লে, ওর মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কেউ বল্লে, ভূতে পেয়েছিল।

কিন্তু বরো বাগদিনী মরেছে অনাহারের শীর্ণতায় ও সম্ভবত আশ্বিন-কার্তিক মাসের ম্যালেরিয়ায় ভুগে। কেউ একটু জলও দেয়নি তার মুখে।

কে-ই-বা দেবে এ জঙ্গলে? জানতই-বা কে?

বরো বাগদিনীর এ-আত্মগোপনের রহস্য তার সঙ্গেই পরপারে চলে গেল।

এয়ার গান

হাবুল নাকি পাস করেছে ফার্স্ট হয়ে। কথাটা শুনে গর্বে তার বুকটা তো ফুলে উঠল দশ হাত। হাওয়ার ওপর ভর করে সে ফিরে এল বাড়িতে ধীরে ধীরে। বিপুল আনন্দে সারা রাত্রি তার ভাল ঘুমই হল না। মাকে কথাটা বলতে মা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, 'সুখী হও—বড় হও বাবা!'

সত্যি, তার এই দীর্ঘদিনের খাটুনি সার্থক হয়েচে। বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে কত রাত্রি জেগে সে বই পড়ে গেছে, তার পড়ার বই একাগ্রচিত্তে। আজ তার পরিণতি ওর প্রথম হওয়া। সকলে তো কথাটা শুনে বিশ্বাসই করতে চায় না। স্কুলের ছেলেরা তো প্রথমে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিল একেবারে। সারাদিন যে আড্ডা মেরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সে এত উন্নতি করলে কী করে? তবু হাবুল ফার্স্ট হল—

শীতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ঝির ঝির করে। হাবুলের ঘুম ভেঙে গেল; ধড়মড় করে উঠে বসল। মনে পড়ল গতকালের ঘটনা—তার প্রথম হবার কথা। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। হাবুল গিয়ে দাঁড়াল তার ছোটকাকার ঘরের দরজায়। ছোট কাকা তখন ঘুমুচ্ছেন নাক ডাকিয়ে লেপের মধ্যে। হাবুল ডাকল, 'ছোটকাকা—ছোট-কাকা!'

ছোট কাকার ঘুম ভাঙল। তিনি দু-হাত দিয়ে চোখ রগড়ে উত্তর দিলেন, 'কী রে হাবুল!'

হাবুল বললে, 'কাকা, আমি ফার্স্ট হয়েচি।'

এমন সময় এই সকালে টুনু এসে হাজির হয়। সে হাবুলের কথা শুনে তীব্র প্রতিবাদ করলে, 'কক্ষনো না ছোটকাকা!'

হাবুল রুখে উঠল, 'তুই জানিস টুনু!'

টুনুও দমে না একটুও, 'ইস। উনি আবার ফার্স্ট হবেন? তবে যদি টোকেন, সে-কথা আলাদা।'

হাবুলের রাগ চড়ে গেল। সে ঠাস করে টুনুর কচি গালে একটা চড় মেরে বললে, 'বাবা সাক্ষী। কাল রাত্রে হেডমাস্টার মশায় বললেন, জানিস সে-কথা? সকাল বেলা এসেচেন চালাকি কর্তে।'

টুনু গালে হাত বুলোতে থাকে বেদনায়। ছোটকাকা বললেন, 'ছিঃ, মারলি কেন রে ওকে?'

'দেখলে তো কী হিংসুটে!'

'এরকম চড় তোমার গালেও পড়বে অখন।' কথার শেষে টুনু ছলছল্ চক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পর হাবুল বললে,—ছোটকাকা, তুমি বলেছিলে, ফার্স্ট হলে আমাকে একটা এয়ার গান কিনে দেবে।'

'ও!' এতক্ষণ পর ছোটকাকার আট মাস আগেকার প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে গেল। বললেন, 'বেশ বেশ, কাল কিনে দেব।'

'কাল না—আজই।'

ঠিক আট মাস আগে হাবুল একদিন ওর ক্লাসফ্রেন্ড ভুলোদের বাড়িতে দেখেছিল তার একটা এয়ার গান। হাবুলেরও একটা এয়ার গান কিনবার ভারি শখ হল। কথাটা তার ছোট কাকাকে বলতে তিনি বললেন, 'ফার্স্ট হলে এয়ার গান তোকে প্রাইজ দেব।'

হাবুল উঠে-পড়ে লেগে গেল প্রথম হবার জন্যে এবং প্রথম হল যথাসময়ে।

সেদিনই সে একটা এগায় গান কিনে আনলে। তারপর সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ করে এয়ার গান হাতে ঝুলিয়ে বাড়িময় খুঁজতে লাগল শিকার। কোথাও বসেছে একটা অসহায় চড়াই কিংবা পায়রা। তাকে লক্ষ্য করে এয়ার গানে আওয়াজ হল ফট ফট শব্দে। পাখি উড়ে পালাল অক্ষত শরীরে আর গুলি বেরিয়ে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে, পাখির দশ হাত তফাত দিয়ে প্রায়।

হতাশ হয়ে ও ফিরে এল হাত-ঠিক করবার জন্যে, যাতে সে পুনরায় না লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘরের দরজার চৌকাঠে বসে, ও লক্ষ করলে দেওয়ালে টাঙানো একটা বিলিতি ক্যালেন্ডারে ছবির মুখ। অনেকক্ষণ পর তার এয়ার গান থেকে শব্দ বেরুল ফট করে—গুলিও ছুটে চলল ছবিতে একটা ছেলের ঠিক মুখের পানে। তারপর আওয়াজ হল ঝন-ঝন-ঝন। ভয়ে হাবুলের মুখ হয়ে গেল পাংশু। সে দৌড়ে গেল। দেখলে মেঝেতে

ছড়ান অগুন্তি কাচের টুকরো। আস্তে আস্তে ক্যালেন্ডারটা তুলে ধরতে দেখলে, দেওয়ালে কালী ঠাকুরের একখানা পট ফ্রেম দিয়ে মুড়ে কাচ দিয়ে ঢাকা। ছবিখানাকে ক্যালেন্ডারটা ঢেকে ছিল এতক্ষণ। লোহার গুলির ঘায়ে ভঙ্গুর কাচই গেছে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে। বুকের ভেতরটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠল আতঙ্কে। চোখের সামনে লকলক করতে লাগল কালী ঠাকুরের দীর্ঘ জিভ। ভয়ে ও ভাবনায় সে মুষড়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে ফেললে কাচগুলো। মা জানলে তো এক্ষুনি রসাতল করে ফেলবেন।

তখন মধ্যাহ্ন-প্রায়। হাবুল ধীরে ধীরে চলে গেল ছাতের 'চিলকুঠরি'র ভেতর। সেখান থেকে লক্ষ করলে পাশের বাড়ির আঙিনায়-বসা একটা কাককে। কাকও সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালিয়ে গেল তাকে বিদ্রূপ করে হয়তো। হাজার হোক, কাক বড় ধূর্ত প্রাণী।

নিচে যেতে হাবুলের আর সাহস হচ্ছে না। টুপ করে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে একটা চটের উপর বসে থাকে জানলা দিয়ে দূরের পানে তাকিয়ে। কাক কিংবা পায়রা কিংবা চড়াই এলে, ও গুলি ছুঁড়ে মারবে তাকে। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে ও সামনের বাড়ির ট্রাঙ্কটাকে লক্ষ্য করে ফেলে। গুলির আঘাতে ট্রাঙ্কটাও বেজে ওঠে ঝন্-ঝন্-ঝন্।

মনে আবার আনন্দ ফিরে আসে। হ্যাঁ, হাত অনেকটা ভাল হয়েছে। আবার সে লক্ষ্য করে পাঁচিলের ওপরের একটা ফুলগাছের টবে। সেটায় আওয়াজ হয় খট করে।

আনন্দ ওর বেড়ে যায় চতুর্গুণ। বন্দুকটা নেড়েচেড়ে ভাল করে পরীক্ষা করে। হ্যাঁ, একদিন ও বড় বন্দুকও ছুঁড়তে পারবে নিশ্চয়। এই হল তার সূচনা। বড় হলে সে চলে যাবে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মঙ্গো পার্কের মতো। অসংখ্য জন্তু-জানোয়ার শিকার করে, ও দেখাবে ওর শৌর্য-বিক্রম। বাঙালি ভীরু নয়—বীরের জাতি—ও তা প্রমাণ করবে। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ওর ফটো ছাপান হবে। ও দাঁড়িয়ে থাকবে হাফ প্যান্ট পরে বন্দুক-হাতে, আর পায়ের কাছে পড়ে থাকবে বিরাটকায় হিংস্র জন্তুর নিহত দেহটা। পুলকে ওর হৃদয় ভরে গেল এখনই। কৃষ্ণ মহাদেশের গভীর অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসবে মানুষ-খাদক জাতি সভ্য মানুষের গন্ধে, ও তাদের দেখে ভয় পাবে না একটুও। বরং ওর বন্দুক ছুঁড়ে দেবে গুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম। শিক্ষা হয়ে যাবে তাদের রীতিমতো। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে কতকগুলো ইতস্তত ভূমিতে। আর সবাই পালিয়ে যাবে এই আশ্চর্য কল দেখে। নিরীহ হাবুল এখনই যে নিষ্ঠুর শিকারী হয়ে উঠল সম্পূর্ণরূপে! রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল ওর ধমনীতে-ধমনীতে। ও পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভেতর এয়ার গনটা হাতে ঝুলিয়ে আফ্রিকার রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে। অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে ও ইতিহাসের পাতায়। নেপোলিয়ন কিংবা নেলসনের চেয়ে ও কোনো অংশে হেয় নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন নাকি পেছনে হাত দিয়ে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাঁর পাশ দিয়ে শন শন করে গুলি চলে গেলেও তিনি গ্রাহ্য করতেন না আদৌ। ঠিক সেই ভঙ্গিমায় সেই স্বর্গীয় বীরের অনুকরণে ও দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মধ্যে জানলার পানে মুখ করে।

কিন্তু ও কী? সামনের বাড়ির ট্রাঙ্কের ওপর একটা বাঁদর যে! তাই এত কাক ডেকে উঠছে অবিশ্রান্ত, তাদের বিকট রব তার কানে যায়নি এতক্ষণ। কারণ সে কলকাতা ছেড়ে এযাবৎ আফ্রিকার গভীর অরণ্যে পড়ে ছিল শিকারের খোঁজে। ওর বুকের ভেতরটা যেন দুর-দুর করে উঠল। ও ওর বন্দুকটা একবার ভাল করে দেখে নিলে—বাঁদরটা বেশ বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট। আর ওদিকে বাঁদরটা ঝুপ করে হাবুলের ঘরের দরজার কাছে এসে উপস্থিত হল। বীর পুরুষের কাঁপনি শুরু হয়, রীতিমতো হাঁটুতে-হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে যায়, নেলসনের ও নেপোলিয়নের মতো। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বাঁদরটার পানে। ঘরের এক পাশে ছিল একছড়া বড় চাঁপা কলা। বাঁদরটা একপা একপা করে এগিয়ে আসে সেই কলার দিকে—বাঁদর নাকি কলা খেতে বড় ভালবাসে। হাবুলের সামনে এই নিদারুণ ডাকাতি ঘটে যায়! সে আর দেখতে পারে না, মরিয়া হয়ে, তার সমস্ত শক্তি একত্র করে দাঁড়ায় কলা ও বাঁদরের মাঝখানে জন্তুটাকে এয়ার গান দিয়ে লক্ষ্য করে। এয়ার গানের ঘোড়া দিলে টিপে; কিন্তু তাতে গুলি পোরা ছিল না একটাও। সুতরাং বাঁদরের ক্ষতি হয় না আদৌ। পরন্তু তার রাগ বেড়ে যায় এই বাধা দেওয়ার জন্যে। সে ত্বরিতে এসে হাবুলের গালে মারে একটা বিরাশি সিক্কার চড়। বেচারার মাথা ঘুরতে থাকে বনবন করে। নেপোলিয়ন গালে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। এয়ার গান পড়ে থাকে তার পদতলে। বাঁদরটাও সুযোগ বুঝে এয়ার গানটা নিয়ে উধাও হয় পাশের নিমগাছের ডালে। হাবুলও প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে বাঁদরের এই বেয়াদপি দেখে। মনে পড়ে টুনুর গালের ব্যথা আর কালীর ছবির কাচ ভাঙার কথা।

তার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন মা দাদা, ছোটকাকা, মায় টুনু। হৈচৈ পড়ে যায়, 'কী হয়েচে রে হাবুল? কী হয়েচে?'

নিরুত্তর হাবুল করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে পলাতক বাঁদরের পানে। টুনু তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ওই দ্যাখো ছোটকাকা, ছোড়দার এয়ার গান বাঁদরের হাতে।'

'কী ছেলে রে তুই? বাঁদরে তোর হাত থেকে এয়ার গানটা নিয়ে গেল? অমন খাসা জিনিসটা, ন-টাকা দশ আনা দাম!'

আর হাবুল?—সে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্ঠুর অপমানে ও পরাজয়ে হৃদয় ভারাক্রান্ত করে।

শুভ কামনা

১৯২৫ সালের কথা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সুধীরবাবুদের দোকানে যাই। সেখানে তখন প্রতি বিকালে একটি সাহিত্যিক আড্ডা হত। আমি তখন নতুন সাহিত্যিক, 'প্রবাসী'তে কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছি মাত্র—এবং 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের খসড়া করচি। তাঁদের এই বৈকালিক আড্ডাটি আমার বড় ভাল লাগত। কাজকর্মের অবসরের মাঝে মাঝে 'মৌচাক' আপিসে এসে এই আড্ডাতে যোগ দিতাম। ১৯২৯ সালে আমি কলকাতায় আবার ফিরে আসি, কয়েক বৎসর বিহার প্রবাসের পরে। ঐ বৎসরেই 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়। ঐ সাল থেকে 'মৌচাক' আপিসে আমার যাওয়া আসা বাঁধা নিয়মে শুরু হয়ে গেল।

অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী, মজলিসী ও রসিক ব্যক্তির সমাগমে 'মৌচাক'-এর এ-আড্ডা গমগম করত। এইখানে বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। সুধীরবাবুর আদর আপ্যায়নে কত বর্ষার বৈকাল ও শীতের সন্ধ্যায় চায়ের মজলিস এখানে সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠেচে। কত

ঠোঙা ঠোঙা 'অবাক জলপান', ফেরিওয়ালার ঝুলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বাদল দিনে অতিথি-সৎকারে সহযোগিতা করেচে ; 'মৌচাক'-এর ইতিহাসের সঙ্গে সেসবের ইতিহাসও জড়ানো।

একদিন সুধীরবাবু বললেন--বিভূতিবাবু, মৌচাকের জন্যে লিখবেন?

আমি তো একপায়ে খাড়া। বললুম—নিশ্চয়ই।

—কী লিখবেন বলুন। ছেলেদের উপন্যাস দিন। কী বলেন?

এভাবে ছেলেদের জন্য লেখা উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়'-এর সূত্রপাত। সুধীরবাবুর উৎসাহ না পেলে হয়তো ও-বই লেখাই হত না।

আজকাল কলকাতা থেকে দূরে বাস করি। কিন্তু 'মৌচাক'-এর বৈকালিক আড্ডার আকর্ষণ এমন মোহ বিস্তার করেচে মনে যে, কলকাতায় এলেই ওখানে না গিয়ে পারি না। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও যাওয়া চাই-ই। বন্ধুবর সরোজ রায়চৌধুরী আসে, মণীন্দ্র বসু আসে, সুধীরবাবু ও অপূর্ব তো থাকেনই—অতীত দিনের আনন্দ-মুহূর্তগুলি আবার যেন সজীব হয়ে ওঠে। সেসব দিনের হারানো অনুভূতিগুলি আবার যেন ফিরে পাই। সেজন্যই, 'মৌচাক' কাগজের ওপর আমার কেমন একটা ব্যক্তিগত টান আছে—এর ভালমন্দ ব্যক্তিগত লাভক্ষতির দৃষ্টি নিয়ে দেখি।

আমি জানি 'মৌচাক' শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দবর্ধন করে না, তাদের পিতামাতারও অবসর বিনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

চাঁইবাসায় একটি বন্ধু গভর্নমেন্টের এনজিনিয়ার ও বিদ্বান ব্যক্তি। আমায় বললেন—এবার 'মৌচাক'-এ হেম বাগচীর 'গরমেটো' কবিতা পড়েছেন?

আমি বললুম—এখনও পড়িনি।

—পড়ে দেখবেন। চমৎকার রস আছে ওর মধ্যে। আজ দুপুরে মশগুল হয়ে ছিলাম 'মৌচাক'খানা নিয়ে।

এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। একটা মাত্র মনে হল।

'মৌচাক'-এর লেখা যখন লিখতে বসি, তখন কল্পনা নেত্রে দেহি বহু ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও তাদের কর্মক্লান্ত পিতাঠাকুরদের উৎসুক দৃষ্টি, সবাই যেন এই লেখার দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে—তবে অক্ষমতার জন্যে তাদের সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ হয়তো সব সময় করে উঠতে পারি না—সে-কথা আলাদা।